পুঁথি

টিম মার্শালের বেস্ট সেলার বই
প্রিজনার্স অব জিওগ্রাফির

দ্বিতীয় পর্ব





সাম্রাজ্য গড়ে উঠবে, আবার ভেঙেও পড়বে—এটাই ইতিহাসের নিয়ম। আজকের মিত্রতা যে আগামীকালও টিকে থাকবে, তেমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। নেপোলিয়নের পতনের পর ইউরোপে যে রাজনৈতিক কাঠামো গড়ে উঠেছিল, তা টিকেছিল মাত্র ছয় দশক। নাৎসিদের স্বপ্নের 'হাজার বছরের রাইখ' ভেঙে যায় মোটামুটি এক দশকের মধ্যে। ক্ষমতার ভারসাম্য ভবিষ্যতেও বদলাবে। তবে সেটা ঠিক কীভাবে ঘটবে এখনই তা নির্ভুলভাবে বলা কঠিন। যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও রাশিয়ার মতো পরাশক্তিগুলো যথারীতি বিশ্ব রাজনীতিতে সক্রিয় থাকবে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং উদীয়মান শক্তি ভারতও পিছিয়ে থাকবে না। এর পাশাপাশি তুলনামূলকভাবে ছোট দেশগুলোর ভূমিকাও ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। কারণ বর্তমান পরিস্থিতিতে ছোট বা বড় শক্তি উভয়েরই পারস্পরিক সাহায্য প্রয়োজন। ছোট দেশগুলোর কৌশলগত নিরাপত্তার জন্য বড় রাষ্ট্রের সমর্থন যেমন প্রয়োজন, তেমনি বড় শক্তিগুলোও ছোটদের সহায়তাকে কাজে লাগিয়ে আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষা করে। এই পারস্পরিক নির্ভরতাই তুলনামূলকভাবে ছোট রাষ্ট্র যেমন তুরস্ক, সৌদি আরব কিংবা যুক্তরাজ্যের সামনে নতুন সুযোগ তৈরি করেছে। তারা এখন চেষ্টা করছে বৃহত্তর বৈশ্বিক মঞ্চে নিজেদের অবস্থান শক্ত করতে। ২০২০-এর দশকের শুরুতে এসে বিশ্ব যেন নতুন এক দাবার বোর্ডে রূপ নিয়েছে। গুটিগুলো সাজানো শেষ, এখন কেবল খেলা শুরুর অপেক্ষা। এই খেলায় টিম মার্শালের সাথে অংশ নিতে চাইলে আপনাকে স্বাগত।





puthii.com

দ্য পাওয়ার অব জিওগ্রাফি



দ্য পাওয়ার অব জিওগ্রাফি

টিম মার্শাল

ভাষান্তর

ইমরান ওয়াহিদ

সম্পাদনা

হিমাংশু কর



প্রথম প্রকাশ
অক্টোবর ২০২৫
প্রকাশক
হিমাংশু কর



পুঁথি
পুঁথি, ৩৩/২ বাংলাবাজার, ঢাকা
বিপণন দপ্তর
বাণিজ্য বিতান সুপার মার্কেট, দ্বিতীয় তলা
প্রচ্ছদ: রাশেদ আনোয়ার

ইমেইল: contact@puthii.com
ফোন: +8801950-886700
ওয়েবসাইট: https://puthii.com
পরিবেশক: জান্নাত কুতুবখানা
৩৮/২/ক, মান্নান মার্কেট, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
যোগাযোগ: ০১৭১১০৩১৭১১

মুল্য: ৭৩৪ টাকা মাত্র

The Power of Geography by Tim Marshall
First Published: October 2025
by Himangshu kar
Puthii Publication, 33/2, Banglabazar, Dhaka- 1100
Price: 20 USD
ISBN- 978-984-8993-20-0



উ ৎ স র্গ

আমার বাবাকে,

যিনি খুব ছোটবেলায় আমার জন্য 'আউটবই'-এর ভাণ্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। তাঁকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেই বলতেন, নিজে পড়ে নাও।
আমি এখনও পড়েই চলেছি।



সূচিপত্র

কিছু কথা

পারস্যের সম্রাট জেরেক্সিস একবার বিশাল বাহিনী নিয়ে গ্রিস আক্রমণ করেছিলেন। ওই সময় পারস্যের সেনাবাহিনী ছিল পৃথিবীর ভয়ংকর বাহিনীগুলোর মধ্যে একটি। বিপুল সংখ্যক সেনা নিয়ে পারস্যের বাহিনী এথেন্সে এসে ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। জ্বালিয়ে দেওয়া হয় এথেন্স শহর। ভয়ে অধিকাংশ নাগরিক পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেয় সালামিস দ্বীপে। এথেন্সের পশ্চিমে একটি সরু খাঁড়ির ওপারে অবস্থিত এই দ্বীপটি।

এথেন্সের এই বিপদের দিনে এগিয়ে আসেন এথেন্সের রাষ্ট্রনায়ক ও নৌ-অধিনায়ক থেমিস্টোক্লিস। তিনি ছিলেন এথেন্সের অন্যতম সেরা সামরিক কৌশলবিদ। কিন্তু পরিস্থিতি এতই ভয়াবহ ছিল যে তিনিও বুঝে উঠতে পারছিলেন না কি করবেন। তখন হঠাৎ তার মনে হয় ওরাকলের কথা। এই ঘটনার কয়েক মাস আগে ডেলফির ওরাকল এক রহস্যময় ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। সেই সতর্কবার্তায় বলা হয়েছিল: "একমাত্র কাঠের প্রাচীরই পারবে গ্রিসের পতন রোধ করতে।"

ওই সময় গ্রিসের রাজা, সৈন্য, ব্যবসায়ী, সাধারণ মানুষ সবাই ডেলফির ওরাকলের কাছে যেত ভবিষ্যৎ জানার জন্য। তখন ওরাকলের বানী শুনে অনেকেই মনে করেছিলেন, এথেন্স হয়ত খুব দ্রুতই একটি ভয়াবহ আক্রমণের শিকার হবে, আর অ্যাক্রোপলিসের চারপাশে কাঠের বেড়া তৈরি করা হলেই হয়ত এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাওয়া যাবে। কিন্তু থেমিস্টোক্লিস তো আর সাধারণ মানুষ না। তিনি ভূরাজনীতির সবগুলো দিক ভেবে দেখলেন যে, ওরাকল আসলে কাঠের প্রাচীন বলতে নৌবহরকে বোঝাতে চেয়েছে। অর্থাৎ "কাঠের প্রাচীর" মানে হলো এথেন্সের যুদ্ধজাহাজ।

তিনি তখন এথেন্সের নাগরিকদের নির্দেশ দেন শহর খালি করে সমুদ্রের দিকে চলে যেতে এবং সব শক্তি নৌবহর তৈরিতে কাজে লাগাতে। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে পারস্যের নৌবাহিনীকে সালামিসের সরু প্রণালীতে টেনে আনেন। পারস্যের যুদ্ধজাহাজগুলো ছিল বিশাল আকারের। ফলে এই সরু প্রণালীতে আসার পর এগুলো ঠিকমতো ঘুরতেও পারলো না। এথেন্সের ছোট আকারের জাহাজগুলো পারস্যের জাহাজগুলোকে একে একে ডুবিয়ে দিতে শুরু করল। সালামিসের এই নৌযুদ্ধ গ্রিক-পারস্য যুদ্ধের মোড়ই ঘুরিয়ে দেয় এবং ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জয় হিসেবে বিবেচিত হয়। ভূরাজনৈতিক কৌশলের কাছে হেরে যায় পৃথিবী সেরা সেনাবাহিনী।

থেমিস্টোক্লিস শুধু সৈনিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন ভূরাজনৈতিক কৌশলবিদ। তিনি বুঝেছিলেন, এথেন্সের শক্তি জমি বা দুর্গে নয়, বরং সমুদ্রে। এজিয়ান

সাগরের ভৌগোলিক গঠন, সরু প্রণালী, অসংখ্য দ্বীপ ও বাতাসের ধারাকে তিনি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন।

প্রাচীনকালে যতগুলো সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, তার প্রায় সবগুলোই গড়ে উঠেছিল হয় উর্বর অঞ্চলে, নয়তো এমন কোনো স্থানে যেখানে বাণিজ্য ও কৃষি একসঙ্গে বিকাশ লাভ করতে পারে। কিন্তু উর্বর জমির মতো যেকোনো প্রাকৃতিক সম্পদই সীমিত। আর সম্পদ সীমিত হলে সেই সম্পদ নিয়ে সংঘর্ষ বাঁধাটাও স্বাভাবিক। এজন্য সেই প্রাচীনকাল থেকেই সভ্যতা ও সাম্রাজ্যগুলো প্রতিনিয়ত যুদ্ধ-বিগ্রহে লিপ্ত থাকত। উর্বর সমতল ভূমি যেমন কৃষিকাজের জন্য খুবই ভাল, তেমনি এমন সমতল অঞ্চল আবার বহিঃশত্রুর আক্রমণ ঠেকানোর জন্য একদমই উপযুক্ত নয়। মেসোপটেমিয়া কিংবা মিশরের মতো সভ্যতাগুলো বারবার আক্রমণের শিকার হয়েছিল তাদের খোলা ও সহজগম্য ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে। অন্যদিকে পারস্য, গ্রীস কিংবা পরবর্তীকালে চীনের মতো পাহাড়-পর্বতবেষ্টিত অঞ্চলগুলো ছিল তুলনামূলকভাবে নিরাপদ।

এই কারণেই প্রাচীন রাষ্ট্রগুলোর জন্য ভৌগোলিক অবস্থান শুধু কৃষি বা অর্থনীতির প্রশ্ন ছিল না, বরং ছিল টিকে থাকার প্রশ্নও। তাই ভূগোলই অনেক সময় ঠিক করে দিত, কোন সভ্যতা বা কোন সাম্রাজ্য টিকে থাকবে আর কোনটা মুছে যাবে ইতিহাসের পাতা থেকে। এমনকি আজকের দিনেও একটি দেশের নেতৃবৃন্দ যখন তাদের পররাষ্ট্রনীতি ঠিক করেন, মিত্র নির্বাচন করেন বা বাণিজ্যিক পরিকল্পনা করেন, তাদের তখন মাথায় রাখতে হয় নিজের দেশের ভৌগলিক অবস্থান। আন্তর্জাতিক রাজনীতি এবং ভূরাজনীতি বোঝার জন্য তাই প্রয়োজন একটি দেশের ভৌগলিক অবস্থান ও ইতিহাস সম্পর্কে ভালোভাবে জানা।

টিম মার্শালের জিওগ্রাফি সিরিজটি এই বিষয়গুলো জানার জন্য খুবই সহায়ক। লেখক প্রতিটি অঞ্চলের আদি ইতিহাস থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত ভূরাজনৈতিক ঘটনাগুলোকে বিশ্লেষণ করেছেন একদম সহজ সরল ভাষায়। প্রিজনার্স অব জিওগ্রাফি যাদের ভাল লেগেছে, এই বইটিও তাদের ভাল লাগার কথা।

পুঁথির অন্যান্য বইয়ের মতোই এই বইয়ের অনুবাদের ক্ষেত্রেও অনুবাদ সহজ সরল করার ক্ষেত্রে জোর দেওয়া হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে জুড়ে দেওয়া হয়েছে প্রাসঙ্গিক তথ্যও। আমাদের প্রচেষ্টা যদি পাঠকদের জ্ঞানের চাহিদার সামান্য অংশও পূরণ করতে পারে তাহলে আমাদের চেষ্টা সার্থক মনে করব।

হিমাংশু কর
সম্পাদক ও প্রকাশক, পুঁথি

শুরুর কথা



বাজপাখি তখন শুনতে পায় না তার মনিবের কণ্ঠস্বর;
যখন সবকিছু ভেঙে পড়ে,
কেন্দ্র আর ভার ধরে রাখতে পারে না;

- *'দ্য সেকেন্ড কামিং'*, ডব্লিউ বি ইয়েটস

পারস্য উপসাগরের এক পাড়ে আরব উপদ্বীপের প্রায় পুরোটা দখল করে রেখেছে মরুভূমির দেশ সৌদি আরব। আর অপর পাড়ে মুখোমুখি বসে আছে বিশালকায় দূর্গের মতো দেশ ইরান। ধর্মীয় বিভাজন আর জ্বালানি সম্পদের জালে জড়িয়ে গোটা মধ্যপ্রাচ্যকে অস্থির করে রেখেছে এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী। ওদিকে প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণে রয়েছে অস্ট্রেলিয়া। দেশ হিসেবে আস্ত একটা মহাদেশকে পাওয়ার পরেও অস্ট্রেলিয়া মোটেও স্বস্তিতে নেই। কারণ ভূরাজনৈতিকভাবে তারা আটকে আছে বর্তমান সময়ের দুই প্রভাবশালী পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের ঠিক মাঝখানে। অন্যদিকে, গ্রিস ও তুরস্কের মধ্যকার দ্বন্দ্ব অনেক পুরোনো। সেই প্রাচীনকাল থেকে ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে অবস্থিত এই দেশ দুইটির মধ্যে নানা-রকম দ্বন্দ্ব লেগেই রয়েছে। আর সেই দ্বন্দ্ব যে কোনো মুহূর্তে রূপ নিতে পারে সহিংসতায়।

২০২০-এর দশকে আপনাদের স্বাগতম। মাত্র তিন দশক আগেও বিশ্ব বিভক্ত ছিল মার্কিন ও সোভিয়েত শিবিরে। অথচ সেই স্নায়ু যুদ্ধের যুগকে এখন মনে হয়

যেন সুদূর অতীতের কোনো স্মৃতি। বর্তমান সময়ে আমরা ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতার নতুন এক যুগে প্রবেশ করেছি। নতুন এই রঙ্গমঞ্চে শুধু পরাশক্তিই নয়, আরও বহু খেলোয়াড় সক্রিয়। এমনকি অনেক পার্শ্ব-চরিত্রও কেন্দ্রস্থলে জায়গা করে নিতে চাইছে। পাশাপাশি, এই প্রতিযোগিতা এখন আর কেবল পৃথিবীতেই সীমাবদ্ধ নেই—তা ছড়িয়ে পড়েছে বায়ুমণ্ডল পেরিয়ে, চাঁদ ছাড়িয়ে, মহাকাশ পর্যন্ত।

কোনো প্রচলিত ব্যবস্থা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে টিকে থাকলে সেটাকে স্থায়ী মনে হওয়া স্বাভাবিক। তাই বড় কোনো পরিবর্তন এলে মানুষের মনে স্বভাবতই উদ্বেগ ও অস্থিরতা জন্ম নেয়। কিন্তু ইতিহাস আমাদের দেখায়, বিশ্ব রাজনীতির কাঠামো কখনোই অপরিবর্তনীয় নয়। অতীতে তা যেমন বদলেছে, ভবিষ্যতেও বদলাবে। বেশ কিছুদিন হলো, আমরা এগিয়ে চলেছি মাল্টিপোলার বা বহুমেরু বিশ্বের দিকে। ইতিহাসের বেশিরভাগ সময় জুড়েই পৃথিবী একাধিক আঞ্চলিক শক্তির প্রভাববলয়ে বিভক্ত ছিল। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শুরু হয় এক নতুন অধ্যায়—বিশ্ব বিভক্ত হয় দুই মেরুতে। একদিকে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পুঁজিবাদী শিবির, অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার ঘনিষ্ঠ মিত্রদের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট শিবির। এই দ্বিমেরু প্রতিযোগিতা অর্ধশতকেরও বেশি সময় ধরে বৈশ্বিক রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। অবশ্য কেউ কেউ বলেন এই প্রতিযোগিতা নাকি একটানা আট দশক ধরে চলছে। আপনি কোথায় গিয়ে থামবেন, তা নিতান্তই আপনার দৃষ্টিভঙ্গি। সে যাই হোক, ১৯৯০-এর দশকে এসে পরিস্থিতি বদলে যায়। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের ফলে কমিউনিস্ট শিবির ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় এবং রাশিয়া নিমজ্জিত হয় অভ্যন্তরীণ সংকটে। অন্যদিকে, চীন তখনো বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে উত্থানের প্রাথমিক স্তরে। ফলে এক দশকেরও বেশি সময় ধরে যুক্তরাষ্ট্রই মূলত এককভাবে বিশ্ব রাজনীতির নিয়ন্ত্রক হয়ে উঠেছিল। বিশ্লেষকরা এই সময়কালকে বলেন 'ইউনিপোলার ডিকেড' বা 'একমেরুর দশক'। কিন্তু ২০০০ এর দশকে প্রবেশের পরপরই চিত্র পাল্টাতে শুরু করে। দেখা যাচ্ছে আমরা আবারও হয়তো মানব ইতিহাসের মূল স্রোতে ফিরে যাচ্ছি। ইতিহাসের অধিকাংশ সময়ের মতো, বর্তমান বিশ্বেও চলছে বহুপাক্ষিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

এই পট পরিবর্তনের শুরুটা ঠিক কোন সময় বা কোন ঘটনার মধ্য দিয়ে হয়েছিল, তা নির্দিষ্ট করা সহজ নয়। হঠাৎ কোনো স্ফুলিঙ্গ এসে পুরো বিশ্বরাজনীতিকে এক ঝটকায় পাল্টে দিয়েছে—এমনটি বলা অতিরঞ্জন হবে। তবে ইতিহাসে কিছু মুহূর্ত থাকে, যেগুলো বৃহত্তর কাঠামোগত পরিবর্তনের আগাম ইঙ্গিত

দেয়। সেগুলো যেন একেকটি লেন্স, যার ভেতর দিয়ে ভবিষ্যতের রাজনৈতিক বাস্তবতা কিছুটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৯৯ সালের গ্রীষ্মের এক স্যাঁতসেঁতে রাতে কসভোর যুদ্ধবিধ্বস্ত রাজধানী প্রিস্টিনায় তেমনই একটি মুহূর্তের সাক্ষী হয়েছিলাম আমি। এই কসভো সংকট ছিল দীর্ঘ এক ডোমিনো ইফেক্টের চূড়ান্ত পর্বের সূচনা।

কসোভো দেশটির অবস্থান বলকান উপদ্বীপে। ইউরোপের একদম দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তের এই বিশাল উপদ্বীপের পশ্চিমে রয়েছে অ্যাড্রিয়াটিক সাগর ও আইওনিয়ান সাগর। দক্ষিণে রয়েছে ভূমধ্যসাগর এবং পূর্ব দিকে এজিয়ান সাগর ও কৃষ্ণ সাগর। অঞ্চলটির একদম উত্তর-পূর্ব থেকে শুরু করে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম পর্যন্ত পুরোটাই পার্বত্য অঞ্চল। এর পরেই শুরু হয়েছে পশ্চিম ইউরোপ। ষোড়শ শতক থেকে শুরু করে প্রায় পাঁচ শত বছর অটোমান বা উসমানি সাম্রাজ্যের দখলে ছিল এই বলকান উপদ্বীপ। ঊনবিংশ শতকে এসে অটোমান সাম্রাজ্য খুবই দুর্বল হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে ১৮৩০ সালে অটোমান শাসন থেকে স্বাধীনতা ঘোষণা করে গ্রিস। তবে সে সময় খুব সামান্য ভূমিই গ্রিসের দখলে ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে উসমানি সাম্রাজ্যের এই দুর্বলতার সুযোগে ১৯০৮ সালে বুলগেরিয়াও স্বাধীনতা ঘোষণা করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানিদের পরাজয়ের পরে প্রতিটি বলকান জাতিগোষ্ঠী ভূমি দখলের লড়াইয়ে নামে। শুরু হয় বলকান যুদ্ধ। তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী গ্রিস ও বুলগেরিয়া যথেষ্ট ভূমি দখলে সমর্থ হয়। পাশাপাশি জাতিগত আলবেনীয়রাও স্বাধীন আলবেনিয়া গঠন করে। আর পশ্চিম অংশের বাকি ছয়টি ছোট ছোট প্রজাতন্ত্র তাদের আলাদা পাঁচটি জাতিগোষ্ঠী ও তিনটি ধর্মীয় জনগোষ্ঠীকে এক কাঠামোর মধ্যে আটকে গঠন করে যুগোস্লাভিয়া রাজ্য।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পট পরিবর্তনের পর ১৯৪৫ সালে যুগোস্লাভিয়ায় রাজতন্ত্র বিলুপ্ত হয়ে যায়। ক্ষমতায় আসেন নাৎসিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ যুদ্ধের নেতা মার্শাল জোসেফ ব্রজ টিটো। পরবর্তী তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে দেশটিকে টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হন এই সোশালিস্ট নেতা। কিন্তু ১৯৮০ সালে টিটোর মৃত্যুর পর এই বহুজাতিক কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়ে। সেই শূন্যস্থানে মাথা তোলে উগ্র জাতীয়তাবাদ। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন এই বারুদে স্ফুলিঙ্গ ছুড়ে দেয়। পরবর্তী এক দশকে সার্ব, ক্রোয়াট, বসনিয়ান ও আলবেনিয়ানদের পারস্পরিক সহিংস সংঘাতে লাখ লাখ মানুষের মৃত্যু ঘটে। এর মধ্যে বসনিয়ার স্বাধীনতা যুদ্ধকে বলা হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইউরোপের সবথেকে রক্তক্ষয়ী

যুদ্ধ। প্রাক্তন যুগোস্লাভিয়া ভেঙে একে একে গঠিত হয় ৮টি রাষ্ট্র। অনেকগুলো টুকরোয় বিভাজিত হয়ে যায় বলকান উপদ্বীপ। এই ঘটনার কারণেই বর্তমান সময়ে যেকোনো অঞ্চলে বড় কোনো রাষ্ট্র ভেঙে একাধিক রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়াকে বলা হয় বলকানাইজেশন।

১৯৯১ সাল থেকে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে একে একে গঠিত হয় স্লোভেনিয়া, সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো, ক্রোয়েশিয়া, উত্তর মেসিডোনিয়া এবং বসনিয়া ও হার্জেগোভেনিয়া। ১৯৯৫ সালে বসনিয়ার যুদ্ধ শেষ হলেও কসভোতে রক্তপাত অব্যাহত ছিল। সেখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ আলবেনিয়ানরা সার্বিয়ান কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করেছিল। ১৯৯৮ সালে তা পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে রূপ নিলে সার্ব বাহিনী কসভোতে ব্যাপক দমন-পীড়ন শুরু করে। এর প্রতিক্রিয়ায় ১৯৯৯ সালে ন্যাটো প্রথমবারের মতো জাতিসংঘের অনুমোদন ছাড়াই সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপ করে। আমি তখন প্রিস্টিনায় যুদ্ধ-প্রতিবেদক হিসেবে কাজ করছি। ন্যাটোর বিমান হামলায় টিকতে না পেরে সদ্যই সার্ব বাহিনী কসভো ছেড়ে পালিয়েছে। দক্ষিণ সীমান্তে ন্যাটোর স্থলবাহিনী প্রবেশের অপেক্ষায়। এমন সময়ে শোনা গেল, রাশিয়ার একটি সামরিক বহর বসনিয়া থেকে কসভোর উদ্দেশে রওনা দিয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে সার্বদের সঙ্গে রাশিয়ার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। তাই তারা চেয়েছিল, এই উত্তাল সময়ে সার্বিয়া অঞ্চলে যেন তাদের ভূরাজনৈতিক প্রভাবের উপস্থিতি দৃশ্যমান থাকে।

এই ঘটনা তখন সামান্য মনে হলেও এর তাৎপর্য ছিল গভীর। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর থেকে প্রায় এক দশক ধরে রাশিয়া আন্তর্জাতিক রাজনীতির মঞ্চে স্রেফ এক পর্যবেক্ষকের ভূমিকায় ছিল। অর্থনৈতিক দুর্বলতা ও অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা তো ছিলই, এর সাথে ছিল ন্যাটো আর ইউরোপীয় ইউনিয়নের সম্প্রসারণ। ফলে তাদের ঐতিহ্যবাহী প্রভাববলয় ক্রমশ সংকুচিত হয়ে আসছিল। রাশিয়ার পশ্চিম সীমান্ত জুড়ে একের পর এক রাষ্ট্র ন্যাটো বা ইইউতে যোগ দিচ্ছিল, কেউ কেউ আবার সদস্য হচ্ছিল উভয় জোটেরই। অনেক দেশে জনগণ গণভোটের মাধ্যমে সরকারকে পশ্চিমা জোটে অন্তর্ভুক্ত হতে বাধ্য করেছিল। বিশেষ করে বাল্টিক রাষ্ট্রগুলোর ন্যাটো ও ইইউতে প্রবেশ রাশিয়ার বাফার অঞ্চলকে কার্যত ভেঙে দেয়। একই সময়ে মধ্যপ্রাচ্য ও লাতিন আমেরিকাতেও রুশ প্রভাব ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়ছিল। এই প্রেক্ষাপটে ১৯৯৯ সালে প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলতসিনের নেতৃত্বে রাশিয়া একটি স্পষ্ট বার্তা দেয়—"আর নয়।" কেবল

পর্দার আড়াল থেকে পশ্চিমের অগ্রযাত্রা দেখা নয়; এবার প্রয়োজন সরাসরি ও দৃশ্যমান পাল্টা পদক্ষেপ। কসোভোতে রাশিয়ার সামরিক উপস্থিতির সিদ্ধান্ত ছিল সেই বার্তারই প্রতীকী প্রকাশ। অনেক পর্যবেক্ষক মনে করেন, এই সিদ্ধান্তের পেছনে তৎকালীন রুশ প্রধানমন্ত্রী ভ্লাদিমির পুতিনেরও বেশ খানিকটা ভূমিকা ছিল। সে সময় তিনি রাশিয়ায় নব্য জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক চেতনার দ্রুত উত্থান ঘটাচ্ছিলেন। আর এই ঘটনার মধ্য দিয়ে রুশ রাজনীতির কেন্দ্রস্থলে তার আবির্ভাব দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

রাতের শেষ প্রহরে প্রধান সড়ক ধরে রাশিয়ার আর্মারড বহর হুট করেই ঢুকে পড়ল প্রিস্টিনায়। তাদের গন্তব্য শহরের অন্য প্রান্তে অবস্থিত এয়ারপোর্ট। সেখানে আগে থেকেই পশ্চিমা সামরিক বাহিনী উপস্থিত ছিল। শোনা যায়, রাশিয়ানদের এই আগমনের খবর ন্যাটো বাহিনী জানার আগেই আমার প্রতিবেদনের সূত্রে প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের কানে পৌঁছে গিয়েছিল। আমি লিখেছিলাম: "রাশিয়ানরা গড়গড়িয়ে শহরে প্রবেশ করল। তারা আবার ফিরে এলো পৃথিবীর রঙ্গমঞ্চে।" সেটা হয়তো পুলিৎজার পাওয়ার যোগ্য প্রতিবেদন ছিল না, কিন্তু ইতিহাসের একটি মুহূর্তের প্রথম সাক্ষ্য হিসেবে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য। সেই বছরের সবথেকে বড় ঘনঘটার মধ্যে ঢুকে পড়ে রাশিয়া জানান দিয়ে দিল যে, ভূরাজনীতিতে এখন থেকে তাদেরও দাবি আছে। রাশিয়াকে বাদ দিয়েই ইতিহাসের যে স্রোতধারা চলছিল তাকে চ্যালেঞ্জ ছোঁড়া হলো এই ঘটনার মাধ্যমে। নব্বইয়ের দশকের শেষভাগে যুক্তরাষ্ট্র হয়ে উঠেছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর যে একমেরু বিশ্বব্যবস্থা তৈরি হয়েছিল, তাতে মনে হচ্ছিল পশ্চিমারাই বাকি পৃথিবীর কর্তা। কিন্তু প্রিস্টিনার সেই রাতেই স্পষ্ট হয়ে উঠল, পরিস্থিতি আর আগের মতো থাকছে না। বর্তমান রাশিয়া অবশ্য সোভিয়েত আমলের মতো আগ্রাসী ও সর্বশক্তিমান নয়; সোভিয়েত পরাশক্তির ছায়া-শরীর মাত্র। তবু তারা যেখানে যতটুকু সামর্থ্য রাখে সেখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বোঝাতে চায়— "প্রভাব বলয়ের লড়াই এখনও শেষ হয়নি।" কসোভোর ঘটনার পর থেকেই এই সংকেত পাওয়া যাচ্ছিল যে জর্জিয়া, ইউক্রেন, সিরিয়া কিংবা ভবিষ্যতের অন্য যে কোনো প্রেক্ষাপটে পশ্চিমারা তাদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করলেই রাশিয়া পাল্টা খেলায় নামবে।

কসভোর চার বছর পরের ঘটনা। মার্কিনি ও ব্রিটিশদের নেতৃত্বে ন্যাটো বাহিনী ইরাকে আগ্রাসন চালিয়ে সাদ্দাম হোসেনকে উৎখাত করেছে। ধীরে ধীরে সেখানে বিদ্রোহ দানা বাঁধছে তখন। আমি সে সময় ছিলাম কারবালা শহরে।

শহরটি গোটা বিশ্বের শিয়া মুসলিমদের কাছে সবথেকে পবিত্র স্থান হিসেবে বিবেচিত হয়। সাদ্দাম ছিলেন সুন্নি মুসলিম। তার আমলে শিয়াদের বেশকিছু ধর্মীয় রীতি ও আচরণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এর মধ্যে অন্যতম ছিল ধারাল বস্তু দিয়ে নিজের শরীরে ক্ষত তৈরির ঐতিহ্যবাহী প্রথা। এক রৌদ্রতপ্ত দুপুরে আমি দেখলাম, দশ লাখেরও বেশি শিয়া বন্যার স্রোতের মতো চারদিক থেকে কারবালা শহরে এসে ঢুকল। দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসেছে তারা। এদের মধ্যে বহু বহু লোক ধাতব চাবুক দিয়ে নিজের পিঠে আঘাত করছে, অনেকে নিজের কপাল চিরে দিচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের সারা শরীর বেয়ে রক্ত ঝরতে থাকল, লালচে হয়ে উঠল রাজপথের ধূসর বালি। আমি জানতাম যে, পূর্ব সীমান্তের ঐপারে বসে পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছে প্রতাপশালী শিয়া রাষ্ট্র ইরান। ইরাকে শিয়া নিয়ন্ত্রিত সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য যেকোনো কিছু করতে রাজি তারা। ইরাকে শিয়া সরকার থাকলে সিরিয়া বা লেবাননের মতো মিত্রদের সঙ্গে যোগাযোগ তাদের জন্য সহজ হয়। ভূগোল এবং রাজনীতির হিসাব কষলে এটি এক অনিবার্য ফলাফল। আমি সেদিন লিখেছিলাম, "এই তীব্র উচ্ছ্বাস একদিকে যেমন ধর্মীয় রেওয়াজের বহিঃপ্রকাশ, পাশাপাশি একে শক্তিশালী রাজনৈতিক বিবৃতিও বলা যায়। এই উচ্ছাসের তরঙ্গ এমনকি ভূমধ্যসাগরেও পৌঁছে যাবে।" সে সময় এই অঞ্চলে রাজনৈতিক ভারসাম্য টলে গেছে। ইরান ভাবছে, সে যদি তার হাত শক্তিশালী করতে পারে, তাহলে এই অঞ্চলে মার্কিন আধিপত্যের বিরুদ্ধে তার অবস্থান আরেকটু দৃঢ় হয়। আর কারবালার এই ঘটনাটি ছিল সেই পরিবর্তিত ভূরাজনৈতিক চিত্রের ক্যানভাস। দুঃখের বিষয় হলো, এই দৃশ্য আঁকা হয়েছিল রক্তের রঙে।

ভূরাজনীতিকে এক সময় বলা হতো 'গ্রেট গেম'। এই গ্রেট গেমে এখন প্রতিযোগীর সংখ্যা অনেক। এই যে জটিল একটা বিশ্ব বাস্তবতায় বর্তমানে আমরা অবস্থান করছি, তার ভিত গড়ে দিয়েছে এই দুইটি বিশেষ মুহূর্ত। এই দুইটি মুহূর্তেই আমার মনে হয়েছিলো, ভূরাজনীতির পরবর্তী গতিপথের একটা ঝলক হয়তো আমি দেখে ফেললাম। ২০১০-এর দশকে যখন একে একে মিশর, লিবিয়া বা সিরিয়ায় ঘটনা গড়াতে শুরু করল, তখন পরিস্থিতি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে আমার কাছে। মিশরজুড়ে তুমুল গণআন্দোলনের মধ্যে অভ্যুত্থান ঘটিয়ে প্রেসিডেন্ট হোসনি মুবারাককে উৎখাত করল সামরিক বাহিনী। লিবিয়ায় কর্নেল গাদ্দাফিকে ক্ষমতা থেকে উৎখাতের পর হত্যা করা হয়। সিরিয়ায় প্রেসিডেন্ট বাসার আল-আসাদ তখন প্রায় পতনের মুখে পড়ে গিয়েছিলেন। রাশিয়া আর ইরান এসে তাকে রক্ষা করে সে সময়। এই তিনটি উদাহরণেই দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্র তার আগের

ভূমিকায় পরিবর্তন এনেছে। যে দেশটি কয়েক দশক ধরে ধারাবাহিকভাবে স্বৈরাচারী শাসকদের সঙ্গে কাজ করে এসেছে, তারা হঠাৎ করেই একনায়কদের পৃষ্ঠপোষকতা বন্ধ করে দেয়। আসলে, প্রেসিডেন্ট ওবামার আট বছরে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মাঠ থেকে অনেকটাই সরে এসেছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ডোনাল্ড ট্রাম্পের চার বছরেও এই নীতি অব্যাহত ছিল। আর সেই শূন্যস্থানে নিজ নিজ প্রভাব বিস্তারে তৎপর হয়ে ওঠে নতুন কিছু রাষ্ট্র। আন্তর্জাতিক শক্তি হিসেবে দ্রুত উঠে আসে চীন, ভারত ও ব্রাজিল। তাদের বিশাল জনসংখ্যা ও ক্রমবর্ধমান অর্থনীতি যতই অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন ঘটাচ্ছে, ততই বৈশ্বিক পরিসরে নিজেদের কৌশলগত ও রাজনৈতিক অবস্থান সুসংহত করার দিকে এগোচ্ছে তারা।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অনেকটা বৈশ্বিক পুলিশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এই ভূমিকা পালনের সময় তাদের হস্তক্ষেপ কখনো স্থিতিশীলতা এনেছে, কখনো আবার নতুন সংকটের জন্ম দিয়েছে। এই পুলিশি কর্মকাণ্ডকে অনেকের কাছেই বিতর্কিত কার্যকলাপ বলে মনে হয়। তবে এটাও সত্য যে, কোনো ধরনের পুলিশি তত্ত্বাবধান না থাকলে নিরাপত্তার ভার প্রত্যেক অঞ্চলকেই নিজেদের কাঁধে নিতে হতো। আর সেক্ষেত্রে এক অঞ্চলে একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি থাকলে সংঘাত ও অস্থিতিশীলতার ঝুঁকিও বেড়ে যেত অনেক।

সাম্রাজ্য গড়ে উঠবে, আবার ভেঙেও পড়বে—এটাই ইতিহাসের নিয়ম। আজকের মিত্রতা যে কালও টিকে থাকবে, তেমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। যেমন আমরা দেখতে পাই, নেপোলিয়নের পতনের পর ইউরোপে যে বিধিব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল, তা টিকেছিল মাত্র ছয় দশক। নাৎসিদের স্বপ্নের 'হাজার বছরের রাইখ' ভেঙে যায় এক দশকেরও কম সময়ে। ক্ষমতার ভারসাম্য ভবিষ্যতেও বদলাবে। তবে সেটা ঠিক কীভাবে ঘটবে এখনই তা নির্ভুলভাবে বলা কঠিন। যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও রাশিয়ার মতো বৃহৎ শক্তিগুলো যথারীতি বিশ্ব রাজনীতিতে সক্রিয় থাকবে। ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং উদীয়মান শক্তি ভারতও পিছিয়ে থাকবে না। এর পাশাপাশি তুলনামূলক ছোট দেশগুলোর ভূমিকাও ক্রমেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। কারণ বর্তমান পরিস্থিতিতে ছোট-বড় উভয়েরই একে অপরের প্রয়োজন রয়েছে। ছোট দেশগুলোর কৌশলগত নিরাপত্তার জন্য বড় রাষ্ট্রের সমর্থন যেমন অপরিহার্য, তেমনি বড় শক্তিগুলোও ছোটদের সহায়তা কাজে লাগিয়ে আঞ্চলিক ভারসাম্য রক্ষা করে। এই পারস্পরিক নির্ভরতার কাঠামোই তুলনামূলক ছোট রাষ্ট্র যেমন তুরস্ক, সৌদি আরব কিংবা যুক্তরাজ্যের সামনে নতুন সুযোগ তৈরি করেছে। তারা এখন

চেষ্টা করছে বৃহত্তর বৈশ্বিক মঞ্চে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করার। ২০২০-এর দশকের শুরুতে এসে বিশ্ব যেন নতুন এক দাবার বোর্ডে রূপ নিয়েছে। গুটিগুলো সাজানো শেষ, এখন কেবল খেলা শুরু হওয়ার অপেক্ষা।

২০১৫ সালে আমি 'প্রিজনারস অব জিওগ্রাফি' নামে একটি বই লিখেছিলাম। ভৌগোলিক বাস্তবতা ঠিক কতটা গভীরভাবে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত ও আন্তর্জাতিক কূটনীতিকে প্রভাবিত করে, তা আমি এই বইটিতে বোঝানোর চেষ্টা করেছি। আমি দেখিয়েছি, কোনো রাষ্ট্রনেতা যখন যুদ্ধ বা শান্তি, বাণিজ্য বা জোট গঠনের সিদ্ধান্ত নেন, তখন তার পেছনে প্রায়শই কাজ করে পাহাড়, নদী, উপকূল, প্রতিবেশী রাষ্ট্র কিংবা খনিজসম্পদের মতো ভৌগোলিক উপাদান নিয়ে ভাবনা। বইটিতে আমি কয়েকটি কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল নিয়ে বিশ্লেষণ করেছি। এগুলো হলো রাশিয়া, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা, ভারত ও পাকিস্তান, জাপান ও কোরিয়া, লাতিন আমেরিকা এবং আর্কটিক অঞ্চল। আমার উদ্দেশ্য ছিল একটি বৈশ্বিক ছবি তুলে ধরা, যেন উত্তর ও দক্ষিণ, পাহাড় ও মরুভূমি, মহাসাগর ও সমতল ভূমি একসাথে মিলে একটি পূর্ণাঙ্গ রাজনৈতিক মানচিত্র গড়ে ওঠে। সেখানে আমি দেখিয়েছি যে, সবকিছুর পরেও একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাতেই একযোগে একাধিক মহাসাগরে নৌশক্তি প্রদর্শনের সক্ষমতা থাকবে। হিমালয় পর্বত ভারত এবং চীনকে চিরকালই আলাদা করে রাখবে। ইউরোপের বিস্তীর্ণ সমতলভূমি চিরকাল রাশিয়ার জন্য দুর্বলতার জায়গা হয়ে থাকবে। কিন্তু, ভূরাজনীতি নিয়ে আরো অনেক কথা বলা বাকি রয়ে গেছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এখন আমরা নতুন ভূরাজনৈতিক বাস্তবতার মুখোমুখি হয়েছি। আরো অনেক কলাকুশলী এসে হাজির হয়েছে, যাদের দিকে আমাদের নজর দেওয়া উচিত। তাদের অনেকেই ভবিষ্যতকে বদলে দেওয়ার সামর্থ্য রাখে। আজকের ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা আগের চেয়ে অনেক বেশি জটিল, অনেক বেশি বহুমাত্রিক। ফলে আমাদের নজর দিতে হবে সেইসব রাষ্ট্র ও শক্তির দিকে, যারা আগামী দিনের ক্ষমতার ভারসাম্য নতুনভাবে নির্ধারণ করতে পারে।

সেই বাস্তবতা নিয়েই আমি লিখেছি 'দ্য পাওয়ার অব জিওগ্রাফি' বইটি। আগের বইয়ের মতো এখানেও পর্বতমালা, নদ-নদী, সাগর ও অন্যান্য ভৌগোলিক উপাদানের আলোকে ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মূল বক্তব্য একটাই—কোনো দেশ কী করতে সক্ষম হবে বা আদৌ কিছু করতে পারবে কিনা, সেটা অনেকাংশেই নির্ধারিত হয় দেশটির ভৌগোলিক পরিস্থিতির মাধ্যমে। আমরা

প্রায়ই রাজনীতিবিদদের সিদ্ধান্তকে ব্যক্তিগত কৌশল বা ক্ষমতার লড়াইয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করি। কিন্তু অনেক সময় আমরা ভুলে যাই যে তারা আসলে ভূগোলের হাতে বন্দি। পর্বতমালা, নদী, উপকূলরেখা কিংবা প্রাকৃতিক সম্পদের অবস্থানই তাদের কার্যক্রমের সীমানা টেনে দেয়। একজন মানুষ যেমন তার আশেপাশের পরিবেশকে উপেক্ষা করে সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, তেমনি রাষ্ট্রনেতারাও ভৌগোলিক বাস্তবতার বাইরে নীতি নির্ধারণ করতে পারে না। ভবিষ্যতেও এই নিয়ম অপরিবর্তিত থাকবে।

একটা দেশের গল্প শুরু হয় তার ভৌগোলিক অবস্থান দিয়ে। আর সেই দেশের সীমান্ত, প্রতিবেশী রাষ্ট্র, সমুদ্রপথ কিংবা প্রাকৃতিক সম্পদ তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক গতিপথ নির্ধারণ করে দেয়। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক, যদি কোনো দ্বীপ আটলান্টিক মহাসাগরের ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ প্রান্তে অবস্থিত হয়, তবে সেখানকার মানুষ ঢেউ কিংবা বায়ুশক্তি থেকে জ্বালানি আহরণের সুবিধা পাবে। আবার যদি কোনো দেশে বছরের প্রায় পুরোটা সময়ই সূর্যালোক থাকে, তবে সেখানে সৌরশক্তি হয়ে উঠবে প্রধান সম্পদ। অপরদিকে, কোনো দেশে কোবাল্টের মতো মূল্যবান খনিজ পাওয়া গেলে তা দেশটিকে বৈশ্বিক চাহিদার কেন্দ্রে নিয়ে আসবে। কিন্তু একইসাথে এই প্রাকৃতিক সম্পদই আবার দেশটিতে যুদ্ধ, বিদেশি হস্তক্ষেপ বা রাজনৈতিক অস্থিরতার আশঙ্কাও বাড়িয়ে তুলবে।

তবে অনেকেই আছেন যারা এই ভৌগোলিক বাস্তবতাভিত্তিক বিশ্লেষণকে সহজভাবে নিতে পারেন না। তাদের মতে এটি এক ধরনের নির্ণয়বাদী (deterministic) চিন্তাভাবনা। তাদের মতে ভাগ্য কখনো অবশ্যম্ভাবীভাবে নির্ধারিত হতে পারে না। বর্তমান এই ডিজিটাল যুগে সাইবারস্পেসের মাধ্যমে বিশ্বের যেকোনো প্রান্তের সঙ্গে মুহূর্তেই যোগাযোগ করা যায়। টাকা লেনদেন হয় চোখের পলকে। তাই ভূগোলকে গুরুত্ব দিতে অনেকেই রাজি নন। কেউ কেউ তো বলতে শুরু করেছেন, "পৃথিবীটা আজ সমতল।" কিন্তু এই ধরনের বক্তব্যে একটি মৌলিক বাস্তবতা আড়াল হয়ে যায়। আর তা হলো, প্রযুক্তির সুফল ভোগ করছে বিশ্বের অতি ক্ষুদ্র একটি অংশ মাত্র। নিয়মিত ভিডিও কনফারেন্স করা, কিংবা বিমানে চড়ে সাগর পেরিয়ে বিজনেস মিটিং করতে যাওয়ার সামর্থ্য রাখেন বিশ্বের খুব অল্পসংখ্যক মানুষ। পৃথিবীর বাকি আট বিলিয়ন মানুষের জীবনে এসব সুযোগ কল্পনারও বাইরে। আজও মিশরের কৃষকরা সেচের পানির জন্য তাকিয়ে থাকে ইথিওপিয়ার দিকে। ইথিওপিয়ার পর্বত থেকে নেমে আসা নদীর পানি তাদের

ফসলের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে। আবার এথেন্সের উত্তরের পাহাড়ি অঞ্চল এখনো ইউরোপের সঙ্গে গ্রিসের সরাসরি বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে বাধা হয়ে আছে। মানুষের হাতে যেহেতু অনেক ক্ষেত্রেই বিকল্প বেছে নেওয়ার সুযোগ থাকে, সেই হিসেবে ভূগোলকে ঠিক ভাগ্য বলা যায় না। তবে ভূগোলের ভূমিকা অস্বীকার করার কোনো সুযোগ নেই।

বর্তমান ২০২০-এর দশক এক অনিশ্চিত ও বিভক্ত সময় হিসেবে আত্মপ্রকাশ করছে। এই অস্থিরতার পেছনে রয়েছে নানা জটিল প্রক্রিয়ার সম্মিলন: বিশ্বায়নের সুফল, বিশ্বায়নের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, কোভিড-১৯ মহামারি, প্রযুক্তির দ্রুত রূপান্তর, জলবায়ু সংকট এবং রাষ্ট্রীয় শক্তির নতুনভাবে পুনর্গঠিত হওয়ার প্রবণতা। আর এই সবকিছুই 'দ্য পাওয়ার অব জিওগ্রাফি' বইতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই বইতে একবিংশ শতকের চলমান ভূরাজনৈতিক সংঘাত এবং সেসবের সম্ভাব্য রূপরেখা আলোচনা করা হয়েছে। সেইসাথে, এসব বিষয় কীভাবে এই বহুমেরুর বিশ্বে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

ইরানের কথাই বলা যাক। ইরান খুব ধীরে ধীরে মধ্যপ্রাচ্যের ভবিষ্যৎ রূপকল্প তৈরি করছে। পারমাণবিক শক্তি অর্জনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ধরে রাখায় তারা হয়ে পড়েছে প্রায় একঘরে। তবুও, মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে ইরান। নিজেদের প্রভাব টিকিয়ে রাখতে ইরানের সবচেয়ে বড় কৌশল হলো তথাকথিত 'শিয়া করিডোর'। এই ভূরাজনৈতিক করিডোর বাগদাদ থেকে দামেস্ক হয়ে বৈরুত এবং সেখান থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই করিডোর কেবল ভৌগোলিক সংযোগ নয়, বরং এটা হলো ইরানের রাজনৈতিক ও সামরিক প্রভাব বজায় রাখার অবলম্বন। তাদের প্রধান আঞ্চলিক প্রতিপক্ষ সৌদি আরব। শুধু তেল ও বালিই নয়, বরং দীর্ঘদিনের কূটনৈতিক কৌশলের অভিজ্ঞতাও এই মরুরাজ্যের সম্পদ। সৌদি আরব যুক্তরাষ্ট্রকে সবসময়ই নিজের প্রধান মিত্র বলে মনে করে এসেছে। কিন্তু নতুন বাস্তবতা হলো—একদিকে বৈশ্বিকভাবে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার ধীরে ধীরে কমছে, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র নিজেই তেল উৎপাদনে প্রায় স্বনির্ভর হয়ে উঠেছে। ফলে ওয়াশিংটনের কৌশলগত অগ্রাধিকার তালিকায় মধ্যপ্রাচ্য আর আগের মতো শীর্ষস্থানে নেই।

অন্যদিকে, আফ্রিকায় আবার তেল নিয়ে কোনো ঝামেলা নেই। সেখানে এখন গোলমাল চলছে পানি নিয়ে। নীল নদসহ আফ্রিকার একাধিক নদীর উৎপত্তি ইথিওপিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে। এই কারণেই দেশটিকে বলা হয় 'আফ্রিকার জলস্তম্ভ'।

উজানের দেশ হওয়ায় ইথিওপিয়ার অবস্থান স্বভাবতই সুবিধাজনক। আর তার নিচে অবস্থানকারী প্রতিবেশী দেশগুলো, বিশেষ করে মিশর, তার ওপর নির্ভরশীল। বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, ভবিষ্যতে 'পানির জন্য যুদ্ধ' যদি সত্যিই শুরু হয়, তবে ইথিওপিয়া হয়ে উঠবে অন্যতম বড় সংঘাতক্ষেত্র। তবে একই সঙ্গে প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভৌগোলিক সুবিধা অর্জনের ঘটনাও আমরা এখানে দেখতে পাই। প্রযুক্তির ক্ষমতা ব্যবহার করে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন করে দেশটি নিজের ভাগ্য বদলে ফেলছে।

তবে পুরো আফ্রিকা মহাদেশের ভাগ্য কিন্তু একই রকম নয়। উদাহরণস্বরূপ সাহারা মরুভূমির ঠিক নিচে অবস্থিত সাহেল অঞ্চলের কথাই বলা যায়। এই বিস্তীর্ণ রুক্ষ, শুষ্ক ভূখণ্ড আগে থেকেই নানারকম ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক বিভাজনে জর্জরিত। তার ওপর যুক্ত হয়েছে একের পর এক যুদ্ধ আর সহিংসতা। এমনকি এই অঞ্চলের কিছু জায়গা এখন কার্যত আল-কায়েদা ও আইএস-এর মতো জঙ্গিগোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে। এই অঞ্চলে চলতে থাকা ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ভবিষ্যতে আরো খারাপ পরিস্থিতিতে এসে দাঁড়াবে। ভবিষ্যতে এই অঞ্চলের বহু মানুষই শরণার্থী হয়ে পালাবে, আর সেই শরণার্থী ঢেউয়ের প্রথম ধাক্কা খাবে ইউরোপ।

শরণার্থী ইস্যুতেই ভূমধ্যসাগরে গ্রিসের অবস্থান আবারও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। গ্রিস ইউরোপে প্রবেশের অন্যতম সিংহদ্বার। ফলে আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা শরণার্থীদের প্রথম ধাক্কাটা প্রায় সবসময়ই এসে পড়ে এই দেশটির ঘাড়ে। দেশটির ভৌগোলিক অবস্থান ভূমধ্যসাগরের পুর্বাঞ্চলে। আর এই অঞ্চলটি আগামী দিনে ব্যাপক ভূরাজনৈতিক কম্পনের কেন্দ্রবিন্দু হতে চলেছে। পূর্ব ভূমধ্যসাগরে আবিষ্কৃত হয়েছে নতুন গ্যাসক্ষেত্র। আর এর দখল নিয়ে গ্রিসের সঙ্গে তুরস্কের দ্বন্দ্ব পেয়েছে নতুন মাত্রা। একদিকে গ্রিস ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্য, যার মাধ্যমে দেশটির হাতে আছে কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি। অন্যদিকে, তুরস্ক ক্রমেই আগ্রাসী হয়ে উঠছে, বিশেষ করে সামরিক দিক থেকে। শুধু গ্যাসক্ষেত্র দখল নয়, তুরস্কের ভূরাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা দিন দিন বেড়েই চলেছে। তারা এখন একটি বড় স্বপ্ন লালন করছে—'নব্য উসমানিকরণ'। অর্থাৎ, তারা চায় এক সময়কার উসমানি খেলাফতের আদলে আধুনিক তুরস্ককে গড়ে তুলতে। পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোতে প্রভাব বিস্তার করতে। তারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে একটি নতুন যোগসূত্র হয়ে দাঁড়াতে চায়। আর এই উচ্চাকাঙ্ক্ষার মূলে রয়েছে তাদের প্রাচীন গৌরব ফিরে পাওয়ার বাসনা এবং আঞ্চলিক পরাশক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার লক্ষ্য।

সাম্রাজ্য হারানো আরেকটি দেশ হলো যুক্তরাজ্য। শীতল আবহাওয়ার একগুচ্ছ দ্বীপ নিয়ে গঠিত এই রাষ্ট্রটির অবস্থান উত্তর ইউরোপের সমভূমির একদম পশ্চিম প্রান্তে, আটলান্টিক মহাসাগরের বুকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগেও বলা হতো, "ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য কখনো অস্ত যায় না।" সেই বিশাল সাম্রাজ্য হারানোর পর থেকেই ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে নিজেদের নতুন অবস্থান খুঁজে চলেছে গ্রেট ব্রিটেন। ব্রেক্সিটের পর দেশটি আরও একা, আরও বিচ্ছিন্ন হয়ে উঠেছে। আপাতদৃষ্টিতে দেশটিকে দেখলে মনে হবে, একটি মধ্যমসারির ইউরোপীয় শক্তি বিশ্বজুড়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার চেষ্টা করছে। কিন্তু বাইরের পরিস্থিতির চেয়ে বরং অভ্যন্তরীণ সংকটই তাদের ভোগাচ্ছে বেশি। স্কটল্যান্ডের মানুষ ক্রমেই নিজেদের ব্রিটেন থেকে আলাদা ভাবতে শুরু করেছে। তারা স্বাধীনতা চায়।

এবার নজর দেওয়া যাক ইউরোপের দক্ষিণে। ইউরোপের অন্যতম প্রাচীন রাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও স্পেন আজ বিভাজনের হুমকির মুখে। কাতালানদের স্বাধীনতার দাবি স্পেনের জাতীয় ঐক্যকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দিয়েছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের পক্ষে কাতালানের স্বাধীনতা আন্দোলনে সমর্থন দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কাতালোনিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করলে নতুন একটি দুর্বল রাষ্ট্রকে একা ছেড়ে দেওয়ার অর্থ হলো রাশিয়া এবং চীনের জন্য ইউরোপে নাক গলানোর সুযোগ করে দেওয়া। স্পেনের এই সংকট দেখেই বোঝা যায়, একবিংশ শতকের তথাকথিত আধুনিক জাতিরাষ্ট্র কিংবা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মতো সংস্থাগুলো আসলে কতটা ভঙ্গুর ও অস্থিতিশীল।

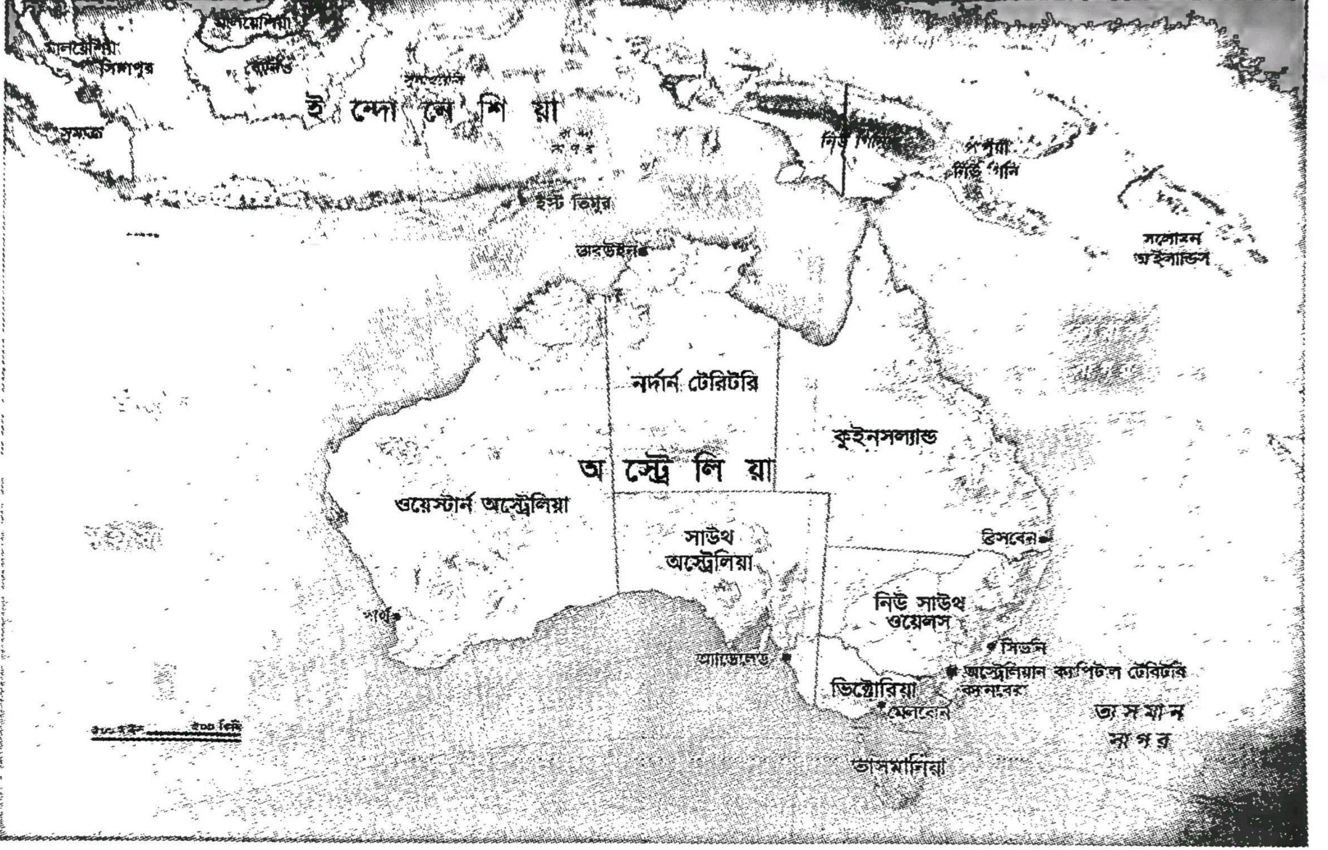
ভূরাজনৈতিক দ্বন্দ্ব বা প্রতিযোগিতা চিরকালই ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। তবে বর্তমান সময়ের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ চমক হলো, মাটির পৃথিবী ছাড়িয়ে শক্তি প্রদর্শনের এই লড়াই পৌঁছে গেছে মহাকাশে। মহাকাশের মালিক কে? এই মালিকানা নির্ধারণ হবে কীভাবে? এমনিতে 'চূড়ান্ত সীমা' বলে আসলে কিছু হয় না। তবুও মহাকাশকে আমরা অনেকটা সর্বশেষ সীমান্ত হিসেবেই ধরে নিই। আর আপনি তো জানেনই, সীমান্ত অঞ্চলগুলো কেমন হয়—বুনো, অনিয়ন্ত্রিত, আইন-কানুনের তোয়াক্কা কম। ভূ-পৃষ্ঠ থেকে একটা নির্দিষ্ট উচ্চতার পরে সার্বভৌমত্ব বলে আর কিছু হয় না। কোনো দেশই আসলে সেখানে সার্বভৌমত্ব দাবি করতে পারে না। আমি চাইলে আমার দেশের স্পাই স্যাটেলাইটকে নির্দিষ্ট উচ্চতায় উঠিয়ে আপনার দেশের ওপর স্থির করে রাখতে পারি। এমন কোনো আন্তর্জাতিক আইন

নেই যা দিয়ে আপনি তা ঠেকাতে পারবেন। এই মুহূর্তে একাধিক পরাশক্তি মহাকাশে নিজেদের কর্তৃত্ব সুসংহত করতে উঠেপড়ে লেগেছে। তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নানা প্রাইভেট কোম্পানিও। আমরা যদি অতীতের ভুলগুলো থেকে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার পাঠ নিতে ব্যর্থ হই, তাহলে সামনে হয়তো অপেক্ষা করছে সর্বাধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত এক ভয়াবহ প্রতিযোগিতার যুগ।

তবে আমরা গল্প শুরু করব পৃথিবীর সেই প্রান্ত নিয়ে, যে অঞ্চলটি মাত্র কয়েক শতাব্দী আগেও অচেনা ছিল বাকি পৃথিবীর কাছে। পরিচিত পৃথিবী থেকে অনেক দূরে প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে বিশাল এক মহাদেশ এটি। বর্তমান জাতিরাষ্ট্রের যুগে এসে অতীতের সেই বিরানভূমি আজ অর্থনৈতিকভাবে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের অন্যতম শক্তিশালী রাষ্ট্র। কিন্তু এই দেশটি পড়ে গেছে এই অঞ্চলের আধিপত্য নিয়ে যুযুধান দুই পক্ষের মাঝখানে। দেশটির পূর্ব দিকে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, আর পশ্চিমে রয়েছে চীন। অবশ্য দেশটি নিজেও ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের পরিস্থিতি বদলে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। শুরু করছি আমাদের এবারের গল্পের অন্যতম প্রধান খেলোয়াড়, দ্বীপ মহাদেশ অস্ট্রেলিয়াকে দিয়ে।

অধ্যায় ১

অস্ট্রেলিয়া



"নিজের পুরোটা দিয়ে খেলবে, পিটিয়ে ওদের ছাতু করে দিতে হবে।"

- ডন ব্র্যাডম্যান, অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটার

অস্ট্রেলিয়া একসময় ছিল বিশ্বের সবচেয়ে দূরবর্তী অঞ্চল। প্রশান্ত মহাসাগরের মাঝখানে পৃথিবীর নির্জনতম বিশাল এক ভূখণ্ড। সেই বিরান ভূমিই আজ হয়ে উঠেছে একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র। আর এই রাষ্ট্রই এখন রয়েছে বিশ্ব রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়। কিন্তু এই রূপান্তর সম্ভব হলো কীভাবে?

একসময় মানুষ মনে করত, পরিচিত পৃথিবীর ঠিক উল্টো পাশে রয়েছে একটি রহস্যময় দ্বীপ। মানুষ তখন সবেমাত্র পৃথিবীকে গোলাকার হিসেবে কল্পনা করতে শিখেছে। তখন তারা ভাবত তাদের চেনা পৃথিবী অর্থাৎ ইউরেশিয়া ও আফ্রিকা পৃথিবীর ওপরভাগে অবস্থিত। আর তার উল্টো পাশে, অর্থাৎ নিচের দিকে রয়েছে বিশাল একটা অচেনা ভূখণ্ড। অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কারের পর মানুষ ভেবেছিল তারা সেই উল্টোপাশের দেশটি খুঁজে পেয়েছে। মানচিত্রের দিকে তাকালেও সেই

আদিকালের ভাবনা পুরোপুরি ভুল মনে হয় না। পৃথিবীর অধিকাংশ স্থলভাগই রয়েছে উত্তর গোলার্ধে, আর দক্ষিণ গোলার্ধের একদম নিচের দিকে আলাদা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই বিশাল ভূখণ্ড—অস্ট্রেলিয়া। এরকম দ্বীপ পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই। প্রথমত, আকারে এটি বিশাল, প্রায় ৭৭ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। সড়কপথে ব্রিসবেন থেকে পার্থের দূরত্ব ৪২০০ কিলোমিটারেরও বেশি। লন্ডন থেকে সড়কপথে যাত্রা শুরু করে ফ্রান্স, বেলজিয়াম, জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, সার্বিয়া, বুলগেরিয়া, তুরস্ক ও সিরিয়া অতিক্রম করে বৈরুত পৌঁছালে প্রায় একই সমান দূরত্ব অতিক্রম করতে হয়। অস্ট্রেলিয়ার ভূপ্রাকৃতিক বৈচিত্র্যও ব্যাপক। এখানে আছে নিরক্ষীয় রেইনফরেস্ট, প্রচণ্ড গরম মরুভূমি, ঢেউ খেলানো সাভানা তৃণভূমি, এমনকি তুষারঢাকা পর্বতশ্রেণী পর্যন্ত। এই বিশাল ভূখণ্ড, ভূ-প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতের বৈচিত্র্যকে বিবেচনায় নিয়েই অস্ট্রেলিয়াকে মহাদেশ বলা হয়।

আর বিচ্ছিন্নতার কথা যদি বলা হয়, সেটাও আক্ষরিক অর্থেই সত্য। এই ভূখণ্ডের আশেপাশে আর কিছুই নেই। অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকূলের শহর ব্রিসবেন থেকে যাত্রা করলে উত্তর-পূর্ব দিকে ১১,৫০০ কিলোমিটার দূরে রয়েছে অ্যামেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া উপকূল। সোজা পূর্ব দিকে গেলে ১৩,০০০ কিলোমিটার দূরে দক্ষিণ অ্যামেরিকা। দক্ষিণ-পূর্ব দিকে আছে প্রতিবেশী নিউজিল্যান্ড, যার দূরত্ব ২০০০ কিলোমিটারেরও কিছু বেশি। নিচের দিকে একদম সোজা দক্ষিণে ৫,০০০ কিলোমিটার জুড়ে কেবল মহাসাগর, তারপর রয়েছে অ্যান্টার্কটিকা। আর পার্থ থেকে পশ্চিম দিকে গেলে ভারত মহাসাগরে ৮,০০০ কিলোমিটার পাড়ি দিলে রয়েছে আফ্রিকা। তবে উত্তর দিকে তাকালেই ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অস্ট্রেলিয়ার সত্যিকারের গুরুত্বটা বোঝা যায়।

অস্ট্রেলিয়ার সোজা উত্তরে প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম উপকূলে বসে আছে বিশাল দেশ চীন। একনায়কতান্ত্রিক দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক ও সামরিক দিক সবথেকে শক্তিশালী এই দেশটি। অন্যদিকে অস্ট্রেলিয়া একটি বৃহৎ আধুনিক রাষ্ট্র। পশ্চিমা রাজনৈতিক আদর্শে গড়া এই রাষ্ট্রে উদার গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত। এই দুইটি ছবি জোড়া লাগালেই আপনারা দেখতে পাবেন অস্ট্রেলিয়া আজ কীভাবে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটা অবস্থানে বসে আছে। প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের সংযুক্ত বাণিজ্যপথকে একবিংশ শতকের 'অর্থনৈতিক পাওয়ারহাউজ' বলা হয়। আর এই ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের ঠিক মাঝামাঝি এক জায়গায়

অবস্থান করছে অস্ট্রেলিয়া। ফলে শুধু নিজস্ব ভূরাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষাতেই থেমে নেই রাষ্ট্রটি। অনেকের মতে, ভবিষ্যতের বিশ্বরাজনীতির নিয়ন্ত্রক শক্তি হিসেবেও আবির্ভূত হতে পারে অস্ট্রেলিয়া।

এই গল্পের সূচনা অবশ্য অন্যরকম। অস্ট্রেলিয়া ভূখণ্ডে প্রথম ব্রিটিশ বসতি স্থাপিত হয় আঠারো শতকের শেষভাগে। তার আগে পর্যন্ত এই বিস্তীর্ণ ভূমিতে বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করত বিভিন্ন আদিবাসী গোষ্ঠী। হাজার হাজার বছর ধরে এই ভূমিতে টিকে থাকা এসব গোষ্ঠীর প্রত্যেকেরই নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি ছিল। ছিল আলাদা আলাদা জীবনধারা। বাইরের পৃথিবী সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা ছিল না, ছিল না আগ্রহও। অস্ট্রেলিয়ার ভূ-প্রকৃতি বেশ রুক্ষ। এখানে ভূমির বড় অংশই অনুর্বর, মরুভূমি বা শুষ্ক তৃণভূমি। এই রুক্ষভূমিতেই লক্ষ লক্ষ আদিবাসী মানুষের জীবন টিকে ছিল। ইউরোপীয়রা সতেরো শতক থেকে এই অঞ্চলে আসতে শুরু করলেও এরকম দূরবর্তী রুক্ষ-শুষ্ক এলাকায় স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপনের কথা তখনও তারা ভাবেনি। সবকিছু পাল্টে যায় আঠারো শতকের শেষভাগে। সে সময়েরর ব্রিটিশ সরকার একটি পেনাল কলোনি স্থাপনের জন্য এই বিশাল ভূখণ্ডকে বেছে নেয়। পেনাল কলোনি বলতে মূলত শাস্তিপ্রাপ্ত অপরাধীদের দূর দ্বীপে নির্বাসনের স্থান বোঝানো হয়। প্রচলিত কারাগারে অপরাধীদের স্থান সংকুলান না হলে সংখ্যা কমানোর জন্য কঠোর সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীদেরকে সমাজের বাইরে একরকম চিরতরে নির্বাসিত করা হতো। অর্থাৎ, এইসব অপরাধীদের এমন এক জায়গায় পাঠানো হতো, যেখান থেকে তারা আর ফিরতে পারবে না।

ব্রিটিশরা প্রথম বসতি গড়েছিল অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের নিউ সাউথ ওয়েলস অঞ্চলে। জাহাজ বোঝাই করে অপরাধীদের সেখানে পাঠানো হতো, এরপর জাহাজ ফিরে যেত ইউরোপে। ঠিক যেন জেলে ঢুকিয়ে তালা মেরে চাবিটা ফেলে দেওয়া। কিন্তু সময়ের সাথে সবকিছু বদলায়। এক সময় যে দ্বীপটাকে ভাবা হয়েছিল সমাজ থেকে নির্বাসনের সর্বোত্তম স্থান, সেই অস্ট্রেলিয়াই কালে কালে পরিণত হয় একটি পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রে। একটা সময় অস্ট্রেলিয়ার ভূ-রাজনৈতিক 'বিচ্ছিন্নতা' রূপ নেয় 'কৌশলগত অবস্থানে'। তবে এই পর্যন্ত আসতে দেশটিকে অনেক কষ্টকর পথ পাড়ি দিতে হয়েছে।

এই অধ্যায়ের শুরুতে যে কোটেশনটি দেওয়া আছে, সেটি ডন ব্র্যাডম্যান বলেছিলেন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একটি ক্রিকেট ম্যাচ নিয়ে। কিন্তু, এই একই ভাবনা আসলে অস্ট্রেলীয়দের মনস্তত্ত্বের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। হয়তো অস্ট্রেলিয়ার

চরম বৈরী ভূপ্রকৃতিতে বেড়ে উঠতে উঠতেই এই চিন্তাধারা তাদের মাথায় গেঁথে যায়। অস্ট্রেলীয়দের ব্যাপারে প্রচলিত ধারণা হলো, তারা সাম্যবাদী, ঠোঁটকাটা, সোজাসাপ্টা, অদম্য ও দিলখোলা মানুষ। এই বর্ণনাগুলো এত বেশি ব্যবহার করা হয়েছে যে আজকাল সেগুলো প্রায় ক্লিশে বলেই ধরা হয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, এই বৈশিষ্ট্যগুলোর প্রতিফলন অস্ট্রেলীয় সমাজে এখনো স্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। হয়তো পরিবেশের কঠিন বাস্তবতা থেকেই এসব গুণাবলি তাদের জাতীয় চরিত্রের অংশ হয়ে উঠেছে। অস্ট্রেলিয়া এমন এক বিশাল ভূখণ্ড যেখানে অধিকাংশ এলাকা বসবাসের অযোগ্য। দেশটি আক্ষরিক অর্থেই রুক্ষ, শুষ্ক, জনশূন্য। আর এই রুক্ষ ভূমি থেকেই গড়ে উঠেছে বিশ্বের অন্যতম বৈচিত্র্যময় ও বহুসংস্কৃতির সমাজ।

বর্তমান সময়ের অস্ট্রেলিয়া তার চারপাশে তাকিয়ে দেখছে যে কীভাবে ও কার সঙ্গে মিত্রতা গড়া যায়—কাদের সঙ্গে কেমন কৌশলগত অবস্থান নেওয়া উচিত তাদের। এই আত্ম-অনুসন্ধানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে তাদের ভৌগোলিক বাস্তবতা। একটি রাষ্ট্র যখন পররাষ্ট্রনীতি বা প্রতিরক্ষা কৌশল তৈরি করে, তখন প্রথমেই ভাবতে হয়—সে কী কী করতে সক্ষম। তারপর আসে, সে কী করতে চায়। আর এই 'সক্ষমতার' পরিধি অনেকাংশেই নির্ধারিত হয় দেশটির ভৌগোলিক অবস্থান দিয়ে। অস্ট্রেলিয়ার আয়তন এবং অবস্থান, দুইটি বিষয়ই একইসঙ্গে তার শক্তি ও দুর্বলতা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দেশটির বিশালতা এবং দ্বীপসদৃশ বিচ্ছিন্ন অবস্থান একদিকে তাদের প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা হিসেবে কাজ করছে। আবার এই বিচ্ছিন্নতাই দেশটির রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এবং কূটনৈতিক বিকাশকে অনেক সময় মন্থর করে দিয়েছে। বিশাল আয়তনের কারণে তাদের প্রয়োজন হয়েছে অতিরিক্ত দূরপাল্লার বাণিজ্যপথ। এসব দূরত্ব পারাপারের প্রয়োজন থেকেই দেশজুড়ে গড়ে উঠেছে বন্দরনগরী, সমুদ্রপথ এবং সংযোগব্যবস্থা। এসব পথকে নিরাপদ রাখতে গড়ে উঠেছে শক্তিশালী ও সুশৃঙ্খল নৌবাহিনী। অন্যদিকে, এই একই অবস্থান অস্ট্রেলিয়াকে তার প্রধান মিত্রদের, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় শক্তিগুলোর থেকে ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

দ্বীপ হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল আজ থেকে প্রায় ৩৫ মিলিয়ন বছর আগে। অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই বিশাল দ্বীপটি ধীরে ধীরে উত্তরের দিকে সরে যেতে শুরু করে। এই সরণ আজও চলছে। এভাবে সরতে সরতে একসময় অস্ট্রেলিয়া গিয়ে ধাক্কা খাবে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে। তবে, এই

বিষয়টি নিয়ে আপাতত এই দুই অঞ্চলের অধিবাসীদের দুর্ভাবনার কোনো প্রয়োজন নেই। অস্ট্রেলিয়া প্রতিবছর মাত্র সাত সেন্টিমিটার করে উত্তর দিকে যাচ্ছে। এভাবে চলতে চলতে ইন্দোনেশিয়ায় ধাক্কা দিতে লেগে যাবে কয়েকশত মিলিয়ন বছর।

আয়তনের দিক থেকে অস্ট্রেলিয়া পৃথিবীর ষষ্ঠ বৃহত্তম দেশ। তবে এর বিশেষত্ব শুধু আয়তনে নয়। একটি সম্পূর্ণ মহাদেশ নিয়ে গঠিত পৃথিবীর একমাত্র দেশ এটি। আধুনিক অস্ট্রেলিয়া রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে ছয়টি অঙ্গরাজ্য মিলে। সবথেকে বড় অঙ্গরাজ্য ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া। অঙ্গরাজ্যটির অবস্থান অস্ট্রেলিয়ার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জায়গা জুড়ে। আয়তনে রাজ্যটি এতই বিশাল যে এর মধ্যে পশ্চিম ইউরোপের সবগুলো দেশ এঁটে যাবে। আয়তনের বিচারে এর পরে আসে যথাক্রমে কুইন্সল্যান্ড, সাউথ অস্ট্রেলিয়া, নিউ সাউথ ওয়েলস, ভিক্টোরিয়া এবং মূল ভূখণ্ডের দক্ষিণে অবস্থিত তাসমানিয়া দ্বীপ। প্রতিটি অঙ্গরাজ্যের রয়েছে নিজস্ব সংবিধান। প্রশাসনিকভাবে অঙ্গরাজ্যগুলো অনেকটাই স্বশাসিত। কিছু কিছু জাতীয় স্তরের নীতিমালা ছাড়া অধিকাংশ আইন ও প্রশাসন পরিচালনা করে রাজ্য সরকার।

অস্ট্রেলিয়ার রাষ্ট্র কাঠামোতে শুধু অঙ্গরাজ্যই নয়, রয়েছে টেরিটোরি নামের কিছু বিশেষ প্রশাসনিক এলাকা। এগুলোর অবস্থান ও গুরুত্ব ভিন্ন ভিন্ন। 'টেরিটোরি' বলতে বোঝায় এমনসব অঞ্চল যেগুলো পূর্ণাঙ্গ অঙ্গরাজ্য নয় এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হয়। এর মধ্যে কিছু টেরিটোরি মূল ভূখণ্ডে অবস্থিত, আবার কিছু রয়েছে দ্বীপাঞ্চলে বা অ্যান্টার্কটিকা অঞ্চলে। অস্ট্রেলিয়ার প্রধান দুইটি টেরিটোরি হচ্ছে মূল ভূখন্ডে অবস্থিত নর্দার্ন টেরিটোরি ও ক্যাপিটাল টেরিটোরি। নর্দার্ন টেরিটোরিতে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসী জনগোষ্ঠীর বসবাস। এটি বিশেষভাবে সংরক্ষিত অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। ক্যাপিটাল টেরিটোরি দেশটির ফেডারেল রাজধানী এলাকা। রাজধানী শহর ক্যানবেরা এই অঞ্চলের অংশ। এই অঞ্চলটি কেন্দ্রীয় সরকার, সংসদ এবং প্রশাসনের সদর দপ্তর হিসেবে কাজ করে। এই দুই অঞ্চলের প্রশাসনের জন্য কেন্দ্রীয় সংসদ থেকে Self-Government Acts পাস করা হয়েছে, যার মাধ্যমে তারা কিছু স্বায়ত্তশাসনের সুযোগ পায়। তবে তা অঙ্গরাজ্যের চেয়ে সীমিত। এছাড়াও রয়েছে কিছু ছোট দ্বীপ-টেরিটোরি, যেগুলো সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে। যেমন, কোকোজ আইল্যান্ডস বা ক্রিসমাস আইল্যান্ডস।

অস্ট্রেলিয়ার জীবনপ্রবাহ বহু চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে এতদূর এসেছে। একদম শুরু থেকেই ধরা যাক। ৩৫ মিলিয়ন বছর আগে অ্যান্টার্কটিকা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছে

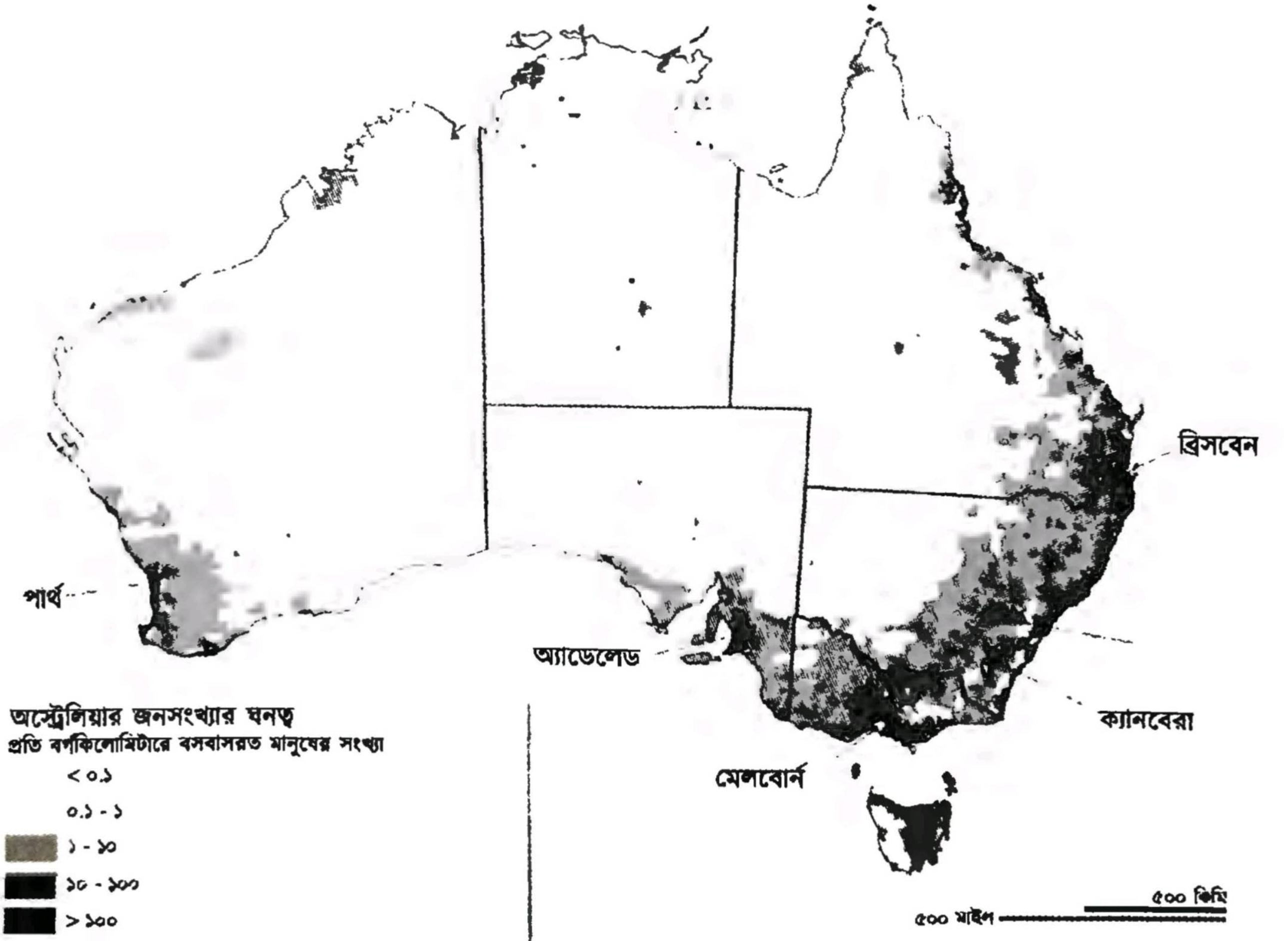
এই দ্বীপ। আর মানুষ এই দ্বীপে প্রথম পা রেখেছে মাত্র ৬০ হাজার বছর আগে। ফলে দ্বীপটিতে নিজস্ব বাস্তুসংস্থান তৈরি হওয়ার মতো যথেষ্ট সময় ছিল। অস্ট্রেলিয়াতে বিষাক্ত প্রাণীর কোনো অভাব নেই। গোটা মহাদেশ জুড়ে এমন সব প্রাণী ছড়িয়ে আছে যারা কামড় দেয়, হুল ফোটায়, ঠোকর দেয় বা বিষ ঢালে। অথচ এসব প্রতিকূলতা ডিঙিয়ে আগমনের ৩০ হাজার বছরের মধ্যে মহাদেশের সকল প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে মানুষ।

তবে বন্যপ্রাণীর চেয়েও বড় চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার ভূমি ও জলবায়ু। এই মহাদেশের বেশিরভাগ অঞ্চলই সমতল। মাত্র ৬ শতাংশ ভূমির উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠের চেয়ে ৬০০ মিটারের বেশি। একটি সম্পূর্ণ মহাদেশ হওয়ায় এর বিভিন্ন অঞ্চলে রয়েছে চরম ভূ-প্রাকৃতিক এবং জলবায়ুগত বৈচিত্র্য। অস্ট্রেলিয়াতে একদিকে রয়েছে রুক্ষ তপ্ত মরুভূমি, অন্যদিকে ক্রান্তীয় বনাঞ্চল, আবার আরেকদিকে রয়েছে তুষারঢাকা পর্বত। তবে বেশিভাগ জমিই এখানে অনুর্বর ও রুক্ষ। মহাদেশটির প্রায় ৭০ শতাংশ জুড়ে বিস্তৃত এই ভূ-বৈশিষ্ট্যকে তারা বলে 'আউটব্যাক'। এর বেশিরভাগ অংশই বসবাসের অযোগ্য। অস্ট্রেলিয়ার মধ্যবর্তী বিশাল বিস্তীর্ণ সমতল এবং মরুভূমি অঞ্চলে পানীয় জলের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। গ্রীষ্মকালে এই অঞ্চলের তাপমাত্রা ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যায়। চারদিক ধু-ধু শূন্যতা, কারো সাড়া পাওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

১৮৪৮ সালে প্রথমবারের মতো পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে মাঝ বরাবর মহাদেশটি পাড়ি দেওয়ার চেষ্টা চালানো হয়। পরিকল্পনা ছিল ব্রিসবেন থেকে থেকে রওনা দিয়ে পার্থে পৌঁছানোর। কিন্তু শেষপর্যন্ত এই উদ্যোগ ব্যর্থ হয়। প্রখ্যাত জার্মান অভিযাত্রী লুডউইক লেইশহার্টের নেতৃত্বে দুইজন আদিবাসী গাইডসহ ৭ সদস্যের একটি দল অভিযান শুরু করেন। তাদের সঙ্গে ছিল ৫০টি গরু, ২০টি খচ্চর, ৭টি ঘোড়া এবং অনেকগুলো গাড়িভর্তি পর্বতসমান রসদ ও সরঞ্জাম। কিন্তু অভিযাত্রী দলটি এই বিপুল বহরসহ আউটব্যাক অঞ্চলে স্রেফ গায়েব হয়ে যায়। বিশাল এই আউটব্যাক অঞ্চলে লুকিয়ে আছে বহু রহস্য। লুডউইগ ও তার দলের ভাগ্যে কী ঘটেছিল তা এখনো এক রহস্য হয়ে আছে। অত্যাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে আজও দলটির চিহ্ন খুঁজে চলেছে অস্ট্রেলীয়রা।

হাজার হাজার বছর ধরে এই ভূপ্রকৃতিই নির্ধারণ করে দিচ্ছে মানুষের সমাগম কোথায় হবে আর কোথায় হবে না। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা এই আউটব্যাক অঞ্চলে তাদের 'ওয়াকঅ্যাবাউট' রীতি পালন করতো। তাদের সমাজে কিশোরদের প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পথে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত হয়। এই রীতির অংশ হিসেবে তরুণ আদিবাসীরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সমাজ থেকে দূরে গিয়ে প্রত্যন্ত

আউটব্যাক অঞ্চলে বসবাস করে। 'ওয়াকঅ্যাবাউট' শুধু শারীরিক সহনশীলতার পরীক্ষাই নয়, বরং এটি হলো আত্ম-উপলব্ধি, সম্প্রদায়ের প্রতি দায়িত্ববোধ এবং সাংস্কৃতিক জ্ঞানের একটি পথ। আজও তারা এই প্রথা পালন করে আসছে। অপরদিকে, ইউরোপীয়রা বরাবরই উপকূলীয় অঞ্চল আঁকড়ে ধরে ছিল। আজও উপকূলীয় অঞ্চলেই তাদের বসবাস। পূর্ব উপকূলের ব্রিসবেন থেকে শুরু করে চাঁদের মতো বাঁকা একটা জনবহুল অঞ্চল আছে। এই বসতি অঞ্চল এগিয়ে গেছে উপকূলরেখা ধরে যথাক্রমে সিডনি, ক্যানবেরা, মেলবোর্ন হয়ে দক্ষিণ উপকূলের অ্যাডিলেড পর্যন্ত। পূর্ব উপকূলের এই পুরো অঞ্চল জুড়ে উপকূল থেকে ক্রমেই পশ্চিম দিকে নেমে গেছে শহরতলী এবং উপশহর। তবে কোনো জায়গাতেই ভেতরের দিকে ৩২০ কিলোমিটারের বেশি যায়নি। এর পরেই শুরু হয়েছে পার্বত্য অঞ্চল এবং নির্জন প্রত্যন্ত এলাকা। এছাড়া জনবসতি আছে একদম পশ্চিমে ভারত মহাসাগর উপকূলে পার্থে এবং একদম উত্তরের ডারউইনে। এই দুইটি জায়গাতেও জনবসতি মূলত উপকূলের কাছাকাছি। ভবিষ্যতেও এরকম থেকে যাওয়ার সম্ভাবনাই সবথেকে বেশি।

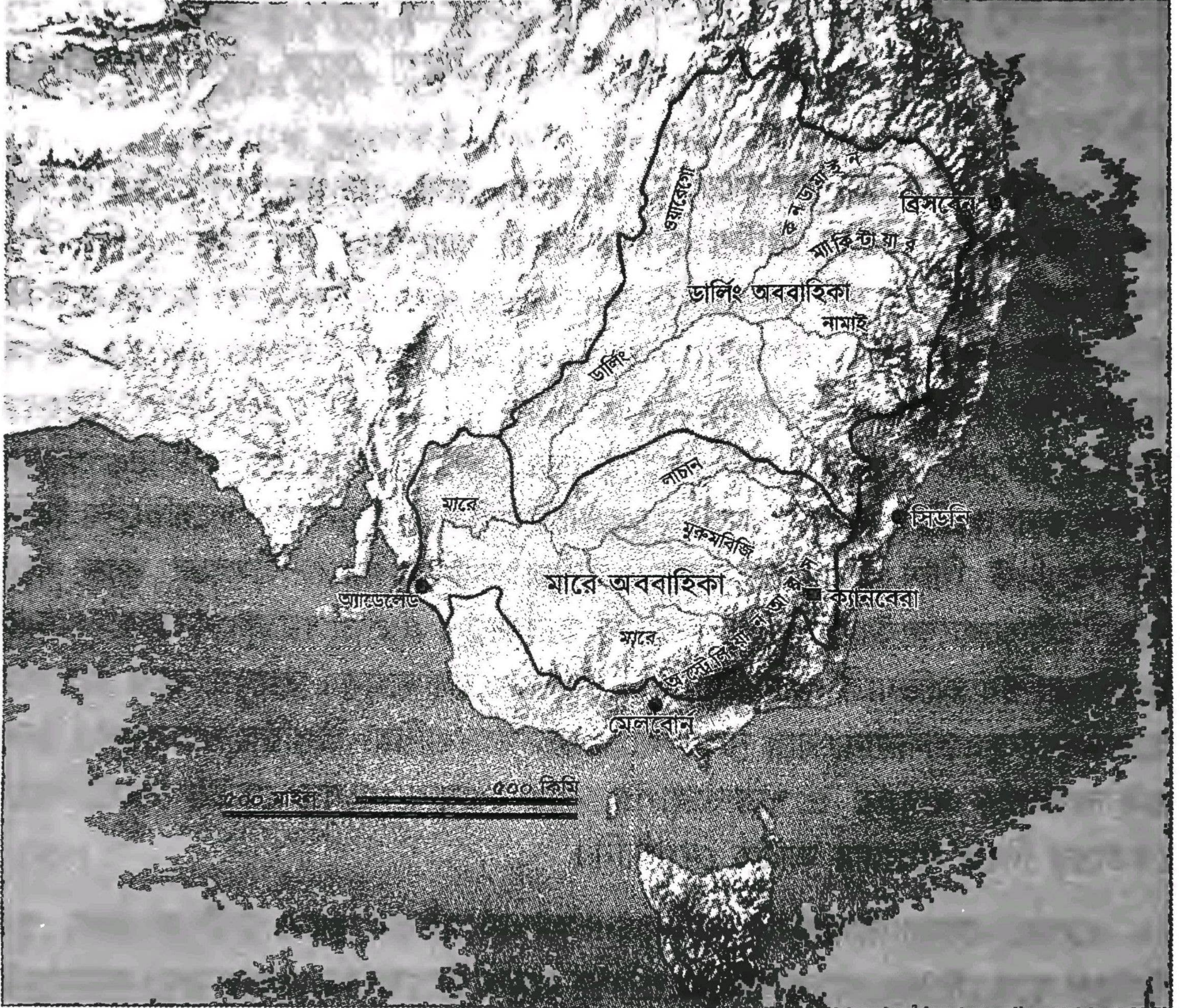


চিত্র: অস্ট্রেলিয়ার আউটব্যাক অঞ্চলের বেশিরভাগ অংশই মানুষ বসবাসের অযোগ্য। অস্ট্রেলিয়ার বেশিভাগ মানুষের বসবাস দেশটির দক্ষিণ-পূর্ব সমুদ্র উপকূল জুড়ে।

সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূগোল বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা গ্রিফিত টেলর আজ থেকে এক শতাব্দী আগে বলেছিলেন, অস্ট্রেলিয়ার ভূপ্রকৃতির কারণে ২০০০ সাল পর্যন্ত জনসংখ্যা ২০ মিলিয়ন ছাড়ানোর সুযোগ নেই। সে সময় স্কলার মহল থেকে বিপুল প্রতিবাদ এসেছিল। গ্রিফিত বলেছিলেন, অস্ট্রেলিয়ার মরুভূমি আসলে কোনো কাজের না, এখানে স্থায়ী বসতি অসম্ভব। সে সময় গণমাধ্যম 'জেরেমিয়াহ!' বলে হাহাকার করে উঠেছিলো। দেশের রাজনীতিবিদরা হুংকার ছেড়ে বলেছিলেন, "এসব হলো পরিবেশগত নির্ধারণবাদ।" রাজনীতিবিদরা ততদিনে ক্রমাগত বসতি বিস্তারের মার্কিন তত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে উঠেছেন। গ্রিফিতের কথা তাদের ভালো লাগার কথাও নয়। কিন্তু, বর্তমানে আমরা দেখতে পাচ্ছি তিনিই সঠিক ছিলেন, আর বাকিরা ছিল ভুল। আজ এই একশত বছর পরেও অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যা ২৬ মিলিয়ন পার হয়নি। বিমানে চেপে সিডনি থেকে ডারউইন যাওয়ার পথে পাক্কা ৩২০০ কিলোমিটারের মধ্যে একটি শহরও চোখে পড়বে না। সিডনি থেকে সোজাসুজি পার্থে উড়ে যাওয়ার সময়ও একই দৃশ্য দেখা যায়। আসলে দেশটির ৫০ শতাংশ মানুষ বাস করে দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলের মাত্র তিনটি শহরে— সিডনি, মেলবোর্ন আর ব্রিসবেন। আর বিষয়টি ঘটেছে স্বাভাবিক নিয়মেই। কারণ, এই তিনটি শহরেরই অবস্থান মারে-ডার্লিং নদীর অববাহিকা অঞ্চলে।

অস্ট্রেলিয়ার অধিকাংশ নদীতেই পানি প্রবাহিত হয় মৌসুম অনুযায়ী। অর্থাৎ সারা বছর নদীতে পানি থাকে না। ফলে আন্তঃনদী সংযোগ কখনোই অবকাঠামো উন্নয়ন পরিকল্পনার অংশ হয়ে উঠতে পারেনি। এই মহাদেশের সবগুলো নদীর মিলিত পানিপ্রবাহের পরিমাণ চীনের ছাং চিয়াং নদীর অর্ধেক মাত্র। তাসমানিয়াকে বাদ দিয়ে ধরলে, শুধু পূর্ব এবং দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের কিছু নদীতেই একমাত্র সারা বছরব্যাপী পানি প্রবাহিত হয়। এই মহাদেশের সবথেকে বড় দুইটি নদী হলো, মারে এবং তার উপনদী ডার্লিং। অস্ট্রেলিয়ান আল্পসের তুষার গলে মারে নদীতে নিয়মিত যথেষ্ট পরিমাণ পানি প্রবাহিত হতে থাকে। ফলে নদীটি প্রায় ২৫০০ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে দক্ষিণ উপকূলে পৌঁছাতে সক্ষম হয়েছে। এই নদীর কিছু অংশ নৌ-যোগাযোগের উপযুক্ত। আর এই অংশকেই মারে-ডার্লিং অববাহিকার মাথার মণি বলা যায়। তবে, সাগর থেকে জাহাজ নদীতে ঢুকতে না পারায় অভ্যন্তরীণ পণ্য পরিবহণ প্রায় পুরোপুরি স্থলনির্ভর। উনিশ শতকে কয়েক দফা নদী ধরে উজানে পণ্য পরিবহণের প্রচেষ্টা চালানো হয়েছিল। তবে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কম থাকায় এমনকি ছোট ছোট নৌযানের পক্ষেও বেশি উজানে যাওয়া সম্ভব হয়নি। অনেক সময় তো উপনদী শুকিয়ে যাওয়ায় নৌযান ডুবোচরে আটকে

যেত। তবে মারে-ডার্লিং নদী অববাহিকা অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণ উর্বরভূমি আছে। আর এই জমিই প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে অস্ট্রেলীয়দের খাদ্যের যোগান দিয়ে চলেছে। এই উর্বরভূমি না থাকলে প্রাথমিক বসতি স্থাপনকারীদের পক্ষে উপকূল ছেড়ে ভেতরে ঢোকাই সম্ভব হতো না।



চিত্র: প্রাথমিক আমলের ইউরোপীয় বসতি দক্ষিণ-পূর্ব অস্ট্রেলিয়ায় স্থাপনের পেছনে মূল ভূমিকায় ছিল মারে-ডার্লিং নদীর অববাহিকা।

অস্ট্রেলিয়ার মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও ছিল ঔপনিবেশিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল। কিন্তু দুই দেশের ভাগ্য মোড় নিয়েছে সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই দিকে। অ্যামেরিকাতেও প্রাথমিক ইউরোপীয় বসতি স্থাপনকারীরা নেমেছিল পূর্ব উপকূলে, তারপর ধীরে ধীরে তারা ভেতরের দিকে ঢুকেছে। সেখানে আপালাচান পর্বতশ্রেণি পার হওয়ার পর তারা পেয়েছিল পৃথিবীর বৃহত্তম নদী উপত্যকা, পৃথিবীর অন্যতম উর্বর অঞ্চল।

সেখানে অস্ট্রেলিয়ার বসতি স্থাপনকারীরা পশ্চিমে গিয়ে দেখেছে মিসিসিপি অববাহিকার প্রায় সমান মাপের এলাকা জুড়ে বিস্তৃত এক অঞ্চল। এই পুরো অঞ্চলে নৌ পরিবহণ, চাষাবাদ বা স্থায়ী বসতি স্থাপনের মতো প্রায় কিছুই নেই। এমনকি আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় অনেকটা বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল তারা। ইউরোপ থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১৩টি কলোনির দূরত্ব ছিল মাত্র ৫০০০ কিলোমিটার। আর সেখানে অস্ট্রেলিয়া থেকে যুক্তরাজ্যের দূরত্ব ১৯,০০০ কিলোমিটার।

এখনো অনেকেই ভুল করে ধরে নেন যে, অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ আবিষ্কার করা প্রথম ইউরোপীয় হলেন ব্রিটিশ নৌ-অভিযাত্রী ক্যাপ্টেন জেমস কুক। বিতর্কিত 'আবিষ্কার' শব্দটিকে যদি বাদও দিই, তার পরেও কথা থেকে যায়। আরো আগেই ইউরোপীয়রা অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে পা রেখেছিল বলে নথিবদ্ধ আছে। প্রথম ইউরোপীয় হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার ভূখণ্ডে অবতরণ করেন ডাচ নাবিক উইলেম জ্যানজুন। ১৬০৬ সালে তর নেতৃত্বে ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জাহাজ 'ডুইফকেন' অস্ট্রেলিয়ার উত্তর উপকূলে এসে পৌঁছায়। জ্যানজুন ভেবেছিলেন তিনি সম্ভবত নিউ গিনি দ্বীপে নেমেছেন। স্থানীয় আদিবাসীদের হামলার মুখে পরে শিগগিরই জাহাজে উঠে পড়তে বাধ্য হয় তার দল। এরপর আরও কয়েকজন ডাচ ও ইউরোপীয় অভিযাত্রী অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে এসেছিলেন। তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন আবেল তাসমান, যার নামে আজকের তাসমানিয়া দ্বীপটির নামকরণ। তবে এই অঞ্চলকে অনুর্বর ও শত্রুভাবাপন্ন মনে হওয়ায় এদের কেউই অস্ট্রেলিয়ার ভেতরের দিকে যাওয়ার আগ্রহ দেখাননি।

১৭৭০ সালে ক্যাপ্টেন কুক যখন হ্যামার বে'তে এসে পৌঁছান এবং পূর্ব উপকূল ঘুরে দেখেন, তখন ইউরোপে এক নতুন উত্তেজনার সঞ্চার হয়। অনেকেই মনে করলেন অবশেষে খুঁজে পাওয়া গেছে কিংবদন্তির সেই 'টেরা অস্ট্রালিস ইনকগিনিটা' বা 'অজানা দক্ষিণ ভূখণ্ড'। এই নামের উৎপত্তি বহু পুরোনো। খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে প্রাচীন গ্রিক ভূগোলবিদ ক্লডিয়াস টলেমি একটি মানচিত্র তৈরি করেছিলেন। সেখানে তিনি ধারণা দিয়েছিলেন যে, পৃথিবী যেহেতু গোলাকার তাই উত্তরের দিকে যদি ভূমি থাকে, তবে ভারসাম্য রক্ষার জন্য দক্ষিণের দিকেও একটা বিশাল ভূখণ্ড থাকতে হবে। এই চিন্তাভাবনা থেকেই জন্ম নেয় দক্ষিণ গোলার্ধের 'অজানা মহাদেশ' নিয়ে ইউরোপীয়দের কল্পনা। এই অজানা ভূমির অস্তিত্ব শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ম্যাপে আঁকা থাকলেও বাস্তবে কেউই জানত না তা কোথায়।

ক্যাপ্টেন কুকের কাছে যে মানচিত্র ছিল, স্বাভাবিকভাবেই তা ছিল অনেক বেশি আধুনিক এবং হালনাদাগাদকৃত। তাকে পূর্ব উপকূলে পা রাখা প্রথম ইউরোপীয় বলা যায়। তিনি যেখানে প্রথম পা রেখেছিলেন, সেখানকার নাম দেওয়া হয় 'বোটানি বে'। বর্তমানে এটা সিডনির মধ্যে পড়েছে। তারা সেখানে সাত দিন অবস্থান করেন। তার দলের লোকেদের সঙ্গে স্থানীয় আদিবাসীদের মোলাকাতের ঘটনাটি সে সময়ের প্রেক্ষাপটে তেমন গুরুত্ব পায়নি। কিন্তু ভালোভাবে চিন্তা করে দেখলে এই ঘটনাকে যুগান্তকারী থেকে কম কিছু ভাবা যায় না। এই ঘটনার হাত ধরেই পরবর্তী সকল পরিবর্তন এসেছে। দুই সভ্যতার এই যোগাযোগ লিপিবদ্ধ হয়ে আছে জেমস কুকের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা জোসেফ ব্যাঙ্কসের লেখা জার্নালে। এই জার্নালগুলো পরে প্রকাশিত হয় 'জার্নাল অফ দ্য রাইট অনারেবল স্যার জোসেফ ব্যাংকস ডিউরিং ক্যাপ্টেন কুক'স ফার্স্ট ভয়েজ ইন এইচএমএস এন্ডেভার ইন ১৭৬৮-৭১' নামে। তিনি লিখেছেন— "আর এভাবেই তারা জীবন ধারণ করে। বলা যায়, খুব সামান্যের মাঝে সুখেই বাস করে এই মানুষগুলো। বলতে গেলে আসলে তাদের কিছুই নেই। ধন-সম্পদের কলুষতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত তারা। আমরা ইউরোপীয়রা যেসব জিনিসকে প্রয়োজনীয় বলি, সেসব দখলে রাখার জন্য বিন্দুমাত্র উদ্বেগ পেতে হয় না এই মানুষগুলোকে... তাদের দেখলে উপলব্ধি হয় মানুষের প্রকৃত চাহিদা আসলে কতটা সামান্য। আমরা ইউরোপীয়রা এই চাহিদা বাড়িয়ে এমন এক উচ্চতায় নিয়ে গেছি, যা এরা ভাবতেও সক্ষম নয়। যদি কোনোভাবে বোঝানো যেত, তাহলে এরা হয়তো হতবাক হয়ে তাকিয়ে থাকত।"

অবশ্য স্থানীয় আদিবাসীদের সঙ্গে এত মানবিক অভিজ্ঞতার পরেও এই বোটানি বে'কেই দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীদের বসতি স্থাপনের উপযুক্ত হিসেবে সুপারিশ করেন ব্যাংকস। পেনাল কলোনির এই ভাবনার পেছনে মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল দুটো। একদিকে, ব্রিটেনের কারাগারগুলোতে স্থান সংকুলান করা, অপরাধীদেরকে এমন জায়গায় রেখে আসা যেখান থেকে তারা আর ফিরতে পারবে না। অন্যদিকে, সাম্রাজ্যের কেন্দ্র থেকে ১৭ হাজার কিলোমিটার দূরে ব্রিটিশ পতাকা গেঁথে দেওয়ার কৌশলগত সুবিধাদিও ভাবনায় রাখা হয়েছিল।

জাহাজ প্রস্তুত হলো, দণ্ডিতদের জড় করা হলো, জাহাজ ভরে চাপানো হলো রসদ ও প্রয়োজনীয় সামগ্রী। জাহাজের প্রথম বহরটি ১৭৮৭ সালের ১৩ই মে ইংল্যান্ডের পোর্টসমাউথ বন্দর থেকে রওনা দিয়ে বোটানি বে'তে গিয়ে ভিড়ল

১৭৮৮ সালের ২৪শে জানুয়ারি। অর্থাৎ সময় লাগল ৮ মাসেরও বেশি। ১১টি জাহাজে করে এসে পৌঁছাল প্রায় ১৫০০ মানুষ। এর মধ্যে ৭৩০ জনই ছিল দণ্ডিত অপরাধী। এদের মধ্যে ৫৭০ জন ছিল পুরুষ আর ১৬০ জন ছিল নারী। বাকিরা সাধারণ মানুষ, যাদের অধিকাংশই নাবিক।

দুই সপ্তাহ পর গভর্নর আর্থার ফিলিপের মনে হলো, বোটানি বে জায়গাটা স্থায়ী বসবাসের জন্য ঠিক সুবিধাজনক নয়। সুতরাং, জেলখানা এবং কয়েদিসহ গোটা বসতিকে তুলে নিয়ে যাওয়া হলো কয়েক কিলোমিটার উত্তরে, বর্তমানে যেখানে সিডনি বন্দর নির্মিত হয়েছে। অবশেষে এই ভূখণ্ডে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিপ্রস্তর স্থায়ী হলো। গভর্নর নতুন বসতির সৈকতে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিয়েছিলেন, আর সেই ভাষণ লিপিবদ্ধ করেছিলেন জর্জ ওরগান নামে এক নেভাল সার্জন। তিনি লিখেছেন, "স্থানীয় বাসিন্দাদের অসন্তুষ্ট করা বা কোনো কারণে তাদের ওপর নিপীড়ন চালানোর ব্যাপারে গভর্নর কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেন... তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণ করতে বললেন।" যদিও পরে আর বিষয়টা তেমন রইল না। সিডনির পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছিল 'এওরা' এবং 'ডারুগ' গোষ্ঠীর লোকেদের বাস। শুরুর দিকে ইউরোপীয়দের সঙ্গে তাদের আদান-প্রদানের মূল ভিত্তি ছিল বিনিময়। তখন তারা ঘুণাক্ষরেও ভাবেনি যে এই আজব লোকগুলো আদতে এসেছে তাদের জমি ছিনিয়ে নিতে।

প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষ ভেবে এসেছে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীরা আসলে একটা জাতিগোষ্ঠীর মানুষ। কিন্তু বিষয়টা মোটেই তেমন নয়। এই দেশজুড়ে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য জাতিগত এবং ভাষাগত গোষ্ঠী। এমনকি কুইনসল্যান্ডের মুরি, সাউথ অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণের নুঙ্গা, বা তাসমানিয়ার পালাওয়া গোষ্ঠীর মধ্যেও আছে বিভিন্ন উপগোষ্ঠী। ১৭৮৮ সালে ধারণা করা হয়েছিল, আদিবাসীদের মোট সংখ্যা আড়াই থেকে পাঁচ লাখের মধ্যে হবে। কেউ কেউ এর বেশিও আন্দাজ করেছেন। পরের দশকগুলোতে বসতি স্থাপনকারীদের সঙ্গে ক্রমাগত লড়াই চলতে থাকে তাদের। ধারণা করা হয়, এই ক্রমাগত লড়াইয়ে প্রতি দশকে দশ হাজারেরও বেশি আদিবাসীর মৃত্যু হয়েছে। 'ফ্রন্টিয়ার ওয়ার' বা 'সীমান্ত যুদ্ধ' নামে পরিচিত এই লড়াই এমনকি বিংশ শতকে এসেও চলমান ছিল।

একদিকে যেমন সিডনির বসতি প্রসার লাভ করতে শুরু করল, অন্যদিকে নতুন নতুন বসতি গড়ে উঠলো মেলবোর্ন, ব্রিসবেন ও তাসমানিয়ায়। সেই সঙ্গে ফ্রন্টিয়ার ওয়ারও ছড়িয়ে পড়তে থাকল। এই যুদ্ধের নৃশংসতার মাত্রা নিয়ে

ইতিহাসবিদেরা প্রায়ই বিতর্ক করে থাকেন। তবে, ক্রমাগত এই লড়াইয়ের ফলে এমনকি কম করে ধরলেও অন্তত ২০০০ ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপনকারী এবং এর বহুগুণ বেশি আদিবাসী নিহত হয়েছেন। আদিবাসীদের ওপর গণহত্যা চালানো হয়েছে বহু দফায়। এক পক্ষ অপর পক্ষের ন্যূনতম অধিকার স্বীকার করতে না চাওয়ার এই গল্পগুলো খুবই দুঃখবহ। বহু উপনিবেশ স্থাপনকারীই আদিবাসীদেরকে পুরোপুরি মানুষ হিসেবে দেখত না।

অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের সংস্কৃতির ওপর যে কী ভয়াবহ ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয়েছিল, তা সুনিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে সাংবাদিক এডওয়ার্ড উইলসনের একটি মর্মস্পর্শী নিবন্ধে। ১৮৫৬ সালে মেলবোর্নের আরগাস পত্রিকায় তিনি লিখেছেন—

"দুই দশকেরও কম সময়ের মধ্যে আমরা তাদেরকে পৃথিবীর বুক থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করে ফেলেছি। আমরা তাদেরকে কুকুরের মতো গুলি করে মেরেছি... এমনকি অনেক সময় গোটা গোত্রকে কষ্ট দিয়ে দিয়ে মেরেছি। আমরা তাদেরকে বেহেড মাতাল বানিয়ে দিয়েছি। তাদের মধ্যে এমন সব রোগের সংক্রমণ ঘটিয়েছি, যেসব রোগে পূর্ণবয়স্কদের শরীরের হাড় ক্ষয়ে যাচ্ছে, আর শিশুদের জন্ম হচ্ছে শারিরীক বিকৃতি নিয়ে। জন্ম থেকেই তাদের জীবন নরক হয়ে উঠছে। তাদের ভূমিতে তাদেরকেই অচ্ছুত বানিয়ে রেখেছি আমরা। তাদেরকে ঠেলে দিচ্ছি পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার পথে।"

পুরো ঊনবিংশ এবং বিংশ শতক জুড়ে আদিবাসীদের অস্তিত্ব বিলীন হওয়ার হুমকিতে ছিল। এমনকি হত্যাযজ্ঞ থেমে যাওয়ার বহু পরেও বিরাজমান ছিল এই তীব্র জাতিবিদ্বেষ। ১৯১০ সাল থেকে শুরু হয় আরেক অমানবিক রাষ্ট্রীয় প্রক্রিয়া। বিভিন্ন অঞ্চলের অ্যাবোরিজিন গোষ্ঠীর জীবিত পরিবারগুলো থেকে শিশুদের ধরে নিয়ে আসা হয়। তাদেরকে হয় শ্বেতাঙ্গ পরিবারের মধ্যে, অথবা রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে রেখে বড় করে তোলা শুরু হয়। দুই ক্ষেত্রেই এই কাজের উদ্দেশ্য ছিল জোরপুর্বক ইউরোপীয় সংস্কৃতিতে অন্তর্ভূক্তিকরণের অমানবিক প্রচেষ্টা। শেষ পর্যন্ত ১৯৭০ সালে এই প্রক্রিয়া বন্ধ হলেও 'হারিয়ে যাওয়া প্রজন্মের' ছিনিয়ে নেওয়া শিশুর সংখ্যা ততদিনে এক লাখ ছাড়িয়ে গেছে। আদিবাসীদেরকে ভোটাধিকার দেওয়া হয় ১৯৬২ সালে। আর অবশেষে ১৯৬৭ সালে এসে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকার করা হয় যে আদিবাসীরাও অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যার অংশ। সে বছর একটি গণভোটের মাধ্যমে শাসনতন্ত্রে পরিবর্তন আনা হয় এবং আদিবাসীদেরকে জনশুমারিতে

অন্তর্ভূক্ত করা হয়। রাষ্ট্রীয় সম্পদের ওপর তাদের অধিকার সুনিশ্চিত করা হয় এর মাধ্যমে। এর আগে পর্যন্ত পরিস্থিতি এমন ছিল যে ১৯৬৫ সালে মানবাধিকার কর্মী ফেইথ ব্যান্ডলার দুঃখ করে বলেছিলেন, "অস্ট্রেলিয়ার অধিবাসীদের বাড়িতে কতগুলো পোষা কুকুর বা গবাদিপশু রয়েছে তা বাধ্যতামুলকভাবে নিবন্ধন করতে হয়, অথচ আমরা জানি না অ্যাবোরিজিনরা সংখ্যায় কত জন।"

এই গণভোটে অংশ নিয়েছিল দিয়েছিল ৯৩ শতাংশ ভোটার। আর আইন পাশ হয় ৯০ শতাংশ সমর্থন নিয়ে। তাৎক্ষণিকভাবে আমূল পরিবর্তন না এলেও, এই গণভোটকে অনেকেই যুগ-সন্ধিক্ষণ বলে থাকেন। এই ভোটের মাধ্যমেই অস্ট্রেলিয়ার জনগণের মধ্যে সমতা সম্প্রসারণের আকাঙ্ক্ষা ফুটে উঠেছিল। তবে এখনো বহু পথ পাড়ি দেওয়া বাকি। অধিকারের এই লড়াই এখনো চলমান আছে। আদিবাসী নারী-পুরুষেরা বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি নিচ্ছেন, মধ্যবিত্ত জীবনে ঢুকে আধুনিক অস্ট্রেলিয়ার প্রতিটি ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ছেন। কিন্তু এর পরেও কথা থেকে যায়। তাদের গড় আয়ুষ্কাল আজও জাতীয় গড়ের চেয়ে বেশ খানিকটা কম। তাদের মধ্যে দূরারোগ্য এবং দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধিতে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বেশি, শিশুমৃত্যুর হার এবং অপরাধপ্রবণতাও অনেক বেশি। কিছু কিছু আদিবাসী সমাজ বেকারত্ব, মদ্যপান এবং অসুখে-বিসুখে অতিমাত্রায় জর্জরিত। এর পাশাপাশি তাদের মধ্যে গেঁথে আছে নানারকম মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা। এতকাল বিচ্ছিন্ন এবং অচ্ছুত হয়ে থাকার ফলে তৈরি হওয়া মানসিক দূরত্ব তো আছেই, তার ওপর চেপেছে আরেক মানসিক পীড়ন। ১৯৭০-এর দশক থেকে গ্রামীণ অঞ্চল ছেড়ে স্রোতের মতো শহরে চলে আসছে তারা। এলাকা ছাড়ার মর্মপীড়া যেমন তাদেরকে ভোগাচ্ছে, সেই সঙ্গে ভোগাচ্ছে নতুন জায়গায় মানিয়ে নেওয়ার সংগ্রাম।

বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের বলা হয় 'পিপলস অব দ্য ফার্স্ট নেশনস'। আদিবাসীদের প্রতি বাকিদের আচরণে পরিবর্তন এসেছে ধীরে ধীরে, নানারকমের প্রতীকী পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। যেমন, অস্ট্রেলিয়ার ঠিক মাঝখানে আউটব্যাক অঞ্চলে প্রায় তিন হাজার ফিট উঁচু একটি পাহাড় আছে। আশ্চর্যের বিষয় হলো এই পুরো পাহাড়টিই আসলে একটা মাত্র পাথরের খণ্ড। এই পাথরটি স্থানীয় আদিবাসী আনাঙ্গু গোত্রের মানুষদের কাছে পবিত্র স্থান। ইউরোপীয়রা পাথরটির নাম দিয়েছিল 'আয়ারস রক'। ১৯৯০-এর দশকে এসে আনাঙ্গু ভাষায় পাথরটির আদি নাম ফিরিয়ে আনা হয় এবং 'আয়ারস রক/উলুরু' এভাবে লেখা হতে থাকে। ২০০২ সালে এসে আবার পরিবর্তন এনে লেখা হয় 'উলুরু/আয়ারস

রক’। ২০০৮ সালে এসে বিগত ২০০ বছর ধরে আদিবাসীদের ওপর চালানো ধ্বংসযজ্ঞ, নিপীড়ন এবং অবহেলার দায় রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকার করে নেয় অস্ট্রেলিয়া। অ্যাবোরিজিন মানুষেরা এ যাবতকালে যত নির্যাতনের শিকার হয়েছে তার দায় স্বীকার করে রাষ্ট্রের হয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করেন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী কেভিন রাড।

১৯২০ সাল নাগাদ তারা সংখ্যায় ৬০ হাজারে নেমে এসেছিল বলে ধারণা করা হয়। এমন নিপীড়ন এবং বঞ্চনার পরেও বিংশ শতকে এসে আদিবাসীরা সংখ্যায় বাড়তে শুরু করে। অস্ট্রেলিয়ার আদিবাসীদের প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায়— ‘অ্যাবোরিজিন’ আর ‘টোরেস স্ট্রেইট আইল্যান্ডারস’। দুই জনগোষ্ঠী মিলে অস্ট্রেলিয়ার বর্তমান আদিবাসীদের সংখ্যা এখন ৮ লাখ ছাড়িয়েছে। টোরেস স্ট্রেইট আদিবাসীদের বসবাস মূলত কুইন্সল্যান্ড, নিউ সাউথ ওয়েলস, ওয়েস্টার্ন অস্ট্রেলিয়া এবং উত্তরাঞ্চলীয় টেরিটোরিতে। আদিবাসীদের শত শত ভাষার বেশির ভাগই এখন হারিয়ে গেছে। কিছু ভাষা এখনো জীবিত আছে বটে, তবে এখন বড়জোর ৫০ হাজার আদিবাসী মানুষ আছেন যারা এগুলোর অন্তত কোনো একটি ভাষা জানেন।

এত সব সর্বনাশের মূলে রয়েছে ইউরোপ থেকে এসে বসতি গড়া মানুষগুলো। পুরো মহাদেশ জুড়ে তাদের ছড়িয়ে পড়ার গতি ধীর হলেও ছিল বেশ ধারাবাহিক। ধীরে ধীরে জাহাজ ভর্তি করে আরো লোক এল। শ্বেতাঙ্গ জনসংখ্যা প্রতি বছর কয়েক হাজার করে বাড়তে শুরু করল। এদের বেশিরভাগই ছিল যুক্তরাজ্য থেকে আগত দণ্ডিত অপরাধী। ১৮২৫ সাল নাগাদ অভিযাত্রীরা এক অসাধ্য সাধন করে ফেললেন। সিডনির পশ্চিমে অবস্থিত দুর্লঙ্ঘ ব্লু মাউন্টেইনস অতিক্রম করে এগিয়ে গেলেন। সামনে দেখতে পেলেন বিস্তীর্ণ আউটব্যাক অঞ্চল। সে সময় অস্ট্রেলিয়ার ঔপনিবেশিক জনসংখ্যা ছিল ৫০ হাজারের মতো। ১৮৫১ সালে এসে তা সাড়ে চার লাখ ছাড়িয়ে যায়। এই সময়ে এসে অপরাধীদের নিয়ে আসা প্রায় বন্ধ করে দেওয়া হয়। সেই সময় থেকে অস্ট্রেলিয়ায় ঢুকতে শুরু করে নতুন জীবনের সন্ধানে আসা ভাগ্যান্বেষী সাধারণ মানুষ।

যখন থেকে অপরাধীদের বদলে শুধু সাধারণ মানুষ আসতে শুরু করল, ঠিক একই সময় অস্ট্রেলিয়ায় শুরু হলো প্রথম ‘গোল্ড রাশ’। ১৮৫১ সালে নিউ সাউথ ওয়েলস অঞ্চলজুড়ে বিভিন্ন জায়গায় স্বর্ণের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। আর এই ঘটনা অস্ট্রেলীয় সমাজকে চিরতরে বদলে দিল। বিভিন্ন দেশ থেকে হাজার হাজার

মানুষ ছুটে আসতে থাকল ভাগ্য পরিবর্তনের আশায়। এদের বেশিরভাগই এসেছিল ব্রিটেন থেকে। এছাড়াও চীন, উত্তর অ্যামেরিকা, ইতালি, জার্মানি, পোল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ এসে জড় হয় এখানে। অস্ট্রেলীয়রা এই প্রজন্মকে বলে 'গোল্ড জেনারেশন'। আর এই প্রজন্মের বদান্যতায় ১৮৭০-এর দশকের শুরুতে এসে জনসংখ্যার উল্লম্ফন ঘটে, জনসংখ্যা হয়ে দাঁড়ায় ১.৭ মিলিয়ন। পরবর্তীতে ধীরে ধীরে এই সমাজ জাতিগত এবং সংস্কৃতিগতভাবে আরো বেশি বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে।

গোল্ড রাশের প্রথম ধাপে যারা এসে মেলবোর্ন উপকূলে নেমেছিল, তাদের বেশিরভাগই ছিল অবিবাহিত তরুণ। তারা এসে নিউ সাউথ ওয়েলসকে প্রায় মার্কিন ওয়াইল্ড ওয়েস্ট বানিয়ে ফেলেছিল। তবে, ক্রমেই সমৃদ্ধি আসতে শুরু হওয়ায় নতুন আগত অভিবাসীদের ধরনেও বদল আসে। ধীরে ধীরে দক্ষ কারিগর, বণিক এবং অ্যাকাউন্ট্যান্ট বা আইনজীবীর মতো অন্যান্য পেশাজীবীরা তাদের পরিবারসহ এখানে আসতে শুরু করে।

তাদের সকলের মিলিত অবদানেই অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় চরিত্র নির্মিত হয়েছে। তবে অনেকেই বলে থাকেন, সর্ব কাজের কাজী ও বন্ধুসুলভ যে আচরণের জন্য অস্ট্রেলীয়রা পরিচিত, তার জন্মদাতা নাকি সেই 'ডিগারের দল', অর্থাৎ যেসব মানুষ স্বর্ণের খোঁজে মাটি খুঁড়ত। পুরোনো পৃথিবীর সুললিত ভদ্রতা এসব রুক্ষ ও কর্দমাক্ত 'প্রোসপেক্টিং' অঞ্চলে কোনো কাজেই লাগে না। এই স্বাধীন অঞ্চলে মানুষ হয়ে ওঠে স্বাধীনচেতা, সেই সঙ্গে থাকে ভ্রাতৃপ্রতিম সহযোগীতার বন্ধন। প্রোসপেক্টারদের এই ভাবধারা থেকে যে আত্মপরিচয়ের সৃষ্টি হয়েছিল, সেখানে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ অনেকটাই কমে এসেছিল।

বিংশ শতকে পা দিয়ে অস্ট্রেলিয়া মোটামুটিভাবে একটি আধুনিক রাষ্ট্রে রূপ নিতে থাকে। তবে অস্ট্রেলিয়া তখনো আদতে অনেকগুলো বসতির সমষ্টি মাত্র। বসতিগুলোর মধ্যকার দূরত্বই ছিল সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। বসতিগুলো এতটাই দূরে দূরে ছিল যে, আলাদা আলাদা দেশ বললেও খুব একটা ভুল হতো না। এই বসতিগুলোর মধ্যে আহামরি তেমন কিছু পারস্পরিক সম্পর্কও ছিল না। যে যার মতো করে নিজের নিজের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ব্যবস্থাদি নিয়েই ব্যস্ত থাকত। আমরা আগেই দেখেছি যে অস্ট্রেলিয়ার নদীগুলো পণ্য পরিবহণের উপযুক্ত নয়। ফলে ওই সময় যেকোনো পণ্য পরিবহণের একমাত্র উপায় ছিল স্থলপথে মানুষের ঘাড়ে চাপিয়ে রুক্ষ পথ ধরে নিয়ে যাওয়া। সে সময় পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ায়

খুব বেশি ভারবাহী পশুও ছিল না। এই ভূখণ্ডের প্রাথমিক পরিবহণ ব্যবস্থা ছিল বন্দরভিত্তিক। প্রতিটি বন্দর থেকে ভেতরের দিকে মালামাল পাঠানো হতো। একেকটি বসতি যেহেতু বিচ্ছিন্নভাবে আলাদা আলাদা অঞ্চলে অবস্থিত ছিল, তাই এদের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ স্থাপনেরও কোনো ভাবনা ছিল না তখন। বন্দর থেকে রাস্তাগুলো সব ঢুকেছিল ভেতরের দিকে, উপকূল ধরে খুব বেশি দূর পর্যন্ত এগোয়নি কোথাও। এসব সীমাবদ্ধতার মুখে পড়ে প্রতিটি বসতিই নিজের মতো করে নিজেদের উন্নয়ন ঘটাতে থাকে।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে এসে অস্ট্রেলিয়াতে রেল ব্যবস্থাপনা গড়ে উঠতে শুরু করে। এই রেললাইন উপকূলীয় শহরগুলোর মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে সংযুক্ত অর্থনীতির ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দেয়। একদিকে যেমন পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে থাকে, সেই সঙ্গে জোরালো হতে থাকে বিভিন্ন অঞ্চল একত্রিত হয়ে ফেডারেশন গঠনের ভাবনা। এই লক্ষ্যে ১৮৯৯ সালে একটি গণভোটের আয়োজন করা হয়। প্রচুর বিরোধী ভোট পড়লেও ফেডারেশন গঠনের প্রস্তাবই শেষ পর্যন্ত জয়যুক্ত হয়। অবশেষে ১৯০০ সালে ৫ই জুলাই ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পাস হয় ‘কমনওয়েলথ অব অস্ট্রেলিয়া কন্সটিটিউশন অ্যাক্ট ১৯০০’। এর চারদিন পর রানি ভিক্টোরিয়া আইনটিতে স্বাক্ষর করেন। ১৯০১ সালের ১লা জানুয়ারি ছয়টি ব্রিটিশ বসতি মিলে গঠন করে ‘কমনওয়েলথ অব অস্ট্রেলিয়া’। এই আনন্দ উদযাপনে ৫ লাখ মানুষের ঢল নেমেছিল সিডনির রাস্তায়। অথচ অস্ট্রেলিয়া তখনো সার্বভৌম রাষ্ট্রের স্বীকৃতি পায়নি। তারা তখনো কেবল একটি ‘স্বশাসিত উপনিবেশ’। তারপরও, নিজের ভাগ্য নিজে নির্ধারণের সুযোগ পাওয়াটাও উদযাপনের বড় উপলক্ষ্য হতে পারে। এখানে বলা রাখা দরকার, ১৯৮৬ সালে ‘অস্ট্রেলিয়া অ্যাক্ট’ পাস হওয়ার মাধ্যমে পরিপূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করে দেশটি।

জনসংখ্যা তিন মিলিয়ন ছাড়িয়ে যাওয়ার পর অস্ট্রেলিয়া ধীরে ধীরে একটি শহুরে সমাজে রূপ নিতে শুরু করে। সিডনি আর মেলবোর্নের লোকসংখ্যা পাঁচ লাখ ছাড়িয়ে যায়। তখন পর্যন্ত বেশিরভাগ অভিবাসীই আসত ব্রিটেন থেকে। বাকি দেশগুলো থেকেও আসত মূলত শ্বেতাঙ্গরাই। স্বশাসিত দেশের নতুন সরকার প্রথম দফাতেই যেসব আইন পাস করে তার অন্যতম ছিল কুখ্যাত ‘ইমিগ্রেশন রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট ১৯০১’। এই আইনটি পরে ‘শ্বেতাঙ্গ অস্ট্রেলিয়া নীতি’ নামে পরিচিতি লাভ করে। সরাসরি উল্লেখ না করা হলেও এই আইনের ভাষার মধ্যে বর্ণবাদী চিন্তাধারা ছিল দিনের আলোর মতোই স্পষ্ট। এই আইনে অস্ট্রেলিয়ায়

প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত ধারায় বলা হয়, "যে ব্যক্তি একজন অভিবাসন কর্মকর্তার চাহিবামাত্র সেই মুহূর্তে সেই কর্মকর্তার সম্মুখে সেই কর্মকর্তার মৌখিক বক্তব্য বা নির্দিষ্ট করে দেওয়া যে কোনো ইউরোপীয় ভাষায় অন্তত ৫০টি শব্দ লিখতে ব্যর্থ হবে, তাকে প্রবেশাধিকার দেওয়া হবে না।"

ধরা যাক আশ্চর্য এক ঘটনা ঘটল। অফিসারের কথা শুনে চীন থেকে আগত এক অভিবাসী পর্তুগীজ ভাষায় ৫০টা শব্দ লিখে ফেলল। তখন কী হতো? সেক্ষেত্রে আবারও তার টেস্ট নেওয়া হতো। এবারে হয়তো বলা হতো ফ্লেমিশ ভাষায় ৫০টা শব্দ লিখতে। আগেই বলা হয়েছে, ভাষা বাছাই হতো ইমিগ্রেশন অফিসারের ইচ্ছামতো। ওই অফিসার হয়তো আগে থেকেই প্রার্থীর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে রেখেছে। এই টেস্টের উদ্দেশ্য ছিল আগে থেকে নিয়ে রাখা সেই সিদ্ধান্তে একটা দাপ্তরিক সিলমোহর মারা। এই পদ্ধতিতে যাদেরকে অস্ট্রেলিয়ায় অভিবাসন নিতে বাধা দেওয়া হয়েছে, তাদের বেশির ভাগই ছিল অশ্বেতাঙ্গ। আবার অনেক সময় এই একই আইন প্রয়োগ করে অনেক অভিবাসীকে অস্ট্রেলিয়া থেকে বের করেও দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে, সহিংস অপরাধীদের ক্ষেত্রে জেলে ভরে রাখার চেয়ে জাহাজে তুলে বিদায় করে দেওয়াকেই শ্রেয় মনে করা হয়েছে অনেক সময়। একদিকে কর্তৃপক্ষ এসমস্ত অমানবিক আচরণ করছে, অপরদিকে নতুন এই কমনওয়েলথের জনপ্রিয় গান হয়ে উঠছে 'অ্যাডভান্স অস্ট্রেলিয়া ফেয়ার' অর্থাৎ 'সাম্যের সঙ্গে এগিয়ে চল অস্ট্রেলিয়া'। এই গানটাই পরবর্তী সময়ে জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হয়—

We've boundless plains to share;
With courage let us all combine
To Advance Australia fair.

তবে ওই সময় রাজনৈতিকভাবে সাধারণ জনগণের মধ্যে সর্বাধিক জনপ্রিয় মতামত ছিল—এই অসীম সমভূমির ভাগ দেওয়া হবে শুধু শ্বেতাঙ্গদের। ব্রিটিশ হলে সবথেকে ভালো। নতুন এই আইনের মূল লক্ষ্য ছিল চীন, জাপান, ইন্দোনেশিয়া বা ইন্দো-প্যাসিফিক প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে অভিবাসন ঠেকানো। কারণ, তারা বেশি বেশি ঢুকলে একদিকে শ্রমিকের মূল্য সস্তা হয়ে যাবে, আরেকদিকে ইউরোপিয়ানদের তথাকথিত জাতিগত বিশুদ্ধতা নষ্ট হবে। অস্ট্রেলিয়ায় এই শ্বেতাঙ্গবাদী নীতি বজায় ছিল ১৯৭০-এর দশক পর্যন্ত। তাদের এশীয় প্রতিবেশীরা বরাবর এই নীতি নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করে এসেছে। বিশেষ করে যেসব দেশ

ঔপনিবেশিকতার ছায়া থেকে বেরিয়ে স্বাধীন হয়েছে, তারা ছিল এই নীতির ঘোরতর বিরোধী।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে অস্ট্রেলিয়ায় শুরু হয় এক নতুন যুগ। দেশটির তখন প্রয়োজন ছিল প্রচুর সংখ্যক জনশক্তি। ফলে নতুন নীতি প্রণয়ন করা হয়। এই নীতিতে বলা হয়—কোনো ব্রিটিশ নাগরিক মাত্র ১০ পাউন্ডের বিনিময়ে জাহাজে চেপে অস্ট্রেলিয়া চলে এলেই নতুন জীবন শুরু করতে পারবে। সে সময় ব্রিটেন থেকে অস্ট্রেলিয়ার ন্যূনতম জাহাজভাড়া ছিল ১২০ পাউন্ড। এই পরিমাণ টাকা তখন অনেক ব্রিটিশ শ্রমজীবীর ছয় মাসের আয়। যুদ্ধ-পরবর্তী বিধ্বস্ত অর্থনীতির সেই সময়ে শ্রেণী-বৈষম্যে জর্জরিত ব্রিটেনের অনেকেই লুফে নেয় অস্ট্রেলিয়ার এই প্রস্তাব। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৮২ সালের মধ্যে ১৫ লাখের বেশি মানুষ ব্রিটেন থেকে অস্ট্রেলিয়ামুখী হয়েছে। জাহাজ ভরে ভরে তারা এসেছে সৌভাগ্যের সন্ধানে।

শুরুতে হয়তো স্যাঁতসেঁতে ব্রিটেন থেকে এসে অস্ট্রেলিয়ার উজ্জ্বল সূর্যালোক ভালোও লেগেছে তাদের। কিন্তু, এরপরেই শুরু হয়েছে কঠোর পরিশ্রম। ঝাঁকে ঝাঁকে আগত এই শ্রমিকদেরকে অস্ট্রেলীয়রা বলত 'টেন পাউন্ড পমস'। আমার এক খালা, খালু আর তিন কাজিন এভাবেই এসেছিল অস্ট্রেলিয়া। খালা অ্যান পেশায় ছিলেন নার্স, আর খালু ডেনিস কাজ করতেন একটি জুতার কারখানায়। তারা ১৯৭২ সালে সাউদাম্পটন বন্দর থেকে রওনা দিয়ে লিডস হয়ে মেলবোর্ন এসে পৌঁছান। প্রাথমিকভাবে তারা ছিলেন অভিবাসী হোস্টেলে। কাজ পেয়ে হোস্টেল ছাড়ার পরে তারা দেখলেন, জীবনযাপনের খরচের তুলনায় বেতন বড্ড কম। এদের মতো অভিবাসী শ্রমিকদের 'পম' বলে ডাকা হতো। পম হচ্ছে পমিগ্র্যানেট এর সংক্ষিপ্ত রূপ। পমিগ্র্যানেটকে অনেকসময় ঠাট্টা করে পমিগ্র্যান্ট ডাকা হতো, কারণ এই শব্দটির সঙ্গে ইমিগ্র্যান্ট শব্দের মিল আছে। পমিগ্র্যানেট বা বেদানার ভেতর যেমন সারিসারি অনেক বীজ থাকে, এই অভিবাসী শ্রমিকরাও তেমনি একসঙ্গে এসে সারিবদ্ধ হয়ে থাকত। বেদানার ছোট ছোট দানার মতো তারা করতোও ছোট খাট কাজ। এই লোকগুলোকে ব্যঙ্গ করে 'টেন পাউন্ডস পম' বলার চল শুরু হয়েছিল।

ওই সময় ব্রিটিশরাই ছিল অস্ট্রেলিয়ার মূল শ্রমশক্তি। তবে ধীরে ধীরে এই অবস্থা বদলাতে শুরু করে। ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকেও প্রচুর সংখ্যক অভিবাসী এসে হাজির হয় অস্ট্রেলিয়ায়। আর এর ফলেই শ্বেতাঙ্গপ্রধান নীতি ধীরে ধীরে শিথিল হতে শুরু করে। ইটালীয়, জার্মান ও গ্রিকরা ১৯০০'র দশকে এসে

নিজস্ব কমিউনিটি গড়ে তুলেছিল। শ্রম অভিবাসনের সময়ে আবারো এই তিন দেশ থেকে অভিবাসীরা আসতে শুরু করে। ১৯৫৬ সালের হাঙ্গেরীয় বিপ্লবের পর সেখান থেকেও অভিবাসী আসা শুরু হয়। ১৯৬৮ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন চেকোস্লোভাকিয়া অধিকার করার পরে চেক অভিবাসীদের ঢল নামে। এর পরে অভিবাসী আসতে শুরু করে দক্ষিণ অ্যামেরিকা ও মধ্যপ্রাচ্য থেকে। এদের বড় অংশ এসেছিল সরকারের দমন-পীড়ন থেকে বাঁচতে। ১৯৭০-এর দশকে ভিয়েতনাম থেকে নৌকায় চেপে আসা শরণার্থীদের নামার সুযোগ দেওয়া হয়। ১৯৯০-এর দশকে আসে যুগোস্লাভিয়া যুদ্ধের শরণার্থীরা।

আর এই জনমিশ্রণের ফলে অস্ট্রেলিয়ায় সংঘটিত হয় সাংস্কৃতিক পট পরিবর্তন। আগে এখানে ছিল একমুখী একটা সংস্কৃতি, যার ভিত্তি ছিল ব্রিটিশ বা আরেকটু ভেঙে বললে অ্যাংলো-কেল্টিক সমাজব্যবস্থা। সেই অস্ট্রেলিয়া ধীরে ধীরে পরিণত হয় বহু সংস্কৃতির মিলনমেলায়। এই পরিবর্তন ঘটার পর একটা বদ্ধ সমাজ অতি দ্রুত রূপান্তরিত হয়ে বর্তমানের আধুনিক অস্ট্রেলিয়ায় পরিণত হয়েছে। এটি এমন এক দেশ, যার অধিবাসীরা ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বহন করে এনেছে ১৯০টি দেশ থেকে। ২০১৬ সালের জনশুমারি অনুযায়ী বর্তমান অস্ট্রেলীয় নাগরিকদের ২৬ শতাংশেরই জন্ম হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার বাইরে। তারা যে সমস্ত দেশ থেকে এসে নাগরিকত্ব পেয়েছে, সেই তালিকায় চোখ বুলালেই দেশটির অভিবাসন নীতির সেই বদলটা চোখে পড়ে। ভিনদেশে জন্ম নেওয়া নাগরিকদের বড় অংশ স্বাভাবিকভাবেই এখনো ব্রিটিশ। তবে, এছাড়াও আছে নিউজিল্যান্ডার (৮.৪%), চীনা (৮.৩%), ভারতীয় (৭.৪%), ফিলিপিনো (৩.৮%) এবং ভিয়েতনামিজ (৩.৬%)। শীর্ষ ১০-এর মধ্যে ৫টিই এশিয়ান দেশ। শুধু অভিবাসন নীতিই নয়, বিংশ শতকের গোড়ার দিকের সঙ্গে তুলনায় গেলে শ্বেতাঙ্গদের আচরণেও আমূল পরিবর্তন এসেছে বলা যায়।

১৭৮৮ তো বটেই, এমনকি ১৯০১ সালের তুলনায়ও উন্নয়নের পথে অনেকদূর অগ্রসর হয়েছে দেশটির সামাজিক পরিস্থিতি। বর্ণবাদ এবং অসাম্য এখনও অন্যান্য অনেক দেশেই ছায়া বিস্তার করে রেখেছে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া এসব বিষয়ে অনেকখানি এগিয়ে গিয়েছে। আর এই পরিবর্তনের গল্পটা ফুটে উঠেছিল ২০১৯ সালে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী কেভিন রাড একটি ভাষণে। তিনি বলেছিলেন— "অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় পরিচয় এদেশের বর্ণভিত্তিক গঠন থেকে আসেনি। এই

জাতীয় পরিচয়ের সংজ্ঞা আমাদের অবশ্যই নিতে হবে আমাদের সামাজিক আদর্শ, প্রতিষ্ঠান এবং রীতি-রেওয়াজ থেকে।"

তবে, অভিবাসী শ্রমিক এবং শরণার্থী বাদে অন্যান্য বিদেশিদের জন্যও আকর্ষণীয় গন্তব্য এই দেশটি। অস্ট্রেলিয়া এখন এতটাই জনপ্রিয় যে, অনেক মানুষ চায় যেকোনো উপায়ে এই দেশে ঢুকে পড়তে। ফলে, অবৈধ অনুপ্রবেশ ঠেকাতে দেশটির প্রতিটি সরকারকেই কঠোর থেকে আরো কঠোর নীতি প্রণয়ন করতে হয়েছে। ২০০১ সাল থেকে নৌকায় চেপে আসা শরণার্থীদের ঠেকাতে নৌবাহিনীকে কাজে লাগাচ্ছে দেশটি। কখনো কখনো নৌকাগুলোকে জোর করে উল্টোদিকে চলতে বাধ্য করা হয়। আবার অনেক সময় নৌবাহিনীর জাহাজে তুলে শরণার্থীদের নামিয়ে দেওয়া হয় পাপুয়া নিউ গিনির নাউরু ও মানুস দ্বীপপুঞ্জে। এই নীতি ২০০৮ সালে সাময়িকভাবে স্থগিত করা হলেও ২০১২ সাল থেকে আবার চালু করা হয়েছে। সে সময় থেকে এখন পর্যন্ত অবৈধ অনুপ্রবেশের দায়ে আটক করা হয়েছে ৩ হাজারেরও বেশি মানুষকে। আটককৃতদের মধ্যে অনেককেই নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হয়েছে। কয়েকশত মানুষকে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। বাকিদের রাখা হয়েছে বিভিন্ন দ্বীপে অবস্থিত আটককেন্দ্রে। অস্ট্রেলীয়রা এগুলোকে বলে 'প্রোসেসিং সেন্টার'। বিভিন্ন প্রোসেসিং সেন্টারে থাকা ২৯০ জন শরণার্থী ২০২০ সালে স্থানীয়দের সহিংস আক্রমণের শিকার হয়েছিল।

মানবাধিকার কর্মীরা বরাবরই অস্ট্রেলিয়ার এই নীতিকে অমানবিক এবং অবৈধ বলে প্রচার করে আসছেন। কিন্তু অস্ট্রেলীয়দের মধ্যে এই নীতি এতটাই জনপ্রিয় যে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা নির্বিঘ্নে তা জারি রেখেছেন। আজকাল এমনিতেও নৌকায় চেপে মানুষ আসা অনেক কমে গেছে। তবে এখন প্রচুর মানুষ আসছে নতুন উপায়ে। ক্রমেই বাড়ছে বিমানে চেপে এসে এসাইলামের আবেদন জানানো মানুষের সংখ্যা।

মানুষ এভাবে অস্ট্রেলিয়াতে আসে কারণ আধুনিক অস্ট্রেলিয়ার বড় অংশই এখনো সম্ভাব্য 'সৌভাগ্যের দেশ' হয়ে আছে। এই তকমাটা জনপ্রিয় হয়েছে ১৯৬৪ সালে ডোনাল্ড হর্নের লেখা একটা বই থেকে। লেখক তার বইতে অনেকটা বিদ্রুপ করেই এই শব্দগুলো লিখেছিলেন। কিন্তু ইতিবাচকতাসহ নানা কারণে এই শব্দগুলো জনপ্রিয় হয়ে যায়। পৃথিবীর উল্টোপাশের সেই দেশটি বর্তমানে পৃথিবীর অন্যতম ধনী রাষ্ট্র, আর ধনী হয়ে থাকাই এই দেশের ভবিষ্যত। এই দেশে রয়েছে

প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুর্য। বহির্বিশ্বে বিক্রয়যোগ্য বেশকিছু খনিজ সম্পদও আছে এখানে। এই দেশে আছে বিশ্বের মোট ইউরেনিয়াম মজুদের এক চতুর্থাংশ। এছাড়াও রয়েছে বিশ্বের সর্বোচ্চ জিংক ও সীসার মজুদ। স্বর্ণ এবং টাংস্টেন উৎপাদনেও দেশটি আছে শীর্ষ পর্যায়ে, আছে প্রচুর পরিমাণে রূপার মজুদও। দেশটি পৃথিবীর অন্যতম শীর্ষ কয়লা উৎপাদক। তাছাড়া, উল, ভেড়ার মাংস, গরুর মাংস, গম এবং ওয়াইন রপ্তানিতে অস্ট্রেলিয়া পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় দেশগুলোর অন্যতম।

অস্ট্রেলিয়ার নাগরিকরা জানে যে, জীবাশ্ম জ্বালানির কারণেই জলবায়ু পরিবর্তন ঘটছে। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধিকেই ২০১৯/২০ সালে অস্ট্রেলিয়ায় ঘটে যাওয়া ভয়াবহ দাবানলের অন্যতম কারণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মূলত অতিরিক্ত তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং পানির সংকটের কারণেই দাবানলের পরিস্থিতি এত ভয়াবহ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। এই দাবানলে মানুষের মৃত্যুর সংখ্যা ছিল সীমিত, কয়েক ডজনের মতো। কিন্তু এই দুর্যোগে মারা যায় নানা প্রজাতির লক্ষ লক্ষ প্রাণী। অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম প্রতীক কোয়ালাও মারা যায় কয়েক হাজার। আগুনের লেলিহান শিখা শহরাঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি, কিন্তু রাজধানী ক্যানবেরার আকাশ ঘন ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ছিল বেশ কিছুদিন। সে সময় ক্যানবেরার বাতাসের গুণমান সাময়িকভাবে বিশ্বের মধ্যে সর্বনিম্নে পৌঁছে যায়। গোটা দেশ জুড়ে তুষারের মতো ঝরে পড়ছিল ছাইয়ের কণা। ছাই ভাসতে ভাসতে ভাসতে এমনকি নিউজিল্যান্ড পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। ২০২০ সালের ৪ জানুয়ারি সিডনি ছিল বিশ্বের সবথেকে উষ্ণ স্থানগুলোর অন্যতম, তাপমাত্রা ছিল ৪৯.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। বুঝতেই পারছেন কি ভয়াবহ ছিল সেই দাবানল।

এই ধরনের পরিবেশে আসলে কতজন মানুষের পক্ষে বসবাস করা সম্ভব? বর্তমানে এর উত্তর হলো ২৫ মিলিয়ন মানুষ। তবে অস্ট্রেলিয়ান ব্যুরো অফ স্ট্যাটিসটিকসের ভবিষ্যদ্বাণীকে যদি সত্য ধরে নেওয়া হয়, তাহলে ২০৬০ সালের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যা ৪০ মিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে। অন্যদিকে, জলবায়ু পরিবর্তনের বর্তমান ধারা যদি অব্যহত থাকে তাহলে সামনের দিনগুলোতে অস্ট্রেলিয়ার তাপপ্রবাহ, খরা এবং দাবানলের ভয়াবহতা পূর্ববর্তী সকল রেকর্ড ভেঙে দিতে পারে। আর এর ফলে পরিবেশ হয়ে উঠবে অতি উত্তপ্ত এবং সেই সঙ্গে আরো বেশি পরিমাণে এলাকা বসবাসের অনুপযুক্ত হয়ে পড়বে। আবার, মহানগরীগুলোর শহরতলী গ্রামাঞ্চলের দিকে যত বেশি বিস্তৃত হবে, তত বেশি

সংখ্যক মানুষ ঝুঁকির মুখে পড়বে। এর অর্থ হলো, অস্ট্রেলীয়রা সম্ভবত উপকূলীয় অঞ্চলেই বসবাস করতে থাকবে। ফলে শহরগুলো হয়ে উঠবে আরও ঘনবসতিপূর্ণ। এমনকি সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির ঝুঁকির মুখে দাঁড়িয়েও এই ধারা অব্যহত থাকবে। তবে এই ঝুঁকির কারণে কিছু এলাকা থেকে ধীরে ধীরে সরে আসতে হতে পারে। পাশাপাশি কম ঝুঁকিপূর্ণ স্থানগুলোর জন্য গ্রহণ করতে হতে পারে দীর্ঘমেয়াদি অবকাঠামোগত পরিকল্পনা।

সূর্যের আলো শক্তির একটি বড় উৎস, আর সূর্যালোক অস্ট্রেলিয়ায় আছে যথেষ্ট পরিমাণে। কিন্তু অন্যদিকে আবার একটি উৎসের ব্যাপক ঘাটতি আছে। সেটা হলো পানি। এই দেশের জলবিদ্যুৎ উৎপাদন একদমই সীমিত। কারণ, যেসব অঞ্চলের মধ্য দিয়ে নদী প্রবাহিত হচ্ছে, সেসব অঞ্চলের বেশিরভাগই সমতল। আবার নদীগুলোর পানিপ্রবাহও পরিবির্তনশীল, যা জলবিদ্যুৎ উৎপাদনে বাধা তৈরি করে। একমাত্র ব্যতিক্রম হলো তাসমানিয়া। তাসমানিয়ার ভূপ্রকৃতি এবং জলবায়ু জলবিদ্যুৎ শিল্পের বিকাশে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে। কিন্তু দেশটি ইতোমধ্যেই পানি সংকটে ভুগছে। ভবিষ্যতে পানি সরবরাহই দেশটির অগ্রাধিকারের তালিকায় শীর্ষ স্থান দখল করবে। এই বিষয়ে টেকসই সমাধানকল্পে দেশটিকে হয়তো খোলামেলা আলোচনা শুরু করতে হবে।

বৈশ্বিক উষ্ণায়নের মুখে দাঁড়িয়ে কয়লা নিয়েও একটা টেকসই সমাধানে আসতে হবে হয়তো। দেশটির প্রতিটি রাজ্যেই কয়লাখনি আছে। ৬৯.৬ বিলিয়ন অস্ট্রেলিয়ান ডলারের এই শিল্পে কর্মরত আছে প্রায় ৫০ হাজার মানুষ। তাই এই বিষয়ে টেকসই সমাধান খুব একটা সহজ হবে না। অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হওয়ার আগে স্কট মরিসন ছিলেন একজন সাধারণ সংসদ সদস্য। সংসদে কয়লা নিয়ে বিশাল শোরগোল তুলেছিলেন তিনি। সংসদের এক অধিবেশনে বড় এক খণ্ড কয়লা হাতে নিয়ে সংসদদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন, "আপনারা ভয় পাবেন না, এটি আপনাদের কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। এটি স্রেফ এক টুকরো কয়লা।" পরিস্থিতি এতটাই জটিল যে অস্ট্রেলিয়া যদি আগামীকালই তাদের সবগুলো কয়লাখনি বন্ধ করে দেয়, তাতেও বৈশ্বিক দূষণ আহামরি কিছু কমবে না। বিশ্বে সবগুলো দেশ একযোগে তাদের কার্বন ফুটপ্রিন্ট কমিয়ে না আনলে এই সমস্যার সমাধান হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। কিন্তু কয়লা উৎপাদন বন্ধ করে দিলে অস্ট্রেলিয়ার অর্থনীতিতে তার প্রভাব হবে ব্যাপক। এই কারণেই দেশটির

কয়লার রাজত্বে আপাতত ভাটা পড়ার সম্ভাবনা খুব কম। তবে বর্তমানে তারা শক্তির বিকল্প উৎসের সন্ধানে রয়েছে।

অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট বিচারে আধুনিক অস্ট্রেলিয়া তার ভৌগোলিক অবস্থানের সঙ্গে ক্রমেই আরো গভীরভাবে সংযুক্ত হচ্ছে। দেশটির রাজনীতিবিদরা দেশটিকে এশিয়া-প্যাসিফিক সম্প্রদায়ের অংশ হিসেবে উল্লেখ করেন। কিন্তু এই অঞ্চলের বাকি দেশগুলো অস্ট্রেলিয়াকে নিজেদের সম্প্রদায়ের অংশ মনে কিনা, সে ব্যাপারে তারা সাধারণত আলোচনা করতে চান না। পশ্চিমাদের মিত্র এই প্রাক্তন উপনিবেশকে নিকটতম প্রতিবেশীরা বড় শক্তি হিসেবে গণ্য করে বটে, তবে পছন্দ খুব একটা করে না। আর বৃহত্তর অঞ্চলের পরিপ্রেক্ষিতে ধরলে এই দেশটি আঞ্চলিক পরাশক্তিগুলোর অন্যতম, যাকে কখনো মিত্র আবার কখনো শত্রু ভাবা হয়।

কৌশলগতভাবে অস্ট্রেলিয়ার মনোযোগ থাকে মূলত উত্তর এবং পূর্ব দিকে। প্রথমে উত্তর দিকের কথা বলা যাক। প্রতিরক্ষার প্রথম স্তর হিসেবে দেশটি নজর রাখে দক্ষিণ চীন সাগরের দিকে। এর পরের ধাপে গুরুত্ব দেওয়া হয় ফিলিপিনো এবং ইন্দোনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের প্রতি। আর সবশেষে আসে অস্ট্রেলিয়া এবং পাপুয়া নিউগিনির মধ্যবর্তী সমুদ্র অঞ্চল। পূর্ব দিকে দেশটির মনোযোগের কেন্দ্র হলো ফিজি এবং ভানুয়াতুর মতো দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপগুলো।

দেশটির বেশকিছু প্রতিরক্ষা সুবিধাও রয়েছে। অস্ট্রেলিয়ায় আগ্রাসন চালানো খুব কঠিন হলেও পুরোপুরি অসম্ভব নয়। আগ্রাসী বাহিনীকে মূলত জল এবং স্থলপথে আক্রমণ চালাতে হবে। দেশটির পূর্ব ও উত্তর দিকে ছড়িয়ে থাকা দ্বীপগুলোর কারণে সম্ভাব্য আক্রমণের পথ খুবই সংকীর্ণ। এই বিষয়টি প্রতিরক্ষার জন্য সুবিধাজনক। এমনকি শত্রুবাহিনী অস্ট্রেলিয়ায় নামতে পারলেও পুরো মহাদেশ দখল করা তাদের জন্য প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়বে। গুরুত্বপূর্ণ শহর ও অবকাঠামো প্রতিরক্ষার জন্য অস্ট্রেলীয়রা গড়ে তুলবে প্রবল প্রতিরোধ। ধরা যাক শত্রুপক্ষ নর্দার্ন টেরিটোরিতে অবতরণ করল। সেখান থেকে সিডনির দূরত্ব ৩২০০ কিলোমিটার। এই দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়া যথেষ্ট কঠিন কাজ। আর এত দীর্ঘ সাপ্লাই লাইন রক্ষণাবেক্ষণ করা দুঃস্বপ্নের মতো ব্যাপার।

তবে এর পরেও অবরোধের ঝুঁকি রয়েই যায়। দেশটির বেশিরভাগ আমদানি-রপ্তানি প্রবাহিত হয় উত্তরের কিছু সংকীর্ণ জলপথের মধ্য দিয়ে। এর মধ্যে অন্যতম হলো মালাক্কা, সুন্দা ও লম্বোক প্রণালি। সংঘাতের সময় এসব প্রণালি সহজেই বন্ধ

করে দেওয়া সম্ভব। মালাক্কা প্রণালি হলো প্রশান্ত মহাসাগর থেকে ভারত মহাসাগরে যাওয়ার সবথেকে সংক্ষিপ্ত পথ। প্রতিবছর এই জলপথ দিয়ে প্রায় ৮০ হাজার জাহাজ চলাচল করে। বিশ্বের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ বাণিজ্যিক পণ্য এই পথেই পরিবহণ করা হয়। উত্তর-পূর্ব এশিয়াগামী তেলের ৮০ শতাংশই যায় এই পথ দিয়ে। যদি এই প্রণালিগুলো বন্ধ হয়ে যায়, তখন বিকল্প পথ খুঁজতে হবে। জাপানে জ্বালানি সরবরাহ করা ট্যাংকারগুলোকে তখন আরো দক্ষিণে গিয়ে অস্ট্রেলিয়ার উত্তর উপকূল ঘেঁষে পাপুয়া নিউগিনির পাশ দিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে ঢুকতে হবে। এর ফলে পরিবহণ খরচ ব্যাপকভাবে বেড়ে গেলেও জাপান এবং অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে বাণিজ্যিক কার্যক্রম চালু রাখা সম্ভব হবে।

অস্ট্রেলিয়ার নিজেরও জ্বালানি প্রয়োজন। আর এটি অস্ট্রেলিয়ার জন্য একটি বড় উদ্বেগের বিষয়। দেশটির ভূগোল ও অবস্থান বিবেচনায় নিরাপত্তা ইস্যুর সঙ্গেও বিষয়টি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। যদি অস্ট্রেলিয়াকে সফলভাবে অবরুদ্ধ করা সম্ভব হয়, তবে দেশটি খুব দ্রুতই জ্বালানি সংকটের মুখোমুখি হবে। দেশটির মজুদে যে পরিমাণে জ্বালানি তেল থাকে, তা দিয়ে মাত্র দুই মাসের চাহিদা পূরণ করা সম্ভব। যেসব ট্যাঙ্কার তেল নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় আসছে, সেগুলোতে মজুদ থাকা তেল দিয়ে বাড়তি আর মাত্র তিন সপ্তাহের চাহিদা পূরণ করা যাবে। ২০২০ সালে তেলের দামে ধ্বস নামার সুযোগ নিয়ে ক্যানবেরা অতিরিক্ত কয়েকদিনের সরবরাহ সংগ্রহ করেছিল। তবে সেই তেল মজুদ রাখা হয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্র্যাটেজিক পেট্রোলিয়াম রিজার্ভে। অবরোধ পরিস্থিতি এলে সেই তেল হাতে পাওয়ার সুযোগ থাকবে না।

এই বিষয়টি মাথায় রেখেই মূলত অস্ট্রেলিয়ার প্রতিরক্ষা কৌশল নির্ধারণ করা হয়। দেশটির হাতে বেশ কিছু যুদ্ধ জাহাজ ও সাবমেরিন আছে। এগুলো ব্যবহার করে জ্বালানিবাহী জাহাজ বহরকে সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব। পাশাপাশি দূরপাল্লার সাগরপথ টহল দেওয়ার উপযোগী বিমানও আছে বেশ কিছু। দেশটির ছয়টি বিমানঘাঁটি আছে ২৬তম অক্ষরেখার উত্তরে। এগুলোর মধ্যে ৩টি ঘাঁটিতে পূর্ণাঙ্গ লোকবলসহ কার্যক্রম চলমান আছে, আর বাকি তিনটি সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে জরুরি প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য। এই অক্ষরেখা মহাদেশটিকে ঠিক মাঝ বরাবর উত্তর-দক্ষিণে বিভক্ত করেছে। পূর্ব প্রান্তে এই রেখা শুরু হয়েছে ব্রিসবেনের ১০০ কিলোমিটার উত্তরে। এরপর সোজা পশ্চিমে গিয়ে শার্ক উপসাগরে গিয়ে পৌঁছেছে। এই রেখার উত্তরে বসবাস করে অস্ট্রেলিয়ার মোট জনসংখ্যার মাত্র ১০

শতাংশ। অনেকের ধারণা, যদি উত্তর দিক থেকে আক্রমণ আসে তবে উত্তরভাগকে পরিত্যাগ করা হবে এবং সামরিক বাহিনী মূলত দক্ষিণের প্রধান জনবসতিগুলোর প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত হবে। তবে এই পরিকল্পনা চরম পরিস্থিতির একটি তাত্ত্বিক দৃশ্যকল্প মাত্র, যা অস্ট্রেলিয়া সরকার যেকোনো উপায়ে এড়াতে চায়। তাদের আশা, বিমানঘাঁটি ও নৌবাহিনী ব্যবহার করে একটি শক্তিশালী ফরোয়ার্ড ডিফেন্স কৌশল গড়ে তোলার মাধ্যমে এই পরিস্থিতি প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

তবে দেশটির বিপুল আয়তন, বর্তমান জনসংখ্যা এবং মধ্যম-স্তরের অর্থনীতি বিবেচনায় নিলে অস্ট্রেলিয়া অভিমুখী সকল সমুদ্রপথ রক্ষা করার মতো বিশাল নৌবাহিনী পরিচালনা করা দেশটির পক্ষে অসম্ভব। শুধু উপকূলবর্তী সমুদ্র অঞ্চল টহল দেওয়াই একটি বড় মাপের চ্যালেঞ্জ। অস্ট্রেলিয়ার মূল ভূখণ্ডের উপকূলরেখা প্রায় ৩৫ হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ। এর পাশাপাশি আরো ২৪ হাজার কিলোমিটার দ্বীপাঞ্চলীয় উপকূলরেখাও নজরদারির আওতায় রাখতে হয়।

ওপরে বর্ণিত পরিস্থিতিগুলো এড়ানোর জন্য অস্ট্রেলিয়া একদিকে যেমন নৌবাহিনীতে বিপুল বিনিয়োগ করেছে, পাশাপাশি কূটনীতিতেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। তারা মিত্র বাছাই করে খুব সতর্কতার সঙ্গে। কোন পরাশক্তি কোন সময় সাগরপথে আধিপত্য বিস্তার করছে, সেদিকে বরাবর নজর রাখে ক্যানবেরা। গ্রেট ব্রিটেন যখন সামরিকভাবে সবথেকে শক্তিশালী ছিল, তখন এই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই ছিল অস্ট্রেলিয়ার প্রধান মিত্র। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পর বিপুল সংখ্যক অস্ট্রেলীয় অধিবাসী ব্রিটেনের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিয়েছিল। আবার প্রধান নৌশক্তি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেনের স্থান দখল করার পরে স্বাভাবিকভাবেই প্রধান রাজনৈতিক, সামরিক এবং কৌশলগত সহযোগী হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রকে বেছে নেয় অস্ট্রেলিয়া। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল অস্ট্রেলিয়া ও ব্রিটেনের মধ্যকার কৌশলগত সম্পর্কের মোড় বদলের সন্ধিক্ষণ। সেই সময় স্পষ্ট হয়ে যায় যে ব্রিটেনের পক্ষে আর অস্ট্রেলিয়াকে সুরক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়। পরবর্তী সময়ে যুদ্ধের গতিপথ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বে কার প্রভাব সবথেকে বেশি থাকবে তা আরও স্পষ্ট হয়ে আসে।

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে অ্যামেরিকার পার্ল হারবার বন্দরে জাপানি হামলার পরপরই 'দ্য টাস্ক অ্যাহেড' শিরোনামের একটি নিবন্ধে বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরেন তৎকালীন অস্ট্রেলীয় প্রধানমন্ত্রী জন কার্টিন। তিনি লিখেছিলেন, "অস্ট্রেলিয়ার সরকার মনে করে যে প্রশান্ত মহাসাগরীয় সংগ্রামে

গণতান্ত্রিক দেশগুলোকে যুদ্ধ নির্দেশনা দেওয়ার ব্যাপারে সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকা উচিত যুক্তরাষ্ট্র ও অস্ট্রেলিয়ার হাতে। কোনো ধরনের সংকোচ বা দ্বিধা ছাড়াই আমরা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিতে চাই যে, অস্ট্রেলিয়া এখন থেকে অ্যামেরিকার ওপরেই ভরসা রাখবে। যুক্তরাজ্যের সঙ্গে ঐতিহ্যগত সম্পর্ক বা আত্মীয়তার কোনো আবেগ আর আমাদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করবে না।" অস্ট্রেলীয়দের স্বভাবসুলভ স্পষ্টবাদিতার সঙ্গে বার্তাটির রাজনৈতিক বাস্তবতার দিকটি স্পষ্টভাবে তুলে ধরেন তিনি। তিনি বলেন, "আমরা এটিও জানি যে, অস্ট্রেলিয়া ধ্বংস হয়ে গেলেও ব্রিটেন তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হবে।"

এটি ছিল পট পরিবর্তনের মুহূর্ত। অস্ট্রেলীয়রা অবশেষে জেনে গেল "ইয়াংকিরা আসছে!" মার্কিন অগ্রবর্তী দল ততদিনে অস্ট্রেলিয়ায় পৌঁছে গেছে। ১৯৪৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে মার্কিন সামরিক বাহিনীর ১ লাখ ৫০ হাজার সদস্য অস্ট্রেলিয়ায় অবস্থান করছিল। তাদের বেশিরভাগই ছিল কুইন্সল্যান্ডে। মিত্রপক্ষের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণক্ষেত্রের সেনাপতি জেনারেল ডগলাস ম্যাকআর্থার সেখানেই তার সদর দপ্তর স্থাপন করেছিলেন। সিডনি ও পার্থে নোঙর ফেলেছিল মার্কিন নৌবাহিনীর রণতরী বহর। এই সময় থেকেই 'মেইড ইন অ্যামেরিকা' ধীরে ধীরে অস্ট্রেলিয়ার সংস্কৃতিতে জায়গা করে নেয়। রক্ষণশীল ব্রিটিশ পণ্যের জায়গা দখল করতে শুরু করে কোকাকোলা, হ্যামবার্গার, পিজা, হটডগ, হলিউডের সিনেমাসহ নানারকমের মার্কিন ভোগ্যপণ্য।

অস্ট্রেলিয়ার মাটিতেও যুদ্ধ পৌঁছে যায় একসময়। ডারউইন বন্দর ছিল মিত্রপক্ষের অন্যতম নৌঘাঁটি। ১৯৪২ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি জাপানের বিমানবাহিনী এই বন্দরে এক ভয়াবহ হামলা চালায়। ১০ সপ্তাহ আগে পার্ল হারবারে হামলা চালাতে জাপান যে বিমানবাহী রণতরীর বহর ব্যবহার করেছিল, এই হামলার জন্যও সেই একই নৌবহর ব্যবহার করে তারা। জানুয়ারি মাসে নিউ গিনি দ্বীপে আগ্রাসন চালায় জাপান। বর্তমান এই দ্বীপের একটা অংশ ইন্দোনেশিয়ার দখলে, আর বাকি অংশ পাপুয়া নিউ গিনি নামে পরিচিত। খুব দ্রুতই তারা পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম এই দ্বীপের উত্তর অংশ দখল করে নেয়। দ্বীপটির অবস্থান অস্ট্রেলিয়ার ঠিক উত্তরে। দ্বীপটি পুরোপুরি জাপানের নিয়ন্ত্রণে চলে গেলে সেখান থেকে সহজেই অস্ট্রেলিয়ায় পুরোদস্তুর আক্রমণ চালানো যেত, বা অস্ট্রেলিয়াকে চারদিক থেকে অবরুদ্ধ করে ফেলা সম্ভব হতো। তবে জাপানের সেই পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করে দেয় কোরাল সাগরের লড়াই। এই লড়াইয়ে

পরাজয়ের ফলে পোর্ট মোর্সবিতে (বর্তমানে পাপুয়া নিউ গিনির রাজধানী) জাপানের উভচর অভিযান ব্যর্থ হয়। জাপানের এই পরিকল্পনাকে পরে তাদের বিরুদ্ধেই কাজে লাগানো হয়েছিল। নিউ গিনি পরিণত হয়েছিল মার্কিন সেনাধ্যক্ষ ডগলাস ম্যাকআর্থারের জাপান-বিরোধী অভিযানের মূল ঘাঁটিতে। এখান থেকেই ফিলিপাইন পুনরুদ্ধার অভিযান পরিচালিত হয়, যা পরবর্তীতে জাপানের পরাজয়ের পথ সুগম করে।

সেই সময় থেকে অস্ট্রেলিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার সম্পর্ক অনেকটাই ব্রিটিশদের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার পুরোনো সম্পর্কের মতো হয়ে উঠেছে। অস্ট্রেলিয়ার সামরিক বাহিনীর কিছু অংশ, বিশেষ করে স্পেশাল ফোর্স মার্কিনিদের বিভিন্ন সামরিক অভিযানে অংশগ্রহণ করে। আর তার বিপরীতে মার্কিন নৌবাহিনী আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথ নিরাপদ রাখে এবং অস্ট্রেলিয়ার মাথার ওপরে পারমাণবিক সুরক্ষার ছাতা ধরে রাখে। সামরিক সহযোগিতার অংশ হিসেবে কোরিয়া যুদ্ধ (১৯৫০-৫৩), ভিয়েতনাম যুদ্ধ (১৯৫৫-৭৫), প্রথম উপসাগরীয় যুদ্ধ (১৯৯০-৯১) এবং ইরাক আগ্রাসনে সেনা পাঠিয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। অন্যদিকে, বিশ্বের প্রধানতম সামুদ্রিক শক্তি হিসেবে অ্যামেরিকা সকল সাগরপথে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এরই অংশ হিসেবে অস্ট্রেলিয়ার ডারউইনে একটি প্রধান সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছে তারা। সেখানে মোতায়েন করা হয়েছে ২৫০০ মার্কিন মেরিন সেনা। এই সংখ্যাটি হয়তো চীনকে আতঙ্কিত করার তুলনায় যথেষ্ট নয়, তবে এর মাধ্যমে বার্তা দেওয়া হচ্ছে যে অ্যামেরিকা এখানে আছে। প্রয়োজনে তারা অস্ট্রেলিয়াকে রক্ষা করবে। তবে এই প্রতিশ্রুতি কতদিন বজায় থাকবে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

এখানেই আসলে অস্ট্রেলিয়া পড়েছে উভয়সংকটে। চীনের উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রকে নতুন করে কৌশলগত সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে। ওয়াশিংটনের সামনে বর্তমানে কয়েকটি পথ খোলা আছে। প্রথম পথটি হলো, চীনের সম্প্রসারণ প্রতিরোধ করা। অর্থাৎ বেইজিং যেসব অঞ্চলকে নিজেদের বাড়ির উঠান বলে মনে করে, সেসব অঞ্চলে তাদেরকে পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ নিতে বাধা দিতে পারে ওয়াশিংটন। দ্বিতীয় পথটি হলো, চীনের সঙ্গে সমঝোতার ভিত্তিতে আঞ্চলিক প্রভাববলয় তৈরি করা। এক্ষেত্রে উভয়পক্ষের শক্তির ভারসাম্য বজায় রাখা হবে। আর তৃতীয় পথটি হলো, চীনের সঙ্গে কোনো ঝামেলায় না গিয়ে দীর্ঘমেয়াদে ধীরে ধীরে পিছু হটে সামরিক শক্তিকে একেবারে ক্যালিফোর্নিয়ায়

ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। চীনের উপকূল এবং অ্যামেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া উপকূলের মাঝে রয়েছে ১১ হাজার কিলোমিটার বিস্তৃত মহাসাগর। মার্কিন সামরিক ও কূটনৈতিক কর্মকর্তারা নিয়মিতই আশ্বস্ত করে থাকেন যে, অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের জোট শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের শাসনামলে অস্ট্রেলিয়া বেশ খানিকটা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিল। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা গেছে দীর্ঘদিনের গণতান্ত্রিক মিত্রদের তুলনায় উত্তর কোরিয়ার মতো কর্তৃত্বপরায়ণ স্বৈরশাসনের প্রতি পক্ষপাতিত্বের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তিনি। তবে প্রেসিডেন্ট বদল হওয়ার পরে অ্যামেরিকার অবস্থানে খানিকটা পরিবর্তন আসে। ২০২০ সালের নভেম্বর মাসে জো বাইডেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। এর এক মাসের মাথায় মার্কিন নৌবাহিনী, মেরিন কর্পস এবং কোস্ট গার্ডের প্রধানরা একটি সতর্কবার্তা দেন। এই সতর্কবার্তায় বলা হয় যে, যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্রদের জন্য অন্য যেকোনো শক্তির তুলনায় বড় ও দীর্ঘমেয়াদি হুমকি হলো চীন।

অস্ট্রেলিয়ার দুশ্চিন্তা আরও বাড়ে ২০২০ সালের শুরুর দিকে। সে সময় পাপুয়া নিউ গিনির দারু দ্বীপে বিশাল এক ফিশারি কমপ্লেক্স নির্মাণের চুক্তি করে চীন। অস্ট্রেলিয়ার মূল ভূখণ্ড থেকে এই দ্বীপটির দূরত্ব মাত্র ২০০ কিলোমিটার। হতেই পারে যে এই ফিশারি কমপ্লেক্স নির্মাণের উদ্দেশ্য শুধুই বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করা। আবার এমনও হতে পারে যে এই বন্দর আসলে চীনা রণতরীর জন্য একটি ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হবে। এমনিতে এই অংশের জলসীমা বাণিজ্যিকভাবে মৎস্য আহরণের জন্য খুব একটা উপযোগী নয়। কিন্তু সমস্যা হলো চীন তাদের মৎস্য আহরণের ট্রলারগুলো প্রায়ই গুপ্তচরবৃত্তির জন্য ব্যবহার করে থাকে। এই উদাহরণ থেকেই বোঝা সম্ভব যে অস্ট্রেলিয়াকে কেন এই অঞ্চলে চীনের কার্যক্রমের ওপরে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। পাশাপাশি এটিও বোঝা যায়—নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার ব্যাপারে অ্যামেরিকার প্রতিশ্রুতিকে কেন অস্ট্রেলিয়াকে বারবার যাচাই করে যেতে হবে।

অস্ট্রেলিয়া ভালো করেই জানে যে, বর্তমান শতকের মাঝামাঝি গিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সম্ভবত প্রতিরক্ষা ব্যায়ের দিক থেকে চীনকে আর ছাড়িয়ে যেতে পারবে না। স্নায়ু যুদ্ধের সময়ের সঙ্গে বর্তমান সময়ের বেশ বড় পার্থক্য রয়েছে। স্নায়ু যুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন অর্থনৈতিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছিল। ফলে, মস্কো শেষ পর্যন্ত অস্ত্র প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনি। কিন্তু চীনের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি ভিন্ন। চীন একটি উদীয়মান শক্তি। খুব সম্ভবত বর্তমান

শতকের মাঝামাঝি গিয়ে চীনের জিডিপি মার্কিন জিডিপিকে ছাড়িয়ে যাবে। এই পরিস্থিতি তার আগেও চলে আসতে পারে। এইসব বিষয়ে ওয়াশিংটনের কৌশলগত সিদ্ধান্ত তাই অস্ট্রেলিয়ার 'চীন নীতি' নির্ধারণে সরাসরি ভূমিকা রাখবে।

অনেকেই মনে করেন অস্ট্রেলিয়া ও চীনের অবস্থান খুব কাছাকাছি। কিন্তু এটি একটি ভৌগোলিক বিভ্রান্তি। এরকম ভাবনার পেছনে মূলত দুইটি কারণ আছে। পূর্ব, পশ্চিম বা দক্ষিণের অন্যান্য বড় ভূখণ্ড থেকে অস্ট্রেলিয়া এতটাই দূরে অবস্থিত যে মানচিত্রে উত্তর দিকে তাকালেই আমরা চীনকে দেখতে পাই। ফলে মানসিকভাবে আমাদের কাছে এই দুই দেশকে খুব কাছাকাছি মনে হয়। আর দ্বিতীয় কারণ হলো 'মার্কেটর ম্যাপ' নামে পরিচিত আমাদের সচরাচর ব্যবহার করা ধ্রুপদী মানচিত্র। এই মানচিত্রে পৃথিবীর বাঁকানো পৃষ্ঠকে সমতল হিসেবে উপস্থাপন করা হয়, ফলে দূরত্বের ধারণা বিকৃত হয়ে যায়। বিভিন্ন অঞ্চলের অবস্থান নিয়ে আমাদের ধারণাকে মার্কেটর আসলে কতটা প্রভাবিত করে তা বুঝতে চাইলে 'ওয়াটারম্যান মানচিত্র' দেখা যেতে পারে। ওয়াটারম্যান মানচিত্র বুঝতে একটু সময় লাগলেও এই মানচিত্র আমাদেরকে এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি দেয়। চীন ভৌগোলিকভাবে পোল্যান্ডের কতটুকু কাছাকাছি তা সাধারণত আমরা ঠিকঠাক আন্দাজ করতে পারি না। অনেকেই মনে করেন পোল্যান্ড সম্ভবত চীন থেকে বহু বহু দূরে। কিন্তু আসলে পোল্যান্ডের ওয়ারস এবং ক্যানবেরা উভয় জায়গা থেকেই বেইজিং-এর দূরত্ব প্রায় সমান। এই কারণেই চীনের ভূরাজনৈতিক কৌশলগত দৃষ্টি সবসময় ৩৬০ ডিগ্রিতে বিস্তৃত থাকে। আর অস্ট্রেলিয়া মূলত তাকিয়ে থাকে উত্তর দিকে। সহজ কথায় বলতে গেলে, অস্ট্রেলিয়ার তুলনায় চীনের কাছে অনেক বেশি বিকল্প আছে।

চীনকে নিয়ে ভাবতে গেলে অস্ট্রেলিয়াকে সবসময় একটি জটিল ভারসাম্য মাথায় রাখতে হয়। এই ভাবনার মধ্যে জড়িত অতি গুরুত্বপূর্ণ তিনটি বিষয় হলো—অর্থনৈতিক স্বার্থ, প্রতিরক্ষা কৌশল এবং কূটনীতি। চীন এখন পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়ার সবথেকে বড় বাণিজ্যিক অংশীদার। অবশ্য, এই দুই দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের ওঠানামার সঙ্গে তাল রেখে বিনিয়োগের মাত্রাতেও অনেকসময় তারতম্য ঘটে। সাম্প্রতিক সময়ে চীন থেকে প্রতিবছর ১.৪ মিলিয়ন পর্যটক অস্ট্রেলিয়ায় ঘুরতে আসে। অস্ট্রেলিয়ায় পড়তে আসা বিদেশি শিক্ষার্থীদের এক তৃতীয়াংশও আসে চীন থেকে। অস্ট্রেলিয়া থেকে রপ্তানি করা মোট কৃষি পণ্যের এক তৃতীয়াংশই যায় চীনে। রপ্তানিকৃত গরুর মাংসের ১৮ শতাংশ এবং বার্লির ৫০ শতাংশের ক্রেতা চীন। এছাড়াও অস্ট্রেলিয়ায় উৎপাদিত লৌহ আকরিক, গ্যাস, কয়লা এবং স্বর্ণের অন্যতম বড় ক্রেতা চীন। কিন্তু চীনের আঞ্চলিক সম্প্রসারণের প্রচেষ্টা ও প্রভাব বিস্তারের নীতি সবক্ষেত্রে অস্ট্রেলিয়ার স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।



চিত্র: আটলান্টিক মহাসাগরকে কেন্দ্র করে ওয়াটারম্যান মানচিত্র



চিত্র: প্রশান্ত মহাসাগরকে কেন্দ্র করে ওয়াটারম্যান মানচিত্র

দক্ষিণ চীন সাগরে নিজের প্রভাব বাড়ানোর চেষ্টা করছে চীন। এদিকে আন্তর্জাতিক জলপথ ও মুক্ত বাণিজ্যের জন্য এই সাগর একটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। অস্ট্রেলিয়া চায় মুক্ত ও স্বাধীন নৌ চলাচল নিশ্চিত করতে। কিন্তু চীনের সামরিক উপস্থিতি ও আঞ্চলিক দাবিগুলো এক্ষেত্রে সরাসরি চ্যালেঞ্জ সৃষ্টি করছে। ফলে, অস্ট্রেলিয়াকে একদিকে চীনের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রাখতে হয়, অন্যদিকে কৌশলগতভাবে আত্মরক্ষাও করতে হয়।

চীনের উপকূলবর্তী অঞ্চল ভূরাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত জটিল এক অবস্থানে দাঁড়িয়ে। দক্ষিণ চীন সাগরের ৮০ শতাংশেরও বেশি অঞ্চলের ওপর ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক অধিকার দাবি করে চীন। তবে মানচিত্রের দিকে লক্ষ করলেই বোঝা যায় যে চীনের এই দাবির ন্যায্যতা আসলে খুবই কম। চীনের এই দাবিকে ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন, তাইওয়ান, মালয়েশিয়া এবং ব্রুনেই বরাবরই চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আসছে। এই দেশগুলোর নিজস্ব ভূগোল ও ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে এই অঞ্চলে তাদের মালিকানার দাবি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই চীনের দাবির সঙ্গে ওভারল্যাপ করে। তবে এই দেশগুলোর দাবিকে কোনো রকম পাত্তা না দিয়ে দক্ষিণ চীন সাগরের বেশ কিছু ক্ষুদ্র প্রবাল প্রাচীর ও পাথরের স্তূপে কংক্রিট ঢেলে কৃত্রিম দ্বীপ তৈরি করেছে চীন। এসব কৃত্রিম দ্বীপের সংখ্যা ক্রমেই বেড়ে চলেছে। এগুলোর মধ্যে কোনো কোনোটি তো চীনের মূল ভূখণ্ড থেকে ১,৬০০ কিলোমিটারেরও বেশি দূরে অবস্থিত। এই দ্বীপগুলোতে তারা রানওয়ে তৈরি করছে, স্থাপন করছে রাডার এবং শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা। এই সমস্ত স্থাপনা এই অঞ্চলে চীনের সামরিক উপস্থিতিকে আরও শক্তিশালী করছে, যার ফলে প্রতিবেশী দেশগুলোর উদ্বেগ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চীনের এই আগ্রাসী সামরিক কার্যক্রম থেকে দেশটির একটি মধ্যমেয়াদি কৌশলগত লক্ষ্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এটাকে বলা হয় 'এরিয়া ডিনায়াল ক্যাপাবিলিটি'। এর উদ্দেশ্য হলো, শত্রুপক্ষকে নির্দিষ্ট একটা ভৌগোলিক অঞ্চলের মধ্যে প্রবেশ করতে না দেওয়া, অবস্থান করতে না দেওয়া এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ওই নির্দিষ্ট অঞ্চল অতিক্রম করতে না দেওয়া। সাম্প্রতিক সময়ে চীন এমনসব অস্ত্র ও প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা তৈরি করছে যা ব্যবহার করে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা অন্য কোনো শক্তিকে দক্ষিণ ও পূর্ব চীন সাগর থেকে ঠেলে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব। শুধু তাই নয়, চীন চাইছে সম্ভাব্য শত্রুপক্ষকে 'ফার্স্ট আইল্যান্ড চেইন'-এর অপর পাশে আটকে রাখতে। মালার মতো ছড়ানো এই

দ্বীপগুলো জাপান থেকে ফিলিপাইন পর্যন্ত বিস্তৃত। অস্ট্রেলিয়ার আশঙ্কা হলো, চীন তাদের এই 'এরিয়া ডিনায়াল ক্যাপাবিলিটি' পরিকল্পনাকে ইন্দোনেশিয়া এবং ফিলিপাইনের দক্ষিণাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত করতে চেয়ে পারে। সেক্ষেত্রে এমনকি বান্ডা সাগর বা পাপুয়া নিউ গিনির উপকূলীয় অঞ্চলও চীনের সামরিক কৌশলের আওতায় চলে আসবে। এই সম্ভাবনা নিয়ে অস্ট্রেলিয়া গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। কেননা দ্বিতীয় বিশ্বযদ্ধের সময় জাপানের নিউ গিনি দখল করার ঘটনা অস্ট্রেলিয়ার স্মৃতিতে এখনও জ্বলজ্বল করছে। সাম্প্রতিক সময়ে ইন্দোনেশিয়ায় ইসলামি উগ্রপন্থার ক্ষীণ উত্থান নিয়েও অবশ্য অস্ট্রেলিয়ার উদ্বেগ আছে। কিন্তু ইন্দোনেশিয়ার উগ্রপন্থার ঝুঁকির চেয়ে চীনের দক্ষিণমুখী সম্প্রসারণ নীতি নিয়েই অস্ট্রেলীয় সামরিক কৌশলবিদরা বেশি উদ্বিগ্ন।

চীনের সম্প্রসারণ প্রতিহত করতে অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম কৌশল হতে পারে নিজের সামরিক বাহিনীকে দ্রুত মোতায়েন করার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা। কিন্তু এজন্য সর্বাধিক সামরিক শক্তি কোথায় মোতায়েন করা যেতে পারে? নর্দার্ন টেরিটোরিতে প্রধান ঘাঁটি স্থাপন করলে, প্রয়োজনে যখন আরো উত্তরে যেতে হবে, তখন সামরিক বাহিনীকে বেশ কয়েকটি 'চোক পয়েন্ট' অর্থাৎ যেখানে পথ সংকীর্ণ হয়ে এসেছে, এমন পয়েন্ট পার হতে হবে। সেক্ষেত্রে হয়তো দেখা যাবে চোক পয়েন্টের অপর দিকে শত্রুপক্ষ ওঁত পেতে আছে। আবার দক্ষিণে ঘাঁটি রাখলে সেনাবাহিনীকে দেশব্যাপী মোতায়েন করতে সময় অনেক বেশি লেগে যাবে। অবশ্য এক্ষেত্রে তারা উন্মুক্ত সাগরপথ ব্যবহারের সুযোগ পাবে।

চীনের এই দক্ষিণমুখী সম্প্রসারণ যদি আঞ্চলিক সার্বভৌমত্বের সীমা লঙ্ঘন করে, তবে সেই বিরোধ আন্তর্জাতিক আইনের আওতাধীন হয়ে যাবে। এই সীমা কোথায় গিয়ে শেষ হবে, তা নির্ধারণের দায়িত্ব আন্তর্জাতিক আইন বিশেষজ্ঞদের ওপর। তবে, এটা নিশ্চিতভাবে ধরে নেওয়া যায় যে, এই সীমা হবে কোরাল সাগরের উত্তর পর্যন্ত। কোরাল সাগরে বৈধভাবে ভূখণ্ডগত দাবি জানানোর কোনো সুযোগ চীনের নেই। এই অঞ্চলে কৃত্রিম দ্বীপ তৈরি বা সামরিক স্থাপনা নির্মাণেরও সুযোগ নেই। কারণ তা সরাসরি সংঘাত সৃষ্টি করতে পারে। তবে, অর্থনৈতিক শক্তি ব্যবহার করে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করতে পারে তারা। কিন্তু, এখানে এসেই চীন এই অঞ্চলের একমাত্র শক্তি অস্ট্রেলিয়ার প্রতিরোধের মুখে পড়বে। দক্ষিণ চীন সাগরে আধিপত্য বিস্তার থেকে চীনকে

ঠেকানো অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে সম্ভব নয়। তবে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে যেন বেইজিংয়ের প্রভাব সীমিত রাখা যায় তা নিশ্চিত করতে সচেষ্ট আছে ক্যানবেরা।

লড়াই এর মধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অস্ট্রেলিয়া ও চীনের মধ্যকার কৌশলগত প্রতিযোগিতা ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠছে। ঐতিহাসিকভাবে অস্ট্রেলিয়াই ছিল এই অঞ্চলের সবচেয়ে বড় সহায়তা প্রদানকারী দেশ। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে চীনও বিপুল অর্থ সহায়তা, ঋণ এবং বিনিয়োগ নিয়ে এই অঞ্চলে ঢুকে পড়েছে। কোভিড-১৯ ভাইরাস সংক্রমণের সময় চীনই সর্বপ্রথম সহায়তা নিয়ে এই অঞ্চলে ছুটে গিয়েছিল। ২০২০ সালের এপ্রিল মাসে রয়্যাল অস্ট্রেলিয়ান এয়ার ফোর্সের একটি সহায়তাবাহী বিমান যখন ভানুয়াতুর পোর্ট ভিলা বিমানবন্দরে অবতরণ করতে যাচ্ছিল, তখন তারা দেখতে পায় চীনের একটি বিমান আগে থেকেই রানওয়েতে অবস্থান করছে। চীনের বিমানটি কোভিড-১৯ সংক্রান্ত চিকিৎসা সরঞ্জাম ও ব্যক্তিগত সুরক্ষা সামগ্রী (পিপিই) নিয়ে এসেছিল। অস্ট্রেলিয়ার বিমানটিকে অবতরণের অনুমতি দেওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত সেটি অবতরণ না করে উল্টোদিকে ২০০০ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে দেশে ফিরে যায়। বিমান অবতরণ করানো নিরাপদ ছিলো কি ছিলো না, তা নিয়ে বহু বিতর্ক থাকলেও একটা ব্যাপার নিশ্চিত যে—চীন আগেই সেখানে উপস্থিত হয়েছিল।

কিন্তু এতে চীনের লাভ কোথায়? লাভ হলো, প্রভাব বিস্তার মানেই প্রবেশাধিকার পাওয়ার সুযোগ। চীনের চাওয়া এখানে অনেক—দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের মৎস্য আহরণ এলাকায় প্রবেশাধিকার, নিজেদের বাণিজ্যিক ও সামরিক জাহাজগুলোর জন্য বন্দর-সুবিধা, সাগরতলের খনিজ সম্পদ আহরণের সুযোগ এবং জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সংস্থায় ভোটের ক্ষেত্রে সমর্থন লাভ। এই শেষ পয়েন্টটি অনেকেরই চোখ এড়িয়ে যায়। চীন এর আগেও আফ্রিকার অনেক দেশকে কূটনৈতিকভাবে নিজেদের পক্ষে টেনেছে। তাইওয়ানকে স্বীকৃতি না দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছে। প্রশান্ত মহাসাগরের দেশগুলোর ক্ষেত্রেও বর্তমানে তারা একই কৌশল প্রয়োগ করছে। ২০১৯ সালে অ্যামেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার তীব্র কূটনৈতিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশ কিরিবাতি ও সলোমন আইল্যান্ডস তাইওয়ানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করেছিল।

প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে নিজেদের প্রভাব ধরে রাখতে এবং চীনের সম্প্রসারণ প্রতিহত করতে অস্ট্রেলিয়া বর্তমানে 'প্যাসিফিক স্টেপ-আপ' নামে

একটা বিশেষ কূটনৈতিক নীতির পথে হাঁটছে। এই নীতির মূল লক্ষ্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে প্রভাব বৃদ্ধি করা। তবে তাদের এই পথে এগোতে হচ্ছে বেশ সতর্কভাবে। কারণ, প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপাঞ্চলের বাসিন্দারা অস্ট্রেলিয়ার ঔপনিবেশিক অতীত সম্পর্কে খুবই সচেতন। ঔদ্ধত্য বা অভিভাবকত্বের গন্ধ পাওয়া যায় এমন যেকোনো আচরণকে নেতিবাচক দৃষ্টিতে দেখে এই দ্বীপরাষ্ট্রগুলো। এই সংবেদনশীলতা মাথায় রেখে এখন দ্বীপগুলোকে 'ছোট দ্বীপদেশ' না বলে তাদের পছন্দ অনুযায়ী 'বৃহৎ মহাসাগরীয় রাষ্ট্র' বলা হয়। এই নতুন পরিচয়ের পেছনেও বড় যুক্তি আছে। দ্বীপগুলোর স্থলভাগ খুব ছোট হলেও সমুদ্রে তাদের রয়েছে বিশাল 'এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন'। আর এই সুবিধাটা তাদের আপেক্ষিক আয়তন ও গুরুত্ব বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। এই দ্বীপগুলো ও তাদের সামুদ্রিক অঞ্চল মিলিয়ে সম্মিলিতভাবে পৃথিবীর পৃষ্ঠভাগের প্রায় ১৫ শতাংশ স্থান দখল করে আছে।

২০১৮ সালে অস্ট্রেলিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক জয় পায়। চীনের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয়ী হয়ে ফিজির প্রধান সামরিক ঘাঁটিতে তহবিল যোগান দিতে সক্ষম হয় তারা। একই বছর তারা ভানুয়াতুর সঙ্গে একটি দ্বিপাক্ষিক নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষর করে এবং প্রশান্ত মহাসাগরের বেশ কয়েকটি দ্বীপ রাষ্ট্রকে মোট ২১টি সামরিক টহল বোট উপহার দেয়। এছাড়াও নিজেদের অনুদান তহবিল ব্যবহার করে সাগরের তলদেশ দিয়ে 'কোরাল সি কেবল সিস্টেম' নামে একটি উচ্চগতির যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্মাণ করে তারা। এই কেবল সিস্টেম সলোমন আইল্যান্ডস ও পাপুয়া নিউ গিনিকে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। তবে চীনও থেমে নেই। অস্ট্রেলিয়ার তরফ থেকে নানারকম প্রচেষ্টার পরও ফিজি, কুক আইল্যান্ডস এবং টোঙ্গায় নিজেদের অবস্থান শক্তিশালী করেছে তারা। তবে চীনের এই আগ্রাসী পদক্ষেপের কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও দেখা যাচ্ছে। এসব দেশের অবকাঠামো প্রকল্পে চীন মূলত নিজ দেশের উপকরণ ব্যবহার করছে। তাছাড়া আফ্রিকার মতো এই অঞ্চলেও তারা ব্যবহার করছে নিজেদের দেশের শ্রমিক। এই কারণে অনেক জায়গায় চীনা প্রকল্পগুলো স্থানীয়দের মধ্যে ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রেক্ষাপটে বলা যায়, এখনো পর্যন্ত অস্ট্রেলিয়াই এই অঞ্চলের প্রধান প্রভাবশালী শক্তি। কিন্তু চীনের কৌশলগত অগ্রগতি ও ব্যাপক অর্থনৈতিক সামর্থ্য বিবেচনায় রেখে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও সক্রিয় কূটনীতির মাধ্যমে অস্ট্রেলিয়াকে নিজের অবস্থান ধরে রাখতে হবে।

এক সময় অস্ট্রেলিয়াকে ঘিরে থাকা প্রশান্ত মহাসাগরের বিশাল জলরাশি তাদের জন্য এক ধরনের প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা হিসেবে কাজ করত। কিন্তু চীনের প্রযুক্তি ও সামরিক শক্তির ব্যাপক উন্নতির ফলে সেই সুবিধা অনেকাংশে কমে গেছে। উন্নতির মাত্রায় অস্ট্রেলিয়াকে অনেকখানি ছাড়িয়ে গেছে তারা। চীনের দূরপাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র অস্ট্রেলিয়ার ভৌগোলিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে দুর্বল করে দিয়েছে। পাশাপাশি সাইবার অস্ত্রের আবির্ভাব যুদ্ধের ধরনও বদলে দিয়েছে। শত্রুকে ধ্বংস করতে এখন আর সবক্ষেত্রে মিসাইল ছুঁড়ে ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর প্রয়োজন হয় না। এর পরিবর্তে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো যেমন বৈদ্যুতিক গ্রিড, পানি সরবরাহ, খাদ্য সরবরাহ ব্যবস্থা বা পরিবহন নেটওয়ার্কের ওপর সাইবার হামলা চালিয়েই একটি দেশকে অকার্যকর করে দেওয়া সম্ভব। ভৌগোলিকভাবে অস্ট্রেলিয়া এতটাই বিচ্ছিন্ন যে মিত্র শক্তিগুলোর পক্ষে সরাসরি এসে সামরিক সহায়তা দেওয়া অনেক সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। তবে, প্রযুক্তিগত উন্নতির ফলে বিশ্ব এখন যেকোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি পরস্পর সংযুক্ত।

অস্ট্রেলিয়া নীতিগতভাবে 'জাস্ট ইন টাইম' অর্থনৈতিক ব্যবস্থা অবলম্বন করে আসছিল। এটি এমন একটি কৌশল, যেখানে প্রয়োজন অনুযায়ী তাৎক্ষণিকভাবে কাঁচামাল সংগ্রহ ও পণ্য উৎপাদন করা হয়। এর ফলে অতিরিক্ত মজুত রাখার প্রয়োজন হয় না। এই পদ্ধতিতে উৎপাদন খরচ কমে আসে, অপচয় কম হয় এবং সামগ্রিক দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। 'জাস্ট ইন টাইম' কৌশল যে আসলে কতটা ঝুঁকিপূর্ণ, অস্ট্রেলিয়া তা বুঝতে পারে কোভিড-১৯ মহামারির পর। চীনের ওপর অতিরিক্ত নির্ভরশীলতা দীর্ঘমেয়াদে কতবড় হুমকি হতে পারে, এসময় প্রথম টের পায় তারা। তাই অন্যান্য অনেক দেশের মতো অস্ট্রেলিয়াও চীনের ওপর নির্ভরশীলতা থেকে ধীরে ধীরে সরে আসছে। গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো প্রকল্পে চীনা কোম্পানিগুলোর প্রবেশের সুযোগ কমিয়ে দিচ্ছে অস্ট্রেলিয়া। বিশেষ করে, চীনের প্রযুক্তি কোম্পানি হুয়াওয়েকে দেশটির ৫জি নেটওয়ার্ক থেকে বাদ দেওয়া ছিল একটি বড় এবং সাহসী পদক্ষেপ। ২০২০ সালের গ্রীষ্মে কোভিড-১৯'এর উৎস নিয়ে আন্তর্জাতিক তদন্তের দাবি জানান অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন। কিন্তু বেইজিং বিষয়টিকে দেখেছিল চীনের বিরুদ্ধে আক্রমণ হিসেবে। আর এর ফলে সম্পর্কের একদফা অবনতি ঘটে। এর কিছুদিনের মধ্যেই চীনের কাস্টমস কর্মকর্তারা অস্ট্রেলিয়া থেকে আমদানিকৃত মাংসে 'লেবেলিং সমস্যা' দেখতে পায়। এই মাংস আমদানির ওপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। এর পরেও অস্ট্রেলিয়া নতি স্বীকার

করেনি। এইসব ঘটনা থেকে এটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, পরবর্তীতে বার্লি এবং লৌহ আকরিক আমদানিতেও সমস্যা হতে পারে।

চীনের সরকারি মুখপত্র গ্লোবাল টাইমস অস্ট্রেলিয়াকে সতর্ক করে দিয়ে লেখে—"এই অর্থনৈতিক পদক্ষেপগুলোকে অস্ট্রেলিয়ার জন্য চীনের তরফ থেকে সরাসরি অর্থনৈতিক শাস্তি বলা যায় না। বরং এগুলো হলো অস্ট্রেলিয়ার জন্য সতর্কবার্তা। অস্ট্রেলিয়ার উচিত চীনের সঙ্গে তাদের অর্থনৈতিক সম্পর্ক পুনর্বিবেচনা করা।" কূটনৈতিক বার্তার ক্ষেত্রে এই 'বলা যায় না' শব্দগুচ্ছকে সাধারণত 'অবশ্যই বলা যায়' হিসেবেই ধরে নেওয়া হয়। ২০২১ সালের শুরুতে অস্ট্রেলিয়া থেকে তামা রপ্তানির পরিসংখ্যান নিয়ে একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করে চীন। এই প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, ২০১৯ সালের ডিসেম্বরে যেখানে ১ লক্ষ মেট্রিক টন তামা আমদানি করা হয়েছিল, সেখানে ২০২০ সালের ডিসেম্বরে তা শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে।

এদিকে ২০২০ সালে অস্ট্রেলিয়ার শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সরকারি অবকাঠামোতে একাধিক সাইবার হামলা চালানো হয়। প্রধানমন্ত্রী স্কট মরিসন হামলাকারীর নাম প্রকাশ করেননি, তবে ইঙ্গিতে তিনি বুঝিয়ে দেন—"এই ধরনের কার্যকলাপে সক্ষম রাষ্ট্রভিত্তিক কুশীলবের সংখ্যা খুব বেশি নয়।" এই বার্তা থেকে বোঝা যায় সন্দেহের তীর আসলে কার দিকে।

চীনের সঙ্গে সম্পর্ক সামলানো বেশ চ্যালেঞ্জিং বিষয়ে পরিণত হয়েছে অস্ট্রেলিয়ার জন্য। যদি অতিরিক্ত কঠোরভাবে সামলানো হয়, তবে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে নতুন একটি স্নায়ু যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হওয়ার ঝুঁকি থাকে। আবার অস্ট্রেলিয়া যদি সামরিকভাবে অতিরিক্ত দুর্বলতা দেখায়, সেক্ষেত্রে চীন কাছাকাছি অঞ্চলে সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের সুযোগ পাবে। কোভিড-১৯ সংকটের সময় আঞ্চলিক পরিস্থিতি আরও বিপদজনক মোড় নিয়েছে। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে চীনকে নিয়ে ভারত, জাপান, তাইওয়ান এবং অস্ট্রেলিয়ার যে সমস্ত উদ্বেগ ছিল কোভিড পরিস্থিতির সুযোগে তা আরো বেড়ে গেছে বললে অত্যুক্তি হবে না। এই দেশগুলো যে সময় কোভিড পরিস্থিতি সামাল দিতে ব্যস্ত ছিল, সেই ফাঁকে চীন বেশ কিছু আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ নেয়। এসব পদক্ষেপের মধ্যে ছিল তাইওয়ানের চারপাশে সম্পূর্ণ বৃত্তাকারে তাদের বিমানবাহী রণতরী বহর চালনা করা। আর এই কাজের জন্য এমন একটা সময় বেছে নেওয়া হয়েছিল, যখন এই অঞ্চলে মোতায়েন করা মার্কিন বিমানবাহী রণতরীর দুইটি বহরই ছিল অকার্যকর

অবস্থায়। একটি বহরে তখন চলছিল মেরামতের কাজ, আর অপরটির কয়েকশত সদস্য কোভিড আক্রান্ত হয়েছিল। ফলে দুইটি বহরকেই ঘাঁটিতে আটকা পড়ে থাকতে হয়েছে। এছাড়া চীনা কোস্টগার্ডের একটি জাহাজ ভিয়েতনামের একটি মাছ ধরার ট্রলারকে ধাক্কা দিয়ে ডুবিয়ে দেয়। মালয়েশিয়ার একটি তেল অনুসন্ধান জাহাজকেও হয়রানি করা হয়। পাশাপাশি, হংকংয়ে চীনের ক্রমবর্ধমান নিয়ন্ত্রণ ও দমননীতি বিশ্বকে চিন্তিত করে তুলেছে।

অস্ট্রেলিয়া আপাতত তার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্রদের সাথে চূড়ান্ত সুসম্পর্ক বজায় রেখে চলছে। গত ৮০ বছরে গড়ে ওঠা এই সম্পর্ক টিকিয়ে রাখতে ওয়াশিংটনের ক্যাপিটল হিল, পেন্টাগন এবং সিআইএ সদর দফতরে অস্ট্রেলীয় কূটনীতিকরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলেছেন। অস্ট্রেলিয়া বিশ্বের সবচেয়ে কার্যকর গোয়েন্দা-তথ্য আদান-প্রদানের নেটওয়ার্ক 'ফাইভ আইজ'-এরও সক্রিয় সদস্য। এই নেটওয়ার্কের অন্যান্য সদস্য হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, নিউজিল্যান্ড ও কানাডা। এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে অস্ট্রেলিয়া শুধু তথ্যই পায় না, বরং নিজেরাও অনেক গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামোও সরবরাহ করে। এর একটি বড় উদাহরণ হলো অস্ট্রেলিয়ার নর্দার্ন টেরিটোরির অ্যালিস স্প্রিংসের কাছে অবস্থিত 'পাইন গ্যাপ' সামরিক ঘাঁটি। এটি যৌথভাবে পরিচালনা করে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সি (NSA), সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (CIA) এবং অস্ট্রেলিয়ার ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স অর্গানাইজেশন (DIO)। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই ঘাঁটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা তৎপরতা কেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা করে। পাইন গ্যাপ কার্যত সিআইএ'র স্যাটেলাইটগুলোর জন্য একটি গ্রাউন্ড স্টেশন। এখান থেকে বিশ্বজুড়ে ইলেকট্রনিক সংকেত ও যোগাযোগ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সিগন্যাল ইন্টেলিজেন্স (SIGINT) সংগ্রহ করা হয়। সিগন্যাল ইন্টেলিজেন্স হলো রেডিও, স্যাটেলাইট, টেলিফোন ও অন্যান্য ডিজিটাল কমিউনিকেশনের যাবতীয় ডিজিটাল তথ্য। SIGINT-এর মাধ্যমে দেশগুলো শত্রু বা প্রতিদ্বন্দ্বীর কর্মকাণ্ড, পরিকল্পনা এবং কৌশলগত তথ্য সম্পর্কে ধারণা পায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, পাইন গ্যাপের মতো ঘাঁটিগুলো স্যাটেলাইট সিগন্যাল পর্যবেক্ষণ করে, ই-মেইল বা কলের তথ্য বিশ্লেষণ করে এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাদের সহায়তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা তথ্য সরবরাহ করে। ঘাঁটিটি আফগানিস্তানসহ বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সেনাদের জন্য গোয়েন্দা সহায়তা প্রদানেও ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও, এটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ শনাক্ত করতে সক্ষম, যা মার্কিন এবং জাপানি ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সহায়তা করে। বর্তমানে পাইন গ্যাপ নবগঠিত মার্কিন 'স্পেস কমান্ড'-এর অংশ হিসেবেও

গুরুত্ব পাচ্ছে। ঘাঁটিটি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এত গুরুত্বপূর্ণ যে মার্কিন সরকার সহজে এটি পরিত্যাগ করবে না। ফলে, অস্ট্রেলিয়া প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার জন্য এই সামরিক স্থাপনাকে একটি 'বার্গেনিং চিপ' বা কৌশলগত আলোচনার হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।

তবে সময় অনেক বদলে গেছে। ফাইভ আইজসহ অন্যান্য প্রতিরক্ষা কাঠামো যখন গঠিত হয়, সে সময় বৈশ্বিক পরিস্থিতি ছিল বর্তমান সময়ের থেকে আলাদা। যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা প্রদানের প্রতিশ্রুতিকে তখন প্রশ্নাতীত হিসেবে ধরা হতো। জাপান তখন ছিল পরাজিত ও সামরিকভাবে দুর্বল একটি দেশ। চীনকে তখনও হুমকি হিসেবে ভাবা শুরু হয়নি। আর সে সময় স্নায়ুযুদ্ধের কেন্দ্র ছিল বহু দূরের ইউরোপ। তখন অস্ট্রেলিয়া ধরে নিয়েছিল, তার অঞ্চলে বড় কোনো হুমকি দেখা দিলে তা প্রতিরোধের জন্য অন্তত দশ বছর সময় পাওয়া যাবে। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতা সম্পূর্ণ ভিন্ন। সম্ভাব্য সংঘাত ও প্রতিরোধের মধ্যবর্তী সময়সীমা অনেক কমে এসেছে। চীন এখন বিশ্বের অন্যতম শক্তিধর সামরিক ও অর্থনৈতিক পরাশক্তি। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে বড় ধরনের হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে তারা। আবার, ওয়াশিংটনের প্রতিশ্রুতির ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে থাকা কতটা নিরাপদ হবে, তা নিয়েও নতুন করে ভাবতে হচ্ছে ক্যানবেরাকে। তাই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখার পাশাপাশি বিকল্প পথ খুঁজছে তারা। যদিও সেগুলো খুব বড় কোনো কৌশলগত বিনিয়োগ নয়, বরং সতর্ক ও দূরদর্শী কিছু পদক্ষেপ মাত্র।

অস্ট্রেলিয়া ও জাপান বর্তমানে একটি ঘনিষ্ঠ সামরিক সম্পর্ক গড়ে তুলছে। এই দুই দেশ এখন একসঙ্গে বিমান ও নৌ মহড়া চালাচ্ছে। 'ভিজিটিং ফোর্সেস এগ্রিমেন্ট' নামে একটি প্রতিরক্ষা চুক্তিও স্বাক্ষর করেছে তারা। এই চুক্তি অনুযায়ী উভয় দেশের সেনাবাহিনী একে অপরের এলাকায় গিয়ে প্রশিক্ষণ ও মহড়া চালাতে পারবে এবং নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে একে অপরের দেশে অবস্থান করতে পারবে। এই চুক্তি শুধু সামরিক মহড়া পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি দুই দেশের মধ্যে আরও গভীর প্রতিরক্ষা সহযোগিতার পথ খুলে দিচ্ছে। অস্ট্রেলিয়া ও জাপান উভয়েই জানে, তারা জ্বালানির ক্ষেত্রে স্বনির্ভর নয়। তাদের জীবনীশক্তি মূলত বিদেশ থেকে আমদানিকৃত জ্বালানির ওপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরতা বড় ধরনের সংকট তৈরি করে। কারণ, যদি কোনো কারণে সরবরাহ-পথ বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে বিশাল বিপর্যয় নেমে আসতে পারে। জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া এই দুই দেশই তেল

পরিশোধন শিল্পে বেশ অগ্রগতি লাভ করেছে। জাপান ৮৫ শতাংশ অপরিশোধিত তেল আমদানি করে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। একই অঞ্চল থেকে দক্ষিণ কোরিয়ার আমদানি ৬০ শতাংশের বেশি। এই দুইটি দেশেই জ্বালানি পরিশোধনের সুবিশাল শিল্প গড়ে উঠেছে। তারা তাদের পরিশোধিত তেল রপ্তানি করে অস্ট্রেলিয়ায়, যা অস্ট্রেলিয়ার মোট পরিশোধিত তেল আমদানির প্রায় অর্ধেক। মধ্যপ্রাচ্য থেকে দক্ষিণ ও পূর্ব চীন সাগর হয়ে জাপান পর্যন্ত পৌঁছানোর সাগরপথ যদি অবরুদ্ধ করা হয়, তাহলে মাত্র কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই অস্ট্রেলিয়া ভয়াবহ জ্বালানি সংকটে পড়ে স্থবির হয়ে যাবে।

এই কারণে বৃহত্তর ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলের সব দেশই একমত যে, আন্তর্জাতিক সামুদ্রিক বাণিজ্য পথগুলো অবশ্যই খোলা রাখতে হবে। এগুলো যেন একক কোনো দেশের নিয়ন্ত্রণে না যায় তা নিশ্চিত করতে হবে। এক কথায়, চীনের আগ্রাসী নীতির বিরুদ্ধাচরণ করতে হবে। কিন্তু এটি মুখের কথা নয়; এর জন্য দরকার প্রতিনিয়ত চাপ প্রয়োগ। বিশেষ করে, বেইজিং যখন দক্ষিণ চীন সাগরকে তার নিজস্ব সার্বভৌম অঞ্চল বলে দাবি করে কিংবা কৃত্রিম দ্বীপ তৈরি করে সেগুলোকে মূল ভূখণ্ডের অংশ বলে ঘোষণা দেয়, তখন এর বিরুদ্ধে প্রতিবারই প্রতিক্রিয়া দেখাতে হবে। চীন বর্তমানে বন্ধু কিনে নেওয়ার কৌশলে ব্যস্ত। বিদেশে বিনিয়োগ, অবকাঠামো নির্মাণ ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশকে প্রভাবিত করছে তারা। একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বাদে আর কারো পক্ষেই অর্থনৈতিকভাবে চীনের এই নীতি মোকাবিলা করা সম্ভব নয়। চীনের প্রভাব প্রতিহত করার জন্য অন্যান্য প্রধান শক্তিগুলোর একমাত্র উপায় হলো—পারস্পরিক সহযোগিতা বাড়ানোর মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

জাপান ও অস্ট্রেলিয়া এখন শুধু নিজেদের সঙ্গেই নয়, বরং ভারতের সঙ্গেও যৌথভাবে কাজ করছে। এর মধ্যেই ভারতীয় নৌবাহিনীর সঙ্গে 'কোয়াড' (কোয়াড্রিলিটারাল সিকিউরিটি ডায়ালগ বা চতুর্পক্ষীয় নিরাপত্তা সংলাপ) নামে একটি কৌশলগত কাঠামো তৈরি করেছে তারা। এই কাঠামোর অপর সদস্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই জোটের উদ্দেশ্য খুব স্পষ্ট করে বলা না হলেও, বোঝাই যায় যে এর মূল লক্ষ্য প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের সমুদ্রপথগুলোকে নিরাপদ ও উন্মুক্ত রাখা। বলতে গেলে মূলত চীনের প্রভাব বিস্তারকে নিয়ন্ত্রণে রাখা। 'কোয়াড' এখনো আনুষ্ঠানিক কোনো সামরিক জোট নয়। এটি একটি কৌশলগত সহযোগিতা কাঠামো, যার মাধ্যমে এই চারটি দেশের নৌবাহিনী একসঙ্গে প্রশিক্ষণ, মহড়া ও

নিরাপত্তা পরিকল্পনায় অংশ নেয়। কোভিড-১৯ মহামারির সময় যখন চীনের আগ্রাসী আচরণ নিয়ে বিশ্বজুড়ে উদ্বেগ বাড়ছিল, সেই সময় এই জোট বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে ওঠে। ২০২০ সালে লাদাখে ভারত ও চীনের সীমান্তে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটে। সেখানে এই দুই দেশের সৈন্যরা হাতাহাতি ও সরাসরি সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনা কোয়াডের উদ্দেশ্যকে আরও প্রাসঙ্গিক করে তুলেছিল। ভারতের নৌ সক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশটি এখন 'ইন্দো-প্যাসিফিক' অঞ্চলকে একটি সমন্বিত কৌশলগত ক্ষেত্র হিসেবে ভাবতে শুরু করেছে। আর এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির মাধ্যমে ভারত কোয়াডকে একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্ম হিসেবে দেখছে। বর্তমানে 'কোয়াড প্লাস' নামে একটি সম্প্রসারণ পরিকল্পনাও তারা তৈরি করতে চাইছে। এই সম্ভাব্য কাঠামোতে নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ কোরিয়া ও ভিয়েতনামকে অন্তর্ভুক্ত করার আলোচনা চলছে। তবে দক্ষিণ কোরিয়া ও ভিয়েতনাম চীনের ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী হওয়ায় এই ব্যাপারে সতর্ক হয়ে কাজ করছে দেশ দুইটি।

অস্ট্রেলিয়া কখনোই কারো সহায়তার জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকেনি। এর পরিবর্তে তারা সবসময় এমন সামরিক সক্ষমতা গড়ে তুলতে চেয়েছে যা অন্ততপক্ষে দেশের প্রতিরক্ষার জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী হয়। আর তারা চেষ্টা করেছে সেই প্রতিরক্ষা কার্যক্রম যেন উপকূল থেকে যথেষ্ট দূরেও চালানো যায়। বাস্তবতার বিচারে এর অর্থ হলো—দেশটির উত্তর ও পূর্ব দিকের দ্বীপগুলো যেন আক্রমণাত্মক হয়ে না ওঠে। পাশাপাশি এটাও নিশ্চিত করা যে, দ্বীপগুলো যেন কোনো শক্তিশালী পরাশক্তির নিয়ন্ত্রণে চলে না যায়।

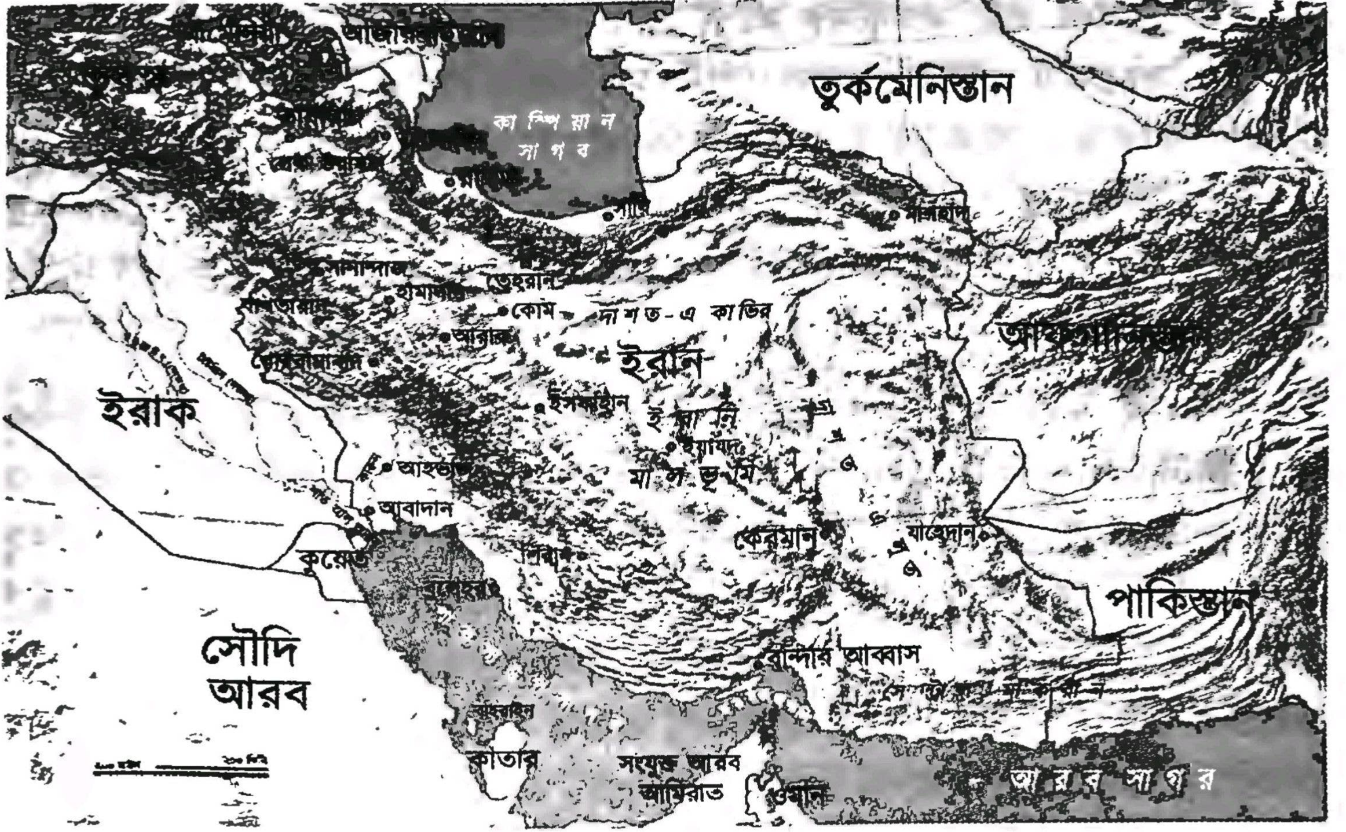
অস্ট্রেলিয়ার সামনে এখন এক জটিল সমীকরণ। খুব সতর্কতার সঙ্গে ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে হচ্ছে দেশটিকে। একটি সামান্য ভুল সিদ্ধান্তও দীর্ঘমেয়াদে গুরুতর পরিণতি ডেকে আনতে পারে। ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলকে বর্তমানে বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, এই অঞ্চলের বিস্তৃতি পূর্ব আফ্রিকার উপকূল থেকে শুরু হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিম উপকূল পর্যন্ত। এটি পুরোনো দিনের ধারণা হলেও সাম্প্রতিক ভূরাজনৈতিক পরিবর্তনের কারণে এই মতের গুরুত্ব আবারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। আধুনিক সময়ে এই ধারণার অন্যতম প্রবক্তা জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শিনজো আবে। ২০০৭ সালে ভারতীয় পার্লামেন্টে দেওয়া এক বক্তৃতায় মুঘল রাজপুত্র দারা শিকোহ রচিত 'দ্য কনফ্লুয়েন্স অব দ্য টু সিজ' (মজমা-উল-বাহরাইন) বই থেকে উদ্ধৃত করেন তিনি। বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন—"প্রশান্ত মহাসাগর ও

ভারত মহাসাগর এখন স্বাধীনতা ও সমৃদ্ধির সাগর। এই দুই মহাসাগর একত্রে এক নতুন গতিশীলতা ও সম্ভাবনার মঞ্চ হয়ে উঠছে।" এরপরে তিনি আরও জোর দিয়ে বলেছিলেন, এই সমুদ্রপথগুলো যেন সবার জন্য উন্মুক্ত ও স্বচ্ছ থাকে, তা নিশ্চিত করতেই হবে।

দুই বিশাল মহাসাগরের মাঝামাঝি বসে আছে অস্ট্রেলিয়া। পশ্চিমে রয়েছে ভারত মহাসাগর, আর পূর্বদিকে প্রশান্ত মহাসাগর। আর তাদের উত্তরে রয়েছে চীন। বর্তমান পরিস্থিতিতে ক্যানবেরা চেষ্টা করবে একদিকে অর্থনৈতিক স্বার্থ মাথায় রেখে বেইজিংয়ের সঙ্গে গঠনমূলক সংলাপ চালিয়ে যেতে, আর অন্যদিকে ওয়াশিংটনের সঙ্গে প্রতিরক্ষা ও অন্যান্য সম্পর্ক অটুট রাখতে। তবে এর পাশাপাশি অস্ট্রেলিয়া নিজের নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক প্রভাব রক্ষার জন্য দৃঢ় ও সক্রিয় অবস্থান নেবে। যেকোনো মূল্যে তারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করবে।

অধ্যায় ২

ইরান



"ইসলাম পুরোপুরি রাজনৈতিক, রাজনীতি বাদ দিলে এর কোনো অস্তিত্ব নেই।"

- আয়াতুল্লাহ রুহুল্লাহ খোমেনি,
ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের প্রাক্তন সুপ্রিম লিডার

ইরানিরা নানারকম সুস্বাদু রুটি তৈরি করে। এসব রুটির মধ্যে অন্যতম হলো 'নান-ই-বারবারি'। রুটিটা তৈরি করা হয় গমের আটা দিয়ে, আর বানানোর পর খেতে বেশ মচমচে লাগে। এই রুটিতে সামুদ্রিক লবণ ব্যবহার করা হয়, ওপরে ছড়ানো থাকে তিল ও পোস্ত দানা। এটা খাওয়া হয় সাধারণত সকালের নাস্তায়। এই রুটির আকৃতি কিছুটা লম্বাটে; ওপরে সমান্তরাল কিছু রেখার মতো থাকে। মজার ব্যাপার হলো, এর আকৃতি অনিচ্ছাকৃতভাবেই অনেক সময় ইরানের ম্যাপের মতো হয়ে যায়।

ইরানের প্রধান ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য মূলত দুইটি। প্রথমটি হলো দেশটির পর্বতমালা। এই পর্বতগুলো দেশটির সীমান্তের বেশিরভাগ অংশজুড়ে দাঁড়িয়ে আছে প্রাচীরের মতো। দ্বিতীয়টি হলো দেশটির ভেতরে অবস্থিত সমতল লবণাক্ত মরুভূমি। অবশ্য এই মরুভূমির মধ্যে প্রায় সমান্তরালভাবে বিস্তৃত রয়েছে স্বল্প উচ্চতার কয়েকটি পার্বত্য অঞ্চল। পর্বতমালাগুলো ইরানকে প্রায় দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করেছে। যেকোনো দিক থেকে দেশটিতে প্রবেশ করতে গেলে কিছু দূর এগোনোর পর উঁচু পার্বত্যভূমির মুখোমুখি হতে হয়। কিছু কিছু জায়গা তো পার হওয়াই সম্ভব নয়। আর এই পর্বতমালার বেষ্টনির মধ্যে আছে দেশটির দুই নির্জন মরুভূমি—দাস্ত-ই কাভির ও দাস্ত-ই লুত।

দাস্ত-ই কাভিরকে বলা হয় 'গ্রেট সল্ট ডেজার্ট'। মরুভূমিটি প্রায় ৮০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং ৩২০ কিলোমিটার প্রশস্ত। এর আয়তন নেদারল্যান্ডস ও বেলজিয়ামের সম্মিলিত আয়তনের প্রায় সমান। আমি গাড়িতে চেপে এর কিছু অংশ পাড়ি দিয়েছি। সেখানে দেখার মতো তেমন কিছুই নেই, আছে শুধু বিস্তীর্ণ শুষ্ক সমতল ভূমি। এই ধরনের লবণাক্ত বিরান মরুভূমির মধ্যে কিছু খোঁজার চেষ্টা করাটাও ঠিক বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। অবাক হওয়ার মতো বিষয় হলো, এই মরুভূমির কিছু অংশে লবণের স্তরের ঠিক নিচেই আছে গভীর কাদামাটি। যেকোনো মুহূর্তে কেউ সেখানে ডুবে যেতে পারে। মরুভূমিতে ডুবে মরার মতো বোকামি আর কিছুই হতে পারে না! আরেকটি বড় মরুভূমি হলো দাস্ত-ই লুত। নামটা শুনলে হয়তো কিছুটা আকর্ষণীয় মনে হতে পারে। কিন্তু যখন শুনবেন যে এই নামের অর্থ আসলে 'নিষ্প্রাণ প্রান্তর' তখন সেই আকর্ষণ বেশ দ্রুতই হারিয়ে যায়।

ঠিক এই কারণে, যুদ্ধ করার খুব ইচ্ছা থাকলেও ইরানে আগ্রাসন চালানো খুব একটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। বিশেষ করে এই আধুনিক যুগে এসে আধুনিক ইরানে আক্রমণ চালানো সহজ নয়। বর্তমান সময়ে ইরানের মতো শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোর রয়েছে পেশাদার ও সুসজ্জিত সেনাবাহিনী। ইরান প্রায় সবসময়ই খবরের শিরোনামে থাকে। দেশটিতে এমনিতেই রয়েছে একটি কর্তৃত্ববাদী সরকার। এই সরকারের বিরুদ্ধে আশেপাশের অঞ্চলজুড়ে সন্ত্রাস ও রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে জড়িত থাকার অভিযোগ আছে। অন্যদিকে ইরান একটি সম্ভাব্য পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্র। তাদের সঙ্গে ইসরায়েলের উত্তেজনাপূর্ণ মুখোমুখি অবস্থা চলছে। মাঝেমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ইরানের সামরিক সংঘর্ষের সম্ভাবনা তৈরি হয়। তবে আশ্চর্য হলেও সত্যি—যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর কেউই

সরাসরি ইরানে সেনা পাঠাতে চায় না। ২০০০-এর দশকের শুরুর দিকে প্রেসিডেন্ট বুশ প্রশাসনের কিছু যুদ্ধপন্থী উপদেষ্টা ইরানে হামলা চালানোর পক্ষে জোরালো চাপ তৈরি করেছিলেন। তবে অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিরা এই সিদ্ধান্ত আটকে দেন। তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও প্রাক্তন চিফ অব স্টাফ কলিন পাওয়েল যুক্তি দেন যে, শুধু বিমান হামলায় কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া সম্ভব নয়। বরং এই যুদ্ধের জন্য আমাদের স্থলবাহিনী মোতায়েন করতে হতে পারে। সেই সময় তিনি সবাইকে একটি পুরোনো সামরিক প্রবচন স্মরণ করিয়ে দেন—"আমরা মরুভূমি সামলাই, পাহাড় নয়।" যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের সম্পর্ক বহু বছরের পুরোনো। তাতে বিতর্ক, সংঘর্ষ, ভুল বোঝাবুঝি সবই আছে। তবে ইতিহাসে যে বিষয়টা সবচেয়ে স্পষ্ট তা হলো—ইরানের পাহাড়ি অঞ্চলে যে দেশের সেনাবাহিনীই প্রবেশ করুক না কেন, তারা সবাই প্রাণ হারিয়েছে প্রচুর সংখ্যায়।

ইতিহাসের বেশিরভাগ সময়জুড়ে ইরান পরিচিত ছিল 'পারস্য' নামে। ১৯৩৫ সালে দেশটির নাম পরিবর্তন করে 'ইরান' রাখা হয়। ইরানে পারসিক ছাড়াও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর লোক বসবাস করে। মূলত দেশের অ-পারসিক সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার জন্যই পারস্য থেকে নাম বদল করে ইরান রাখা হয়। দেশটিতে অ-পারসিকরা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সীমানা পরিবর্তিত হওয়ার পরেও দেশটির আকৃতি 'নান-এ বারবারি' রুটির আকৃতিই রয়ে গেছে।

দেশটির ভৌগোলিক কাঠামো বোঝার জন্য আমাদের উচিত হবে ১,৫০০ কিলোমিটার দীর্ঘ জাগ্রোস পর্বতমালা ধরে দক্ষিণ-পশ্চিম থেকে উত্তর-পূর্ব দিকে যাওয়া। জাগ্রোস পর্বতমালা শুরু হয়েছে হরমুজ প্রণালির উপকূল থেকে। এরপরে এই পর্বতমালা পারস্য উপসাগরের উপকূল ধরে পশ্চিমে এগিয়ে গিয়ে বাঁক নিয়েছে উত্তর দিকে। জাগ্রোস যেখান থেকে উত্তরমুখী হয়েছে, সেই বরাবর উপসাগরের অপর পাড়ে রয়েছে কাতার ও সৌদি আরব। এই পর্বতমালা শাত-ইল-আরব জলপথ বরাবর আরো উত্তরে দিকে এগিয়ে গিয়ে ইরাক ও তুরস্কের সঙ্গে ইরানের স্থলসীমান্ত তৈরি করেছে। এরপর এটি উত্তর-পূর্ব দিকে বাঁক নিয়ে বিস্তৃত হয়েছে আর্মেনিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত। আক্রমণকারীরা পশ্চিম দিক থেকে আসলে ইরানের সীমান্ত পেরোনোর পরপরই এই পর্বতমালার দেওয়ালে বাধার সম্মুখীন হয়। তবে এই পুরো পার্বত্য অঞ্চলে একমাত্র ব্যতিক্রম হলো শাত-ইল-আরব জলপথ। ইরাকের বসরা নগরের কাছাকাছি টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদী পরস্পর মিলিত

হয়ে তৈরি হয়েছে শাত-ইল-আরব নদী। এরপর সীমান্ত পেরিয়ে ইরানে প্রবেশ করেছে। সাধারণ দৃষ্টিতে এই শাত-ইল-আরব অঞ্চলটি ইরানের প্রতিরক্ষার দুর্বলতা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এই অঞ্চলই কৌশলগতভাবে ইরানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 'প্রবেশদ্বার'। দরজার ধর্ম হলো ভেতর ও বাহির দুই দিকেই খুলে যাওয়া। তেমনি, ইতিহাসের পুরোটা সময় জুড়ে পারসিকরা হয় এই পথে অভিযান চালিয়েছে, নয়তো এই পথ বন্ধ করে রাখতে চেয়েছে। কখনো আবার এই জলপথকে একটি বাফার অঞ্চল হিসেবেও গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে, যেন শত্রু কাছে আসার আগেই প্রতিহত করা যায়। এই জলপথ ধরে ইরানের সীমান্তের ভেতরে ঢুকলেই সামনে পড়ে বিস্তীর্ণ জলাভূমি। এই জলাভূমিও একটা প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা হিসেবে কাজ করে। আর যদি কোনো আগ্রাসী শক্তি এই নরম ও নিচু জলাভূমি পার হয়েও যায়, তবে কয়েক কিলোমিটার এগিয়ে গেলেই রয়েছে সেই জাগ্রোস পর্বতমালা।

জাগ্রোস যেখানে গিয়ে শেষ হয়েছে, ঠিক সেখান থেকে শুরু হয়েছে এলবুর্জ পর্বতমালা। আমরা যদি আগের মতোই ঘড়ির কাঁটা ধরে এগিয়ে যেতে থাকি, তাহলে দেখব এলবুর্জ পর্বতমালা আর্মেনিয়ার সীমান্ত ধরে কিছুদূর এগিয়ে হঠাৎ করে দক্ষিণে বাঁক নিয়ে ক্যাস্পিয়ান সাগরের উপকূল বরাবর চলে গেছে। ইরানের ক্যাস্পিয়ান উপকূল প্রায় ৬৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ। এই পুরো উপকূলের পাশ ঘেঁষে উত্তরে টানা উঠে গেছে এলবুর্জ পর্বতমালা। এই পর্বতের সুউচ্চ শৃঙ্গগুলো প্রায় ৩,০০০ মিটার উঁচু। গড়ে এই পাহাড়ি অঞ্চল উপকূল থেকে প্রায় ১১৫ কিলোমিটার ভেতরে পর্যন্ত বিস্তৃত। ফলে দেশটির পশ্চিম অংশের মতো এখানেও আক্রমণকারী বাহিনী কয়েক কিলোমিটার অগ্রসর হওয়ার পরেই কঠিন পাহাড়ি এলাকায় আটকে যাবে। ক্যাস্পিয়ান উপকূল পার হয়ে এই পর্বতমালা আবার বাঁক নিয়ে এগিয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে—তুর্কমেনিস্তান ও আফগানিস্তানের সীমান্ত ধরে। এরপরে পার্বত্য অঞ্চল ঢালু হয়ে পাকিস্তান সীমান্ত ধরে আরব সাগরের কাছাকাছি এসে প্রায় সমতল হয়ে গেছে। এরপর এটি যুক্ত হয়েছে সেন্ট্রাল মাকরান পার্বত্য অঞ্চলের সঙ্গে। এখান থেকে মাকরান পার্বত্য অঞ্চল এগিয়ে গেছে হরমুজ প্রণালির দিকে। এই ভৌগোলিক অবস্থা ইরানকে দিয়েছে দারুণ একটা প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা। কেউ যদি দেশটিকে আক্রমণ করে দখল করতে চায়, তবে তাকে জলাভূমি, পর্বত আর মরুভূমির মধ্য দিয়ে লড়াই করতে হবে। এমনকি যদি তারা সমুদ্রপথেও অবতরণ করে, সেক্ষেত্রেও একই রকম প্রতিকূল ভূমি অপেক্ষা করছে তাদের জন্য।

এই কঠিন ভূমিরূপ যেকোনো আগ্রাসী বাহিনীর জন্যই এক বিশাল বাধা। ফলে অতীতে যারাই ইরানে আক্রমণ চালিয়ে দখল করতে চেয়েছে, তাদেরকেই চড়া মূল্য দিতে হয়েছে। পাহাড়ের এই প্রাকৃতিক প্রাচীর ভেদ করা শুধু কঠিনই নয়, বরং প্রায় অসম্ভব। আর ইতিহাস বলে, যারা এই প্রতিরক্ষা ভেঙে ইরানে প্রবেশ করেছে, শেষ পর্যন্ত তাদের পরাজিত হয়ে ফিরে যেতে হয়েছে। তবে, পারস্যের সুদীর্ঘ ইতিহাস থেকে দেখা যায়, এত ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও এই ভূখণ্ডে আগ্রাসন চালানো থেমে থাকেনি। আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট সফলভাবে ইরানে প্রবেশ করেছিলেন। তবে ৩২৩ খ্রিষ্টপূর্বে তাঁর মৃত্যুর কয়েক বছর পরেই পারস্য আবার নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। ত্রয়োদশ শতকে আক্রমণ করে মঙ্গোলরা। এরপর চতুর্দশ শতকে তুর্ক-মঙ্গোল বংশোদ্ভূত তৈমুর লং তার বাহিনী নিয়ে মধ্য এশিয়ার বিস্তীর্ণ স্তেপ অতিক্রম করে পারস্যে আক্রমণ চালায়। এই দুইবারই তারা দেশজুড়ে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ চালায় এবং হত্যা করে কয়েক লক্ষ মানুষ। তবে বেশিদিন টিকে থাকতে না পারায় পারস্য সংস্কৃতিতে দীর্ঘমেয়াদি কোনো প্রভাব রাখতে পারেনি তারা। ষোড়শ শতক থেকে অটোমানরা একাধিকবার জাগ্রোস পর্বতমালার দিকে অগ্রসর হয়েছিল। তবে মূল ভূখণ্ডে প্রবেশ না করে সীমান্তবর্তী অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল তারা। রুশরাও অটোমানদের মতো একই কাজ করেছিল। এরপরে আসে ব্রিটিশরা। তবে সরাসরি আক্রমণের বদলে অর্থনৈতিক সক্ষমতা কাজে লাগিয়ে ইরানের বিভিন্ন সংখ্যালঘু গোষ্ঠীকে নিজেদের পক্ষে টানার চেষ্টা করে তারা।

ভূগোল যেমন ইরানকে আগ্রাসীদের হাত থেকে রক্ষা করেছে, তেমনি ইরানের নিজস্ব শক্তিকেও সীমাবদ্ধ করে রেখেছে। প্রাচীন পারস্য সাম্রাজ্য পাহাড়ের এই দুর্গ থেকে বেরিয়ে চারদিকে প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছে, কিন্তু বেশিরভাগ সময়েই তারা ওপরে বর্ণিত ভূখণ্ডের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। কখনো কখনো তারা তাদের সীমান্তের পশ্চিমের সমতল অঞ্চলগুলো দখল করার চেষ্টা করেছিল। তবে সেসব অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ বেশিরভাগ সময় মূলত গ্রিক, রোমান, বাইজেন্টাইন, অটোমান বা ব্রিটিশদের হাতেই ছিল। এমনকি সর্বশেষ দেখা যায় মার্কিনিরা এসে সীমান্তের অপর পাড়ে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। এসব শক্তি অনেক সময় ইরানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছে। আর এই কারণেই বাইরের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সবসময় সতর্ক অবস্থানে থাকে তেহরান।

এই কঠোর ও নিষ্ঠুর ভূখণ্ড ইরানের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বাস্তবতাতেও প্রভাব ফেলেছে। সমতলভূমির বড় অংশই বিরান শুষ্ক মরু অঞ্চল হওয়ায় অধিকাংশ ইরানির বসবাস পার্বত্য অঞ্চলে। পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে অন্য অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ কঠিন হওয়ায় জনবসতিগুলোর মধ্যে সহজ কোনো যোগাযোগ গড়ে ওঠেনি। ফলে প্রতিটি অঞ্চল ও প্রতিটি জাতিগোষ্ঠী নিজেদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি ও পরিচয় বজায় রাখতে পেরেছে। দেশটির প্রায় প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীই নিজেদের আত্মপরিচয় আঁকড়ে ধরে থাকে এবং সহজে একীভূত হতে চায় না। এই কারণে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠা করাও আধুনিক ইরান রাষ্ট্রের জন্য কঠিন হয়ে উঠেছে। এছাড়াও, পাহাড়ি ভূখণ্ডের কারণে ইরানের প্রধান জনবসতিগুলো রয়েছে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে। দীর্ঘদিন ধরে তারা একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল না। এমনকি বর্তমান সময়ে এসেও ইরানের মাত্র ৫০ শতাংশ সড়ক পাকা। ফলে জাতীয়তার দিক থেকে সকলে ইরানি হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে রয়েছে নানা জাতিগত বৈচিত্র্য।

ইরানের প্রায় ৬০ শতাংশ মানুষের মাতৃভাষা ফার্সি। দেশের দাপ্তরিক ভাষাও তাই। তবে দেশটির কুর্দি, বালোচি, তুর্কমেন, আজারবাইজানি ও আর্মেনীয়দের মতো বড় জাতিগোষ্ঠীগুলো তাদের নিজস্ব ভাষায় কথা বলে। এছাড়াও আরব, সার্কাসিয়ান এবং আধা-যাযাবর লুর জনগোষ্ঠীসহ আরো অনেক ছোট ছোট জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা রয়েছে। এমনকি কিছু গ্রামে জর্জিয়ান ভাষাও প্রচলিত আছে। এছাড়াও আছে প্রায় ৮,০০০ সদস্যের ক্ষুদ্র ইহুদি সমাজ। খ্রিস্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে ব্যাবিলনের রাজা দ্বিতীয় নেবুচাদনেজার যখন জেরুজালেম শহর দখল করে বহু ইহুদিকে বন্দি করে ব্যাবিলনে নিয়ে যান, তখন কিছু ইহুদি পরিবার পারস্যের আকামেনিদ সাম্রাজ্যে স্থায়ী হয়। পারস্যের রাজা সাইরাস দ্য গ্রেট পরে ইহুদিদের জেরুজালেমে ফিরে যেতে অনুমতি দেন, কিন্তু সবাই ফেরেনি। অনেকেই থেকে যায় পারস্যে, অর্থাৎ আজকের ইরান অঞ্চলে।

এই বৈচিত্র্য এবং বিশেষত কুর্দি ও আজেরির মতো বৃহৎ জাতিগত গোষ্ঠীগুলোর উপস্থিতি ইরানের শাসকদের বরাবরই শক্তিশালী, কেন্দ্রীভূত এবং প্রায়শই দমনমূলক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য করেছে। ইতিহাস জুড়ে ইরানের শাসকদের মূল লক্ষ্য ছিল সংখ্যালঘুদের নিয়ন্ত্রণে রাখা, যাতে কোনো অঞ্চল বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে না পারে। বাইরের শক্তির সঙ্গে যেন তারা যোগসাজশ করতে না পারে সেটাও তাদের খেয়াল রাখতে হয়েছে। অতীতের পারসিক

শাসকরা এই ধরণের নীতি গ্রহণ করেছিল, আধুনিক যুগের আয়াতুল্লাহরাও একই পথে হেঁটেছেন।

রাষ্ট্রের জোরপূর্বক একীভূতকরণ নীতির মুখে দাঁড়িয়েও পাহাড়ি জাতিগোষ্ঠীগুলো নিজস্ব সংস্কৃতি ধরে রেখেছে। এর অন্যতম সেরা উদাহরণ হলো কুর্দিরা। তাদের সঠিক সংখ্যা নির্ধারণ করা অত্যন্ত কঠিন, কারণ ইরানের সরকার জাতিগত জনসংখ্যার পরিসংখ্যান প্রকাশ করে না। তবে বেশিরভাগ অনুমান অনুসারে ইরানে বসবাসরত কুর্দিদের সংখ্যা প্রায় ৮৫ লাখ। এটা ইরানের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১০ শতাংশ। এখানে আজেরিরা রয়েছে ১৬ শতাংশ, অর্থাৎ আজেরিদের পরে কুর্দিরাই দেশটির দ্বিতীয় বৃহত্তম সংখ্যালঘু গোষ্ঠী। অধিকাংশ কুর্দি বসবাস করে জাগ্রোস পর্বতমালায়, ইরাক ও তুরস্ক সীমান্তের কুর্দি অধ্যুষিত অঞ্চলের কাছাকাছি। একটি স্বতন্ত্র কুর্দি রাষ্ট্র গঠন করা এই অঞ্চলের কুর্দিদের বহুদিনের লালিত স্বপ্ন। কুর্দিরা প্রধানত সুন্নি মুসলমান, যেখানে ইরান একটি শিয়া-প্রধান রাষ্ট্র। তাদের জাতিগত পরিচয়, ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনচেতা মনোভাব এবং ধর্মীয় বিভাজনের কারণে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়েছে তারা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে সৃষ্টি হওয়া রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগ নিয়ে কুর্দিরা একটি ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র রাষ্ট্র ঘোষণাও করেছিল। তবে ইরানের কেন্দ্রীয় সরকার খুব দ্রুতই স্থিতিশীল হয়ে আসায় সেই স্বাধীনতা এক বছরও স্থায়ী হয়নি। তাদের সর্বশেষ বড় বিদ্রোহ ঘটে ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের পরপর। এই বিদ্রোহ দমন করতে ইরানি সামরিক বাহিনীর প্রায় তিন বছর লেগেছিল।

আজেরিরা মূলত বসবাস করে ইরানের উত্তর সীমান্ত অঞ্চলে, বিশেষ করে আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার সংলগ্ন এলাকায়। তুর্কমেনদের বসবাস তুরস্ক সীমান্তের লাগোয়া অঞ্চলে। এছাড়াও দেশটিতে রয়েছে প্রায় ১৬ লাখ আরব, যাদের বসবাস মূলত ইরাক সীমান্তের পার্শ্ববর্তী শাত-ইল-আরব জলপথ-সংলগ্ন অঞ্চলে। এছাড়াও পারস্য উপসাগরে অবস্থিত কিছু ছোট দ্বীপেও রয়েছে অল্প সংখ্যক আরব জাতিগোষ্ঠীর বসবাস।

ইরানের বেশিরভাগ মানুষ বসবাস করে পর্বতের ঢালে গড়ে ওঠা শহরাঞ্চলে। তবে এই জনবসতিগুলো দেশটির মাত্র এক-তৃতীয়াংশ অঞ্চলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। যদি ক্যাস্পিয়ান সাগর থেকে শুরু করে তেহরান হয়ে শাত-ইল-আরব পর্যন্ত একটি সরলরেখা কল্পনা করা হয়, তবে দেখা যাবে যে অধিকাংশ মানুষই এই রেখার

বামদিকে বসবাস করে। অন্যান্য অঞ্চলে শহর খুব কম। শহরগুলোর মধ্যকার দূরত্বও অনেক বেশি। ইরানের শহরগুলোর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো পানি সংকট। পানির অভাবের কারণে এসব শহর গড়ে উঠেছে পর্বতের পাদদেশে, যাতে পাহাড় থেকে পানির ব্যবস্থা করা যায়। যেমন, রাজধানী তেহরানের অবস্থান এলবুর্জ পর্বতমালার ঠিক নিচে। 'কানাত' নামক এক প্রাচীন পদ্ধতি ব্যবহার করে সেখানে পানি সরবরাহ করা হয়। প্রথমে পাহাড়ের গায়ে সুড়ঙ্গ খুঁড়ে ঝরনা ও বরফ গলানো পানি জমা করা হয়। এরপর ভূগর্ভস্থ নালা এবং ছোট খালের মাধ্যমে সেই পানি প্রবাহিত হয় শহরে। একবার তেহরানে পুলিশের ধাওয়া খেয়ে দৌড়ানোর সময় এমনই একটি খালে পড়ে গিয়েছিলাম আমি! এই প্রসঙ্গে পরে বলব।

ইরানের অর্থনৈতিক অগ্রগতির পথে অন্যতম প্রধান বাধা হলো এই পানি সংকট। দেশটির চাষযোগ্য ভূমির পরিমাণ মাত্র এক-দশমাংশ। এর মধ্যে আবার মাত্র এক-তৃতীয়াংশ রয়েছে সেচের আওতায়। ইরানে বড় নদীর সংখ্যা মাত্র তিনটি। এর মধ্যে শুধু কারুন নদীই নৌ-পরিবহনের উপযোগী। ইরান আয়তনে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জার্মানির সম্মিলিত আয়তনের চেয়েও বড়। এই দেশে দূরবর্তী শহরগুলোর মধ্যে দ্রুত যোগাযোগের একমাত্র কার্যকর উপায় হলো আকাশপথ। বর্তমানে তেহরান, বন্দর আব্বাস, শিরাজ, আবাদান ও ইস্পাহানে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর রয়েছে। অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এসব বিমানবন্দর।

ইরানে রয়েছে বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম তেলের মজুদ এবং দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রাকৃতিক গ্যাসের ভাণ্ডার। এসব সম্পদ থাকার পরও কাঙ্ক্ষিত অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে পারেনি দেশটি। ১৯৮০-৮৮ সালের ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময় আবাদানের তেল শোধনাগার ধ্বংস হয়ে যায়। দীর্ঘদিন পর সাম্প্রতিক সময়ে এটি যুদ্ধ-পূর্ব পর্যায়ের উৎপাদনে ফিরে এসেছে। তবে ইরানের তেল-গ্যাস খাত অদক্ষতার জন্য কুখ্যাত। আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা এই সমস্যা আরো ঘনীভূত করেছে। কারণ, নিষেধাজ্ঞার ফলে কঠিন হয়ে পড়েছে আধুনিক যন্ত্রপাতি আমদানি। বিদেশি বিশেষজ্ঞেরাও ইরানে কাজ করতে অনিচ্ছুক। এছাড়া, ইরান থেকে জ্বালানি কিনতে চাওয়া দেশের সংখ্যাও এখন সীমিত।

ইরানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রপ্তানি পণ্য হলো জ্বালানি। দেশটির প্রধান তেলক্ষেত্রগুলোর অবস্থান দেশটির দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে—সৌদি আরব,

কুয়েত ও ইরাকের বিপরীত দিকে। এছাড়া উত্তরের কোম শহরের কাছাকাছি একটি ছোট তেলক্ষেত্র রয়েছে। গ্যাসক্ষেত্রগুলোর বেশিরভাগই এলবুর্জ পর্বতমালা এবং পারস্য উপসাগরের আশেপাশে অবস্থিত। জ্বালানি রপ্তানির প্রধান পথগুলোর একটি হলো, হরমুজ প্রণালি পেরিয়ে ওমান উপসাগর হয়ে উন্মুক্ত মহাসাগরে পৌঁছানো। এই হরমুজ প্রণালিই একমাত্র পথ, যার মাধ্যমে ইরান আন্তর্জাতিক সমুদ্রপথে প্রবেশ করতে পারে। কিন্তু সমস্যাটা হলো, এই প্রণালির সবচেয়ে সংকীর্ণ জায়গার প্রস্থ মাত্র ৩৪ কিলোমিটার। জাহাজ চলাচলের জন্য নির্ধারিত দুইটি লেনের প্রতিটিই মাত্র ৩ কিলোমিটার প্রশস্ত। দুর্ঘটনা এড়ানোর জন্য দুই লেনের মাঝখানে রয়েছে ৩ কিলোমিটারের বাফার জোন। এই ভৌগোলিক পরিস্থিতি ইরানের জন্য একদিকে সীমাবদ্ধতা তৈরি করেছে, আবার অন্যদিকে কৌশলগত সুবিধাও এনে দিয়েছে। সীমাবদ্ধতা এই কারণে যে, প্রয়োজনে ইরানকে সহজেই সমুদ্রপথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলা যায়। এবং এই কারণেই ইরান কখনো প্রকৃত অর্থে সমুদ্রশক্তি হয়ে উঠতে পারেনি। তবে এই প্রণালির সংকীর্ণতা তেহরানকে দিয়েছে একটি শক্তিশালী কৌশলগত হাতিয়ার—তারাও চাইলে প্রণালিটি বন্ধ করে দিতে পারে। বিশ্বের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ তেল এই হরমুজ প্রণালির মধ্য দিয়ে যাতায়াত করে, তাই এই পথ বন্ধ হয়ে গেলে বিশ্বজুড়ে জ্বালানি সংকট দেখা দেবে। অবশ্য হরমুজ বন্ধ করে দিলে ইরান নিজেও বিপদে পড়বে। এমনকি পুরোমাত্রার যুদ্ধের মুখেও পড়তে পারে। তারপরও হরমুজ প্রণালি তেহরানের হাতে থাকা একটি শক্তিশালী কৌশলগত হাতিয়ার। ইরান সরকার এর গুরুত্ব অনুধাবন করে একে 'তুরুপের তাস' বানাতে ব্যাপক বিনিয়োগ করেছে।

ইরানের সামরিক বাহিনী প্রায়ই হরমুজ প্রণালিতে মহড়া চালায়। সেখানে তারা ছোট ছোট দ্রুতগামী অ্যাটাক বোট ব্যবহার করে বড় জাহাজকে ঘিরে 'সোয়ার্মিং' বা 'পঙ্গপালের মতো ঘিরে আক্রমণ' করার কৌশল অনুশীলন করে। অনেক অ্যাটাক বোটে থাকে জাহাজ-বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র। যদি পূর্ণমাত্রার যুদ্ধ শুরু হয়, সেক্ষেত্রে তারা হয়তো আত্মঘাতী স্কোয়াড মোতায়েন করতেও দ্বিধা করবে না। ইরাক-ইরান যুদ্ধের সময় তেমনটিই করেছিল তারা। ইরানের নৌবাহিনীর হাতে বেশ কয়েকটি সাবমেরিন থাকলেও সেগুলো খুবই পুরোনো মডেলের। যেকোনো অত্যাধুনিক সামরিক বাহিনী হয়তো সহজেই সেগুলোকে খুঁজে বের করে ধ্বংস করে ফেলতে পারবে। তবুও যদি তারা তীর থেকে জাহাজ লক্ষ্য করে ক্ষেপণাস্ত্র ছোড়ে, বিশেষ বাহিনী দিয়ে তেল ট্যাংকারে মাইন বসায় এবং অ্যাটাক বোটের মাধ্যমে 'সোয়ার্মিং' কৌশল ব্যবহার করে—তাহলে অস্থায়ীভাবে হলেও

হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দেওয়া সম্ভব হতে পারে। এই সম্মিলিত কৌশল শত্রুপক্ষকে এতটাই বিপর্যস্ত করে ফেলতে পারে যে তারা হয়তো পিছু হটতে বাধ্য হবে। এই ধরনের আক্রমণ হলে ইরাক, কুয়েত, সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে জ্বালানি রপ্তানি ব্যাহত হবে। যার ফলে বিশ্বজুড়ে জ্বালানির দাম বেড়ে যাবে খুব দ্রুত। আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশ্বব্যাপী মন্দার ঝুঁকি তৈরি হতে পারে। তাই, তেহরান যখন আন্তর্জাতিক চাপের মুখে পড়ে, বিশেষ করে যখন তাদের তেল রপ্তানি হুমকির মুখে থাকে, তখন তারা প্রায়ই হরমুজ বন্ধ করে দেওয়ার সতর্কবাণী দেয়। ২০১৮ সালে এই রকম একটি হুঁশিয়ারি বার্তা দিয়েছিল তারা—"আমরা শত্রুকে বুঝিয়ে দেব, হরমুজ প্রণালি হয় সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে, নতুবা কেউই এটি ব্যবহার করতে পারবে না।"

পরিস্থিতি এতদূর গড়াবে কি না তা নিশ্চিতভাবে বলার কোনো উপায় নেই। তবে এই স্তরের ভূরাজনৈতিক ও সামরিক কৌশল অনেকটা জুয়া খেলার মতোই। এই অনিশ্চয়তা মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্র অনেক আগে থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে। তাদের লক্ষ্য হলো, যুদ্ধ শুরু হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ইরানের আক্রমণাত্মক সামরিক সক্ষমতা যতটা সম্ভব ধ্বংস করে দেওয়া। অন্যদিকে, তেল ও গ্যাস পরিবহনের বিকল্প পথ তৈরি করেছে আরব দেশগুলো। তারা লোহিত সাগর পর্যন্ত নতুন পাইপলাইন তৈরি করছে। ট্যাংকারগুলো সেখান থেকে তেল ভর্তি করে বাবেল মান্দেব প্রণালি হয়ে ভারত মহাসাগরে পৌঁছাবে। তবে এই পথেও একটা সমস্যা থেকে যায়। বাবেল মান্দেব প্রণালি ও এডেন উপসাগরের উত্তর প্রান্তে রয়েছে ইয়েমেন। আর ইয়েমেনের এই উপকূলবর্তী অঞ্চল পুরোপুরি শিয়া হুথি বিদ্রোহীদের নিয়ন্ত্রণে। আর হুথিদের সবচেয়ে বড় মিত্র ইরান। হুথি বিদ্রোহীরা ইরানের কাছ থেকে যেসব ক্ষেপণাস্ত্র পেয়েছে, সেগুলোর নিশানা হওয়া থেকে এই ট্যাংকারগুলো রক্ষা পাবে কিনা সে প্রশ্ন রয়েই যায়।

আধুনিক ইরান এক অস্থির রাষ্ট্র। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা এখানে লেগেই আছে। কিন্তু এর অতীত এক গৌরবময় ইতিহাসে মোড়া। পারস্য সাম্রাজ্য ছিল প্রাচীন বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সভ্যতা। ইরানের ইতিহাস যেমন বৈভবময় ও সৃষ্টিশীল, তেমনি রক্তাক্ত ও সংঘাতপূর্ণ। তুলনা করতে গেলে তা প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাসের মতোই চিত্তাকর্ষক। তাই প্রাচীন পৃথিবীর এই দুই সভ্যতার মধ্যে সংঘর্ষ হওয়াটা ছিল অবশ্যম্ভাবী। পারস্য যেমন গ্রীসের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়েছে, তেমনি পরবর্তী রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গেও সংঘর্ষ ঘটেছে। তবে তার

আগেও পারস্যকে পার হতে হয়েছিল এক স্থানীয় সংকটকাল, যা ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়।

পারসিক জাতির উত্থান শুরু হয় আজ থেকে প্রায় ৪,০০০ বছর আগে। সে সময় পন্টিক-ক্যাস্পিয়ান স্তেপ অঞ্চলে প্রাক ইন্দো-ইউরোপীয় জনগোষ্ঠীর মানুষের বসবাস ছিল। এদের মধ্যে কিছু গোত্র স্তেপ অঞ্চলের তৃণভূমি ছেড়ে মধ্য এশিয়ায় চলে আসে। মধ্য এশিয়া থেকে তারা দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে একদল চলে যায় ভারত উপমহাদেশে, আর অন্যদল থেকে যায় ইরান মালভূমি ও এর আশপাশের অঞ্চলে। এই ইরানীয় শাখা থেকে পরবর্তীতে নানা উপগোষ্ঠী তৈরি হয়—মিডীয়, পারসিক, পার্থীয়, সোগ্দীয়, ব্যাক্ট্রীয়, স্কিথীয় ইত্যাদি। পারসিকরা বসতি গড়েছিল জাগ্রোস পর্বতমালার দক্ষিণে। তাদের প্রতিবেশী ছিল মিডীয় জনগোষ্ঠী। খুব শীঘ্রই প্রতিবেশী এই দুই জনগোষ্ঠীর সম্পর্কের প্রভাবক হয়ে ওঠে ভূগোল। একটি সামরিক প্রবচন আছে—“পাহাড় থেকে সমতলে নেমে এসে আক্রমণ করা সহজ, কিন্তু সমতল থেকে পাহাড়ে উঠে আক্রমণ করা অনেক কঠিন।” এই কৌশলগত সুবিধা কাজে লাগিয়ে পারস্যের শাসক দ্বিতীয় সাইরাস বা ‘সাইরাস দ্য গ্রেট’ খ্রিস্টপূর্ব ৫৫০ সালে মিডিয়া রাজ্য দখল করেন। মিডিয়াকে পারস্য সাম্রাজ্যের সঙ্গে একীভূত করা হয়। এই ঘটনার মাধ্যমে শুরু হয় পারস্যের আকেমেনীয় সাম্রাজ্যের।

সাইরাস দ্য গ্রেট তৎকালীন বিশ্বের সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিলেন। এই সাম্রাজ্যের বিস্তার ছিল মেসোপটেমিয়া অর্থাৎ আধুনিক ইরাক ও সিরিয়া অঞ্চল পেরিয়ে গ্রিস পর্যন্ত। তবে তাঁর জীবন শেষ হয়েছিল এক টালমাটাল অভিযানে, এক অসাধারণ নারী যোদ্ধার হাতে। এই নারী যোদ্ধার নাম টোমাইরিস। তিনি ছিলেন মাসসাগেতাই নামে মধ্য এশিয়ার এক সিথিয়ান রাজ্যের রানি। খ্রিস্টপূর্ব ৫২৯ সালে এই অঞ্চলটি দখল করতে চেয়েছিলেন সাইরাস। অভিযানের শুরুতেই রানির পুত্রকে বন্দি করেন তিনি। এতে রানি প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন এবং সাইরাসকে কঠোর হুঁশিয়ারি দেন, “আমার ছেলেকে ফেরত দাও এবং এই অঞ্চল ছেড়ে চলে যাও... যদি না যাও, তবে সূর্য দেবতাকে সাক্ষী রেখে শপথ করছি ... আমি তোমাকে এমনভাবে রক্তস্নান করাব যে তোমার রক্তের বাসনা পুরোপুরি তৃপ্ত হবে!” সাইরাস এই হুঁশিয়ারিকে অগ্রাহ্য করেন। পরবর্তী যুদ্ধে তাঁর বাহিনীর বেশিরভাগ সেনা নিহত হয়। নিহত হন সাইরাস নিজেও। কিন্তু ঘটনা এখানেই শেষ হয়নি।

সাইরাসের কাটা মাথা মানুষের রক্তে পূর্ণ একটি চামড়ার থলিতে ডুবিয়ে দেন রানি টোমাইরিস। এভাবেই টোমাইরিসের হুঁশিয়ারি পূর্ণতা লাভ করে।

সাইরাসের মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন তাঁর পুত্র দ্বিতীয় ক্যাম্বেসিস। তিনি সাম্রাজ্যের সীমানা মিশর ছাড়িয়ে বর্তমান লিবিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত করেন। এরপর খ্রিস্টপূর্ব ৫২২ সালে ক্ষমতায় আসেন প্রথম দারিউস। তার শাসনামলে সাম্রাজ্যের সীমানা পূর্ব দিকে বর্তমান পাকিস্তান ও উত্তর ভারতের কিছু অংশ এবং পশ্চিম দিকে ইউরোপের দানিউব উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। দারিউস ছিলেন একাধারে শাসক ও সংগঠক। তিনি ইহুদিদের জেরুজালেমে মন্দির পুনর্নির্মাণের অনুমতি দেন। পাশাপাশি পারস্যের নিজস্ব ধর্ম জরথুস্ত্রবাদকে পৃষ্ঠপোষকতা করেন তিনি। তাঁর শাসনামলেই বিশ্বের প্রথম ডাকব্যবস্থা চালু হয়। এই ব্যবস্থায় বারবার ঘোড়া বদলের মাধ্যমে দ্রুত বার্তা আদান-প্রদানের পদ্ধতি গড়ে তোলা হয়। এছাড়াও তিনি হাজার হাজার মাইল জুড়ে নির্মাণ করেন পাকা সড়ক। এই রাস্তাগুলো সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তকে সংযুক্ত করে সাম্রাজ্যের অর্থনীতি, সামরিক নিয়ন্ত্রণ ও প্রশাসনকে আরো কার্যকর করে তোলে।

দারিউসের শাসনামল অত্যন্ত গৌরবময় হলেও সবকিছু তার পরিকল্পনামাফিক হয়নি। খ্রিস্টপূর্ব ৪৯০ সালে কয়েকটি গ্রিক নগর রাষ্ট্রের ওপর বিরক্ত হয়ে ওঠেন তিনি। কারণ তারা তাকে যথাযথ শ্রদ্ধা জানায়নি বা কর প্রদান করেনি। এই অপমানের জবাব হিসেবে গ্রিসের মূল ভূখণ্ডে আক্রমণ চালান তিনি। কিন্তু পারস্য বাহিনী ম্যারাথনের যুদ্ধে গ্রিকদের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এর চার বছর পরে দারিউস মারা যান এবং সিংহাসনে বসেন তার পুত্র জেরেক্সেস। জেরেক্সেসও গ্রিস আক্রমণ করেন। কিন্তু তিনি আরো বড় পরাজয়ের সম্মুখীন হন। অনেক ইতিহাসবিদের মতে এই ব্যর্থতা থেকেই আকেমেনীয় সাম্রাজ্যের পতনের শুরু। এই সাম্রাজ্য পরবর্তী প্রায় দেড় শতক ধরে টিকে থাকলেও জেরেক্সেসের পরাজয় থেকেই সাম্রাজ্যের ভিত দুর্বল হতে শুরু করে। সাইরাস, দারিউস এবং জেরেক্সেস নিজেদের নামের সাথে 'গ্রেট' বা 'মহামতি' যুক্ত করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তাদের গড়ে তোলা সাম্রাজ্য ধ্বংস করেন আরেক মহামতি—'আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট' বা আলেকজান্ডার অব মেসিডোনিয়া। আলেকজান্ডার খ্রিস্টপূর্ব ৩৩১ সালে পারসিক সেনাবাহিনীকে সম্পূর্ণ পরাজিত করেন। এরপর তিনি পারস্য সাম্রাজ্যের রাজধানী পারসেপোলিসে প্রবেশ করে ব্যাপক অগ্নিসংযোগ করেন।

এরপর প্রায় এক শতাব্দী ধরে পারস্য রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে ডুবে ছিল। শেষ পর্যন্ত অপর একটি আদি ইরানীয় গোষ্ঠী পার্থীয়রা একটি নতুন পারস্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। মেসোপটেমিয়া দখলে রাখা এবং আধুনিক তুরস্ক ও আর্মেনিয়ার দিক থেকে রোমানদের পারস্যে প্রবেশ রোধ করার জন্য রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে দীর্ঘ সময় ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যায় পার্থীয়রা। শেষ পর্যন্ত পার্থীয়রাই জয়ী হয়েছিল। খ্রিস্টপূর্ব ৫৩ সালে রোমান জেনারেল ক্রাসাস পার্থীয়দের বিরুদ্ধে লড়াই করেন এবং পরাজিত হন। পার্থীয়রা তাকে অত্যন্ত লোভী মনে করত, তাই তার জন্য এক ভয়ংকর শাস্তি নির্ধারণ করা হয়। তার মুখে ঢেলে দেওয়া হয় উত্তপ্ত গলিত স্বর্ণ। এ যেন প্রকৃতির প্রতিশোধ! এই ক্রাসাস হলেন সেই ব্যক্তি, যিনি একসময় স্পার্টাকাসের নেতৃত্বে শুরু হওয়া দাস বিদ্রোহ দমন করেছিলেন। সে সময় হাজার হাজার পরাজিত দাস সৈনিককে ক্রুশবিদ্ধ করেন তিনি। ১৯৬০ সালে নির্মিত 'স্পার্টাকাস' চলচ্চিত্রে অভিনেতা লরেন্স অলিভিয়ার এই ক্রাসাস চরিত্রটিকে বিখ্যাত করে তুলেছেন। এই চলচ্চিত্রের সবথেকে বিখ্যাত দৃশ্য হলো, পরাজিত দাস সৈনিকদের কাছে এসে স্পার্টাকাসকে চিনিয়ে দেওয়ার বিনিময়ে মুক্তির আশ্বাস দিচ্ছেন রোমান জেনারেল ক্রাসাস। আর দাসেরা সকলে নিজেকে স্পার্টাকাস হিসেবে দাবি করছে।

ক্রাসাসের পরাজয়ের প্রায় পাঁচ শত বছর পরে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বে পতন ঘটে পার্থীয়দের। শুরু হয় সাসানীয় সাম্রাজ্য। সাসানীয়দের সময়েও রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে যুদ্ধ চলতে থাকে পারস্যের। রোমান সাম্রাজ্য বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যে রূপ নেওয়ার পরেও যুদ্ধ অব্যাহত ছিল। এই দীর্ঘকালীন সংঘাত সাসানীয়দের চূড়ান্ত ক্লান্ত করে তুলে। আর তখনই পশ্চিম দিক থেকে উঠে আসে নতুন এক শক্তি—আরব এবং ইসলাম। সপ্তম শতকে আরব মুসলিমদের হাতে সাসানীয়দের চূড়ান্ত পতনের কারণ ছিল অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দুর্বলতা। ধর্মীয় বিপ্লবের জোয়ারে বলীয়ান আরব মুসলিম বাহিনীর বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রতিরোধ তৈরি করতে ব্যর্থ হয় সাসানীয়রা। মুসলিম আগ্রাসনের মুখে পারস্য প্রথমে হারায় মেসোপটেমিয়ার বাফার অঞ্চল। এরপরে তাদের নিজ ভূখণ্ডের অধিকাংশই আরবদের দখলে চলে যায়। তবে মুসলিমদের জন্য এই জয় খুব সহজ ছিল না। পারস্যের নগরগুলো পুরোপুরি দখলে আনতে তাদের লেগে যায় প্রায় ২০ বছর। পার্বত্য অঞ্চলগুলো তো কখনোই পুরোপুরি আরবদের নিয়ন্ত্রণে আসেনি। এছাড়াও বারবার আরবদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘটেছে।

আরব সামরিক শক্তি শেষ পর্যন্ত হেরে গেলেও ইসলাম জয়ী হয়। ধীরে ধীরে নিঃশেষ হতে থাকে প্রাচীন পারসিক ধর্ম জরথুস্ট্রবাদ। এই ধর্মের পুরোহিতদের হত্যা করা হয়, মন্দিরগুলো ধ্বংস করে ফেলা হয় এবং ইসলামই হয়ে ওঠে পারস্যের প্রধান ধর্ম। পারস্যকে মুসলিম খিলাফতের অধীনে নিয়ে আসা হলেও দেশটির বিশাল আকার এবং শক্তিশালী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের কারণে পারসিক জনগণ কখনোই আরবদের সঙ্গে একীভূত হয়নি। পারস্যবাসী সবসময় নিজেদেরকে স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে দেখেছে এবং বহিরাগত ও নিজেদের মধ্যে এক ধরণের অদৃশ্য দেয়াল অনুভব করেছে। কয়েক শতাব্দী পর পারস্য শিয়া ইসলাম অবলম্বন করলে এই সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যবোধ আরো প্রবল হয়ে ওঠে।

তবে এর আগে একের পর এক তুর্কি ও মঙ্গোল যোদ্ধাদের আগ্রাসনের শিকার হয়েছে পারসিকরা। এই আক্রমণ প্রতিবারই ঘটেছে এমন সব সময়, যখন পারস্যের কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা দুর্বল হয়ে দেশটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তবে, পরে সাফাভি রাজবংশের (১৫০১–১৭২২ খ্রিস্টাব্দ) অধীনে পারস্য আবারও শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সাফাভিরা পারস্যকে ঐক্যবদ্ধ করে নিজস্ব শাসনের ক্ষমতা ফিরিয়ে আনে এবং দেশের সীমান্ত রক্ষা করার শক্তি অর্জন করে।

সাফাভিদের উত্থান পারস্যের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ পট পরিবর্তন। ১৫০১ খ্রিস্টাব্দে প্রথম সাফাভি শাহ্ ইসমাইল ঘোষণা করেন যে শিয়া ইসলামই হবে পারস্যের রাষ্ট্রীয় ধর্ম। ইসলাম ধর্মে সুন্নি-শিয়া বিভেদের সূত্রপাত হয়েছিল ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে মহানবী হযরত মুহাম্মদের (সা.) মৃত্যুর পরে শুরু হওয়া উত্তরাধিকারের দ্বন্দ্ব থেকে। পরবর্তীকালে ইসলামের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী (রা.) আততায়ীর হাতে নিহত হওয়ার ঘটনায় হযরত আলীর সমর্থকেরা বাকিদের থেকে আলাদা হয়ে যায়। ৬৮০ সালে কারবালার যুদ্ধে নবীর প্রিয় দৌহিত্র হুসাইন (রা.) শহিদ হওয়ার পর এই বিভেদ চূড়ান্ত রূপ নেয়। পরবর্তীকালে হযরত আলী ও হুসাইনের অনুসারীরা শিয়া নামে পরিচিত হয়। শিয়ারা হযরত আলী ও তার বংশধরদের মহানবীর (সা.) পরবর্তী 'ইমাম' বা 'পথ প্রদর্শনের উত্তরাধিকারী' হিসেবে বিশ্বাস করে। এর বিপরীতে অন্য আরব মুসলিমরা নিজেদের সুন্নি বা মহানবীর (সা.) সুন্নাত অনুসারী হিসেবে পরিচয় দিতে শুরু করে। অনেক ইতিহাসবিদ মনে করেন, বাদশাহ ইসমাইলের শিয়া মতবাদ চালু করার সিদ্ধান্ত মূলত ছিল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত। ঠিক যেমন ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরি

'চার্চ অব ইংল্যান্ড' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন রোমান ক্যাথলিক চার্চের বিপরীতে নিজেকে আলাদাভাবে সংজ্ঞায়িত করার জন্য। ঘটনাটির বিস্তারিত আমরা যুক্তরাজ্য অধ্যায়ে দেখব। একাদশ থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত পারস্য ছিল ওঘুজ-তুর্কি জাতিগোষ্ঠীর সেলজুকদের অধীনে। তারা ছিল কট্টর সুন্নি। দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে সুন্নি তুর্কি মামলুকরা পারস্য থেকে সেলজুকদের বিতাড়িত করে খারেজমি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। সেলজুকরা আনাতোলিয়া অঞ্চলে সরে যায়। ত্রয়োদশ শতকে মঙ্গোল আগ্রাসনের মুখে খারেজমিরাও বিতাড়িত হয়ে আনাতোলিয়ায় চলে যায়। পরবর্তীতে আনাতোলিয়া অঞ্চলে সুন্নি তুর্কিদের দ্বারা অটোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বাদশাহ ইসমাইল চেয়েছিলেন সাফাভি সাম্রাজ্যের প্রতিদ্বন্দ্বী আটোমান সাম্রাজ্য থেকে আলাদা পরিচয় গড়ে তুলতে।

পারস্যের এই শিয়া ধর্ম গ্রহণ পুরো অঞ্চলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। তবে এই ধর্মীয় সিদ্ধান্ত পারস্যে একটি জাতীয় পরিচয় গঠনে সহায়তা করে। দেশটিতে গড়ে ওঠে শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনব্যবস্থা। কিন্তু এতে দেশের মধ্যে কিছু সমস্যারও সৃষ্টি হয়। দেশটিতে গড়ে ওঠে সংখ্যালঘুদের প্রতি অবিশ্বাস ও সন্দেহের মনোভাব, যা এখন পর্যন্ত অব্যাহত আছে। এই ধর্মীয় বিষয়টিই ইরানকে বর্তমানের রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠতে সাহায্য করেছে। মধ্যপ্রাচ্যে সাম্প্রতিক সময়ের বহু সংকটের পেছনে থাকা অন্যতম প্রধান কারণও এই ধর্মীয় বিভাজন। লেবাননে চলমান উত্তেজনা, ইয়েমেন ও সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ, এমনকি ১৯৭৯ সালের ইরানি বিপ্লবের পর থেকে ইরান ও সৌদি আরবের সংঘাত—সবকিছুর পেছনে রয়েছে ধর্মীয় বিভাজনের দীর্ঘ ইতিহাস। অবশ্য এসব ঘটনা কেবল ধর্মীয় বিভাজন দিয়েই ব্যাখ্যা করা যায় না। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও আন্তরাষ্ট্রীয় রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাও এতে জড়িত।

আপনারা অনেকেই হয়তো শিয়াদের ধর্মীয় মিছিলের দৃশ্য দেখেছেন—একদল অর্ধনগ্ন শিয়া মুসলিম পুরুষ নিজেদের বুকে আঘাত করছে এবং চাবুক দিয়ে নিজেদের পিঠ রক্তাক্ত করছে। এটি আশুরা উৎসবের দৃশ্য। এই আত্মপীড়নের মাধ্যমে তারা কারবালার যুদ্ধে মহানবী হযরত মুহাম্মদের (সা.) দৌহিত্র হুসাইনের (রা.) শহীদ হওয়ার বেদনা অনুভব করতে চায়। কারবালার যুদ্ধকে স্মরণ করা ইরানি সংস্কৃতির অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত। তাদের কবিতা, সংগীত ও নাটকে এই স্মৃতি বার বার ফুটে ওঠে। এই যুদ্ধের ছাপ ইরানের জাতীয় পরিচয়েরও অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে, যার প্রতিফলন দেখা যায় তাদের জাতীয়

পতাকাতে। ইরানের পতাকার মাঝখানে আছে একটি লাল টিউলিপ, যা মূলত শাহাদাতের প্রতীক। বলা হয়ে থাকে, হুসাইন যখন শহীদ হন, তখন তার রক্ত থেকে একটি টিউলিপ ফুল ফুটেছিল।

১৭২২ সালে আলেমদের নেতৃত্বে সাফাভি বংশকে ক্ষমতা থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। তাদের বক্তব্য ছিল, শাসক হতে হলে অবশ্যই তাকে একজন জ্ঞানী ধর্মবিশারদ হওয়া উচিত। তবে এই ঘটনার কিছুদিন পরই আফগান গিলজাই গোত্রের যুদ্ধবাজ নেতা মাহমুদ হুতাক এই ধর্মীয় নেতাদের অপসারণ করেন। এই আফগান নেতা বলেছিলেন, ধর্মকে নিয়ন্ত্রণ করা ধর্মীয় নেতাদের কাজ হতে পারে, কিন্তু শাসনকার্য পরিচালনা, কর আদায় ও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা রাজনীতিবিদদের হাতেই থাকা উচিত। এই ভাবনা এক নতুন বিভাজনের সূচনা করে। ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যকার এই ক্ষমতার দ্বন্দ্ব ইরানের রাজনীতিতে আজও উত্তপ্ত বিতর্কের বিষয়। অনেকেই মনে করেন, আধুনিক ইরানে ধর্মীয় নেতারা আবারও রাজনীতিতে অতিরিক্ত ক্ষমতার অধিকারী হয়ে পড়েছেন।

সাফাভিদের পতনের পরের দুইশত বছর আবার ফিরে আসে অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ও বহিঃশত্রুর হস্তক্ষেপের চক্র। আফগানরা কয়েক বছর শাসন চালালেও তাদের শাসন ছিল দুর্বল। জনগণও তাদের শাসন পছন্দ করত না। এই অরাজকতার সুযোগ নেয় পারস্যের প্রতিবেশী অটোমান সাম্রাজ্য ও রাশিয়া। এই দুই পক্ষই পারস্যের উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তে প্রভাব বিস্তারের জন্য ভূখণ্ড ভাগাভাগির চেষ্টা চালায়। পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করে যখন আফশার বংশের সেনাপতি নাদির খান ক্ষমতায় উঠে আসেন। এই নাদির খানই পরবর্তীতে নাদির শাহ্ হিসেবে পরিচিত লাভ করেন। তিনি আফগানদের পরাজিত করে ১৭৩৬ সালে নিজেকে শাহ্ ঘোষণা করেন এবং আফশারি রাজবংশের সূচনা হয়। তার শাসনে পারস্য সাময়িকভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে। দিল্লিতে অভিযান চালিয়ে মুঘলদের পরাজিত করে বিপুল ধনসম্পদ নিয়ে আসেন তিনি। কিন্তু তার মৃত্যুর পর আফশারি রাজবংশ দ্রুত ভেঙে পড়ে। এরপর ১৭৫১ সালে কারিম খান জ্যান্ডের নেতৃত্বে দক্ষিণ ইরানের জ্যান্ড রাজবংশ ক্ষমতায় আসে। তবে তার উত্তরসূরিরা ছিল দুর্বল। এর পাশাপাশি ছিল অভ্যন্তরীণ কোন্দল, ফলে জ্যান্ডরা টিকে থাকতে পারেনি। অবশেষে তুর্কোমান কাজারদের উত্থান ঘটে এবং ১৭৯৪ সালে কাজার রাজবংশ ইরান শাসন শুরু করে। তাদের শাসন ২০ শতকের শুরু পর্যন্ত স্থায়ী ছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পারস্য নিরপেক্ষ থাকার ঘোষণা দিলেও তাতে তাদের কোনো লাভ হয়নি। ব্রিটিশ, জার্মান, রুশ ও তুর্কি বাহিনী দেশটিকে যুদ্ধক্ষেত্র বানিয়ে ফেলে। যুদ্ধের পর রুশরা নিজেদের বিপ্লব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। জার্মান ও অটোমান সাম্রাজ্য পরাজিত হয়। ফলে পারস্যে প্রভাব বিস্তারের জন্য থেকে যায় কেবল ব্রিটিশরা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগেই পারস্যে তেলের খনি আবিষ্কৃত হয়েছিল। ব্রিটিশরা সে সময় নিশ্চিত করেছিল যেন তাদের হাতেই পারস্যের তেল উত্তোলন ও বিক্রির একচেটিয়া অধিকার থাকে। ১৯০৯ সালে অ্যাংলো-পার্সিয়ান অয়েল কোম্পানি (পরবর্তীকালে ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম) গঠিত হয়। ব্রিটিশ সরকার এই কোম্পানির কন্ট্রোলিং শেয়ার কিনে নেয়। পরবর্তী সময়ে উইনস্টন চার্চিল এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—"ভাগ্য যেন আমাদের জন্য রূপকথার দুনিয়া থেকে কল্পনাতীত এক অমূল্য রত্ন এনে দিল।"

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লন্ডনের পরিকল্পনা ছিল পারস্যকে তাদের অধীনস্থ প্রোটেক্টোরেটে পরিণত করা। অর্থাৎ, পারস্য আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীন থাকলেও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যই দেশটির পররাষ্ট্রনীতি, প্রতিরক্ষা ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়ন্ত্রণ করবে। কিন্তু পারস্যের কসাক ব্রিগেডের এক দুঃসাহসী কর্মকর্তা রেজা খানের ভাবনা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। পারস্যের এই বিশেষায়িত সেনা ব্রিগেড তৈরি হয়েছিল উনিশ শতকের শেষভাগে কাজার রাজপরিবারের ব্যক্তিগত বাহিনী হিসেবে। রাজশক্তিকে অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বাহ্যিক চাপ থেকে নিরাপদে রাখাই ছিল এই বাহিনীর উদ্দেশ্য। তবে বাহিনীটি গড়ে উঠেছিল রাশিয়ান সাম্রাজ্যের উদ্যোগে, যাতে পারস্যে রাশিয়ার প্রভাব বজায় থাকে। কসাক ঘোড়সওয়ার বাহিনীর সামরিক মডেল অনুসারে এটি গড়ে তোলা হয় বলে এই বাহিনীর নাম রাখা হয় কসাক ব্রিগেড। ধীরে ধীরে এই বাহিনী পারস্যের রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হয়ে ওঠে। বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় পারস্য যখন নানা দিক থেকে বিদেশি চাপের মুখে পড়ে, তখন কসাক ব্রিগেড হয়ে ওঠে দেশের একমাত্র তুলনামূলকভাবে সংগঠিত সামরিক বাহিনী। এই ব্রিগেডের মধ্য থেকেই উঠে আসেন রেজা খান। সাধারণ পরিবারের সন্তান হলেও শৈশব থেকেই তিনি সামরিক জীবনে প্রবেশ করেন এবং কসাক ব্রিগেডে যোগ দেন। শারীরিক সক্ষমতা, কঠোর অনুশাসন মেনে চলা এবং নেতৃত্বদানের ক্ষমতার কারণে তিনি দ্রুত সহকর্মী ও ঊর্ধ্বতনদের নজরে আসেন।

১৯১০ ও ১৯২০-এর দশকের শুরুতে পারস্য ছিল রাজনৈতিক ভাঙন, বিদেশি হস্তক্ষেপ ও অর্থনৈতিক দুর্বলতায় জর্জরিত। একদিকে ব্রিটিশরা ও রাশিয়ানরা তাদের নিজেদের প্রভাব বিস্তারে ব্যস্ত ছিল, অন্যদিকে পারস্যের কেন্দ্রীয় শাসন হয়ে পড়ছিল দুর্বল। এমন পরিস্থিতিতে রেজা খান ধীরে ধীরে কসাক ব্রিগেডের অভ্যন্তরে তার অবস্থান শক্ত করেন। তার নেতৃত্বে বাহিনী শৃঙ্খলা ফিরে পায়। মূলত তিনিই ব্রিগেডের প্রধান শক্তি হয়ে ওঠেন। ১৯২১ সালে রেজা খান মাত্র ১,২০০ সৈন্য নিয়ে তেহরানে প্রবেশ করেন এবং দেশটির শাসনক্ষমতা দখল করে নেন। চার বছর পর ১৯২৫ সালে পারস্যের সংসদ 'মাজলিস' আগের শাহ্‌কে ক্ষমতাচ্যুত করার পক্ষে ভোট দেয়। নতুন শাহ্ হিসেবে নামে অভিষিক্ত করা হয় রেজা খানকে। তার নতুন আনুষ্ঠানিক নাম হয় 'রেজা শাহ্ পাহলভি' ।

দেশটি তখন ছিল ধ্বংসের প্রায় দ্বারপ্রান্তে। শত শত বছরের দুর্বল ও অদক্ষ শাসনের ফলে পারস্যের দশা তখন পুরোপুরি বিধ্বস্ত। ঠিক এই সময় রাজধানীতে এসে পারস্যের গৌরব পুনরুদ্ধারের ডাক দিলেন রেজা খান। জনগণ মনোযোগ দিয়ে তার কথা শুনেছিল। ১৯৩৫ সালে তিনি দেশটির নাম পরিবর্তন করে রাখেন 'ইরান' বা 'আর্য জনগোষ্ঠীর দেশ'। তার উদ্দেশ্য ছিল দেশের নামের মধ্যে যেন দেশটিতে বসবাস করা সকল জাতিগোষ্ঠীর পরিচয় প্রতিফলিত হয়। তার লক্ষ্য ছিল বিশ শতকের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশকে আধুনিক করে গড়ে তোলা। তিনি বিশাল বিশাল নির্মাণ প্রকল্প হাতে নেন। দেশব্যাপী রেল নেটওয়ার্ক তৈরি করে গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোকে সংযুক্ত করেন তিনি। তবে রেজা শাহ্ পাহলভি একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ এড়িয়ে যান। অ্যাংলো-পার্সিয়ান অয়েল কোম্পানির ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেননি তিনি। ফলে যতদিন ব্রিটিশদের হাতে তেলের নিয়ন্ত্রণ ছিল, ততদিন পারস্যের রাজনীতিতেও ব্যাপক প্রভাব খাটানোর সুযোগ পায় ইংরেজরা। ব্রিটিশরা আবাদান বন্দরে বিশ্বের বৃহত্তম তেল শোধনাগার গড়ে তোলে। আর সেখান থেকে চলতে থাকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্য সস্তা তেল সরবরাহ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ইরান আবারও নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু আগের মতো এবারও বহিঃশক্তির খেলায় জড়িয়ে পড়তে হয় তাদের। রেজা শাহের বিরুদ্ধে নাৎসি জার্মানির প্রতি সহানুভূতি দেখানোর অভিযোগ ছিল। এই অভিযোগকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে দেশটিতে একযোগে আক্রমণ চালায় ব্রিটিশ ও সোভিয়েত বাহিনী। শাহ্‌কে সিংহাসন ছাড়তে বাধ্য করা হয়। তাদের লক্ষ্য ছিল, ইরানি তেলক্ষেত্রের পুরো নিয়ন্ত্রণ নেওয়া এবং রাশিয়া পর্যন্ত সরবরাহ

লাইন নির্মাণ করা। শাহ্ যে রেলপথ নির্মাণ করেছিলেন সেটিকেই নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করতে চেয়েছিল তারা।

এরপর রেজা শাহের স্থলাভিষিক্ত হন তার ২১ বছর বয়সী পুত্র মোহাম্মদ রেজা শাহ্ পাহলভি। ১৯৪৬ সালে বিদেশি সৈন্যরা চলে যাওয়ার পর দেশের অর্থনৈতিক সংস্কার চালিয়ে যাওয়ার উদ্যোগ নেন এই তরুণ শাহ্। তবে পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তিনি ব্রিটিশ ও অ্যামেরিকানদের পক্ষ নেন। কারণ ততদিনে বিশ্বে শুরু হয়েছে স্নায়ুযুদ্ধ, আর শাহ্ চেয়েছিলেন ইরান যেন একটি পশ্চিমাপন্থী মিত্ররাষ্ট্র হিসেবে থাকতে পারে। কিন্তু সময় বদলাচ্ছিল, ঔপনিবেশিকতা বিরোধী হাওয়া তখন প্রবল। অল্প সময়ের মধ্যেই এই হাওয়া এক প্রলয়ংকরী ঝড়ে রূপ নেয়। এই ঝড়ের কেন্দ্রে ছিল তৎকালীন অ্যাংলো-ইরানিয়ান অয়েল কোম্পানি। ইরানিদের দাবি ছিল স্পষ্ট—তেলের মালিকানা ইরানিদের হাতে ফিরিয়ে দিতে হবে। এমন এক সময়, ১৯৫১ সালে ইরানের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন এই দাবির অন্যতম প্রবক্তা মোহাম্মদ মোসাদ্দেক। তার নেতৃত্বে খুব দ্রুতই তেলক্ষেত্র জাতীয়করণের বিল পাস হয়। জনগণকে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে, ইরানের তেল থেকে অর্জিত সমস্ত অর্থ কেবলমাত্র ইরানের জন্যই ব্যয় করা হবে।

খুব দ্রুতই এর কঠোর প্রতিক্রিয়া আসে। ব্রিটিশ ব্যাংকগুলোতে ইরানের সম্পদ স্থগিত করা হয়, ইরানে পাঠানোর জন্য নির্ধারিত পণ্য আটকে দেওয়া হয় এবং আবাদান রিফাইনারিতে কর্মরত ব্রিটিশ টেকনিশিয়ানদের প্রত্যাহার করা হয়। তবে এসবের পরেও কোনো লাভ হয়নি। ইরানিরা নিজেদের অবস্থানে অনড়ই থেকে যায়। ১৯৫৩ সালে এমআই-৬ এবং সিআইএকে ব্যবহার করে এক সামরিক অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করে লন্ডন ও ওয়াশিংটন। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ আসে মোসাদ্দেকের একটি আগ্রাসী পদক্ষেপের পর। মোসাদ্দেক হঠাৎ করেই সংসদ ভেঙে দেন ও এককভাবে দেশ শাসনের ঘোষণা দেন। তিনি কার্যত শাহের ক্ষমতাও কেড়ে নিয়েছিলেন। মোসাদ্দেকের এই সিদ্ধান্তের কারণে এমআই-৬ এবং সিআইএর পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা আরো সহজ হয়ে যায়। পশ্চিমা বিশ্বে অনেকেই বলেন যে ব্রিটিশ ও মার্কিনিরা ইরানের গণতন্ত্র ধ্বংস করেছিল। তবে আরো সঠিকভাবে বললে বলা যায়, তারা ইরানের অভ্যন্তরীণ কিছু গোষ্ঠীকে সহায়তা দেয় এবং তাদের ব্যবহার করে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত একটি সরকারকে উৎখাত করে। অ্যামেরিকানদের মূল উদ্বেগ ছিল, এই বিশৃঙ্খলার সুযোগে ইরানে সোভিয়েতপন্থী কমিউনিস্টরা ক্ষমতা দখল করতে পারে। ইরানের

তেলের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে অ্যামেরিকার কোনো মাথাব্যথা ছিল না। তবে ব্রিটিশদের কাছে তেলের বিষয়টাই ছিল প্রধান। অভ্যুত্থান শুরুর পরপরই নিরাপত্তার তাগিদে বাগদাদ হয়ে ইতালি পালিয়ে যান শাহ্। অভ্যুত্থান শেষ হলে ইতালি থেকে শাহ্ ফিরে আসেন। পশ্চিমাদের দৃষ্টিতে ইরানের পরিস্থিতি আবার 'স্বাভাবিক' হয়ে যায়। কিন্তু বাস্তবতা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

অনেকের কাছে অভ্যুত্থানটি সফল মনে হলেও এটি ইরানের ইতিহাসে দীর্ঘ ছায়া ফেলেছিল। ইরানের নবজাতক গণতন্ত্র শুরুতেই থমকে যায়, আর শাহ্ এগিয়ে যেতে থাকেন ক্রমবর্ধমান দমননীতির দিকে। খুব শিগগিরই বিভিন্ন দিক থেকে বিরোধিতার মুখে পড়েন তিনি। অমুসলিমদের ভোটাধিকার দেওয়ার কারণে রক্ষণশীল ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো তার ওপর ক্ষুব্ধ হয়। মস্কো-সমর্থিত কমিউনিস্টরা তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে। উদারপন্থী বুদ্ধিজীবীরা গণতন্ত্রের দাবিতে সোচ্চার হয়। অন্যদিকে জাতীয়তাবাদীরা মনে করছিলেন, বিদেশি হস্তক্ষেপে ইরানের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়েছে। এই অভ্যুত্থান ইরানিদের আরেকবার দেখিয়ে দেয়, বিদেশি হস্তক্ষেপ তাদের দেশে কী ধরনের পরিণতি বয়ে আনতে পারে। মোসাদ্দেকের পতনের পর তেলক্ষেত্র "জাতীয়" রয়ে গেল নামমাত্রভাবে, কিন্তু প্রকৃত নিয়ন্ত্রণ চলে গেল পশ্চিমা কোম্পানিগুলোর হাতে। ফলে এই জাতীয়করণে রাষ্ট্রের রাজস্ব বৃদ্ধি পেলেও এর সুফল সাধারণ জনগণের কাছে খুব একটা পৌঁছায়নি। অভ্যুত্থানটি ইরানের ইতিহাসে এক পট পরিবর্তনকারী ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়। এই অভ্যুত্থান দেশকে দ্রুতই ১৯৭৯ সালের বিপ্লবের দিকে ঠেলে দেয়।

ইরানের বর্তমান শাসকগোষ্ঠী প্রচার করে থাকে যে—শাহের পতনের সময় লক্ষ লক্ষ ধর্মপ্রাণ মানুষ নতুন এক যুগের প্রত্যাশায় রাস্তায় নেমেছিল। আয়াতুল্লাহরা দেশ শাসন করবে, এমনটাই নাকি তাদের দাবি ছিল। তবে বাস্তবতা ছিল একদমই ভিন্ন। যে বিক্ষোভগুলো শেষ পর্যন্ত শাহের পতন ঘটায়, সেসব বিক্ষোভে আয়াতুল্লাহপন্থীদের পাশাপাশি ধর্মনিরপেক্ষ গোষ্ঠী, কমিউনিস্ট এবং শ্রমিক ইউনিয়নও যুক্ত ছিল। কিন্তু আয়াতুল্লাহ খোমেনির নেতৃত্বাধীন ধর্মীয় গোষ্ঠী ক্ষমতায় আসার পর অন্যান্য গোষ্ঠীর কয়েক হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়। আর এর মাধ্যমেই ইতিহাসের ওপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে তারা।

খোমেনি খুবই পরিচিত একজন নেতা ছিলেন। ১৯৬৪ সালে তিনি শাহ্কে অভিযুক্ত করে বলেছিলেন যে, শাহ্ "ইরানি জনগণকে অ্যামেরিকান কুকুরের চেয়েও নিচু স্তরে নামিয়ে এনেছেন।" এই কারণে খোমেনিকে নির্বাসিত করা হয়।

কিছুদিন ইরাকে অবস্থানের পর তিনি ফ্রান্সে চলে যান। ১৯৭৮ সালে ইরানজুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। শাহ্ তার জবাব দেন চরম দমন-নিপীড়ন দিয়ে। শাহের গোপন পুলিশ বাহিনী 'সাভাক' তখন হয়ে উঠেছিল নির্যাতন ও হত্যার প্রতীক। শত শত বিক্ষোভকারী নিহত হওয়ার পর সে বছরের শেষ নাগাদ সামরিক আইন জারি করা হয়। কিন্তু তাতেও বিক্ষোভ থামেনি। ১৯৭৯ সালের জানুয়ারি মাসে রেজা শাহ্ পাহলভি দেশ ছাড়তে বাধ্য হন। তিনি ছিলেন ইরানের শেষ শাহ্ এবং অ্যামেরিকার প্রভাবে চলা শেষ ইরানি শাসক। এই ঘটনার পরপর ওয়াশিংটন তাদের সমর্থন ইরান থেকে সরিয়ে খুব দ্রুতই ইরাকের দিকে ঘুরিয়ে নেয়।

এদিকে খোমেনি নির্বাসনে থাকাকালেও রাজনৈতিকভাবে প্রবল সক্রিয় ছিলেন। বিবিসির ফারসি সার্ভিসে তার বক্তব্য নিয়মিত সম্প্রচারিত হতো। ফলে তার কণ্ঠস্বর অনেকের কাছেই ছিল পরিচিত। তার ভাষণের হাজার হাজার ক্যাসেট টেপ চোরাইপথে ইরানে পাঠানো হয়েছিল। এইসব রেকর্ড ইরানের মসজিদগুলোতে বাজানো হতো। শাহ্ দেশ ছাড়ার দুই সপ্তাহের মাথায় দেশে ফিরে আসেন আয়াতুল্লাহ খোমেনি। তাকে স্বাগত জানাতে রাস্তায় নেমেছিল এক মিলিয়নেরও বেশি মানুষ। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষ তখনও বুঝতে পারেনি যে, আদতে রাজমুকুটের বদলে ধর্মীয় পাগড়ির শাসন বরণ করে নিয়েছে তারা।

ইসলামি বিপ্লবের প্রকৃতি অনেকেই তখন বুঝতে পারেনি। তারা ভেবেছিল যে বৃদ্ধ আয়াতুল্লাহ খোমেনি হয়তো কেবল প্রতীকী নেতা হয়েই থাকবেন। দেশকে তিনি ধীরে ধীরে নিয়ে যাবেন কম দমনমূলক ভবিষ্যতের পথে। কিন্তু খুব দ্রুতই তারা বুঝে যান যে বাস্তবতা অন্যরকম হতে চলেছে। মিশরীয় বুদ্ধিজীবী সাইয়েদ কুতুব কট্টরপন্থী মত প্রচার করতেন। ১৯৬৬ সালে কায়রোতে ফাঁসিতে ঝোলানো হয় তাকে। নিজের লেখনীর মাধ্যমে ইসলামি বিপ্লবীদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন তিনি। তিনি সুন্নি মুসলিম হলেও তার চিন্তাধারা ছড়িয়ে পড়েছিল ইরানের শিয়া বিপ্লবীদের মাঝেও। সাইয়েদ কুতুব তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'মাইলস্টোন'-এ মুসলিম বিশ্বের সমস্যার সমাধান হিসেবে ইসলামকে উপস্থাপন করেছিলেন। কুতুব মূলত আরব দেশগুলোতেই বেশি প্রভাব ফেলেছিলেন। কেননা, এসব দেশে রাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র বা ধর্মনিরপেক্ষ একনায়কতন্ত্র কোনো শাসনব্যবস্থাই জনগণের জীবনে দৃশ্যমান কোনো পরিবর্তন আনতে পারেনি। ফারসিতেও অনূদিত হয়েছিল এই গ্রন্থটি। খোমেনি যখন ঘোষণা করেন যে "ইসলাম পুরোপুরি রাজনৈতিক, রাজনীতি বাদ দিলে এর কোনো অস্তিত্ব নেই" তখন তিনি মূলত

কুতুবের ভাবধারাকেই প্রচার করেছিলেন। মুসলিম ব্রাদারহুডের অনুসারীরা দীর্ঘদিন ধরে এই একই ভাবধারা প্রচার করে আসছিল। কুতুব বিশ্বাস করতেন যে, 'ক্রুসেডার ও জায়নবাদীদের' বিরুদ্ধে সশস্ত্র জিহাদ অপরিহার্য। তার এই মতবাদ ইরানি শিয়া সংস্কৃতির আত্মত্যাগ ও শাহাদাতের ভাবনার সঙ্গে মিলে যায়। এই কারণে বিপ্লবের সময় ও পরবর্তীকালে ধর্মীয় উন্মাদনা ভয়াবহ মাত্রায় পৌঁছায়।

ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীরাও খোমেনির চৌম্বক ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হয়ে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের প্রতি তাদের দীর্ঘদিনের ঘৃণা ভুলে যান। শাহ্কে উৎখাতের লক্ষ্যে একজোট হন সবাই। ধর্মীয় উগ্রবাদীরা যা বলে তারা যে সেটাই বাস্তবায়ন করতে চায়—তা বুঝতে উদারপন্থীরা ব্যর্থ হয়েছিলেন। বিপ্লবের ইতিহাসে প্রায়ই এরকম দেখা যায়। তেহরানে অবতরণ করেই খোমেনি সোজাসাপ্টা ঘোষণা দিলেন, "এখন থেকে সরকার গঠনের দায়িত্ব পুরোপুরি আমার।" কেউ হয়তো বলতে পারত, "আপনাকে ভোট দিল কে?" কিন্তু সেই সময়টা পাওয়ার আগেই ভয়ঙ্কর দমননীতি শুরু হয়ে গেল।

খোমেনি তেহরানে ফিরে আসার মাত্র দশ দিনের মাথায় সেনাবাহিনী হাত গুটিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দেয়। ক্ষমতাসীন প্রধানমন্ত্রী শাপুর বখতিয়ার আত্মগোপনে চলে যান এবং পরে ফ্রান্সে আশ্রয় নেন। ১৯৯১ সালে সেখানেই গুপ্তহত্যার শিকার হন তিনি। সংখ্যালঘু ধর্মীয় গোষ্ঠী এবং কমিউনিস্টদের নির্মমভাবে দমন করা হয়। নির্যাতন, মৃত্যুদণ্ড ও গুমের মাধ্যমে পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয় তাদেরকে। বিপ্লব-বিরোধী যেকোনো সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া দমন করতে খোমেনি গঠন করেন 'ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস' (IRGC)। খোমেনিবিরোধীদের ভয় দেখানো ও দমন করার কাজে অল্পদিনেই পারদর্শী হয়ে ওঠে এই বাহিনীটি। পরবর্তী সময়ে এটি ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক সংগঠনে পরিণত হয়। নির্মাণ শিল্প ও অন্যান্য ব্যবসায় জড়িয়ে ব্যাপক সম্পদের মালিক হয়ে ওঠেন এর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা।

নারীদের স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়ার মরিয়া প্রচেষ্টা হিসেবে সহশিক্ষা নিষিদ্ধ করে দেয় নতুন শাসনব্যবস্থা। বিবাহের আইনি সুরক্ষাও কমিয়ে দেওয়া হয়। 'মুতাহ' বিবাহ বা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বিবাহকে রাষ্ট্রীয়ভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ইসলামি আইনের অধীনে আনা হয় বিষয়টিকে। খুব দ্রুতই ইমাম খোমেনির কট্টরপন্থী অনুসারীরা স্থানীয় পর্যায়ে 'কমিতেহ' বা "ইসলামি বিপ্লবী কমিটি" গঠন করে। শুরুতে এগুলো ছিল বেশ শক্তিশালী এবং প্রায়শই আইনের বাইরে গিয়েও

কাজ করত তারা। সাধারণ মানুষের কাছে কোমিতেহ মানে ছিল বিপ্লবের প্রহরী বাহিনী, যারা রাতের বেলা টহল দিত, চেকপোস্ট বসাত এবং সন্দেহভাজনদের আটক করত। দলবদ্ধভাবে সড়কে টহল দিয়ে নারীদের জোরপূর্বক হিজাব পরতে বাধ্য করত তারা। আইনগতভাবে ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা বজায় রাখা হলেও বাস্তবে তাদের অবস্থান সংকুচিত হয়ে পড়ে। আর বাহাই সম্প্রদায়ের ওপর নেমে আসে চরম নিষ্ঠুর নিপীড়ন। মধ্যবিত্ত উদারপন্থীদের মধ্যে যারা দেশ ছাড়ার সামর্থ্য রাখতেন, তারা দ্রুতই পালিয়ে যান অন্য কোনো দেশে। তাদের পথ ধরে দেশ ত্যাগ করে আরো কয়েক লাখ মানুষ। এর ফলে ইরান এক ভয়াবহ ব্রেন ড্রেইন-এর সম্মুখীন হয়। দেশত্যাগীদের মধ্যে ছিলেন প্রায় ৬০,০০০ ইহুদি। কারণ সদ্যোজাত এই ইসলামি প্রজাতন্ত্র দ্রুতই ইসরায়েলের সবচেয়ে কট্টর সমালোচক ওঠে এবং কট্টর ইহুদি-বিদ্বেষী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

নতুন নেতারা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মিত্র তৈরি করার কোনো আগ্রহই দেখাননি। বরং ইরানকে একঘরে রাষ্ট্রে পরিণত করেছেন তারা। অভ্যন্তরীণ দমন-পীড়নের পাশাপাশি বিদেশেও তারা রাষ্ট্রীয় মদদে সন্ত্রাসী হামলা চালানো শুরু করে। ব্রিটিশ লেখক সালমান রুশদির বই 'দ্য স্যাটানিক ভার্সেস' প্রকাশিত হওয়ার পর তাঁর বিরুদ্ধে জারি করা হয় হত্যার ফতোয়া। এই বিষয়টি ইরানের বৈশ্বিক ভাবমূর্তিকে আরো নষ্ট করে।

খোমেনির শাসনব্যবস্থার ভিত্তি ছিল তারই প্রবর্তিত 'বেলায়েত-ই ফকিহ' বা 'ধর্মীয় বিচারকের অভিভাবকত্ব'-এর ধারণা। শিয়া মতবাদের অন্তর্গত এই ধারণা অনুসারে, সবচেয়ে শিক্ষিত ধর্মীয় ব্যক্তির হাতেই রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ থাকা উচিত। এই নীতির ওপর ভিত্তি করেই খোমেনি হয়ে ওঠেন 'রাহবারে মোআজ্জামে এনকেলাবে এসলামি' বা 'ইসলামি বিপ্লবের সুপ্রিম লিডার' সংক্ষেপে 'সুপ্রিম লিডার'। এই পদটি সংবিধানের মাধ্যমে সুরক্ষিত করা হয়। তবে আয়াতুল্লাহ খোমেনি নিজেকে 'ইমাম' বলতে পছন্দ করতেন। এই নীতিতে আরো বলা হয় যে, ভবিষ্যতের নেতারা নির্বাচিত হবেন জ্যেষ্ঠ ধর্মীয় পণ্ডিতদের নিয়ে গঠিত 'অ্যাসেম্বলি অব এক্সপার্টস'-এর মাধ্যমে। এক অর্থে, নেতা নির্বাচনের এই প্রক্রিয়া রোমান ক্যাথলিক চার্চের পোপ নির্বাচনের প্রক্রিয়ার সঙ্গে বেশ খানিকটা সাদৃশ্যপূর্ণ। তবে পার্থক্য হলো, পোপ কোনো দেশের সামরিক বাহিনীর প্রধান নন। যুদ্ধ ঘোষণা করার ক্ষমতাও তার থাকে না। অন্যদিকে, ক্ষমতায় আসার এক বছরের মধ্যেই যুদ্ধ ঘোষণা করার প্রয়োজনীয়তা এসে পড়ে খোমেনির সামনে।

ইরানে শিয়া ইসলামি প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকে একাধারে হুমকি এবং সুযোগ হিসেবে দেখছিলেন প্রতিবেশী ইরাকের সেক্যুলার স্বৈরশাসক সাদ্দাম হুসেইন। কিন্তু খোমেনিকে আরব দেশগুলোতে ইসলামি বিপ্লব ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বান জানাতে দেখে ভীত হয়ে পড়েন এই একনায়ক। এর প্রতিক্রিয়ায় ইরাকের নিপীড়িত শিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠদের ওপর নতুন করে কঠোর দমন-পীড়ন শুরু করেন তিনি। এরপর চেষ্টা করেন ইরান আক্রমণের। কিন্তু আমরা এই অধ্যায়ের শুরুতেই দেখেছি, ইরানে আগ্রাসন চালানো কোনোভাবেই ভালো সিদ্ধান্ত নয়।

সাদ্দাম হুসাইন আশা করেছিলেন, ইরানের বিপ্লব-পরবর্তী বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে শাত-ইল-আরব জলপথের পূর্ব তীর এবং জাতিগত আরব-অধ্যুষিত তেলসমৃদ্ধ খুজেস্তান প্রদেশ দখল করে নিতে সক্ষম হবেন। আট বছরব্যাপী রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ কোনোভাবেই আশা করেননি তিনি। এত দীর্ঘ যুদ্ধের পরও, যুদ্ধ শেষে উভয় দেশের মধ্যকার সীমান্ত ঠিক আগের জায়গাতেই রয়ে যায়। সাদ্দাম ও তার উপদেষ্টাদের মধ্যে যুদ্ধের আগমুহূর্তে হওয়া কথোপকথনের রেকর্ডিং পরবর্তীতে ফাঁস হয়েছিল। সেই কথোপকথন থেকে জানা যায়, সাদ্দামের স্থির বিশ্বাস ছিল যে এটি একটি সংক্ষিপ্ত সংঘর্ষ হতে চলেছে। তিনি আশা করেছিলেন, ইরানিরা "আমাদের চাওয়া থেকে বেশি দূর এগোবে না। তারা কোনোভাবেই এমন জটিল কোনো পরিস্থিতি তৈরি করতে চাইবে না যা কারো জন্যই ভালো হবে না।" তার পরিকল্পনা ছিল, "শুধু সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে বোমাবর্ষণ করা হবে, যাতে তারা বাস্তবতাকে মেনে নিতে বাধ্য হয়... তবে, যদি এটি পূর্ণমাত্রার যুদ্ধে রূপ নেয়, সেক্ষেত্রে যেখানে প্রয়োজন সেখানেই অভিযান চালাব আমরা।"

শেষ পর্যন্ত এই যুদ্ধ ভয়াবহ এক হত্যাযজ্ঞে পরিণত হয়েছিল। সাদ্দাম দ্রুত জয়লাভের প্রত্যাশা করেছিলেন। কিন্তু তার ভয়াবহ ভুল হিসাবের ফলে প্রাণ হারায় এক মিলিয়নেরও বেশি মানুষ। ১৯৮০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ৬৪৪ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্তজুড়ে অগ্রসর হতে শুরু করে ইরাকি বাহিনী। প্রাথমিক কিছু সাফল্যও অর্জন করে তারা। এর মধ্যে অন্যতম ছিল খোররামশাহর দখল। সেখানে তারা প্রতিরোধকারীদের বিরুদ্ধে মাস্টার্ড গ্যাস ব্যবহার করে। তবে, আবাদানের তেলবন্দর দখল করতে তারা ব্যর্থ হয়। আক্রমণ থমকে যায় কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই। ইরাকি বাহিনী কোনো স্থানেই ১০০ কিলোমিটারের বেশি অগ্রসর হতে পারেনি। জাগ্রোস পর্বতমালায় পৌঁছানোর পর তারা মনোবল হারিয়ে ফেলে। কয়েক মাসের মধ্যেই পাল্টা ইরানি আক্রমণের মুখে পড়ে সীমান্ত পেরিয়ে পিছু

হটতে বাধ্য হয় ইরাকি সেনারা। উভয় দেশের রাজধানী শহরই বিমান হামলার শিকার হয়। পরবর্তী সময়ে ইরানি বাহিনী ইরাকে প্রবেশ করে কারবালার মতো শিয়া সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলো দখলের চেষ্টা চালায়। কিন্তু ১৯৮৮ সালে পাল্টা ইরাকি আক্রমণ ইরানের অগ্রযাত্রা রুখে দেয়। নিজ দেশের ক্লান্ত ও বিপর্যস্ত পরিস্থিতি উপলব্ধি করে জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় যুদ্ধবিরতির শর্ত মেনে নিতে বাধ্য হন খোমেনি। শেষ পর্যন্ত উভয় পক্ষই যুদ্ধ শুরুর আগের সীমান্ত রেখায় ফিরে যায়।

সুপ্রিম লিডার খোমেনি এর পরের বছরই মৃত্যুবরণ করেন। তার পদে অধিষ্ঠিত হন আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি। এরপর অর্থনৈতিকভাবে কিছুটা অগ্রগতি হলেও সমাজের ওপর ধর্মীয় নেতারা কঠোর নিয়ন্ত্রণ ঠিকই বজায় রাখে। বিপ্লবের প্রভাব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য তারা ছিল বদ্ধপরিকর। রাজনৈতিক ব্যবস্থা পুরোপুরি তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। মজলিসের (পার্লামেন্ট) নির্বাচনে দাঁড়াতে চাইলে বারো সদস্যবিশিষ্ট অভিভাবক পরিষদের অনুমোদন পেতে হয়। আর এই অভিভাবক পরিষদের অর্ধেক সদস্যকে নিয়োগ দেন সুপ্রিম লিডার স্বয়ং। মজলিসে প্রতিনিধিত্বকারী দলগুলোর নাম দেখলেই বোঝা যায়, নির্বাচন করার সুযোগ কারা পায়। যেমন, মিলিট্যান্ট ক্লারিকস সোসাইটি (যোদ্ধা ধর্মগুরুদের সমাজ) বা সোসাইটি অব পাথসিকারস অব দি ইসলামিক রেভল্যুশন (ইসলামি বিপ্লবের পথ অনুসারীদের সমাজ)। এইসব দলের মাঝে 'পারভেসিভ কোয়ালিশন অব রিফর্মিস্টস' (ব্যাপক সংস্কারবাদী জোট) যে তাদের অবস্থান খুঁজে পেতে সমস্যায় পড়বে, তা অনুমান করা খুব একটা কঠিন নয়। কারণ, মজলিস কোনো আইন পাস করতে চাইলেও অভিভাবক পরিষদের অনুমোদন প্রয়োজন হয়।

এই অবস্থার মধ্যে ১৯৯৭ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অপেক্ষাকৃত উদারপন্থী ধর্মীয় পণ্ডিত মোহাম্মদ খাতামি ভূমিধস জয়লাভ করলে কট্টরপন্থীরা হতভম্ব হয়ে যায়। তবে, তার শাসনামলে প্রস্তাবিত আইনগুলোর এক-তৃতীয়াংশই ধর্মীয় নেতারা বাতিল করে দিয়েছিলেন। প্রস্তাবনাগুলোর অধিকাংশই ছিল উদারপন্থী সংস্কারের উদ্যোগ। একই সময়ে, 'বিপ্লব বিরোধীদের' নির্মূল করতে অতিরক্ষণশীলরা বেছে নেয় সন্ত্রাসের পথ। উদারপন্থী সংবাদমাধ্যমগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং কারারুদ্ধ করা হয় সাংবাদিকদের। সংস্কারপন্থী বুদ্ধিজীবীদের অনেককেই হত্যা করা হয়। আর শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করলে তাদের মারধর করে হোস্টেলে ঢুকিয়ে আবারো পেটানো হয়।

পরবর্তী এক দশকে ইরানের অর্থনীতি দুর্বলই থেকে যায়। ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলো সমাজের ওপর তাদের কঠোর বিশ্বাস চাপিয়ে যেতে থাকে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইরানের আগ্রাসী নীতির ফলে দেশটি আরো একঘরে হয়ে পড়ে। ২০০৫ সালে সংস্কারপন্থী খাতামি ক্ষমতা হারান, আর তার জায়গায় আসেন প্রাক্তন রেভল্যুশনারি গার্ড মাহমুদ আহমাদিনেজাদ। তবে ২০০৯ সালের নির্বাচনের সময় মির হোসেইন মুসাভি নামে আরেকজন সংস্কারবাদী নেতা উঠে আসেন। সেই নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক ভোটার অংশ নেয়, কিন্তু ভোটে কারচুপির অভিযোগ ছড়িয়ে পড়ে চারিদিকে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে মুসাভি ঘোষণা দেন যে, তিনিই জয়ী হয়েছেন। তবে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম তার বক্তব্য খণ্ডন করে জানিয়ে দেয় যে জয়ী হয়েছেন আহমাদিনেজাদ। এর পরপরই ক্ষুব্ধ জনতা রাস্তায় নেমে আসে এবং সহিংস বিক্ষোভের কারণে দেশজুড়ে অস্থিরতা ছড়িয়ে পড়ে।

সেই নির্বাচনের খবর সংগ্রহের জন্য আমি সৌভাগ্যক্রমে ইরানের সাংবাদিক ভিসা পেয়েছিলাম। এই ধরনের ভিসা অত্যন্ত বিরল। নির্বাচনের পরের দিন এক ইরানি সহকর্মীর সঙ্গে তেহরানের রাস্তায় ঘুরছিলাম আমি। হাঁটতে হাঁটতে লক্ষ করলাম, পথচারীরা নিচু স্বরে কিছু একটা বলছে। বিষয়টি নিয়ে কৌতূহল জাগল। আমি সহকর্মীকে জিজ্ঞেস করলাম, "কি বলছে ওরা?" তিনি ব্যাখ্যা করলেন যে, তারা নির্দিষ্ট একটি রাস্তার নাম এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের কথা বলছে। উল্লিখিত সময়ে সেই রাস্তায় গিয়ে আমি দেখলাম, প্রথমে কয়েক ডজন মানুষ জড়ো হলো, তারপর শত শত! ধীরে ধীরে তাদের সাহস বাড়তে শুরু করল এবং সরকারবিরোধী স্লোগান উঠল। খুব দ্রুতই আরো কয়েক হাজার বিক্ষোভকারী এসে জমায়েত হলো সেখানে। এরপরই পৌঁছে গেল দাঙ্গা পুলিশ এবং বাসিজ মিলিশিয়ার গুন্ডারা। প্রথমে ছোটখাটো ধাক্কাধাক্কি শুরু হলেও দ্রুতই তা সংঘর্ষে রূপ নিল। উভয় পক্ষ থেকেই বোতল ও পাথর ছোঁড়া শুরু হলো। মুহূর্তের মধ্যেই রাস্তা যেন পরিণত হলো একটা যুদ্ধক্ষেত্রে।

বিক্ষোভ দমন করতে বেশ কার্যকর একটি কৌশল গ্রহণ করেছিল দাঙ্গা পুলিশ। তারা মোটরবাইক দল নামিয়েছিল। প্রতিটি বাইকে থাকত দুজন করে, পেছনের যাত্রীর হাতে থাকত একটি বড় লাঠি। এই মোটরবাইক দল বিক্ষোভকারীদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লে মুহূর্তের মধ্যে ভিড় ছত্রভঙ্গ হয়ে যেত। ফোন মারফত সরাসরি সংবাদ পাঠাতে পাঠাতে আমি বুঝতেই পারিনি যে কখন আমি দাঙ্গার দুই পক্ষের মাঝখানে পড়ে গেছি। কয়েকটি মোটরবাইক সামনে এসে

আরেকটি হামলার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল। আমি দ্রুত ফুটপাথে উঠে গেলাম, কিন্তু দেখলাম একটি মোটরবাইকও আমার পেছন পেছন উঠে আসছে! পালানোর কোনো উপায় ছিল না। পুলিশ অফিসারটি লাঠি উঁচিয়ে ধরতেই আমি দুইহাত তুলে আত্মসমর্পণের ভঙ্গি করলাম। লাঠিটি আমার মাথায় নামতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ করেই সে থেমে গেল। সম্ভবত সে বুঝতে পেরেছিল যে আমি একজন বিদেশি, হয়তো দুর্ঘটনাবশত এই বিশৃঙ্খলার মাঝে পড়ে গেছি। আমি প্রথমবারের মতো কৃতজ্ঞ বোধ করলাম যে আমার শরীরে এত ফ্রেকলস (মেছতা) আছে! বাইকটি আমাকে পাশ কাটিয়ে অন্যদিকে গেল। সাথে সাথেই অফিসারটি নির্মমভাবে অন্যদের পেটাতে লাগল। তাদের শরীরে আমার মতো ফ্রেকলস ছিল না। তারপর তারা ফিরে গেল পুলিশের সারিতে।

বিক্ষোভকারীরা শাসকগোষ্ঠীর প্রতীকগুলোর ওপর আক্রমণ শুরু করতেই আমি দ্রুত ভিড়ের মধ্যে লুকানোর চেষ্টা করলাম। তাদের অন্যতম লক্ষ্য ছিল 'ব্যাংক অব ইরান'-এর একটি ভবন। ভবনের জানালাগুলো একের পর এক ভেঙে ফেলছিল তারা। ঘটনাচক্রে আবারও আমি নিজেকে আবিষ্কার করলাম বিক্ষোভকারীদের সামনের সারিতে। আর তখনই পুলিশ আরেক দফা আক্রমণ শুরু করল। আমি ঘুরে দৌড় দিতে গেলাম, কিন্তু ঠিক তখনই নিরাপত্তা বাহিনীর ছোড়া একটি বড় পাথর এসে লাগল আমার পিঠে। আঘাতটা এতটাই শক্তিশালী ছিল যে আমি ছিটকে গিয়ে পড়লাম শহরের মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া সরু খালের মধ্যে। পড়ে যাওয়ার সময় আমার একটা পায়ের পুরো অংশ ছড়ে গেল। কয়েকজন বিক্ষোভকারী খাল থেকে টেনে তুলল আমাকে। কোনোমতে টলতে টলতে পাশের গলির দিকে এগিয়ে গেলাম আমি। সিদ্ধান্ত নিলাম—আজকের মতো সরাসরি প্রতিবেদনের এখানেই ইতি! মনে মনে ভাবলাম, এরপরে আর কোনোদিন পুলিশের সামনে পিঠ দেখিয়ে দাঁড়াব না। এর ঠিক পাঁচ বছর পরে কায়রোতে আবারও পুলিশের হাতে পড়লাম। তবে সেবার খুব সামান্য আহত হয়েছিলাম। একজন পুলিশ আমার পিঠে ছররা গুলি ছুড়েছিল। কিন্তু, সে আরেক গল্প!

ইরানের এই বিক্ষোভ বেশ কয়েকদিন ধরে চলতে থাকে। নিহত হয় বহু মানুষ। তবে শাসকগোষ্ঠীর দমন-পীড়ন এতটাই শক্তিশালী ছিল যে, আহমাদিনেজাদ সহজেই দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় থাকতে সক্ষম হন। কিন্তু বিদ্যমান অসন্তোষ মেটানো যায়নি, বরং প্রতি বছর তা আরো প্রকট হতে থাকে। বিশেষ করে তরুণদের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অসন্তোষের মাত্রাও বাড়তে থাকে। এই

তরুণদের অনেকেই বেড়ে উঠেছিল পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা নিয়ে। এর প্রতিফলন দেখা যায় ২০১৩ সালের নির্বাচনে। এই নির্বাচনে মধ্যপন্থী ধর্মগুরু হাসান রুহানি এমন বড় ব্যবধানে জয়ী হন যে, শাসকগোষ্ঠীর পক্ষে আর তা পরিবর্তন করা সম্ভব হয়নি।

সবাই উদারনৈতিক ইরানের স্বপ্ন দেখছিল বলেই যে এমন ঘটেছে, ব্যাপারটা মোটেই তা নয়। উদারনৈতিকতার আকাঙ্ক্ষা স্রেফ একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। বাস্তবতা হলো, 'ইটস দ্য ইকোনমি, স্টুপিড'—এই কথাটি শুধু ইংরেজিতেই নয়, ফারসিসহ বহু ভাষাতেই অর্থবহ। ২০১৩ সালের ভোট আসলে ছিল আহমাদিনেজাদের শাসনামলে চরমে পৌঁছে যাওয়া অর্থনৈতিক দুর্দশার বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ। তার নীতির ফলে ইরানের আন্তর্জাতিক বিচ্ছিন্নতা বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি অর্থনীতি আরো সংকুচিত হয়ে পড়েছিল।

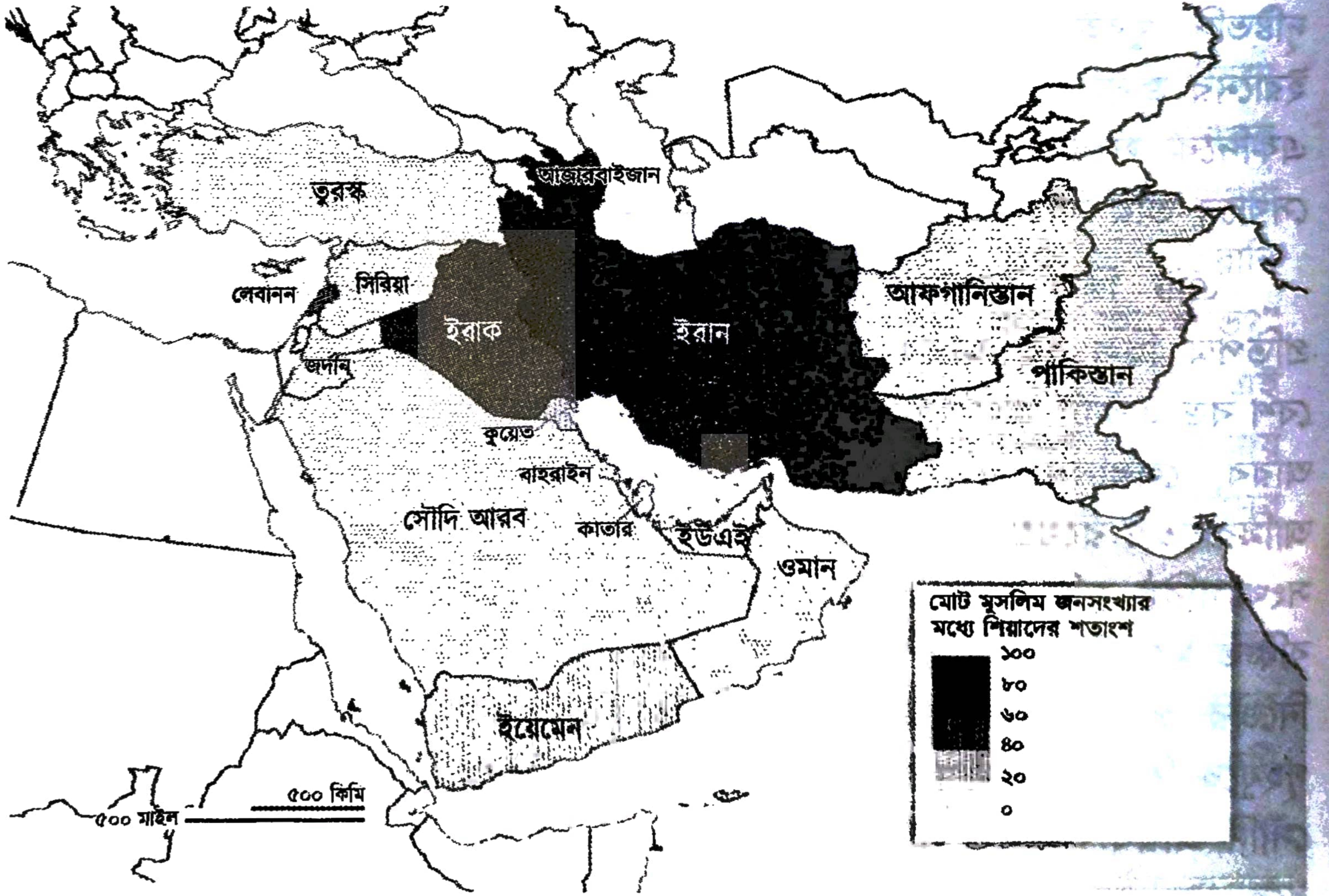
হাসান রুহানি ২০১৭ সালে পুনরায় জয়ী হন। কিন্তু ২০২০ সালের নির্বাচনে ভোটের মাসখানেক আগেই নির্বাচনী ফলাফল নিশ্চিত হয়ে যায়। অভিভাবক পরিষদ তাদের শক্তি প্রদর্শন করে প্রায় ৭,০০০ প্রার্থীকে নির্বাচনের অযোগ্য ঘোষণা করে। এর মধ্যে নব্বই জন ছিলেন চলতি মজলিশের সদস্য। লক্ষ লক্ষ ইরানি তখন নিজেদেরকে প্রশ্ন করতে শুরু করে যে, "এত কিছু করে কী লাভ?" নির্বাচনের দিন তারা ভোট না দিয়ে বাড়িতে বসে ছিল। ১৯৭৯ সালের পর এই নির্বাচনেই সর্বনিম্ন ভোটের হার দেখা যায়। ফলে রক্ষণশীল উগ্রপন্থীরা বিশাল জয় লাভ করে। এই বার্তা ছিল স্পষ্ট—যেভাবেই হোক, আয়াতুল্লাহরা এবং তাদের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড ক্ষমতা ধরে রাখবেই।

এভাবেই প্রায় আমরা এসে পৌঁছেছি বর্তমান সময়ে। ইরানের নেতৃত্ব তাদের দেশটিকে দেখে একঘরে, শত্রু পরিবেষ্টিত এক রাষ্ট্র হিসেবে। তাদের এই চিন্তাকে অবশ্য খুব একটা ভুলও বলা যায় না। দেশটির অনেক নেতা বলেন, ইরান একটি 'সুন্নি বৃত্ত' দ্বারা ঘেরাও হয়ে আছে। তাদের বক্তব্য হলো, সৌদি আরবসহ অন্যান্য সুন্নি দেশ মার্কিন সমর্থনপুষ্ট হয়ে ভেতর ও বাইরে থেকে ইরানকে দুর্বল করার চেষ্টা করছে। এই যুক্তির কিছু বাস্তব ভিত্তিও রয়েছে। আর সেই কারণেই অ্যামেরিকানরা যখন ২০০৩ সালে ইরাকে আগ্রাসন চালায়, আয়াতুল্লাহ এবং রেভল্যুশনারি গার্ডের কমান্ডাররা তখন নিজেদের ভাগ্যকে বিশ্বাসই করতে পারেনি। তখন অ্যামেরিকানরা নিজেদের অজান্তেই তেহরানের ঐতিহাসিক পারস্যের স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে ফেলে। কার্যত ইরানের পশ্চিম সীমান্তকে সুরক্ষিত করে দেয় তারা।

অ্যামেরিকানরা হামলা চালিয়ে ইরাকের সেই সুন্নি সরকারকেই উৎখাত করে, যারা একসময় ইরান আক্রমণ করেছিল। বুশ প্রশাসন ভেবেছিল ইরাকে গণতন্ত্র বিকশিত হবে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, রাজনীতির নিয়ন্ত্রণ চলে গেছে ইরাকের সংখ্যাগরিষ্ঠ শিয়া জনগোষ্ঠীর হাতে। কলকাঠি নেড়ে দেশটির নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে নিয়ে নেয় শিয়া নেতারা। আর ইরান এই পুরো প্রক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সহায়তা করেছে। মার্কিন আগ্রাসনের পর ইরাকে যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়েছিল, সেখানে বিভিন্ন শিয়া মিলিশিয়াদের সহায়তায় সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল ইরান। রাস্তার পাশে পেতে রাখা যে বোমাগুলো বহু মার্কিন ও ব্রিটিশ সেনার প্রাণ কেড়ে নিয়েছে, সেগুলোর একটা অংশ তৈরি হতো ইরানে। শিয়া মিলিশিয়াদের অর্থ, অস্ত্র এবং সামরিক প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো তেহরান থেকে। বর্তমান ইরাক ইরানের অনুগত রাষ্ট্র হয়ে ওঠেনি বটে, তবে পূর্ব দিকের প্রতিবেশীর প্রতি তাদের দৃষ্টিভঙ্গি খুবই সহানুভূতিশীল। আর এর ফলে মেসোপটেমিয়ার সমতলভূমি ইরানের জন্য আবারও একটি বাফার জোনে পরিণত হয়েছে। এই বাফার জোন একদিকে সম্ভাব্য শত্রুদের দূরে রাখতে সহায়তা করছে এবং প্রয়োজনে ইরান সেখানে তার শক্তি প্রক্ষেপ করতেও সক্ষম হচ্ছে।

এটি ছিল ইরানের চলমান লড়াইয়ের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এখানে প্রতিপক্ষ ছিল বহু আরব রাষ্ট্র। ইতিহাসের ওঠানামার ফলে অনেক আরব রাষ্ট্রের বেশ বড় একটা অংশেই শিয়া সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী রয়ে গেছে—বিশেষ করে সৌদি আরব, লেবানন ও ইয়েমেনে। এছাড়াও সিরিয়া, কুয়েত ও সংযুক্ত আরব আমিরাতেও রয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিয়া সম্প্রদায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সুন্নি জনগোষ্ঠীর তুলনায় পিছিয়ে আছে এবং অনেকেই নিজেদেরকে বঞ্চিত মনে করে। এই অসন্তোষকে কাজে লাগিয়ে ইরান বরাবরই পুরো অঞ্চলে নিজের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধে শিয়া হুথি বিদ্রোহীদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে ইরান। হুথিরা লড়াই করছে সৌদি আরব সমর্থিত সুন্নি বাহিনীর বিরুদ্ধে। একইভাবে, তেহরান গত বিশ বছর ধরে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত একটি করিডোর তৈরি করে সেটা ধরে রাখার চেষ্টা করেছে। এই করিডোর ইরানকে একদিকে ভূমধ্যসাগরে প্রবেশাধিকার দিয়েছে, অন্যদিকে দিয়েছে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে তার তুরুপের তাস হিজবুল্লাহকে রসদ সরবরাহ চালু রাখার সুযোগ। ইরান থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত সরলরেখা টানলে প্রথমে আসে ইরাক, এর পরে সিরিয়া, আর সিরিয়া পার হলেই রয়েছে ছোট্ট রাষ্ট্র লেবানন। বাগদাদে এখন রয়েছে শিয়া-নিয়ন্ত্রিত সরকার। আর সিরিয়ায় আসাদ

সরকারকে ইরানই নিয়ন্ত্রণ করত। আসাদ আলাওইত সম্প্রদায়ের সদস্য। এটি শিয়া ইসলামের একটি শাখা। এই শিয়া করিডোর খোলা রাখার জন্যই সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে আসাদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়েছে ইরান। এদিকে লেবাননের জাতীয় সেনাবাহিনীকে স্রেফ একটি প্রতীকী বাহিনী বললে অত্যুক্তি হবে না। এই দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক বাহিনী হলো ইরান-অর্থায়নে পরিচালিত হিজবুল্লাহ মিলিশিয়া। বেকা উপত্যকা, দক্ষিণ বৈরুত এবং লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলের বেশিরভাগ অংশ হিজবুল্লাহর নিয়ন্ত্রণাধীন। আর দক্ষিণ লেবাননের সঙ্গে ইসরায়েলের সীমান্ত আছে। এই সামরিক মিত্রতা বা কৌশলগত মিত্রতার পদ্ধতি ব্যবহার করেই মেসোপটেমিয়া ও লেভান্ত অঞ্চলে নিজের শক্তি প্রয়োগ করছে ইরান। আগের শতাব্দীগুলোতেও পারসিক শাসকেরা একই কাজ করেছেন।



চিত্র: চারপাশ থেকে ইরানকে যেসব রাষ্ট্র ঘিরে রেখেছে তাদের মধ্যে একমাত্র ইরাক আর আজারবাইজান ছাড়া বাকি সকল মুসলিমপ্রধান রাষ্ট্রেই সুন্নিরা সংখ্যাগুরু। অন্যদিকে ইরান মূলত শিয়া মতাবলম্বী। তাই ইরান নিজের প্রয়োজনেই মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সংখ্যালঘু শিয়াদের সঙ্গে মিত্রতা বজায় রাখে।

সুন্নি-নেতৃত্বাধীন রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে নিত্য সংঘাতে লিপ্ত থাকলেও যে দেশটির প্রতি ইরানের ঘৃণা সবচেয়ে বেশি, সেটি হলো ইসরায়েল। ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের আগে ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে সম্পর্ক মোটামুটি ভালো ছিল। ইহুদি-বিরোধী মনোভাবের জন্য সে সময় ইরানের তেমন পরিচিতি ছিল না। কিন্তু বিপ্লবের পর থেকে ইসরায়েল রাষ্ট্র তো বটেই, সার্বিকভাবে ইহুদিদের বিরুদ্ধেই ঘৃণার প্রচারণা চালিয়ে আসছে দেশটি। ইরানের প্রচারমাধ্যমে নিয়মিত শোনা যায় যে সবখানে সবকিছুতে 'জায়নবাদীদের' ষড়যন্ত্র লুকিয়ে আছে। দেশটির মূলধারার সংবাদমাধ্যমগুলো প্রায়ই নাৎসি জার্মানির প্রচারিত ইহুদি-বিদ্বেষী ব্যঙ্গচিত্রের আদলে কার্টুন প্রকাশ করে। তারা বিশ্বনেতাদের পোশাকে স্টার অব ডেভিড এঁকে ইঙ্গিত দেয় যে তারা ইহুদিদের অধীনে কাজ করছে। তেহরান শুধু কূটনৈতিক প্রচারণা বা ঘৃণাসূচক বক্তব্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, ইহুদিদের হত্যার জন্য বিভিন্ন দেশে গুপ্তঘাতক দলও পাঠিয়েছে তারা। আর্জেন্টিনা, বুলগেরিয়া, থাইল্যান্ড, ভারত, কেনিয়া ও আরো অনেক দেশে এমন হামলা পরিচালিত হয়েছে। সবচেয়ে ভয়াবহ হামলাটি ঘটেছিল ১৯৯৪ সালে। এই সময় আর্জেন্টিনার একটি ইহুদি কমিউনিটি সেন্টারে বোমা হামলা চালিয়ে ৮৭ জনকে হত্যা করা হয়।

ইসরায়েল ও ইহুদিদের দোষারোপ করা ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের শাসকদের জন্য বেশ সুবিধাজনক। এতে তারা নিজেদের ব্যর্থতা থেকে জনগণের মনোযোগ সরিয়ে রাখতে পারে। তবে ইহুদিদের প্রতি এই বিদ্বেষ শুধুই রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য নয়। বরং এটি তাদের বিশ্বাসের গভীরেও প্রোথিত রয়েছে। ১৯৬০-এর দশকেই আয়াতুল্লাহ খোমেনি ইহুদিদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার শুরু করেন। তিনি সে সময় ইহুদিদেরকে 'অপবিত্র জীব' বলে অভিহিত করতেন। তিনি বলেছিলেন, "ইহুদিদের চেহারায় দারিদ্র্য, অভাব, ভিক্ষাবৃত্তি, ক্ষুধা ও দুর্দশার ছাপ স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে... এটি আসলে তাদের আত্মিক দারিদ্র্য ও নৈতিক পতনের প্রতিফলন।" এমনকি ইরানি জনগণের কাছে শাহ্‌কে ইহুদি হিসেবে উল্লেখ করে পরিতৃপ্তি নিতেন তিনি। তার উত্তরসূরি, বর্তমান সুপ্রিম লিডার আয়াতুল্লাহ আলি খামেনি, আরো এক ধাপ এগিয়ে মন্তব্য করেছেন, "ইসরায়েল হলো ক্যানসারের মতো ক্ষতিকারক একটি টিউমার। এই জিনিস শিকড় থেকে উপড়ে ফেলা দরকার।" এই ধরনের বক্তব্যকে কেবলমাত্র রাজনৈতিক বিদ্বেষ বলা যায় না। এই ধরণের গভীর ঘৃণা এক ধরণের বিকারগ্রস্ততা, যা অত্যন্ত বিপজ্জনক। সবথেকে উদ্বেগজনক হলো ইসলামি বিপ্লব শুধু ইরানের শিয়াদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নেই। তাদের এই ভাবধারা সুন্নি আরব বিশ্বের চরমপন্থীদেরকেও উৎসাহিত করছে।

ধর্মীয় উগ্রবাদ ও সহিংসতার মাধ্যমে কীভাবে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা সম্ভব সে ব্যাপারে ইরান তাদের কাছে উদাহরণ হয়ে উঠেছে।

ইরানের নেতাদের দৃষ্টিতে যুক্তরাষ্ট্র প্রায় সবসময়ই ইসরায়েলের সঙ্গে যুক্ত এবং দেশটি আসলে ইসরায়েলের হাতের পুতুল। ইরানের কট্টরপন্থীরা বিশ্বাস করে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুসলিম বিশ্বে তাদের 'শয়তানসুলভ' দখলদারিত্ব বজায় রেখে মুসলিমদের সম্পদ লুট করছে। পাশাপাশি তারা রক্ষা করছে 'বদমায়েশ জায়নিস্টদের', যারা ইরানের বিরুদ্ধে প্রতিটি ষড়যন্ত্রের মূল হোতা। অ্যামেরিকাকে ইরানের নেতারা বলে 'মহা ইবলিশ' আর ইসরায়েলকে বলে 'ছোট ইবলিশ'। ২০০১ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশও ইরানকে একটি বিশেষ তকমা দেন। তিনি দেশটিকে 'শয়তানের অক্ষশক্তি'র অংশ বলে অভিহিত করেন এবং দাবি করেন যে, ইরানের পারমাণবিক শক্তি উন্নয়নের আড়ালে আসলে পরমাণু অস্ত্র তৈরি করা হচ্ছে। ততদিনে তেহরান ৫,০০০ কিলোমিটারের বেশি দূরত্বে আঘাত হানতে সক্ষম দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাণ করে ফেলেছে। এই ক্ষেপণাস্ত্রে পারমাণবিক ওয়ারহেড সংযুক্ত করা সম্ভব—এই আশঙ্কা ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লার মধ্যে থাকা মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উদ্বেগ বাড়িয়ে তোলে।

২০০২ সালে এক ইরানি ভিন্নমতাবলম্বী গোষ্ঠী প্রকাশ করে যে, তেহরান একটি ইউরেনিয়াম শোধন কেন্দ্র এবং একটি ভারী-পানি প্রকল্প নির্মাণ করছে। পরিশোধিত ইউরেনিয়াম এবং ভারী-পানি এই দুইটি জিনিসই পারমাণবিক অস্ত্র তৈরিতে কাজে লাগানো যায়। ইরান সরকার ওই সময় জোর দিয়ে বলে যে, তাদের পারমাণবিক কর্মসূচি শুধু শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে পরিচালিত হচ্ছে। তবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বেশিরভাগ দেশই এই দাবিতে সন্তুষ্ট হয়নি। বিশেষ করে, আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থার (IAEA) একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল যে, ইরানের ইউরেনিয়াম শোধন প্রক্রিয়া অস্ত্র উৎপাদনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। এরপরই জাতিসংঘ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে একের পর এক নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। এসব নিষেধাজ্ঞা দেশটির তেল ও গ্যাস উৎপাদন এবং রপ্তানির সক্ষমতাকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে।

রুহানি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পরে ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি নিয়ে এক ধরনের আন্তর্জাতিক সমঝোতায় আসার চেষ্টা করেছিলেন। যার ফলে ২০১৫ সালে বিশ্বনেতাদের সঙ্গে একটি ঐতিহাসিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এমনকি তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার সঙ্গেও সরাসরি যোগাযোগ করেন

তিনি। এটি ছিল প্রায় চল্লিশ বছর পর দুই দেশের রাজনৈতিক নেতৃত্বের মধ্যে প্রথম সরাসরি সংলাপ। তবে এই পদক্ষেপ ইসলামি বিপ্লবের কট্টরপন্থী নেতাদের মোটেও সন্তুষ্ট করতে পারেনি। ১৯৮০ সালেই যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক বিছিন্ন হয়ে গিয়েছিল এবং আজও তা পুনঃস্থাপিত হয়নি। এই শীতল সম্পর্কের পেছনে মূল কারণ ছিল ১৯৭৯ সালের নভেম্বর মাসে তেহরানে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসে জঙ্গি হামলা। একদল উত্তেজিত জনতা দূতাবাসে হামলা চালিয়ে পঞ্চাশ জনেরও বেশি অ্যামেরিকানকে জিম্মি করে। এই জিম্মি সংকট চলতে থাকে পরবর্তী ৪৪৪ দিন ধরে। এই দীর্ঘমেয়াদি সংকট তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের প্রশাসনের ওপর এক বিশাল চাপ সৃষ্টি করেছিল। এর প্রভাব এতটাই গভীর ছিল যে, এর ফল হিসেবে ১৯৮০ সালের নির্বাচনে রোনাল্ড রিগানের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পথ অনেকটাই সুগম হয়ে যায়।

ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে উত্তেজনা চলমান থাকলেও ইরাক ও সিরিয়ায় আইএসের উত্থান শুরু হওয়ার পরে একটি অস্থায়ী সমঝোতা ঘটেছিল। ২০১৫ সালের পারমাণবিক চুক্তি ছিল এরই ফল। সে সময় তেহরান বুঝতে পেরেছিল যে, যদি আইএস আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে সেক্ষেত্রে মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের প্রভাব হুমকির মুখে পড়তে পারে। আইএস ইরাকের শিয়া সরকার বা সিরিয়ার আসাদ সরকারকে পরাজিত করলে ভূমধ্যসাগর বরাবর ইরানের করিডোর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেত। অন্যদিকে, আফগানিস্তান ও ইরাকের যুদ্ধে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি স্বীকারের পরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আইএসের বিরুদ্ধে ইরানকে কিছুটা যুদ্ধ করার সুযোগ দেয়। আসলে প্রেসিডেন্ট ওবামা তার পররাষ্ট্রনীতিতে একটি সাফল্য অর্জনের জন্য মরিয়া ছিলেন। আর এই চুক্তি ছিল তার জন্য একটি বড় কূটনৈতিক বিজয়ের সম্ভাবনা। তেহরানও জানত যে, পারমাণবিক চুক্তিতে রাজি হলে তা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এক ধরনের সহযোগিতার পথ খুলে দেবে। এই কারণে চুক্তির শর্ত অনুযায়ী উচ্চমাত্রায় শোধিত ইউরেনিয়ামের ৯৮ শতাংশ পর্যন্ত পরিত্যাগ করতে সম্মত হয় তারা। এটি ছিল একটি স্বল্পমেয়াদি সমঝোতা। বিভিন্ন বিষয়ে গভীর মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও উভয় পক্ষই অস্থায়ীভাবে পারস্পরিক স্বার্থ রক্ষা করেছিল।

আইএস দুর্বল হয়ে পড়তে না পড়তেই নতুন করে উত্তেজনা বাড়তে থাকে। বিশেষ করে ২০১৭ সালে ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর রীতিমতো যুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দেয়। তিনি যুক্তরাষ্ট্রকে পারমাণবিক চুক্তি থেকে সরিয়ে নেন। পুনরায় নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেন ইরানের ওপর। পাশাপাশি ইউরোপীয় কোম্পানিগুলোর

ওপর চাপ সৃষ্টি করে ইরানের সঙ্গে চুক্তি করতে নিরুৎসাহিত করেন। এরপর কয়েকটি ঘটনা উত্তেজনা আরো বাড়িয়ে তোলে। হরমুজ প্রণালির কাছে দুইটি তেল ট্যাঙ্কারে বিস্ফোরণ ঘটে এবং সন্দেহের তীর যায় তেহরানের দিকে। যদিও কে দায়ী তার নির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ ছিল না। ইরানও কূটনীতির ভাষায় 'বিশ্বাসযোগ্য অস্বীকৃতি' দেখাতে সক্ষম হয়। অর্থাৎ, বাস্তব প্রমাণের অভাবে ইরান নির্দ্বিধায় অভিযোগ অস্বীকার করে। হরমুজ প্রণালিতে কেউই যুদ্ধ চায়নি, তাই কোনো পাল্টা সামরিক পদক্ষেপও নেওয়া হয়নি। এর কয়েক দিন পরে একই ধরনের ঘটনা ঘটে সৌদি আরবের এক তেল শোধনাগারে। এবার চালানো হয় ক্ষেপণাস্ত্র হামলা। ইয়েমেনের হুথি বিদ্রোহীরা দাবি করেছিল এই হামলা তারা চালিয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন সূত্রে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এর পেছনে ইরানের হাত থাকার সম্ভাবনাই বেশি। সব মিলে মনে হচ্ছিল, ইরান আসলে যুক্তরাষ্ট্রের সহনশীলতার মাত্রা যাচাই করছে। ২০১৯ সালে তারা প্রায় মাত্রা ছাড়িয়ে যায়। একটি মার্কিন স্পাই ড্রোন ভূপাতিত করে ইরান। এর তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বিমান হামলার প্রস্তুতি নিলেও শেষ মুহূর্তে তা বাতিল করে যুক্তরাষ্ট্র। এর অবশ্য কারণও ছিল। ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর বিভিন্ন বিশ্লেষক নানারকমের দাবি করেছিলেন। যেমন, তিনি কখনো প্রেসিডেন্ট হতে চাননি, কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি পদত্যাগ করবেন, দুই বছরের মধ্যে অভিশংসনের মাধ্যমে ক্ষমতাচ্যুত হবেন, কিংবা তিনি যুদ্ধ শুরু করবেন ইত্যাদি। এসব দাবির বেশিরভাগই বাস্তবতার সঙ্গে মেলেনি। তাছাড়া প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তখন আর মাত্র এক বছর বাকি। এই সময় এটি আশা করা একটু বেশিই বাড়াবাড়ি ছিল যে ট্রাম্প ইচ্ছাকৃতভাবে এমন একটি যুদ্ধ শুরু করবেন যা বৈশ্বিক মন্দার কারণ হতে পারে।

তবে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধ না বাঁধার এটিই একমাত্র কারণ নয়। ইরাক আর আফগানিস্তানে পরপর পরাজয়ের ফলে মার্কিন জনতা ততদিনে যুদ্ধ অভিযানের বিরুদ্ধে প্রবল সোচ্চার হয়ে উঠেছে। এসব ইরান ভালো করেই জানত। তাই তারা মনে করছিল, 'অযৌক্তিক অ্যামেরিকান আগ্রাসনের বিরুদ্ধে' তাদের দৃষ্টিতে একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত প্রতিরোধ করা সম্ভব। তেহরান বুঝে গেছে, উত্তেজনা বৃদ্ধি পেলে ইরান বিমান হামলার শিকার হতে পারে বটে, তবে যুক্তরাষ্ট্র ইরাক থেকে জাগ্রোস পর্বতমালার দিকে আগ্রাসন চালাবে না। উপসাগর থেকেও সৈন্য অবতরণ করাবে না মার্কিনিরা। ইরানের সেনাবাহিনী হয়তো আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত নয়, তবে তারা বিশাল জনবলকে ঠিকই কাজে লাগাতে পারবে। দেশটিতে কয়েক মিলিয়ন মানুষ বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে। সক্রিয়

সামরিক বাহিনীতে রয়েছে প্রায় ৬ লাখ সৈন্য। এর মধ্যে বিপ্লবী গার্ড বাহিনীতেই রয়েছে ১ লাখ ৯০ হাজার সদস্য।

তবুও, এসব প্রস্তুতি বা সামরিক সক্ষমতাও ইরানের ওপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞার প্রভাবকে পাল্টে দিতে পারেনি। দেশটির অর্থনীতি গুরুতরভাবে ধ্বসে পড়েছে। বেড়ে গেছে বেকারত্ব ও মুদ্রাস্ফীতি। ২০১৯ সালের শেষের দিকে শীত ঘনিয়ে এলে সরকার জ্বালানির দাম বাড়িয়েছিল। এই মূল্য বৃদ্ধির ফলে শুরু হয় দেশজুড়ে ব্যাপক গণবিক্ষোভ। এর আগের প্রতিবাদ দেখে রাষ্ট্রযন্ত্র বিস্মিত হয়েছিল; এবার তারা হতবাক এবং উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল। তাদের উদ্বেগের সবচেয়ে বড় কারণ ছিল বিক্ষোভকারীদের ধরন। আগেরবারের মতো এবারে আর বিপ্লব শুধু শিক্ষার্থী বা উদারপন্থী শ্রেণীর মধ্যেই সীমিত ছিল না; বরং ১৯৭৯-এর বিপ্লবের মেরুদন্ড হিসেবে পরিচিত শ্রমজীবীরাও এবারে পথে নেমেছিল। বিক্ষোভকারীরা সরাসরি সুপ্রিম লিডার খামেনির বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়, "খামেনির মৃত্যু চাই!" ইরানের পররাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধেও আওয়াজ উঠেছিল জনসমাবেশ থেকে। যেমন, "গাজা নয়, লেবানন নয়, আমার জীবন ইরানের জন্য" বা "সিরিয়া থেকে বেরিয়ে এসো"। জনগণ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিচ্ছিল যে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। তারা আর তাদের যুবকদের আরব গৃহযুদ্ধের বলি হতে দিতে রাজি নয়। এছাড়াও আরেকটা বিষয় লক্ষ্য করা গেল। কর্তৃপক্ষ যখন সড়ক বা চত্বরগুলোতে বিশাল করে অ্যামেরিকান পতাকা আঁকতো, তখন বিক্ষোভকারীরা সেটির ওপর দিয়ে হাঁটতে পর্যন্ত অস্বীকৃতি জানায়। এক অর্থে এটি ছিল অ্যামেরিকার প্রতি সম্মান প্রদর্শনেরই ইঙ্গিত।

২০২০ সালের শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্রের হাতে কাসেম সোলেমানি নিহত হওয়ার পর উত্তেজনা কিছুটা প্রশমিত হয়। রেভল্যুশনারি গার্ডের কুদস ফোর্সের কমান্ডার সোলেমানি ছিলেন জাতীয়ভাবে পরিচিত একজন নেতা। সিরিয়ায় ইরানের অংশগ্রহণের ব্যাপারে কলকাঠি নেড়েছিলেন তিনি। এক শিয়া মিলিশিয়া নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে বাগদাদে পৌঁছানোমাত্র তাকে হত্যা করা হয়। ইরানের আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ কয়েক দিনের মধ্যেই দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা বাড়িয়ে দেয়। যুক্তরাষ্ট্রের সৈনিকরা অবস্থান করছিল এমন একটি ইরাকি সামরিক ঘাঁটিতে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় তারা। কিন্তু সেই রাতেই ভয়াবহ এক ঘটনা ঘটে। ইরানি সামরিক বাহিনী মার্কিন বিমান হামলার আশঙ্কায় তীব্র সতর্ক অবস্থায় ছিল। ভুলবশত তেহরান বিমানবন্দর থেকে উড্ডয়নরত একটি বেসামরিক যাত্রীবাহী বিমান গুলি করে ভূপাতিত করে তারা। বিমানে থাকা ১৭৬ জনের সকলেই নিহত

হয়। ইরান সরকার প্রথমে দায় এড়ানোর চেষ্টা করলেও পরে তারা স্বীকার করে যে, এটি তাদের ভুল ছিল। আর এর ফলে নতুন এক বিক্ষোভের ঢেউ শুরু হয়। সরকার চাইছিল সোলেমানি হত্যাকাণ্ডের সূত্র ধরে দেশকে ঐক্যবদ্ধ করার মাধ্যমে রাজনৈতিক মূলধন অর্জন করে নেবে। এই ঘটনায় সেই সুযোগ পুরোপুরি হাতছাড়া হয়ে যায়।

এরপর আসে কোভিড-১৯ মহামারি। সরকারের প্রতি মানুষের আস্থা আরো এক দফা কমে যায়। প্রেসিডেন্ট রুহানির প্রশাসন প্রথম থেকেই ভাইরাসের হুমকিকে খাটো করে দেখাচ্ছিল। এমনকি যখন সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ল, তখনও প্রকৃত আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা গোপন করা হয়। স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কিত বার্তাগুলো বিভ্রান্তিকরভাবে প্রচারিত হতে থাকে দেশজুড়ে। পরিস্থিতি আরো হাস্যকর তোলে রেভল্যুশনারি গার্ড বাহিনী। এই বাহিনীর প্রধান দাবি করেছিলেন, তারা এমন একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেছে যা ১০০ মিটার দূর থেকে করোনা ভাইরাসের উপসর্গ চিহ্নিত করতে পারে। এই বক্তব্য সারা দেশে হাস্যরসাত্মক প্রতিক্রিয়া তৈরি করে। ইরানের ফিজিক্স সোসাইটি এই বক্তব্যকে 'একটি সায়েন্স ফিকশন গল্পের মতো' বলে ব্যঙ্গ করে। বিভ্রান্তি ছড়ানোতে ধর্মীয় নেতারাও পিছিয়ে ছিলেন না। বিশিষ্ট আয়াতুল্লাহ হাসেম বাতহেই-গোলপায়েগানি ঘোষণা দিয়েছিলেন—তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন, তবে একটি 'ইসলামি ওষুধ' ব্যবহার করে নিজেই নিজেকে সুস্থ করে তুলেছেন। কিন্তু এর দুই দিন পরেই তিনি মারা যান। আরো একজন আয়াতুল্লাহ তার অনুসারীদের পরামর্শ দিয়েছিলেন কোভিড-১৯ থেকে বাঁচতে চাইলে বেশি করে পেঁয়াজ খেতে হবে। তার পরামর্শের মধ্যে আরো ছিল—বেশি করে চুল আঁচড়াতে হবে। ইরানে 'ইসলামি চিকিৎসা' নামে বিকল্প ওষুধের এক বিশাল বাজার রয়েছে। তবে আরো বড় বাজার হলো রসিকতার। হাস্যরসই যে সবথেকে বড় টনিক এই ধারণাতে অনেক মানুষই বিশ্বাস করেন। ফলে ধর্মীয় নেতাদের ব্যঙ্গ করে তৈরি হওয়া মিম, ঠাট্টা এবং কার্টুনগুলো ভাইরাসের চেয়েও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে!

এটি শাসকগোষ্ঠীর জন্যও একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ বিপ্লবীদের নিয়ে হাসিঠাট্টা করাও এক রকমের বিপ্লব। মানুষকে হাসাহাসি করা থেকে তো আর থামানো সম্ভব না! তবে, তার মানে এই নয় যে ইসলামি শাসনের পতন আসন্ন, কিংবা পতনের পর সেখানে আলোকিত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। আবার এটিও সত্য যে, ইরান তার প্রতিবেশী দেশগুলোর তুলনায় শিক্ষিত ও

সাংস্কৃতিকভাবে উন্নত। এটি মধ্যপ্রাচ্যের একমাত্র রাষ্ট্র যার সীমানা ইউরোপীয়দের হাতে কৃত্রিমভাবে আঁকা হয়নি। ফলে, এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশের তুলনায় ইরানেই বরং প্রকৃত গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা সবথেকে বেশি। তবে সেসব এখনো বহুদূরের কথা।

আমাদের এখন ইরানের শাসনব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জগুলোর দিকে নজর দিতে হবে এবং দেখতে হবে যে এই সমস্যাগুলোর মোকাবিলায় তাদের সক্ষমতা কতটুকু। অর্থনৈতিকভাবে দেশটি গভীর সংকটে আছে। এই সংকট সামনে আরো গভীর হয়ে উঠতে পারে। তবে, এই সরকার যেভাবে নিষেধাজ্ঞা পাশ কাটানোর কৌশল রপ্ত করেছে, তা দেখে মনে হয় সরকারের কিছু কর্মকর্তা এই বিষয়ে ডক্টরেট ডিগ্রি অর্জন করেছেন। ফলে বছরের পর বছর ধরে ধুঁকে ধুঁকে কোনোমতে টিকে আছে দেশটির অর্থনীতি। আজকাল অবশ্য চীনের সঙ্গে ইরানের বেশ ভালো অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। কারণ চীন নিষেধাজ্ঞার অনেক শর্তই উপেক্ষা করতে প্রস্তুত। একইভাবে রাশিয়াও রয়েছে ইরানের পাশে। ফলে নিষেধাজ্ঞার প্রভাব যতটা পড়ার কথা, বাস্তবে ততটা পড়ছে না। তবে এতে সমস্যা মিটে যাচ্ছে এমন নয়। জনগণের ক্ষোভ যে বাড়বে না, এমন নিশ্চয়তাও তাই নেই। তবে এই শাসনব্যবস্থা আগেই দেখিয়ে দিয়েছে যে, নির্বিচারে হাজার হাজার মানুষ হত্যা করে হলেও বিক্ষোভ দমন করতে রাজি তারা। একবার যখন কেউ এই পথ বেছে নেয়, তখন আর ফিরে আসার পথ খুব একটা থাকে না।

ইরানের ভেতরের সংখ্যালঘুদের মধ্যে বিদ্রোহের ইতিহাস রয়েছে। কুর্দিরা অতীতে বেশ কয়েকবার বিদ্রোহ করেছে। তবে কঠোর দমন-নিপীড়ন চলতে থাকা পর্যন্ত তাদের বড় কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার সম্ভাবনা কম। দক্ষিণ-পশ্চিমের খুজেস্তান প্রদেশে বসবাসরত আরব সংখ্যালঘুদের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই তীব্র অসন্তোষ রয়েছে। তারা মনে করে, তাদের অঞ্চলে বিপুল পরিমাণ তেল সম্পদ থাকা সত্ত্বেও তাদের জীবনমানের কোনো উন্নতি ঘটেনি। বাস্তবেই দেশটির সবচেয়ে দরিদ্র সংখ্যালঘু গোষ্ঠীগুলোর একটি তারা। এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে তারা মাঝেমধ্যে সরকারি স্থাপনাগুলোতে বোমা হামলা চালায়। দক্ষিণ-পূর্ব দিকের বিশাল বেলুচিস্তান প্রদেশও বরাবরই অশান্ত। এখানে প্রায় দেড় মিলিয়ন মানুষ বসবাস করে। এরা মূলত সুন্নি মুসলিম, দারিদ্র্য তাদের নিত্যসঙ্গী। এদের অনেকেই ইরানিদের চেয়ে পার্শ্ববর্তী পাকিস্তানের বালুচদের সঙ্গে বেশি আত্মীয়তা অনুভব করে। অঞ্চলটি আফগানিস্তান ও পাকিস্তান থেকে ইউরোপে মাদক এবং

মানবপাচারের অন্যতম প্রধান রুট। এই অঞ্চলেও রেভল্যুশনারি গার্ড ও সরকারি কর্মকর্তাদের ওপর একাধিক বোমা হামলার ঘটনা ঘটেছে। খুজেস্তান ও বেলুচিস্তানের এই চলমান অসন্তোষ সবকিছুর পরেও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই আছে। যতদিন পর্যন্ত কোনো বিদেশি শক্তি সরাসরি বিদ্রোহ উসকে না দিচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত এগুলো শাসকদের জন্য অস্তিত্বের সংকট সৃষ্টি করবে না।

এবার দেখা যাক ইরানের মধ্যবিত্ত শ্রেণি, বুদ্ধিজীবী সমাজ, শিল্পী-সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী কেমন আছে। এই গোষ্ঠীগুলো আসলে এখনো নীরবে দেশের মধ্যে একটি বিকল্প নাগরিক সংস্কৃতি ধরে রাখার অবিচল লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইরানের বুদ্ধিজীবীরা রাজতন্ত্র ও ধর্মীয় শাসন থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে আনার সংগ্রাম চালিয়ে এসেছে। বর্তমান প্রজন্মও সেই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার বহন করে চলেছে। সংগীত ও চলচ্চিত্র এখনো সমাজের গভীর অসন্তোষ ও রাজনৈতিক বার্তা প্রকাশের অন্যতম মাধ্যম। নিজেদের জীবনে এত হস্তক্ষেপ তরুণ প্রজন্মের অনেকেই আর সহ্য করতে রাজি নয়। তাদের চুলের কতটুকু অংশ দেখা যাব সেটাও যদি রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করে দিতে চায়, তা এই প্রজন্মের পক্ষে সহ্য করা কঠিন। সাম্প্রতিক সরকারবিরোধী বিক্ষোভগুলোতে একটি উত্তেজনাপূর্ণ স্লোগান শোনা গেছে—"ওহে ইরানের শাহ্, ফিরে এসো ইরানে!" এটি সত্যিকার অর্থে পুরোনো রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার আহ্বান নয়। বরং এটি হলো বর্তমান শাসনব্যবস্থার প্রতি গভীর অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ। কারণ, ইরানের উদারনৈতিক আন্দোলন সবসময়ই রাজতন্ত্র ও ধর্মীয় কর্তৃত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য লড়াই করেছে। কিন্তু এমন স্লোগান আসলে শাসকগোষ্ঠীকে উদ্বিগ্ন করে তোলে। কারণ এসব তাদের ক্ষমতার ভিত্তিকে ধীরে ধীরে ক্ষয় করে দিচ্ছে। তবে, এই ধরনের কর্মকাণ্ডেরও সীমাবদ্ধতা আছে। একজন তরুণী যখন একটি ভাস্কর্যের ওপরে উঠে দাঁড়িয়ে নিজের মাথার হিজাব বাতাসে ওড়ায় এবং পুলিশের চোখে চোখ রেখে চ্যালেঞ্জ জানায়, তখন সেটি একটি প্রতীকী দৃশ্য হয়ে ওঠে। এটি ইউটিউবে জায়গা করে নেয়, জনমনে আলোড়ন তোলে, পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু এই ধরনের ঘটনা এখনো বিপ্লবের জন্য যথেষ্ট নয়। একদিন হয়তো বিক্ষোভ এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছাবে, যার মুখে পড়ে শাসনব্যবস্থা ভেঙে পড়বে। আবার এমনও হতে পারে যে শাসকগোষ্ঠী ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যাবে। কিন্তু আপাতত ক্ষমতার পাল্লা শাসকদের পক্ষেই ঝুলে আছে।

আমি নিজ চোখে দেখেছি, কী অবিশ্বাস্য সাহস নিয়ে শাসকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় ইরানের তরুণরা। তাদের সংস্কৃতিতে শহীদ হওয়ার ধারণা গভীরভাবে প্রোথিত। কিন্তু আত্মোৎসর্গেরও তো একটা সীমা থাকে! সবাই তো আর নিজেদের জীবন দিতে প্রস্তুত নয়। তবে যখন যথেষ্ট সংখ্যক তরুণ সৈন্য ও মিলিশিয়া সদস্য বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালাতে অস্বীকৃতি জানাবে, তখনই বদলে যাবে পরিস্থিতি। এখনো পর্যন্ত বিপ্লবী গার্ড বাহিনী ও বাসিজ মিলিশিয়ার মতো কট্টরপন্থী গোষ্ঠীগুলোর সদস্যরা সরকারকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে চলেছে। শাসকগোষ্ঠী তাদের নিরাপত্তা বাহিনীর ওপরেও কঠোর নজরদারি চালায়। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর ভেতরেই সক্রিয় আছে গোপন পুলিশ। আর যখন সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়, তখন তাদের সঙ্গে রেভল্যুশনারি গার্ড ইউনিট রাখা হয়, যাতে কেউ 'পথভ্রষ্ট' হওয়ার সুযোগ না পায়।

এছাড়া ভেতর থেকেও কিছু সংস্কারপন্থী পরিবর্তন আনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ইরানের শক্তিশালী ইসলামি ঐতিহ্য সংরক্ষণ করতে চাওয়ার পাশাপাশি ধীরে ধীরে গণতন্ত্র গড়ে তুলতে চায় তারা। গত বিশ বছর ধরে তারা নির্বাচিত প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবহার করে ক্ষমতার ভারসাম্য আনার চেষ্টা করছে। সমস্যা হলো, এসব প্রতিষ্ঠান আসলে গণতন্ত্রের ছদ্মাবরণ ধারণ করে আছে। প্রকৃত ক্ষমতা রয়েছে ধর্মীয় নেতা ও রেভল্যুশনারি গার্ডের হাতে। তাই সংস্কার এখন পর্যন্ত স্রেফ একটি চলমান প্রয়াস, অগ্রগতির চিহ্নও তেমন একটা দেখা যাচ্ছে না।

২০২০ সালের দিকে নতুন একটি বক্তব্য ইরানে জনপ্রিয় হতে শুরু করে। আগে বলা হতো 'ক্ষমতা মুকুট থেকে পাগড়িতে' প্রবাহিত হয়েছে। অর্থাৎ রাজতন্ত্রের পতনের পর ক্ষমতা ধর্মীয় নেতাদের হাতে চলে গেছে।। কিন্তু এই সময় এসে বলা শুরু হয়, ক্ষমতা এখন 'পাগড়ি থেকে বুটে' গড়িয়ে পড়ছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রক্ষমতা বর্তমানে সামরিক বাহিনীর হাতে, বিশেষ করে রেভল্যুশনারি গার্ডের কাছে। ইরানের সংসদ 'মজলিস' বর্তমানে প্রাক্তন গার্ড সদস্যদের দিয়ে ঠাসা। দেশের বৃহৎ ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানগুলোর বোর্ডেও তাদের সরব উপস্থিতি দেখা যায়। বড় বড় কোম্পানির প্রধান নির্বাহীরা জানেন, যদি তাদের বোর্ডে একজন গার্ড সদস্য থাকে তাহলে সরকারি চুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়। কারণ, বিপ্লবী গার্ড বাহিনী শুধু প্রভাবশালী জেনারেলদের দলে ভিড়িয়ে রাখে না, বরং এটি নিজেই একটি বিশাল কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান। এর নির্মাণ শিল্প শাখার নাম 'খাতাম আল-আনবিয়া', যা দেশের বিভিন্ন অবকাঠামোগত প্রকল্প পরিচালনা করে। এমনকি এটি

তেহরান মেট্রোর কিছু অংশ নির্মাণেও ভূমিকা রেখেছে। বিষয়টি এমন যেন ব্রিটেনের রয়্যাল মেরিনরা লন্ডনের সাবওয়ে সম্প্রসারণ থেকে লাভবান হচ্ছে, বা যুক্তরাষ্ট্রের ৮২তম এয়ারবোর্ন ডিভিশন গাড়ি উৎপাদনের ব্যবসায় নামছে। রেভল্যুশনারি গার্ড মুখে বিপ্লবের আদর্শের কথা বলে, কিন্তু বাস্তবে অর্থ উপার্জনের পথ সুগম করে নিচ্ছে বাহিনীটি।

রেভল্যুশনারি গার্ডের এমনকি নিজস্ব গণমাধ্যমও আছে। তাদের রয়েছে অসংখ্য সংবাদপত্র, টেলিভিশন, রেডিও স্টেশন, স্যোশাল নেটওয়ার্ক প্ল্যাটফর্ম এবং চলচ্চিত্র প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এসব গণমাধ্যম মূলত তিনটি প্রধান বক্তব্য প্রচার করে আসছে। প্রথমত, রেভল্যুশনারি গার্ড ও সুপ্রিম লিডার মহান ব্যক্তিত্ব। যারা তাদের বিরোধিতা করে তারা খুবই খারাপ। দ্বিতীয়ত, দেশের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা নিরাপত্তা সংক্রান্ত যেকোনো ব্যর্থতার জন্য সংস্কারপন্থী প্রশাসন দায়ী। তৃতীয়ত, বিদেশি শক্তিগুলো প্রতিনিয়ত ইরানকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্র করছে।

বিদেশি গণমাধ্যমগুলো যখন ইরান সম্পর্কে রিপোর্ট করে, তখন তারা সাধারণত ইংরেজিতে দক্ষ বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের সাক্ষাৎকার নেয়। তাদেরকেই দেশের যুবসমাজের কণ্ঠস্বর হিসেবে তুলে ধরে। কিন্তু বাস্তবতা অনেক বেশি জটিল। অনেক তরুণই যেমন সরকারের সাথে ভিন্নমত পোষণ করছে, তেমনি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী এবং বাসিজ মিলিশিয়াতেও স্বেচ্ছায় যোগ দিচ্ছে বহু ইরানি তরুণ। রেভল্যুশনারি গার্ড-সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে গ্রাফিক ডিজাইনার, চিত্রনাট্যকার, ভিডিও এডিটর বা চলচ্চিত্র নির্মাতা হিসেবে কাজ করার জন্য লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকা উচ্চশিক্ষিত তরুণদের কথাও এসব প্রতিবেদনে উল্লেখ করা উচিত। এসব প্রতিষ্ঠান বেশ ভালো বেতন দেয়। এই বাস্তবতা তুলে ধরা হয় না বলেই পাঠকরা ইরানকে বুঝে উঠতে পারেন না ঠিকঠাক। তারা বোঝেন না—তরুণ প্রজন্ম পরিবর্তনের দাবি জানালেও সেই পরিবর্তন বাস্তবে ঘটছে না কেন! রেভল্যুশনারি গার্ড বাহিনীর জন্য যারা কাজ করছে, তারা সবাই যে সরকারের প্রতি বিশ্বস্ত এমন নয়। তবে এই বিষয়টি প্রমাণ করে যে, টিকে থাকার জন্য যতদূর সম্ভব সবাইকে নিজেদের কাছে টেনে নেওয়ার কৌশল গ্রহণ করেছে ইরানের এই শাসনব্যবস্থা। প্রযুক্তিতে দক্ষ নতুন প্রজন্মের একটি অংশ ইরানের সাইবার-যুদ্ধ প্রকল্পের নেতৃত্ব দিচ্ছে। তারা একদিকে ইরানের দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিচ্ছে, অন্যদিকে

প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলোর সামরিক, বাণিজ্যিক এবং রাজনৈতিক কম্পিউটার সিস্টেম হ্যাক করার চেষ্টা করছে। এই কাজে যথেষ্ট দক্ষ তারা।

এভাবেই একটি সমন্বিত সরকার পরিচালনা করা হয়। রেভল্যুশনারি গার্ডের গণমাধ্যম শাখা হাজার হাজার মানুষকে কর্মসংস্থান দেয়। কিন্তু একই সঙ্গে কর্মীদের গতিবিধির ওপর নজরদারির জন্য একটি গোয়েন্দা বিভাগও পরিচালনা করা হয় এখানে। নিজেদের তৈরি প্রোগ্রাম রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার মাধ্যমের কাছে বিক্রি করে তারা, যাতে তাদের বার্তা আরো বেশি ছড়িয়ে দেওয়া যায়। এই গণমাধ্যম কার্যক্রম চালানো হয় বাসিজ মিলিশিয়ার সঙ্গে সমন্বয় করে। একটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। আইআরজি'র অন্যতম বড় গণমাধ্যম সংস্থা 'মার্টির আভিনি আর্টস অ্যান্ড মিডিয়া অরগানাইজেশন'। বাসিজে যিনি সুপ্রিম লিডারের প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত, তিনি এই সংস্থার প্রধান। আর বাসিজ সরাসরি রেভল্যুশনারি গার্ডের অধীনে পরিচালিত হয়। এটি একটি নিখুঁত ব্যবস্থা, আর বিষয়টিও সকলে ভালোভাবেই বোঝে।

তবে তার অর্থ এই নয় যে রেভল্যুশনারি গার্ড সরাসরি ক্ষমতা দখলের পরিকল্পনা করছে। বরং রাজনীতিতে সরাসরি সম্পৃক্ত না থাকার ভান করাই তাদের জন্য বেশি সুবিধাজনক। কিন্তু উল্লিখিত কাঠামো সুস্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয় যে, তারা রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে কতটা গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। যদি কখনো ধর্মীয় নেতাদের পিছু হটতে হয়, তাহলে তাদের জায়গায় একটি সশস্ত্র বিকল্প শক্তি প্রস্তুত আছে। রেভল্যুশনারি গার্ড চাইলে 'বিপ্লবকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে' পারে। তাদের নামই বলে দেয় তাদের কাজ কী! এই নাম ও কাজের কারণেই চার দশকের অভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত চাপের মুখেও ইরানি শাসনব্যবস্থা টিকে আছে।

ইরানের শাসনব্যবস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলোর একটি হলো এর বিপ্লবী ধর্মতান্ত্রিক চরিত্র। এই বিষয়টাকে প্রায়ই উপেক্ষা করে যায় অনেকে। এই শাসনব্যাবস্থা আগেও একটি বিপ্লবী ধর্মতন্ত্র ছিল, এখনো আছে এবং ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। ধর্মতান্ত্রিক মৌলিক নীতিগুলো এই ব্যবস্থার এতটাই গভীরে প্রোথিত যে এগুলো পরিবর্তন করা মানেই পুরো কাঠামোর ভিত্তি দুর্বল করে দেওয়া। যেমন, ফ্রান্সের জাতীয় মূলনীতি হলো 'স্বাধীনতা, সমতা, ভ্রাতৃত্ব'। যদি কোনো ফরাসি প্রেসিডেন্ট হঠাৎ ঘোষণা করেন যে তিনি এই মূলনীতির মধ্যে সমতার পক্ষে নন, তাহলে তা হবে কল্পনাতীত। ঠিক তেমনি, ইরানের আয়াতুল্লাহরা বিশ্বাস করেন যে ইরানের শিয়া ইসলামই মানবজাতির জন্য সৃষ্টিকর্তার পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ।

এখন তারা যদি হঠাৎ ঘোষণা করেন যে তারা 'মহা শয়তান' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা ইসরায়েলের সঙ্গে আপস করবেন, যৌন স্বাধীনতা মেনে নেবেন, অন্য ধর্মে ধর্মান্তরের অনুমতি দেবেন এবং প্রকৃত বহুদলীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থা চালু করবেন—তবে তা হবে তাদের অস্তিত্বের মৌলিক ভিত্তির পরিপন্থী। যারা মনে করে তারা নিজেরা পৃথিবীতে আল্লাহ্‌র বিধান কার্যকর করছেন, তাদের পক্ষে এসব ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়ার প্রশ্নই আসে না।

১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের পর থেকে প্রত্যেক অ্যামেরিকান প্রেসিডেন্ট ইরানের সঙ্গে একধরনের 'ক্যারট অ্যান্ড স্টিক' অর্থাৎ বাংলায় যেটাকে আমরা বলি 'মুলা ঝোলানোর কৌশল' অনুসরণ করেছেন। এর উদ্দেশ্য হলো, এই ইসলামি প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে কোনো একটি বড় ধরনের সমঝোতায় পৌঁছানো। তবে এমন একটি চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য উভয় পক্ষকেই নিজেদের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপক ছাড় দিতে হতো। ইরানকে প্রমাণ করতে হতো যে তারা পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করছে না এবং এজন্য তাদের জাতিসংঘের সামগ্রিক পর্যবেক্ষণ মেনে নিতে হতো। তাদের ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র কর্মসূচি সীমিত করতে হতো, সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোকে অর্থায়ন বন্ধ করতে হতো। পাশাপাশি আফগানিস্তান, ইয়েমেন, ইরাক, লেবানন ও সিরিয়ায় তাদের যেসব কর্মকাণ্ডকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির প্রচেষ্টা বলে মনে করে, সেগুলোও বন্ধ করতে হতো। একই সঙ্গে, ইসরায়েল-ফিলিস্তিন সংঘাতের কূটনৈতিক সমাধানের বিরোধিতা না করার শর্তও হয়তো মানতে হতো। এই ধরনের ছাড় দেওয়া ইরানের জন্য অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। ইরান বরাবরই নিজেদের বিপ্লবী আদর্শ নিয়ে গর্ব করে এসেছে। এমনকি তারা এই আদর্শ বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টাও করেছে। তবে ভবিষ্যতে এমন এক পরিস্থিতি আসতে পারে যেখানে দেশের ভেতরে বিপ্লব টিকিয়ে রাখার জন্য ইরানকে হয়তো আন্তর্জাতিক বিপ্লবী ভূমিকা থেকে সরে আসতে হতে পারে। এর বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্রকে এই নিশ্চয়তা দিতে হবে যে তারা ইরানে শাসনব্যবস্থা পরিবর্তন করার কোনো চেষ্টা করবে না, একতরফা নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করবে এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের পর ইরানের জ্বালানি খাত আধুনিকায়নে সহায়তা করবে। একই সঙ্গে, আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার ক্ষেত্রেও সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিতে হবে যুক্তরাষ্ট্রকে।

এসব কথা শুনতে ভালো লাগলেও এই লক্ষ্য অর্জনের পথ বরাবরই কঠিন। কারণ উভয় পক্ষের কট্টরপন্থীরা প্রতিবারই যে কোনো সম্ভাব্য সমঝোতাকে বাধাগ্রস্ত

করেছে। পাশাপাশি পারস্পরিক অবিশ্বাসের কারণে আলোচনা কখনোই তেমন অগ্রগতি পায়নি। বারাক ওবামা প্রেসিডেন্ট থাকাকালে কিছুটা অগ্রগতি হয়েছিল বটে, তবে সমালোচকরা বলে থাকেন যে ২০১৫ সালের পারমাণবিক চুক্তির ত্রুটিগুলো ইরানকে গোপনে বোমা তৈরির সুযোগ করে দেয়। প্রেসিডেন্ট হাসান রুহানি এই আলোচনার দুয়ার সামান্য হলেও খুলেছিলেন, তবে তেহরানের কট্টরপন্থীদের প্রবল বিরোধিতার মুখে পিছু হটতে বাধ্য হন তিনি।

প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের নেতৃত্বে অ্যামেরিকানরা বা অন্যরাও, 'সরকার পরিবর্তন'-এর লক্ষ্য থেকে সরে এসেছে। এখন তাদের লক্ষ্য কেবল 'সরকারের আচরণ পরিবর্তন' করানো। আয়াতুল্লাহরা যদি 'দুর্গের মত সুরক্ষিত ইরান' ধরে রাখতে চান, তাহলে পরমাণু শক্তিধর রাষ্ট্র হয়ে ওঠার উচ্চাকাঙ্ক্ষা তাদের পরিত্যাগ করতে হবে। ত্যাগ করতে হবে আরব বিশ্বে হস্তক্ষেপের নীতি। আরব সরকারগুলো হয়তো কখনোই তেহরানের প্রতি উষ্ণ মনোভাব দেখাবে না, তবে ইরান যদি সৌদি আরব, ইয়েমেন, সিরিয়া, ইরাক ও বাহরাইনে নাক গলানো বন্ধ করে তাহলে আপসের পথ খোলা থাকবে। কিন্তু এর বদলে ইরান যদি পরমাণু অস্ত্র অর্জনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছায়, তবে আরব রাষ্ট্রগুলো এক হয়ে ইরানের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে। তারা তখন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ করার চেষ্টা করবে। আর সেটি সম্ভব না হলে সৌদি আরবের নিরাপত্তা ছাতার নিচে আশ্রয় খুঁজবে।

বর্তমান ব্যবস্থার অধীনে ইসলামিক প্রজাতন্ত্র ইরান এক দুষ্টচক্রের ফাঁদে আটকে আছে। এই সরকার একবিংশ শতকের চাইতে ষোড়শ শতকের সঙ্গেই বেশি মানানসই। তারা উদারীকরণের পথে এগোতে পারবে না। কারণ সেক্ষেত্রে যেটুকু বৈধতা এখনও তাদের সমর্থকদের মধ্যে অবশিষ্ট আছে, সেটাই নড়বড়ে হয়ে যাবে। কিন্তু তারা যদি এভাবেই চলতে থাকে, তাহলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তরুণ জনগোষ্ঠী আরো ক্ষুব্ধ হয়ে উঠবে।

১৯৭৯ সালের বিপ্লবের প্রজন্ম জানে যে সময় তাদের পক্ষে নেই। জনসংখ্যার দিক থেকেও এখন তাদের সংখ্যা কমে আসছে। কিন্তু, তাদের হাতে এখনো বহু তাস রয়ে গেছে। পরমাণু ইস্যুটি এখনো আলোচনার কেন্দ্রে রয়েছে, আর হরমুজ প্রণালিও আগের মতোই সংকীর্ণ রয়ে গেছে। কূটনীতি থেকে শুরু করে সন্ত্রাসবাদ পর্যন্ত যেকোনো অস্ত্র তারা ব্যবহার করতে রাজি। গোটা অঞ্চলে তাদের বিভিন্ন প্রক্সি পাওয়ার সক্রিয় রয়েছে, যাদেরকে প্রয়োজন মতো ব্যবহার করা সম্ভব। অভ্যন্তরীণ এবং বহিরাগত ষড়যন্ত্র মোকাবিলার জন্য তাদের আছে দমন-নিপীড়নের

জন্য কুখ্যাত, ভয়ংকর ও নিষ্ঠুর নিরাপত্তা বাহিনী। আর তারা মনে করে, তারা স্রেফ নিজেদের জন্যই নয়, বরং তারা আল্লাহ্‌র হয়ে কাজ করছে। ফলে আপস করাটা হবে পাপ। আর প্রতিরোধ করাই হবে তাদের পবিত্র কর্তব্য। ধর্মীয় বিপ্লবীরা তাদের বিপ্লব পরিত্যাগ করার কোনো ইচ্ছাই পোষণ করে না।

অধ্যায় ৩

সৌদি আরব



"আপনি হাঁটতে থাকলে, ওরা আপনাকে অনুসরণ করতে বাধ্য।"

- প্রিন্সেস রিমা বিনতে বন্দর আল সৌদ,
প্রথম নারী সৌদি রাষ্ট্রদূত

একটা সমস্যা সমাধানের প্রথম শর্ত হলো সমস্যাটিকে সঠিকভাবে বুঝতে পারা। 'সৌদি' এবং 'আরব'—মাত্র এই দুইটি শব্দ দিয়েই সৌদি আরবের সমস্যাটা ব্যাখ্যা করা যায়।

আরব উপদ্বীপের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত নাজদ অঞ্চল। ১৭৪০ সালের দিকে এই অঞ্চলের কিছু অংশ নিয়ন্ত্রণ করতেন মুহাম্মদ ইবনে সৌদ নামে এক স্থানীয়

আমির। তারই এক সরাসরি বংশধর ১৯৩০ সালে এসে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে থাকা অঞ্চলের সীমানা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত করেন। ইবনে সৌদের পরিবারের নামে দখলকৃত এই অঞ্চলটির নতুন নাম দেওয়া হয় সৌদি আরব। কিন্তু, কোনো পরিবার যদি নিজেদের নামে একটি রাষ্ট্রের নাম রাখে, তাহলে যেসব মানুষ সেই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়, তাদের কী হবে? যেমন, ব্রাজিলের প্রতিটি নাগরিকই ব্রাজিলীয় পরিচয়ের অংশ এবং আইনের দৃষ্টিতে সবাই সমান। কিন্তু সৌদি আরবের প্রতিটি নাগরিক সৌদ পরিবারের সদস্য নয়, আর তাই সবার মর্যাদাও এক নয়। আজকে যদি আমি যুক্তরাজ্যের ক্ষমতা দখল করি, আর তারপর যুক্তরাজ্য নাম বদলে মার্শল্যান্ড রেখে দিই, কিছু মানুষ হয়তো সেটা মেনেও নেবে। আবার অনেকেই হয়তো বলবে, নামটা দেশের জলবায়ুর সঙ্গে বেশ মানানসই। কিন্তু নতুন সেই দেশের প্রতি তাদের আসলে ঠিক কতটা আনুগত্য থাকবে? দেশ তো আসলে তখন আমি নিজেই। আমার প্রতিই নাগরিকদের আনুগত্য চাইছি আমি। (এখানে আমি আগেভাগেই স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই যে, ঈশ্বরের কৃপায় কমনওয়েলথের প্রধান এবং খ্রিস্ট ধর্মের রক্ষক মহামান্য রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের প্রতি আমার কোনো বিশ্বাসঘাতকতামূলক মনোভাব নেই। এতটা উচ্চাভিলাষী আমি নই।)

আসলে রাষ্ট্রের সঙ্গে নিজেদের পারিবারিক পরিচয় যুক্ত করার ফলে সৌদি রাজপরিবারের জন্য বেশ বড় একটি জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে। ঐতিহাসিকভাবে বিচার করলে সৌদ বংশ এটা দাবী করতে পারে যে, নাজদের কিছু অংশ তাদের নামে পরিচিত হোক। কিন্তু, তাই বলে গোটা আরব উপদ্বীপ? এটা অনেক বড় দাবি। এমনকি আজকের সৌদি আরব রাষ্ট্রের বিশাল একটি অংশ মাত্র এক শতাব্দী আগেও সৌদ পরিবারের শাসনের অধীনে ছিল না। ১২০ বছর আগেও যদি কেউ শাম্মার গোত্রের কাছে গিয়ে বলত যে, তাদের স্বাধীন আমিরাত একদিন সৌদ সাম্রাজ্যের অধীনে একটি সাধারণ প্রদেশে পরিণত হবে—তার পরের মুহূর্তেই হয়তো সবার হাতে তলোয়ার উঠে আসত। তাছাড়া, পারস্য উপসাগরের কাছাকাছি অঞ্চলে বসবাসকারী শিয়া জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সুন্নি ওয়াহাবিদের দ্বন্দ্ব চলে আসছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে। শিয়ারা কখনো কল্পনাই করেনি যে, তারা একদিন সুন্নি ওয়াহাবি মৌলবাদী সৌদি শাসকের অধীনে চলে যাবে।

তবে তার মানে আবার এটা নয় যে আধুনিক সৌদি রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারবে না। দেশটিতে যে আজও অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা রয়ে গেছে এবং আঞ্চলিক উত্তেজনা রয়ে গেছে, এটি তার একটা ব্যাখ্যা মাত্র। সৌদি রাজপরিবার যদি ক্ষমতা

ধরে রাখতে চায়, তাহলে একদিকে যেমন তাদের কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে হবে, অন্যদিকে প্রান্তিক অঞ্চলগুলোর আনুগত্যও নিশ্চিত করতে হবে।

এক শতাব্দী আগেও এই অঞ্চলে বাস করত মাত্র ২ মিলিয়ন মানুষ। এদের বেশিরভাগই ছিল যাযাবর। সেই অঞ্চলটিই এখন ৩৪ মিলিয়ন জনসংখ্যার একটি রাষ্ট্র। আরব উপদ্বীপের বড় অংশ জুড়ে বিস্তৃত এই রাষ্ট্র মূলত একটা বিশাল মরুভূমি। তেল আর বালি ছাড়া এখনো দেশটিতে তেমন কিছুই নেই। তবে, এই জ্বালানি সম্পদই সৌদি আরবকে বিশ শতকের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। পরিণত করেছে বিশ্ব রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ শক্তিতে। সৌদি আরব দেশটির প্রধান মিত্র ও রক্ষক হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আর যুক্তরাষ্ট্রের সাথে তাদের সম্পর্কের ভিত্তিই হলো এই তেল। এই সম্পদ সৌদি আরবকে বিপুল ঐশ্বর্যের মালিক করেছে। আর সেই ঐশ্বর্যের জোরেই তেলের প্রবল তৃষ্ণায় কাতর এই পৃথিবীতে টিকে আছে দেশটি। অবশ্য, সৌদি ক্ষমতা কাঠামোর একটি অংশ ইসলামি মৌলবাদের চরম সহিংস রূপ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে রপ্তানি করে চলেছে। সাম্প্রতিক সময়ের সবচেয়ে পরিচিত সৌদি নাগরিক কোনো বাদশাহ বা তেল ব্যবসায়ী বিলিয়নিয়ার নন। তিনি একজন সন্ত্রাসী, যার নাম ওসামা বিন লাদেন।

কিন্তু সৌদি আরবের সামনে এখন বেশ বড় একটা সমস্যা দেখা দিয়েছে। সমগ্র বিশ্ব তেলের ওপর থেকে নির্ভরতা কমিয়ে ফেলছে ধীরে ধীরে। তাহলে এই রাজতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কী? দেশটির জনসংখ্যার একটা অংশ অস্থির, চারপাশে রয়েছে শত্রুর উপস্থিতি, আর অন্যদিকে শাসকের শাসনের বৈধতাও প্রশ্নবিদ্ধ। এমন পরিস্থিতিতে শাসকদের করণীয় কী? একমাত্র পথ হলো আধুনিকায়ন। প্রযুক্তি ব্যবহার করে এবং নবায়নযোগ্য শক্তির সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে একবিংশ শতাব্দীর বাস্তবতায় টিকে থাকতে হবে। তবে, এই যাত্রা খুব একটা সহজ হবে না। সৌদি আরবের এই প্রচেষ্টা সফল হবে নাকি ব্যর্থ হবে, তার ফলাফল শুধু এই দেশটিকেই নয়—বরং পুরো মধ্যপ্রাচ্য এবং বাকি বিশ্বকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করবে।

সৌদি আরব দেশটি গড়ে উঠেছে বিংশ শতকে—আধুনিক পরিবহন ও যোগাযোগ প্রযুক্তির সাহায্যে। তবে ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এখনো দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে নানারকম বৈচিত্র্য রয়ে গেছে। কয়েক দশক আগেও দেশটির বিশাল একটা অংশ বসবাসের অনুপযুক্ত ছিল। সৌদি আরব হলো পৃথিবীর বৃহত্তম নদীবিহীন দেশ। দেশটির অভ্যন্তরভাগ জুড়ে বিস্তৃত রয়েছে দুইটি বিশাল মরুভূমি। উত্তর দিকে রয়েছে 'আন-নাফুদ' মরুভূমি, যা আবার একটা সরু বালুময় করিডোর

দিয়ে সংযুক্ত হয়েছে 'রুব আল-খালি' মরুভূমির সঙ্গে। 'রুব আল-খালি' অর্থ 'শূন্য প্রান্তর'। এটি হলো পৃথিবীর সবথেকে বড় অবিচ্ছিন্ন বালিময় অঞ্চল। এই ভয়ংকর নির্জন মরুভূমিতে টিকে থাকতে পারে শুধু অল্প কিছু যাযাবর বেদুইন। তবে বেদুইনদের কাছে মরুভূমিটির নাম 'আল-রামলাহ', অর্থাৎ 'বালি'। এই বিরানভূমি আয়তনে ফ্রান্সের চেয়েও বড়! এখানে বালিয়াড়িগুলো ২৫০ মিটার পর্যন্ত উঁচু হতে পারে। সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে শুরু হয়ে সৌদি আরব ও ওমান পার হয়ে ইয়েমেন পর্যন্ত এই মরুভূমির বিস্তার। গ্রীষ্মকালে এই মরুভূমির তাপমাত্রা এমনকি ছায়াতেও ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস ছাড়িয়ে যায়। যদিও ছায়া বলতে আসলে এই মরুতে তেমন কিছুই নেই। আবার শীতকালে রাতের বেলায় এই মরুভূমিতে অনুভূত হয় তীব্র কনকনে ঠান্ডা। আজকের এই আধুনিক যুগে এসেও খুব কম মানুষই এই মরুভূমির গভীরে প্রবেশ করে। ফলে, এর বড় অংশই এখনো অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে। জানা যায়, এই অঞ্চলের বালির নিচে নাকি বিপুল পরিমাণ তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুত রয়েছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্ববাজারে তেলের দাম নিম্নমুখী। ফলে, এই সম্পদকে কাজে লাগানো লাভজনক মনে করা হচ্ছে না।

আটটি রাষ্ট্রের সঙ্গে সৌদি আরবের স্থলসীমান্ত রয়েছে। দেশটির উত্তরে রয়েছে জর্ডান, ইরাক ও কুয়েত। দেশটির পূর্ব উপকূল দক্ষিণ দিকে বিস্তৃত হয়ে বাহরাইন, কাতার এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের দিকে গেছে। এই ছয়টি দেশ পারস্য উপসাগরের তীরে অবস্থিত। দক্ষিণে রয়েছে ওমান ও ইয়েমেন। এর মধ্যে ইয়েমেনের সীমান্তই সবচেয়ে দীর্ঘ এবং সবচেয়ে অস্থির। সৌদি আরবের দক্ষিণাঞ্চলকে স্থলভিত্তিক হুমকি থেকে রক্ষা করার জন্য রুব আল-খালি মরুভূমি প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা হিসেবে কাজ করে। কিন্তু একইসঙ্গে দক্ষিণের দেশগুলোর সঙ্গে বাণিজ্য করাও কঠিন করে তোলে এই বিশাল মরুভূমি। এই বিশাল বালির সমুদ্র পাড়ি দেওয়া একসময় দক্ষিণ মেরু অতিক্রম করার মতোই কঠিন বলে মনে করা হতো। এই মরুভূমিতে প্রথম নথিবদ্ধ অভিযানটি মাত্র এক শতাব্দীরও কম সময় আগের ঘটনা। ১৯৩১ সালের ডিসেম্বর মাসে ব্রিটিশ অভিযাত্রী বারট্রাম থমাস বেদুইন ট্রাইবালদের সঙ্গে নিয়ে ওমান উপকূল থেকে যাত্রা শুরু করেন। ১,৩০০ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে কয়েক সপ্তাহ পরে তিনি কাতারে পৌঁছান। তবে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মরুভূমির বুকে যাতায়াত কিছুটা সহজ হয়েছে। এমনকি ২০১৮ সালে ওমান থেকে মরুভূমি পেরিয়ে সৌদি রাজধানী রিয়াদ পর্যন্ত একটি মহাসড়কও চালু করা হয়েছে। আপনি যদি এই পথ ধরে গাড়ি চালানোর কথা ভাবেন, তাহলে

থমাস বা তার সঙ্গীদের মতো দুর্ধর্ষ অভিযাত্রী হতে হবে না। তবে একটা ব্যাপার মাথায় রাখা জরুরি—এই পথে কোথাও কোনো সার্ভিস স্টেশন নেই! না আছে তেল নেওয়ার সুযোগ, না আছে গাড়ি খারাপ হলে মেরামতের সুযোগ।

সৌদি আরবের বর্তমান জনবসতির কাঠামো বোঝার জন্য প্রাচীন বাণিজ্যপথ ও জলবায়ুর প্রভাব জানা গুরুত্বপূর্ণ। ভূগোলের প্রভাবেই এই অঞ্চলের প্রাচীন বাণিজ্য পথগুলো গঠিত হয়েছে। সৌদি আরবের সমস্ত উঁচু অঞ্চল মূলত দেশটির পশ্চিমাংশে অবস্থিত। লোহিত সাগরের সৌদি উপকূলজুড়ে প্রায় সমান্তরালভাবে সারি সারি পাহাড় ও পর্বতমালা দেখা যায়। এই অঞ্চলের উপকূলবর্তী সমভূমি তুলনামূলক সরু। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, উপকূলীয় শহর জেদ্দা সমতল ভূমিতে অবস্থিত। কিন্তু মাত্র ৬০ কিলোমিটার ভেতরে গেলেই পবিত্র মক্কা নগরী। আর মক্কার অবস্থান সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ২৭৭ মিটার উঁচুতে। মক্কার আশেপাশের পাহাড়গুলোর মধ্যে কোনো কোনোটির উচ্চতা ১,৮৭৯ মিটার পর্যন্ত। এই উঁচু অঞ্চলগুলোর মধ্য দিয়ে একটি গিরিপথ চলে গেছে মদিনার দিকে। প্রাচীনকালের কাফেলাগুলোর জন্য এটি একটি প্রধান বাণিজ্যপথ হয়ে উঠেছিল। ওই সময় রুব আল-খালি মরুভূমির মধ্য দিয়ে যাতায়াত করা সম্ভব ছিল না। ফলে, আফ্রিকা ও লোহিত সাগরের সাথে পারস্য ও ভারতের বাণিজ্য মূলত এই তিনটি শহর—জেদ্দা, মক্কা ও মদিনার মধ্য দিয়ে পরিচালিত হতো। দেশটির প্রধান জনবসতিগুলোও মূলত ভূ-প্রাকৃতিক কারণে এই অঞ্চলগুলোতে গড়ে উঠেছিল।

সৌদি আরবের সর্বোচ্চ পর্বতমালা অবস্থিত দক্ষিণের ইয়েমেন-সংলগ্ন সীমান্তের কাছাকাছি। এই অঞ্চলের আবহাওয়া তুলনামূলকভাবে ঠাণ্ডা। আর এই কারণে প্রাচীনকাল থেকেই এখানে জনবসতি গড়ে উঠেছে। সৌদি আরবের অধিকাংশ মানুষ দেশের পশ্চিম অংশে, বিশেষ করে মক্কা, মদিনা ও জেদ্দার আশপাশে বসবাস করে। তবে ইয়েমেন সীমান্তসংলগ্ন পার্বত্য অঞ্চল হলো দেশটির সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা।

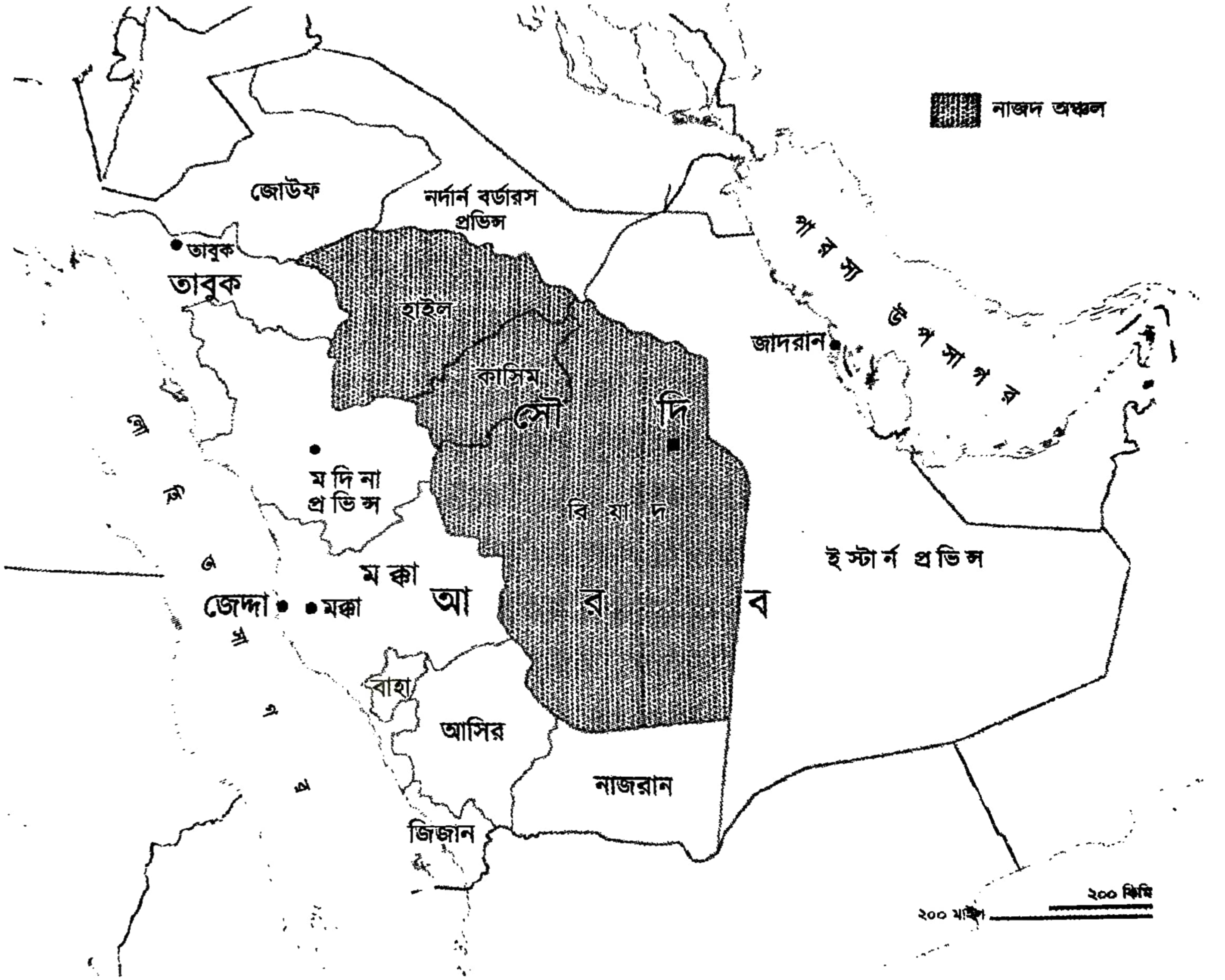
উত্তর-পশ্চিমের হিজাজ বা অন্যান্য পার্বত্য অঞ্চল পার হয়ে পূর্ব দিকে এগিয়ে গেলে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত পুরোটাই সমতল অঞ্চল। সৌদি আরব মূলত সুন্নি সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। তবে এখানে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় শিয়া সংখ্যালঘুও রয়েছে। শিয়াদের বেশিরভাগই বসবাস করে পারস্য উপসাগর উপকূলের ইস্টার্ন প্রভিন্সে। এই শিয়ারা মূলত বাহারনা গোত্রের সদস্য। বাহারনা শব্দটি এসেছে বাহরাইন শব্দ থেকে। বাহরাইন শব্দটির মূল আরবি হচ্ছে 'বাহর' বা সমুদ্র। শব্দটির বহুবচন

'বাহরাইন' অর্থাৎ 'দুই সমুদ্র'। ঐতিহাসিকভাবে বাহরাইন অঞ্চলে একদিকে যেমন ছিল মিঠা পানির উৎস, আর আরেকদিকে ছিল লবণাক্ত সমুদ্র। তাই এই অঞ্চলের নাম হয়েছিল বাহরাইন। আর এই অঞ্চলের মানুষ হিসেবে তাদের নাম হয়েছে বাহারনা। এরা আরব উপকূলের প্রাচীন আরব অধিবাসী। কথা বলার জন্য এই মানুষগুলো বাহারনি আরবি উপভাষা ব্যবহার করে, যা সাধারণ খাড়ি আরবি থেকে কিছুটা ভিন্ন।

সৌদি আরবের এই শিয়াপ্রধান অঞ্চলটি বিদেশি শক্তির অনুপ্রবেশ বা নাশকতার জন্য সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ। এই অঞ্চলে তেল ও গ্যাসের শত শত পাইপলাইন থাকায় ধ্বংসাত্মক নাশকতা ঘটানোও খুব সহজ। ইস্টার্ন প্রভিন্সকে ২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতুর মাধ্যমে শিয়া-অধ্যুষিত বাহরাইনের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়েছে। বাহরাইনের শাসক সুন্নি হলেও, বাহারনা শিয়ারাই দেশটিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ। ১৯৮৬ সালে সৌদি সরকার সেতুটি নির্মাণ করেছিল। সৌদি সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী এটি নির্মাণ করা হয়েছে মূলত যাতায়াত, পর্যটন ও বাণিজ্যের জন্য। কিন্তু অপ্রকাশ্য বাস্তবতা হলো, বাহরাইনে সুন্নি শাসকদের বিরুদ্ধে যদি ওই দেশের শিয়াদের আন্দোলন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়, তাহলে এই সেতু ব্যবহার করে সৌদি ট্যাংক দ্রুত সেখানে পৌঁছাতে পারবে। শিয়া জনগোষ্ঠীর আরেকটি বড় অংশ রয়েছে ইয়েমেনের সীমান্তবর্তী এলাকায়। এছাড়া মক্কা ও মদিনাতেও উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শিয়া বসবাস করে।

সৌদি আরবের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে রাজধানী রিয়াদ এবং নাজদ অঞ্চল। রিয়াদ দেশের বৃহত্তম শহর এবং রাজনৈতিক কেন্দ্রবিন্দু হলেও অন্যান্য প্রধান জনবসতি থেকে এটি সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। এই ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা রিয়াদের ইসলাম চর্চাকে তুলনামূলকভাবে আরও কট্টর করে তুলেছে, যা এমনকি বেশিরভাগ সৌদি জনগণের কাছেও অতিরিক্ত কঠোর মনে হয়। অতি প্রাচীনকালে 'মরুভূমির জাহাজ' খ্যাত উটের আবির্ভাব মরুভূমির বুকে মানুষের চলাচলের সুযোগ করে দিয়েছিল। ফলে ব্যবসায়ীরা মক্কা ও মদিনার মতো ছোট ছোট মরূদ্যান ভিত্তিক শহরে সহজেই আসা-যাওয়া করতে পারত। তবে সৌদ পরিবার যেখানে বাস করত, অর্থাৎ সেই নাজদ অঞ্চলকে পশ্চিম দিক থেকে আলাদা করে রেখেছিল হিজাজ পর্বতমালা। আর বাকি তিনদিক থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল তিনটি বিশাল মরুভূমি। নাজদ কার্যত ছিল একটি অনুন্নত মরু অঞ্চল। এখানে পানির তেমন কোনো উৎস ছিল না। আসলে বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কেউই যেত না নাজদের আশেপাশে। তবে

এর মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল আরব উপদ্বীপের পূর্ব প্রান্ত থেকে মক্কায় যাওয়া হজ্বযাত্রীরা। হজ্বযাত্রীরা ছাড়া অধিকাংশ মানুষ নাজদের মধ্য দিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে বিকল্প সহজ পথ বেছে নিত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বহির্বিশ্ব নাজদকে একরকম উপেক্ষাই করে এসেছে।



চিত্র: বর্তমান সৌদি আরব রাষ্ট্রের প্রশাসনিক মানচিত্র। মানচিত্রের ওপরে গাঢ় রঙের অংশ ঐতিহাসিক নাজদ অঞ্চল। এই অঞ্চল থেকে সৌদ বংশের উত্থান।

নাজদ অঞ্চলের ইতিহাসে একটা পরিবর্তন আসে অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে এসে। সে সময় আল সৌদ বংশের কয়েকশত উচ্চাভিলাষী সদস্য আদ-দিরিয়াহ নামক এক মরূদ্যানের কাছে কয়েকটি খেজুর বাগানের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। এরপর এই মরূদ্যানকে ঘিরেই তারা বসতি স্থাপন করে এবং সৌদদের নেতা মুহাম্মদ ইবনে আল সৌদ নিজেকে আমির ঘোষণা করেন। মরুদ্যান থেকে একটু দূরেই

ছিল হাজর নামে একটা প্রাচীন শহর। ইবনে সৌদ শহরটির নাম বদলে রাখেন রিয়াদ। এরপর সেখানে তিনি গড়ে তোলেন একটি সমৃদ্ধ বাণিজ্যকেন্দ্র। শহরটি ধীরে ধীরে নাজদ অঞ্চলের রাজনৈতিক কেন্দ্র হয়ে ওঠে। যদি কখনো আপনার রিয়াদে যাওয়ার সুযোগ হয়, তাহলে মরুভূমির মধ্য দিয়ে ২৫ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে এই স্থানটি দেখে আসা আপনার জন্য একটা মূল্যবান অভিজ্ঞতা হতে পারে। শহরটি বেশ উপভোগ্য। তাছাড়া সৌদি রাষ্ট্রের জন্মস্থান হওয়ায় শহরটির রোমাঞ্চকর একটি দিকও আছে। ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃত আদ-দিরিয়াহ এখনো সেই অতীতের স্মৃতি ধরে রেখেছে। এখানে গেলে আপনি দেখতে পাবেন কাদামাটি দিয়ে তৈরি শহরের প্রাচীরের মধ্যে আধভাঙা ভবন, নতুন করে বানানো মাটির ঘর এবং কাদামাটির ইঁটে তৈরি চারতলা রাজপ্রাসাদ। সব মিলিয়ে জটিল গোলকধাঁধার মতো সরু গলিপথে ঘেরা ঐতিহাসিক এক শহর এটি।

সৌদ পরিবারের শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় ওয়াহাবি বংশের সঙ্গে একটি কৌশলগত জোট গড়ে তোলে তারা। এই জোট আজও বহাল রয়েছে। ধর্মীয় পণ্ডিত মুহাম্মদ ইবনে আবদ আল-ওয়াহাব ১৭৪৪ সালে মুহাম্মদ ইবনে সৌদের কাছে আনুগত্যের শপথ নেন। ইবনে আল-ওয়াহাব বিশ্বাস করতেন, সাধারণ মুসলিমদের অবশ্যই নিরঙ্কুশ আনুগত্যসহ একজন মুসলিম শাসকের অধীনে থাকতে হবে। আর এর বিনিময়ে সেই শাসককে দেশ পরিচালনা করতে হবে কঠোর ইসলামি নীতির ভিত্তিতে। খ্রিস্টানদের মতো ধর্ম ও রাজনীতিকে আলাদা করে রাখার কোনো ঐতিহ্যগত কলাকৌশল ইসলামে নেই। এই সমঝোতার ভিত্তিও ছিল মূলত ধর্ম ও রাজনীতির একাত্মকরণ। এখানে রাজনৈতিক ক্ষমতা থাকবে সৌদ পরিবারের হাতে, আর ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা নিয়ন্ত্রণ করবে ওয়াহাবিরা। এখনও পর্যন্ত মূলত এই কাঠামোই বজায় আছে। তবে মাঝেমধ্যেই সৌদি আরবের এই দুই স্তম্ভ একে অপরকে নিজের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালায়।

সৌদির বেশিরভাগ নাগরিক সুন্নি মুসলিম হলেও সবাই ওয়াহাবি মতবাদ অনুসরণ করে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, নাজদের উত্তরাঞ্চলে একসময় সৌদ পরিবারের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী শাম্মার গোত্রের শাসন ছিল, সেখানে সুন্নি মতবাদেরই তুলনামূলকভাবে কম কট্টর একটি সংস্করণ প্রচলিত আছে। একইভাবে, লোহিত সাগরের উপকূলীয় অঞ্চলগুলোর মানুষ নিজেদেরকে তুলনামূলকভাবে উদার মনে

করে। বহির্বিশ্বের প্রতিও তাদের মনোভাব বেশ খোলামেলা। তাদের মনস্তত্ত্ব ওয়াহাবি মতবাদের মূল নীতিগুলো থেকে অনেকটাই আলাদা। অর্থাৎ, আধুনিক বিশ্বের অন্যতম নিয়ন্ত্রিত সমাজ হিসেবে গড়ে ওঠার পেছনে সৌদি আরবের সব মানুষের পূর্ণ সম্মতি ছিল না। পরবর্তী সময়েও অনেকেই এই কঠোর ধর্মীয় কাঠামো ভেঙে আরও স্বাধীন সমাজ চেয়েছে।

আজকের যে সৌদি সমাজ আমরা দেখি সেটা তৈরি করা হয়েছে রীতিমতো পরিকল্পনা করে। সৌদ–ওয়াহাবি জোটকে আরও দৃঢ় করতে ইবনে সৌদের জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে ইবনে আবদ আল-ওয়াহাবের কন্যার বিয়ে দেওয়া হয়। আল সৌদ প্রকাশ্যে ওয়াহাবি মতবাদকে বুকে জড়িয়ে ধরেন, ওয়াহাবিরা সৌদদের সমর্থন জানায় এবং এরপর তারা একসঙ্গে আরব উপদ্বীপ জয়ের অভিযানে নামে। ১৭৬৫ সালের মধ্যে তারা পুরো নাজদ অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নেয় এবং চারদিকে সাম্রাজ্য সম্প্রসারণ করতে থাকে। খুব শিগগিরই পবিত্র মক্কা ও মদিনা শহর তাদের দখলে চলে আসে। এই দুই শহরে প্রবেশ করেই তারা বিভিন্ন ধর্মীয় স্থাপনা ধ্বংস করে দেয়। বিশেষভাবে আঘাত হানে শিয়া সংখ্যালঘুদের মাজার ও কবরস্থানের ওপর। ওয়াহাবিরা শিয়াদের 'রাফিদা' বলে উল্লেখ করত। রাফিদা শব্দের অর্থ 'প্রত্যাখ্যানকারী'। আরবি ভাষায় এটি একটি অবমাননামূলক শব্দ, যা একবিংশ শতকেও ওয়াহাবিরা ব্যবহার করে।

নাজদ অঞ্চল থেকে শুরু করে এই ক্ষমতা বিস্তারের সময়কালকে 'প্রথম সৌদি রাষ্ট্র' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। আদি এই রাষ্ট্র একসময় বর্তমান সৌদি আরবের বেশিরভাগ অংশসহ ওমানের উত্তরাঞ্চল, কাতার, বাহরাইন ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের কিছু অংশও দখল করে নিয়েছিল। তবে ১৮১৮ সালে অটোম্যান সাম্রাজ্যের সুলতান মিশর থেকে সামরিক বাহিনী পাঠিয়ে হিজাজ অঞ্চল দখলমুক্ত করেন। সেই সেনাবাহিনী এরপর নাজদের দিকে অগ্রসর হয়ে আদ-দিরিয়াহ দখল করে নেয় এবং শহরটির বড় অংশ ধ্বংস করে দেয়। এরপর স্বঘোষিত সুলতান আবদুল্লাহ আল সৌদকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হয় ইস্তাম্বুলে। সেখানে প্রকাশ্যে শিরচ্ছেদ করা হয় তাকে। ফলে আদি সৌদি রাজ্যের পতন ঘটে।

তবে এই ঘটনার দুই বছর পর অটোমানরা তাদের বেশিরভাগ সেনা প্রত্যাহার করে নেয়। আবদুল্লাহ আল সৌদের পুত্র তুর্কি ইবনে আবদুল্লাহ এই হত্যাযজ্ঞ থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন। আটোমানদের বাহিনী চলে যাওয়ার পর নতুন করে সাম্রাজ্য ও পরিবার পুনর্গঠনের উদ্যোগ নেন তিনি। ১৮২৪ সালের মধ্যে তিনি

রিয়াদ পুনরুদ্ধার করেন এবং এর মাধ্যমে দ্বিতীয় সৌদি রাষ্ট্রের সূচনা ঘটে। এই রাজ্য টিকে ছিল ১৮৯১ সাল পর্যন্ত। তবে এই পুরোটা সময়জুড়ে 'অটোমান সাম্রাজ্য' অর্থাৎ উসমানি খিলাফতের আক্রমণ মোকাবিলা করতে হয়েছে তাদের। শুধু তাই নয়, নাজদের শাম্মার পর্বতাঞ্চল থেকে উঠে আসা রাশিদি গোত্রের আক্রমণও ছিল নিয়মিত ঘটনা। এই রাশিদি বংশ ছিল নাজদের উত্তরাঞ্চলের শাম্মার আমিরাতের শাসক। সৌদ ও রাশিদিরা বহু দশক ধরে আরবের অভ্যন্তরীণ অঞ্চল নিয়ন্ত্রণের জন্য একে অপরের সঙ্গে লড়াই করছিল। শেষ পর্যন্ত ১৮৯০ সালে ভয়াবহ এক পরাজয়ের শিকার হয় সৌদরা। এই ঘটনার পর সৌদরা রিয়াদের দখল হারিয়ে ফেলে এবং কুয়েতে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়।

কুয়েতে দারিদ্র্য, ক্ষোভ আর অসহায়তার মধ্যে নির্বাসিত জীবন কাটাতে থাকে সৌদ গোত্র। ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে তাদের নাম মুছে যাওয়ারই কথা ছিল। কিন্তু এই গোত্রের মধ্যে এমন একজন মানুষ ছিলেন, যার পদবী একদিন পুরো একটি জাতির নাম হয়ে উঠবে। তার নামটাও ছিল বেশ বড়সর—আবদুল আজিজ বিন আবদুর রহমান বিন ফয়সাল বিন তুর্কি বিন আবদুল্লাহ বিন মুহাম্মদ আল সৌদ। ইবনে সৌদ নামে পরিচিত এই ব্যক্তি যখন পরিবারের সঙ্গে কুয়েতে পালিয়ে যান, তখন তার বয়স মাত্র পনের বছর। তার সামনে ছিল দারিদ্র্যের কঠিন বাস্তবতা। নামের গৌরব থাকলেও হাতে তার একটি রিয়ালও ছিল না। বিশের কোঠায় পৌঁছে, ১৯০১ সালে তিনি সৌদ বংশের নেতা হিসেবে তার পিতার স্থলাভিষিক্ত হন। 'নাজদের সুলতান' উপাধি গ্রহণ করেন তিনি। কিন্তু তখনো তার সামনে রয়েছে বিশাল বড় এক সমস্যা। নাজদের শাসনভার রাশিদিদের হাতে, আর তিনি কুয়েতে নির্বাসিত।

আবদুল আজিজ ইবনে সৌদ এই ধরনের প্রতিবন্ধকতাকে নিজের সুলতানির পথে বাধা হিসেবে মেনে নেওয়ার মতো ব্যক্তি ছিলেন না। ১৯০২ সালের জানুয়ারি মাসে মাত্র বিশজন যোদ্ধার একটি দল নিয়ে তিনি নাজদে প্রবেশ করেন। এক অন্ধকার রাতে সুযোগ বুঝে রিয়াদের প্রাচীর টপকে ভেতরে ঢুকে রাশিদি গভর্নরকে হত্যা করে শহর দখল করেন তিনি। এক বর্গকিলোমিটার আয়তনের এই শহরের নতুন সুলতান হয়ে উঠলেন তরুণ ইবনে সৌদ।

এই শহরটি ছিল রাজ্য পুনরুদ্ধার অভিযানের জন্য আদর্শ ঘাঁটি। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময়ের মধ্যে নাজদের বেশিরভাগ অঞ্চল পুনর্দখল করে সত্যিকারের 'নাজদের সুলতান' হয়ে ওঠেন ইবনে সৌদ। তবে তার

উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল আরও অনেক বড়। তার লক্ষ্য ছিল বর্তমান সিরিয়া ও জর্ডানের কিছু অংশ এবং হিজাজ রাজ্য। এই হিজাজেই মক্কা ও মদিনা অবস্থিত। তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা উপসাগরীয় উপকূলের বাকি অংশও ছিল তার লক্ষ্য। তবে সরাসরি এসব অঞ্চল দখলের চেষ্টা করলে ব্রিটিশ ও অটোমানদের সঙ্গে সংঘর্ষ বাঁধতে পারত। তাই তিনি প্রথমে তার পুরোনো শত্রু রাশিদিদের দিকে মনোযোগ দিলেন। রাশিদিরা ছিল উসমানি সাম্রাজ্যের মিত্র। ফলে ইবনে সৌদ স্বাভাবিকভাবেই ব্রিটিশদের সঙ্গে হাত মেলান। ব্রিটিশরা তাকে অর্থ ও অস্ত্র দিয়ে সাহায্য করেছিল যাতে তিনি রাশিদিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারেন। সুলতান ইবনে সৌদ এই উপহার পেয়ে বললেন, "অসংখ্য ধন্যবাদ"। তিনি এই অর্থ-সম্পদ নিজের কাছে রেখে দিলেন, আর অস্ত্রশস্ত্র জমিয়ে ভবিষ্যতের জন্য এক বিশাল অস্ত্রাগার গড়ে তুললেন। তারপর চুপচাপ বসে অপেক্ষা করলেন বিদেশিদের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ শেষ হওয়ার জন্য। বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর একসময় সুযোগ বুঝে নতুন করে রাশিদিদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করেন তিনি। এই যুদ্ধে তিনি সবচেয়ে বেশি ভরসা রেখেছিলেন ইখওয়ান বাহিনীর ওপর। এই বাহিনী ছিল প্রায় এক লাখ চরমপন্থী ওয়াহাবি যোদ্ধার একটি দল। বিশাল এই দলটা অ-ওয়াহাবিদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সবসময় উদগ্রীব হয়ে থাকত। তারা এতটাই আগ্রাসী হয়ে উঠেছিল যে, একসময় তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে ইবনে সৌদকে সামরিক ব্যবস্থা নিতে হয়। ১৯২০ সালে ইবনে সৌদের সুসজ্জিত বাহিনী রাশিদিদের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে এবং মাত্র দুই বছরের মধ্যেই তাদের পরাজিত করে। এর ফলে তার রাজ্যের আয়তন প্রায় দ্বিগুণ হয়ে যায়।

এরপর তিনি নজর ফেরান আরেক ঐতিহাসিক প্রতিপক্ষ হাশেমি বংশের দিকে। হাশেমিরা তখন সুন্নি মুসলিমদের মধ্যে সবথেকে সম্মানিত বংশ। সেই ১০ম শতাব্দী থেকে মক্কার তত্ত্বাবধায়ক এবং আমির পদে ছিলেন হাশেমি বংশোদ্ভূতরা। মক্কা ইসলামের পবিত্রতম স্থান। এখানেই মহানবী হযরত মুহাম্মদের (সাঃ) জন্ম হয়েছিল। মুসলিমদের পবিত্রতম স্থান কাবার অবস্থানও এই শহরেই। এই হাশেমি বংশ প্রাচীন আরব কুরাইশ গোত্রের একটা শাখা। তারা নিজেদের বংশপরম্পরা নবী মুহাম্মদের দাদা হাশিম ইবনে আবদ মানাফ পর্যন্ত টেনে নিয়ে যান। কাবার তত্ত্বাবধায়ক ও কুরাইশ বংশের সম্মানিত নেতা হওয়ায় হাশেমিদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক মর্যাদা ছিল আরবদের কাছে অত্যন্ত উচ্চ। তবে তারা স্থানীয়ভাবে প্রভাবশালী হলেও মক্কার বাইরের বৃহৎ খেলাফতের প্রতি আনুগত্য দেখাতেন। বিভিন্ন সময়ে আব্বাসীয়, ফাতিমীয়, এবং পরে মামলুক ও উসমানি

সুলতানরা মক্কার ওপর সার্বভৌমত্ব দাবি করেছেন। আর তাদের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেই স্থানীয় প্রশাসন চালাতেন হাশেমিরা। অটোমান সুলতানদের যুগে অর্থাৎ ১৬শ শতাব্দী থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত মক্কার শরিফরা কার্যত আধা-স্বাধীন ছিলেন। তারা ধর্মীয় মর্যাদা ও স্থানীয় কর্তৃত্ব বজায় রাখতেন, কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে তারা ছিলেন অটোমান সুলতানের অধীন। তাদেরকে বলা হতো মক্কার শরিফ অর্থাৎ 'মর্যাদাবান বংশের শাসক'।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়, ১৯১৬ সালে মক্কার তৎকালীন শরিফ হুসেইন ইবনে আলি অটোমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। এই আরব বিদ্রোহ উসকে দিয়েছিল ব্রিটিশরা। তারা হুসেইনকে গোপন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, যদি তিনি অটোমানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন তাহলে যুদ্ধের পর আরবদের জন্য একটি স্বাধীন একক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা হবে। এই প্রতিশ্রুতি লিপিবদ্ধ হয়ে আছে বিখ্যাত 'হুসেইন–ম্যাকমোহন চিঠিপত্রে (১৯১৫–১৬)। ১৯১৬ সালের ১০ জুন তিনি হিজাজকে স্বাধীন রাজ্য ঘোষণা করেন এবং নিজেকে আরবদের রাজা সুলতান হুসেইন বিন আলি আখ্যা দেন। তার বাহিনী মক্কা, মদিনা, জেদ্দা ও ইয়ানবু ঘিরে উসমানি প্রশাসন ও সেনাবাহিনীর ওপর আক্রমণ চালায়। এই বিদ্রোহীদের অস্ত্র, অর্থ ও সামরিক উপদেষ্টা দিয়ে সাহায্য করেছিল ব্রিটিশরা। আরব বিদ্রোহকে সংগঠিত করতে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন ব্রিটিশ উপদেষ্টা টি. ই. লরেন্স। সে সময় সবাই তাকে 'লরেন্স অব অ্যারাবিয়া' নামে চিনত। কিন্তু যুদ্ধের পর হাশেমিদের সেই প্রতিশ্রুত 'বৃহৎ আরব রাজ্য' আর বাস্তবায়িত হয়নি। ব্রিটিশরা উল্টো সাইকস–পিকো চুক্তির মাধ্যমে মধ্যপ্রাচ্যকে ভাগ করে নেয় ফ্রান্সের সাথে। তবে ক্ষতিপূরণ হিসেবে হাশেমিদের অন্যত্র সিংহাসন দেয় ব্রিটিশরা। ১৯২১ সালে হুসেইনের এক ছেলে ফয়সাল ইবনে হুসেইনকে ইরাকের সুলতান বানায় তারা। আর আরেক ছেলে আবদুল্লাহ ইবনে হুসেইনকে বানানো হয় জর্ডানের আমির। সাইকস-পিকো চুক্তি অনুসারে উভয় রাজ্যই তখন ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণ ও প্রভাবের অধীনে।

ইবনে সৌদ ১৯২৪ সালে তার বাহিনী নিয়ে হিজাজে হামলা চালায়। এই আক্রমণের পর হুসেইন ইবনে আলি পুরো হাশেমি পরিবারসহ ইরাক ও জর্ডানে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। এর ফলে প্রায় এক হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে মক্কা–মদিনার প্রশাসক থাকা হাশেমি পরিবারের সরাসরি কর্তৃত্ব শেষ হয়ে যায়। মক্কা ও মদিনা শহর ইবনে সৌদের নিয়ন্ত্রণে আসে ১৯২৫ সালে।

এর দুই বছর পর তিনি ব্রিটিশদের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি অনুযায়ী ব্রিটিশরা তাকে নাজদ ও হিজাজের রাজা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। আর এর বিনিময়ে তিনি হিজাজের উত্তরাঞ্চলের কিছু অংশ জর্ডানের হাতে তুলে দিতে সম্মত হন এবং জর্ডানের পূর্বাঞ্চলের ওপর দাবি পরিত্যাগ করেন। ইবনে সৌদ এরপরে অনেকটা হাশিমদের অনুকরণে 'খাদিম আল-হারামাইন আশ-শরিফাইন' অর্থাৎ 'মক্কা ও মদিনার দুই পবিত্র মসজিদের তত্ত্বাবধায়ক' উপাধি গ্রহণ করেন।

এই সময় ইবনে সৌদ ছিলেন আরব উপদ্বীপের একমাত্র স্বাধীন আরব নেতা। কেউই তার ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করার অবস্থানে ছিল না। ব্রিটিশদের সঙ্গে তার কৌশলগত চুক্তি তাকে দুটো সুবিধা দিয়েছিল। এই চুক্তি একদিকে যেমন তাকে ব্রিটিশ হস্তক্ষেপ থেকে রক্ষা করে, অপরদিকে পুরো উপদ্বীপের ওপর নিয়ন্ত্রণ সুসংহত করতেও সাহায্য করে। ১৯৩২ সালে ইবনে সৌদ আবার তার উপাধি পরিবর্তন করেন। তবে এবার শুধু নিজের উপাধি নয়, বরং গোটা দেশের নামই বদলে দেন ইবনে সৌদ। হিজাজ এবং নাজদ একত্রিত করে তিনি একটি একক রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি নতুন রাজ্যের নাম দেন 'আল-মামলাকাতুল আরাবীয়াতুস সৌদিয়া' বা 'কিংডম অব সৌদি আরব'। আর আবদুল আজিজ ইবনে সৌদ হন এই রাজ্যের প্রথম বাদশাহ।

ইবনে সৌদ মূলত যুদ্ধের মাধ্যমে সৌদি আরবকে একত্রিত করেছিলেন। কিন্তু এটিকে সংহত রাখার জন্য তিনি আরও কৌশলী পন্থা অবলম্বন করেন। পরাজিত গোত্র এবং শীর্ষস্থানীয় ধর্মীয় পরিবারের কন্যাদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন তিনি। সব মিলে তার প্রায় বিশজন স্ত্রী ছিল। তবে ধর্মীয় আইনের নিয়ম মেনে একই সময়ে কখনো চারজনের বেশি নয়। তার সন্তানসংখ্যা ছিল একশরও বেশি। আজও দেশটির ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছে তার বংশধররাই।

সৌদি আরবের সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী, সৌদ বংশ আরব উপদ্বীপকে একত্রিত করেছিল সকল গোত্রের কল্যাণের জন্য। আর ইবনে সৌদ মূলত সেই পুরোনো সৌদি রাষ্ট্রই নতুন করে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এর ব্যাখ্যা হলো, ইবনে সৌদ শুধু তার পূর্বপুরুষদের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেছেন এবং পারিবারিক ভূমির ওপর নিজের কর্তৃত্ব ফিরিয়ে এনেছেন। এই ইতিহাসের অন্য কোনো ব্যাখ্যা সৌদি আরবে নিষিদ্ধ। দেশের মধ্যে এই বিষয় নিয়ে ভিন্নমত কতটা রয়েছে, তা নির্ণয় করাও খুব কঠিন। কারণ, স্থানীয়রা সাধারণত এই বিষয়টি নিয়ে বিদেশিদের সামনে কথা বলার ঝুঁকি নেয় না। আমি নিজেও তা জানার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি।

তবে বিদেশে বসবাসরত সৌদি অধ্যাপক মাদাওয়ি আল-রাশিদ তার লেখায় এক ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। তার মতে, সৌদি আরবের জন্ম আসলে সম্পূর্ণ নতুন একটি রাষ্ট্রের আবির্ভাব। আল-রাশিদের ভাষ্য অনুযায়ী, সৌদি আরবের কোনো ঐতিহাসিক ঐক্যের স্মৃতি কিংবা জাতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তি না থাকায় এরকম বানোয়াট একটি ইতিহাস তৈরি করে জনগণের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

সৌদি আরবের ইতিহাস নিয়ে এই বিতর্ক গুরুত্বপূর্ণ, কারণ সৌদি রাজপরিবারের কর্তৃত্ব টিকে থাকার অন্যতম ভিত্তি হলো তাদের বৈধতার প্রতি জনগণের সম্মতি। সাম্প্রতিক দশকগুলোতে সাধারণ সৌদি নাগরিকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার প্রচেষ্টার মাধ্যমে এই বৈধতাকে আরো সুসংহত করা হয়েছে। আর তা সম্ভব হয়েছে দেশের বিপুল জ্বালানি সম্পদ থেকে অর্জিত অবিশ্বাস্য পরিমাণ অর্থ লাভের ফলে।

১৯৩০-এর দশকের আগের কয়েক দশকে ইরান, বাহরাইন এবং ইরাকে তেলের সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। ফলে তেল কোম্পানিগুলো ধারণা করেছিল যে, সৌদি আরবেও বিপুল পরিমাণ তেলের মজুদ থাকতে পারে। বর্তমান সময়ের ইস্টার্ন প্রভিন্সে তেল অনুসন্ধানের অনুমতি চেয়ে ইবনে সৌদের দ্বারস্থ হয় তারা। বাদশাহ ব্রিটিশ কোম্পানিগুলোর প্রতি সন্দিহান ছিলেন। তার আশঙ্কা ছিল, ব্রিটিশরা কোনোভাবেই তাদের ঔপনিবেশিক প্রবণতা দমন করতে পারবে না। তারা সৌদির রাজনীতিতে অতিরিক্ত হস্তক্ষেপের চেষ্টা করবে। ফলে ব্রিটিশদের বদলে ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানির (SOCAL) হাতে তেলের অনুসন্ধান ও উত্তোলনের চুক্তি তুলে দেওয়া হয়। এটা ১৯৩৩ সালের ঘটনা। তবে সৌদিরা এটাও জানত যে অ্যামেরিকানরাও তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে খানিকটা নাক গলাবে। তবে তাদের ধরন হবে ব্রিটিশদের থেকে আলাদা, লন্ডনের মতো ঔপনিবেশিক মানসিকতা তাদের থাকবে না।

১৯৩৫ সালে পারস্য উপসাগর উপকূলের দাম্মামে খনন কাজ শুরু হয়। ১৯৩৮ সালে তেলের সন্ধান মেলে, এবং একই বছরে 'দাম্মাম ৭ নং' কূপ থেকে বিপুল পরিমাণ তেল উত্তোলন শুরু হয়। আর তখন থেকেই সৌদি আরবে পরিবর্তনের ঢেউ বইতে শুরু করে। পরে এই তেলকূপটির নামকরণ করা হয় 'সমৃদ্ধির কূপ'। SOCAL দাম্মামে একটি নতুন বন্দর নির্মাণ করে, পানির কূপ খনন করে এবং হাসপাতাল ও অফিস ভবন তৈরি করে। এসমস্ত নির্মাণ কাজের

জন্য বিদেশি শ্রমিকদের নিয়ে আসতে বাধ্য হয় তারা। কারণ, তৎকালীন বেশিরভাগ সৌদি নাগরিক যান্ত্রিক সরঞ্জামের ব্যবহার জানা তো দূরের কথা, সেগুলো কখনো চোখেই দেখেইনি। রিয়াদের জনসংখ্যা তখন ছিল মাত্র ৪০,০০০। সত্তর বছরের ব্যবধানে এই সংখ্যা বেড়ে পৌঁছায় ৬ মিলিয়নে।

সৌদি আরবে তেল এবং অর্থ প্রবাহিত হতে শুরু করে বটে, তবে প্রথমদিকে এই প্রবাহ মূলত ছিল কোম্পানির দিকেই। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে রিয়াদ আরও বেশি সুবিধা আদায় করতে সক্ষম হয় এবং ধীরে ধীরে তারা কোম্পানির কন্ট্রোলিং শেয়ার কিনে নিতে শুরু করে। একসময় কোম্পানিটি পুরোপুরি সৌদিদের হাতে চলে আসে এবং তারা কোম্পানির নতুন নাম দেয় 'সৌদি আরামকো'।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সৌদি আরব আনুষ্ঠানিকভাবে নিরপেক্ষ অবস্থান ধরে রাখলেও মিত্রশক্তির প্রতি তারা কিছুটা ঝুঁকে ছিল। আগে ভাবা হতো শিল্প ও সমৃদ্ধির জন্যই তেলের গুরুত্ব সবথেকে বেশি। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এটা প্রমাণ করে দেয় যে, যুদ্ধ পরিচালনার জন্যও আধুনিক বিশ্ব সম্পূর্ণভাবে তেলের ওপর নির্ভরশীল। একটি মাত্র মার্কিন মেকানাইজড ডিভিশন, অর্থাৎ প্রায় ২৫০টি ট্যাংক মাত্র ১৬০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে খরচ করত ২৫,০০০ গ্যালন তেল। এদিকে ইবনে সৌদ যেমন এটা জানতেন, ওদিকে প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টও এটা জানতেন। তাই তাদের সাক্ষাৎ হওয়া জরুরি হয়ে ওঠে।

১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সুয়েজ খালে নোঙর করা একটি মার্কিন যুদ্ধজাহাজে বৈঠকে বসেন ইবনে সৌদ এবং ফ্র্যাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট। দুই রাষ্ট্রপ্রধানই ছিলেন বাস্তববাদী নেতা। তারা ছিলেন প্রায় সমবয়সী এবং দুই জনেরই কিছুটা শারীরিক দুর্বলতা ছিল। সম্ভবত, এই শেষ বিষয়টির কারণেই তাদের মধ্যে একটি পারস্পরিক বোঝাপড়া গড়ে ওঠে। আজীবন লড়ে আসা যুদ্ধের ক্ষত বয়ে বেড়াচ্ছিলেন ইবনে সৌদ। এসব ক্ষত তাকে ধীরে ধীরে দুর্বল করে তুলছিল। সে সময় হাঁটতেও কষ্ট হতো তার। অন্যদিকে, রুজভেল্ট তখন হুইলচেয়ারে। তার জীবনের বাকি আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ। এই অবস্থায় তারা একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তিতে উপনীত হন। প্রথমত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবাধে সৌদির তেলের নিশ্চয়তা পাবে। দ্বিতীয়ত, সৌদি আরব নিজের সীমানার মধ্যে থাকবে, সীমানা বাড়ানোর চেষ্টা করবে না। আর তৃতীয়ত, অ্যামেরিকা সৌদি আরবের নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে। ইবনে সৌদের শত্রুর সংখ্যা ছিল অনেক, বিশেষ করে হাশেমি বংশ তখন ইরাক ও জর্ডানের শাসক। মাত্র বিশ বছর আগেই তিনি হাশেমিদের মক্কা-মদিনা

থেকে বিতাড়িত করেছিলেন। যদি কখনো তারা পর্যাপ্ত শক্তি অর্জন করে এবং সঠিক সুযোগ পেয়ে যায়, তবে তারা হিজাজ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করতে পারে। এই ধরনের ঘটনা ইবনে সৌদ ও তার রাজ্য সৌদি আরবের জন্য ভয়াবহ পরিণতি বয়ে আনবে। সুতরাং, বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশকে নিজের মিত্র বানানোই ছিল তার জন্য সবচেয়ে নিরাপদ পথ। এতে করে অ্যামেরিকা আর ইবনে সৌদের শত্রুদের পৃষ্ঠপোষকতা করবে না। ব্রিটিশরা তখনো হাশেমিদের সমর্থন করত। ইবনে সৌদের আশা ছিল এই নতুন মিত্রতার কারণে লন্ডন আর সৌদি আরবের বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র করার সাহস পাবে না।

ইবনে সৌদ সময়ের হিসাব ভালোই জানতেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। ফ্র্যাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট ফিরে যাওয়ার কয়েকদিন পরই সৌদি আরব আনুষ্ঠানিকভাবে জার্মানি ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এর ফলে দেশটি সদ্য গঠিত 'লিগ অব নেশনসে' (পরে জাতিসংঘ) সদস্যপদ লাভ করে। আর সঙ্গে সঙ্গে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় হয়ে ওঠে সৌদি আরব। তেল তাদের প্রভাবশালী করে তোলে, আর তাদের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেয় অ্যামেরিকা।

ইবনে সৌদ ১৯৫৩ সালে ৭৮ বছর বয়সে মারা যান। তিনি তার পরিবারকে এক অসাধারণ ভাগ্য পরিবর্তনের পথে নিয়ে গিয়েছেন। তার মৃত্যুর পর সিংহাসনে বসেন তার অসংখ্য পুত্রদের একজন—ক্রাউন প্রিন্স সৌদ। তবে সৌদির এই নতুন শাসক তার বাবার মতো বিচক্ষণ ছিলেন না। রাজকোষের টাকা তিনি ভোগবিলাসে উড়িয়ে দিতে শুরু করেন। ফলে দ্রুত শূন্য হতে থাকে সরকারি কোষাগার। অথচ এই সময়ে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য খাতে তেমন কোনো বিনিয়োগই করা হয়নি। তার বাবা ইবনে সৌদ যখন প্রথমবারের মতো নিজের জন্য একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন, সেটি তৈরি করা হয়েছিল সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত রোদে শুকানো কাদামাটির ইট দিয়ে। কিন্তু বাদশাহর ছেলে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ। শাসনের প্রথম কয়েক বছরের মধ্যেই দেশ-বিদেশের প্রায় সবার সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট করে ফেলেন তিনি। জনসাধারণের মধ্যে ক্রমেই বাড়তে থাকে অসন্তোষ। ১৯৬৪ সালের মধ্যে তার বেশ কয়েকজন ভাই মিলে তাকে সিংহাসন থেকে সরানোর সিদ্ধান্ত নেয়। এজন্য তারা দেশের প্রধান ধর্মীয় নেতাদের কাছে গেলেন। সৌদের অমিতব্যয়িতা নিয়ে ধর্মীয় নেতারা আগে থেকেই অসন্তুষ্ট ছিলেন। শীর্ষ নেতারা একটি ফতোয়া জারি করলেন। সেখানে 'পরামর্শ' দেওয়া হলো—বাদশাহর সিংহাসন ছেড়ে দেওয়া উচিৎ

এবং তার সৎভাই ফয়সালকে শাসক নির্বাচিত করা উচিৎ। সৌদ তখন বাধ্য হয়ে গ্রিসে নির্বাসনে গেলেন, আর ফয়সাল রওনা দিলেন রাজপ্রাসাদের দিকে।

নতুন বাদশাহ ফয়সালের শাসনামলে তেল থেকে পাওয়া রাজস্ব ১,৬০০ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পায়। এর ফলে দেশব্যাপী আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিবহন নেটওয়ার্ক এবং উদার জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব হয়। এছাড়াও আইনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে দাসপ্রথা বিলুপ্ত করা হয়। যদিও আধুনিককালে বিদেশি শ্রমিকদের প্রতি আচরণের মাধ্যমে এক ভিন্ন রূপে এই দাসপ্রথার অস্তিত্ব এখনো বজায় রয়েছে।

১৯৬৭ সালের আরব-ইসরায়েল যুদ্ধের সময় বাদশাহ ফয়সাল ছিলেন আধা-নিরপেক্ষ ভূমিকায়। তিনি প্রতীকীভাবে কিছু সৈন্য জর্ডানে পাঠান, তবে সংঘাতে সক্রিয়ভাবে অংশ নেননি। ১৯৭৩ সালে নতুন করে যুদ্ধ শুরু হয়। এবারও সৌদির সামরিক সম্পৃক্ততা সীমিত রাখেন তিনি। একটা পর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্র যখন ইসরায়েলকে অস্ত্র সরবরাহ শুরু করে, এর জবাবে আরব লীগ তখন পশ্চিমা দেশগুলোর ওপর তেল অবরোধের আহ্বান জানায়। এই সময় বাদশা আরব লীগের আহ্বানে সাড়া দেন এবং এতে সৌদি আরবের তেল উত্তোলন বন্ধ হয়ে যায়। ফলে বিশ্ববাজারে তেলের দাম বেড়ে যায় প্রায় তিনগুণ। এই পরিস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট নিক্সন সৌদি আরবকে সতর্ক করে জানান, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না এলে মার্কিন সেনারা সৌদি আরবে প্রবেশ করতে পারে। এর পর খুব দ্রুতই সৌদি নেতৃত্বের চিন্তাধারা বদলে যায়। বাদশা ফয়সাল গোপনে মার্কিন নৌবাহিনীকে তেল সরবরাহ শুরু করেন এবং পরের বছর আনুষ্ঠানিকভাবে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেন। সৌদি-অ্যামেরিকা 'অংশীদারিত্ব' যে আদতে কতটা একতরফা, তা এই ঘটনা থেকেই বোঝা যায়। পাশাপাশি এটাও বোঝা যায় যে, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা আসলে কার হাতে।

বাদশা ফয়সালের রাজত্বকালে সৌদির অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতেও বেশ কিছু উত্তাল ঘটনা ঘটে। ১৯৬৫ সালে সৌদি আরবে টেলিভিশন চালুর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই সিদ্ধান্তই শেষ পর্যন্ত ফয়সালের সহিংস পতনের পথ প্রশস্ত করে এবং দেশকে আরও বেশি ধর্মীয় উগ্রবাদের দিকে ঠেলে দেয়। ধর্মীয় রক্ষণশীলরা মনে করেছিলেন, এই নতুন প্রযুক্তি সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করবে। তাই প্রথম সম্প্রচারের আগেই ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু করে তারা। অথচ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হিসেবে কুরআন তেলাওয়াতেরই আয়োজন করা হয়েছিল। এই সময়

রাজপরিবারেরই এক সদস্য দলবল নিয়ে টেলিভিশন স্টুডিওতে হামলা চালান। নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে নিহত হন তিনি। এই ঘটনায় নিরাপত্তা বাহিনীর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি, যা কট্টরপন্থী ধর্মীয় নেতাদেরকে আরও ক্ষুব্ধ করে তোলে। তাদের সন্তুষ্ট করতে ফয়সাল এমন এক সিদ্ধান্ত নেন, যার ফল পরবর্তীতে ভয়ংকর হয়ে দেখা দেয়। মিশর ও সিরিয়ার ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের হাত থেকে পালিয়ে আসা কট্টর ইসলামপন্থীদের তিনি সৌদি আরবে বসবাসের সুযোগ দেন। শিক্ষাব্যবস্থায়ও নিয়োগ দেওয়া হয় তাদের। সৌদি আরবে এমনিতেই ধর্মীয় উগ্রপন্থার প্রবল চর্চা ছিল; ফয়সালের এই সিদ্ধান্ত সেই প্রবণতাকে আরও শক্তিশালী করে তোলে। এই প্রজন্মের মৌলবাদী শিক্ষকদের কাছ থেকেই একবিংশ শতকের সৌদি জিহাদিরা তাদের ভাবাদর্শ শিখেছিল।

১৯৭৫ সালে ঘটে এক ভয়ংকর ঘটনা। এক দশক আগে টেলিভিশনবিরোধী বিক্ষোভের সময় যে প্রিন্স নিহত হয়েছিলেন, তার ভাই গুলি করে হত্যা করেন বাদশাহকে। সরকারিভাবে অবশ্য এটিকে প্রতিশোধমূলক হত্যাকাণ্ড না বলে হত্যাকারীকে মানসিকভাবে অসুস্থ বলে প্রচার করা হয়। এরপর চতুর্থ বাদশাহ হিসেবে সিংহাসনে বসেন ফয়সালের সৎভাই প্রিন্স খালিদ। তার শাসনামলে এমন এক ঘটনা ঘটে যা সৌদি আরবের ইতিহাসের অন্যতম ভয়ংকর অধ্যায়ে পরিণত হয়।

১৯৭৯ সালের ২০ নভেম্বর কয়েকশত সশস্ত্র বিদ্রোহী মক্কার গ্র্যান্ড মসজিদ দখল করে নেয়। এই মসজিদ তৈরি হয়েছে পবিত্র কাবা শরিফকে ঘিরে। এই বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিলেন জুহাইমান আল-ওতাইবি। ওতাইবি পরিবার ছিল নাজদ অঞ্চলের অন্যতম প্রভাবশালী পরিবারগুলোর একটি। ১৯২০-এর দশকে সৌদি রাজপরিবারের হয়ে লড়াই করা সেই ইখওয়ান ওয়াহাবি যোদ্ধাদের বংশধর তিনি। তার দাদা স্বয়ং ইবনে সৌদের পাশাপাশি যুদ্ধ করেছেন। বিদ্রোহীরা মসজিদের চত্বরে বেশ কয়েকটি কফিন এনে রেখেছিল। সাধারণত মৃতদের জন্য দোয়া ও বরকত কামনার উদ্দেশ্যে কাবা চত্বরে কফিন আনা হতো। কিন্তু সেদিনের কফিনগুলোর ভেতরে ছিল আগ্নেয়াস্ত্র। ইসলাম ধর্মে কাবা শরিফ এতটাই পবিত্র যে, এর পাশেপাশে শিকার করা, গাছ কাটা, যুদ্ধ করা ইত্যাদি হারাম। শুধু এই মসজিদেই নয়, মক্কা শহরে প্রবেশও অমুসলিমদের জন্য নিষিদ্ধ। শহরের প্রবেশপথে বড় বড় সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে, যেখানে স্পষ্টভাবে লেখা আছে যে অমুসলিমদের প্রবেশ নিষেধ। মক্কার এই পবিত্র স্থানে রক্তপাত

কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। যদি কেউ এই আইন লঙ্ঘন করে তবে তাকে ক্রুশবিদ্ধ করে শাস্তি দেওয়ার বিধান রয়েছে।

হামলার খবর শুনে সৌদি নেতৃত্ব হতভম্ব হয়ে পড়ে। শুধু যে একটি পবিত্র স্থানের অবমাননা হয়েছে তাই নয়, বিদ্রোহীরা মসজিদের মাইক ব্যবহার করে রাজপরিবারকে দুর্নীতিগ্রস্ত হিসেবে ঘোষণা করছিল। তারা অভিযোগ করছিল যে, সৌদি রাজপরিবার বিদেশিদেরকে দেশের ভেতরে প্রবেশ করতে দিচ্ছে। আর এই বিদেশিরা তাদের বিলাসী ও নৈতিকভাবে অধঃপতিত জীবনযাত্রার মাধ্যমে সৌদি সমাজকে কলুষিত করছে। সব মিলে পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে ওঠে। রাজপরিবার প্রথমে পুরো শহর থেকে সাধারণ জনগণকে সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেয়। এরপর তারা দেশের শীর্ষ ধর্মীয় নেতাদের কাছে যায়, যাতে তারা এমন একটি ফতোয়া জারি করেন, যা মসজিদ পুনরুদ্ধারের জন্য শক্তি প্রয়োগের অনুমতি দেবে।

প্রায় এক সপ্তাহের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে উভয় পক্ষই ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির শিকার হয়। শেষপর্যন্ত ফরাসিদের সাহায্য নিতে বাধ্য হয় সৌদি কর্তৃপক্ষ। ফ্রান্স দীর্ঘদিন ধরেই সৌদি আরবের সঙ্গে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময় করে আসছিল এবং তাদের কাছে বিপুল পরিমাণ অস্ত্রও বিক্রি করছিল। সৌদির স্পেশাল ফোর্সকে প্রশিক্ষণ দিতে অতি গোপনীয়তার সঙ্গে সৌদি আরবে আসে ফ্রান্সের এলিট কাউন্টার-টেরর ইউনিট GIGN-এর তিনজন সদস্য। অবশেষে দুই সপ্তাহের মাথায় বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হয়। ৬৩ জন জীবিত বিদ্রোহী আত্মসমর্পণ করে। পরবর্তীতে সৌদি আরবের বিভিন্ন শহরে জনসমক্ষে শিরশ্ছেদ করা হয় তাদের।

এই ঘটনার ফলে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ইরানের বিপ্লবী নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনি কাবার ঘটনার জন্য 'মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ এবং আন্তর্জাতিক জায়নবাদকে' দায়ী করেন। এই বক্তব্যের জের ধরে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন দেশে। লিবিয়া ও পাকিস্তানে অ্যামেরিকান দূতাবাসে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এটি ছিল খোমেনির পরিচিত কৌশল। তিনি জানতেন, এই বক্তব্য কোটি কোটি মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে। কারণ, মুসলিমরা বিশ্বাস করতে রাজি ছিল না যে, কোনো মুসলিম পবিত্র কাবায় হামলা করতে পারে। সুতরাং, তিনি প্রচার করতে থাকেন—এর পেছনে অবশ্যই কোনো 'গোপন হাত' কাজ করছে এবং সম্ভবত সৌদি সরকার নিজেই এতে জড়িত।

সৌদি শাসনব্যবস্থায় এই ঘটনার দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়ে। আতঙ্কিত রাজপরিবার সামাজিক সংস্কার এবং আধুনিকায়নের সকল পরিকল্পনা পুরোপুরি

বাতিল করে দেয়। বাদশাহ খালিদ উপলব্ধি করেন যে, বিদ্রোহীদের বড় অংশই সেইসব গোত্রের লোক, যাদের সদস্যরা মূলত ন্যাশনাল গার্ডে কর্মরত। এর সমাধান হিসেবে তিনি আরও বেশি ধর্মীয় কঠোরতা আরোপের পথ বেছে নেন।

ধীরে ধীরে দেশজুড়ে কঠোর ধর্মীয় বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়। পরবর্তী চার দশক ধরে ধর্মীয় পুলিশ 'মুতাওয়া' ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করতে থাকে। সংবাদপত্র থেকে নারীদের ছবি বিলীন হয়ে যায়, টেলিভিশন থেকেও নারী উপস্থাপকদের সরিয়ে ফেলা হয়। ধর্মীয় রক্ষণশীল গোষ্ঠীগুলো বাড়তি সরকারি অনুদান পেতে থাকে। সিনেমা হলগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং জাতীয় শিক্ষাক্রমে ধর্মীয় শিক্ষার সময় আরও বাড়ানো হয়। স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালগুলোতে নিয়োগ দেওয়া হয় প্রচুর সংখ্যক আলেম। আর এই আলেমরা তরুণদের শেখাতে থাকেন, শুধু ওয়াহাবি মতবাদই প্রকৃত ইসলাম। বাকি সকলের বিরুদ্ধে জিহাদ করে প্রকৃত ইসলাম কায়েম করতে হবে। ফলে, পরবর্তী এক দশক ধরে হাজার হাজার সৌদি তরুণ আফগানিস্তানে গিয়ে 'নাস্তিক সোভিয়েত কমিউনিস্টদের' বিরুদ্ধে জিহাদে যোগ দেয়। কমিউনিস্টদের পরাজয়ের পরে দেশে ফিরে যে এই তরুণরা তাদের সামরিক দক্ষতা আন্তর্জাতিক জিহাদের জন্য ব্যবহার করতে চাইবে—এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এই দলটির মধ্যেই একজন ছিলেন ওসামা বিন লাদেন। তবে বিন লাদেন পরিবারের নাম বিশ্বজুড়ে পরিচিত হতে তখনও এক দশক বাকি।

এরই মাঝে বাদশাহ খালিদ মারা যান এবং তার সৎভাই ফাহাদ সিংহাসনে বসেন। ১৯৯০ সালে ইরাক যখন কুয়েত আক্রমণ করে, তখন মনে হচ্ছিল সাদ্দাম হুসাইনের পরবর্তী লক্ষ্য হবে সৌদি আরবের তেলক্ষেত্র। সে সময় ওসামা বিন লাদেন তার আফগান-প্রশিক্ষিত মুজাহিদিন বাহিনী দিয়ে দেশ রক্ষার প্রস্তাব দেন। তখনও এমনকি সৌদি আরবেও তেমন পরিচিতি পাননি লাদেন। তাই তাকে কেউ গুরুত্বও দেয়নি। এর বদলে ফাহাদ সাহায্যের জন্য হাত বাড়ান অ্যামেরিকার দিকে। 'দুই পবিত্র মসজিদের রক্ষক' বাদশা নিজেই কয়েক লাখ 'অবিশ্বাসী' অ্যামেরিকান সৈন্যকে সৌদির মাটিতে আমন্ত্রণ জানান। মার্কিন বাহিনীতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় নারীরাও ছিল! এটাই স্বাভাবিক। বিষয়টি ধর্মীয়ভাবে ন্যায্যতা দিতে শীর্ষ ইসলামি আলেমদের কাছ থেকে একটি ফতোয়া নিয়েছিলেন ফাহাদ। বাদশাহ ফতোয়া পেলেন ঠিকই, কিন্তু এর বিনিময়ে সৌদি আরব এমন কিছু পেল, যা তারা কল্পনাও করেনি।

অ্যামেরিকান বাহিনী এল, দেখল এবং জয় করল। তাদের নেতৃত্বাধীন জোট বাহিনী খুব দ্রুতই সাদ্দামের বাহিনীকে কুয়েত থেকে হটিয়ে দেয়। এই বাহিনীতে সৌদি সেনারাও ছিল। কিন্তু সমস্যা হলো, মার্কিনিরা সৌদি আরব ছেড়ে নড়ল না। ওসামা বিন লাদেনের মতো কট্টর ইসলামপন্থীদের জন্য বিষয়টি তখন অসহনীয় হয়ে ওঠে। অনেকেই প্রশ্ন তুলতে লাগল, সরকার যদি বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে সর্বাধুনিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাই গড়ে তুলে থাকে, তাহলে 'কাফির' অ্যামেরিকানদের সাহায্যের দরকার পড়ল কেন? অন্যদিকে অ্যামেরিকান সেনাদের উপস্থিতি আবার দেশের সংস্কারপন্থীদের সাহসী করে তুলল। ফলে শাসকগোষ্ঠী দুই দিক থেকেই বিরোধিতার মুখে পড়ল—একদিকে ইসলামপন্থীদের চাপ, অন্যদিকে উদারপন্থীদের সংস্কারের দাবি। সব মিলে সৌদি রাজপরিবারের জন্য সংকট আরও গভীর হলো। তবে সবচেয়ে ভয়ংকর হুমকি ছিল ইসলামপন্থীদের দিক থেকে। সৌদি বাদশাহরা তাদের শাসনের বৈধতা আংশিকভাবে ধর্মীয় ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছেন। কিন্তু 'বাদশাহ' বা 'বাদশাহী'—এ দুইটি শব্দের একটিও ইসলামের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। তাছাড়া বাদশাহরা আলেম নন, কিন্তু তারা দাবি করেন শরিয়াহ অনুসারেই দেশ পরিচালনা করছেন। তাই ইসলামপন্থী বিরোধী গোষ্ঠীর উত্থান পুরো সৌদি শাসনব্যবস্থাকে তখন নাড়িয়ে দেয়।

১৯৯৫ সালে সৌদি ন্যাশনাল গার্ডের জন্য পরিচালিত একটি মার্কিন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সদর দফতরে এক ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। এতে পাঁচজন অ্যামেরিকান ও দুইজন ভারতীয় নিহত হয়। এই ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয়েছিল চারজন তরুণ সৌদি নাগরিককে। টেলিভিশনে তাদের স্বীকারোক্তি নেওয়া হয়; সেখানে তারা দাবি করে যে ওসামা বিন লাদেনের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই তারা হামলাটি চালিয়েছে। পরে তাদের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। এরপর ১৯৯৬ সালে আরও একটি বোমা হামলা হয়। এবার লক্ষ্য ছিল মার্কিন সামরিক কর্মীদের আবাসিক ভবন। এতে নিহত হন উনিশজন। এই ধরনের আরও বেশ কিছু হামলার ঘটনা ঘটেছিল, তবে সৌদি গোয়েন্দা সংস্থাগুলো বেশ কয়েকটি বিদ্রোহী গোষ্ঠীকে নির্মূল করে সমস্যাটিকে কিছুদিনের জন্য চাপা দিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। কিন্তু ২০০১ সালে সেই চাপা দেওয়া পর্দাটা সরিয়ে দিলেন বিন লাদেন। তিনি এতটাই জোরে আঘাত করলেন যে অ্যামেরিকানরা যুদ্ধে নেমে পড়ল, আর সৌদি রাজপরিবারের ভিত পর্যন্ত কেঁপে উঠল।

২০০১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ারে ভয়াবহ হামলার মূল পরিকল্পনাকারী ছিলেন স্বয়ং ওসামা বিন লাদেন। হামলায় অংশ নেওয়া উনিশজন আততায়ীর মধ্যে পনেরোজনই ছিল সৌদি নাগরিক। সৌদি কর্তৃপক্ষ একান্তে স্বীকার করেছিল যে, চরমপন্থা মোকাবিলায় তাদের ব্যর্থতাই আল-কায়েদার উত্থানে ভূমিকা রেখেছে। তবে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের জন্য নিজেদের দায় প্রকাশ্যে কখনো স্বীকার করেনি তারা।

সমগ্র বিশ্ব এটা জানে যে, রিয়াদ শত শত মিলিয়ন ডলার ব্যয় করে বসনিয়া বা পাকিস্তানের মতো স্থানে ওয়াহাবি প্রভাবিত মসজিদ-মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছে। তবে ওয়াহাবিবাদ নিজে তো আর সন্ত্রাস নয়, আর তাছাড়া অর্থের জোর অনেক কিছুই চাপা দিতে পারে। যদিও কিছু মসজিদের কর্মকাণ্ড নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিশেষ করে তাদের কিছু ধর্মীয় বক্তব্য মানুষকে সহিংসতার দিকে নিয়ে যাওয়ার পরে এই প্রশ্নগুলো সামনে আসে। তবে সৌদি প্রশাসন কখনো এসব অভিযোগকে গুরুত্ব দেয়নি। অ্যামেরিকা যখন আফগানিস্তানে যুদ্ধ শুরু করল, তখন সৌদির জনগণের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছিল। অনেকেই যুদ্ধের বিপক্ষে ছিল। তবে সৌদি সরকার নীরবে তাদের বিমানঘাঁটিগুলোকে মার্কিন কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সেন্টার হিসেবে ব্যবহারের অনুমতি দেয়। এদিকে, আফগানিস্তানে ধরা পড়া এবং গুয়ান্তানামো বে কারাগারে পাঠানো যোদ্ধাদের মধ্যে আনুপাতিকভাবে সৌদি নাগরিকরাই ছিল সবচেয়ে বেশি। স্বাভাবিকভাবেই সৌদি গণমাধ্যম সেই খবরগুলো জনসাধারণকে কখনো জানায়নি।

আল-কায়েদায় যোগ দেওয়া কিছু সৌদি যোদ্ধা এই লড়াইকে নিজের দেশেও নিয়ে যায়। সৌদি রাজপরিবার একসময় ওসামা বিন লাদেনের সহায়তা প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং পরবর্তীতে লাদেনের শত্রুদের সহায়তা দিয়েছিল। এই কারণে বিন লাদেন এবং তার অনুসারীরা শুধু সৌদিতে থাকা মার্কিন সেনাদের ওপর হামলা চালিয়েই থামলেন না। তারা পুরো রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধেই অবস্থান নিলেন। দীর্ঘদিন ধরে সৌদি শাসকরা ওয়াহাবিবাদের ওপর ভরসা করেই নিজেদের শাসনব্যবস্থা চালিয়ে আসছিল। কিন্তু ৯/১১-এর ঘটনা তাদের চোখ খুলে দেয়। তারা বুঝতে পারে—যে মতবাদকে তারা এতদিন হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছিল, তার একটা অংশ এখন তাদেরই বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে গেছে।

২০০৩ সালে মার্কিন সরকার ঘোষণা দেয় যে তারা সৌদি আরব ছেড়ে চলে যাচ্ছে। ততদিনে তারা কাবুল থেকে তালেবানদের হটিয়ে দিয়েছে এবং বাগদাদেও

প্রবেশ করেছে। সৌদি আরবে তাদের উপস্থিতি যে পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলছে, সেটা তারা ধীরে ধীরে বুঝতে পারছিল। আফগানিস্তান ও ইরাকে 'বিজয়' নিশ্চিত করার পর তাদের মনে হলো, এখন সৌদি ছেড়ে যাওয়ার অবস্থা তৈরি হয়েছে। কিন্তু বিন লাদেন এত সহজে ছেড়ে দিতে রাজি ছিলেন না।

সেই বছরের মে মাসে রিয়াদের তিনটি আবাসিক কমপ্লেক্সে হামলা চালায় বন্দুকধারীরা। সেখানে মূলত বাস করতেন বিদেশি শ্রমিকরা। বন্দুকধারীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে 'ক্রুশ ও গরু পূজারীদের', অর্থাৎ খ্রিস্টান ও হিন্দুদের খুঁজতে শুরু করে। এই ঘটনায় মোট ৩৯ জন নিহত ও ১০০ জনেরও বেশি আহত হয়। এই হামলার পর আরও হামলা চলতে থাকে। জেদ্দায় মার্কিন কনস্যুলেটে বোমা বিস্ফোরণ ঘটে, হামলা হয় আরও কয়েকটি আবাসিক কমপ্লেক্সে। একই সময়ে পল জনসন নামে এক মার্কিন নাগরিককে অপহরণের পর নির্মমভাবে শিরশ্ছেদ করা হয়। তার মৃত্যুর ভিডিও পরে ইন্টারনেটে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই সমস্ত সহিংসতায় ১০০'র ওপর বিদেশি নাগরিক প্রাণ হারান। এদের মধ্যে ছিলেন ব্রিটিশ গণমাধ্যম বিবিসির চিত্রগ্রাহক সাইমন কাম্বারসও।

৩৬ বছর বয়সী আইরিশ সাংবাদিক সাইমন ছিলেন হাসিখুশি, সাহায্যপরায়ণ, প্রাণবন্ত ও উদার মনোভাবের দারুণ একজন মানুষ। তার মৃত্যুর মাত্র কয়েকদিন আগেই লন্ডনে একটি পার্টিতে আমাদের মধ্যে কথা হয়েছিল। আমরা দুইজনেই সৌদি আরবে যাচ্ছিলাম। সেখানে কীভাবে কাজ করা সহজ হবে সে বিষয়ে পরস্পরের সঙ্গে মতামত বিনিময় করছিলাম আমরা। যে ঘটনায় বিবিসির সংবাদদাতা ফ্রাঙ্ক গার্ডনার গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হয়েছিলেন সেই একই ঘটনায় সাইমন নিহত হন। তারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে শুটিং করছিলেন, এমন সময় বন্দুকধারীরা তাদের ওপর হামলা চালায়। কয়েক সপ্তাহ পর আমি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আল-কায়েদা এবং সাইমনের মৃত্যুর বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করছিলাম। আমরা অনুরোধ করেছিলাম, নিরাপত্তার জন্য একটা পুলিশের গাড়ি যেন আমাদের অনুসরণ করে। কিন্তু এলাকাটিতে ঢোকামাত্র হঠাৎ করে পুলিশের গাড়িটি কোথায় যেন উধাও হয়ে গেল। আমরা গাড়ি থেকে নেমেছিলাম মাত্র চার মিনিটের জন্য। শুট করে খুব দ্রুত আমরা ফিরে আসি। আমাদের গাড়ির চালক ছিলেন সেই একই ব্যক্তি, যিনি সাইমনদের নিয়ে গিয়েছিলেন। ঘটনার পর তিনি এতটাই মর্মাহত হন যে, কয়েক সপ্তাহের জন্য ছুটিতে চলে যান। আমি কিছু খোঁজখবর নিয়ে তাকে খুঁজে বের করি। আমাদের কথা শুনে অনেকটা জোর করেই আমাদের সহায়তা

করতে এগিয়ে আসেন তিনি। ক্যামেরার সামনে কথা বলতে চাননি তিনি, কিন্তু যখন নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন তখন তার চোখ থেকে অশ্রু ঝরছিল। তিনি ভয় পাচ্ছিলেন ঠিকই, কিন্তু দৃঢ়ভাবে এটাও বললেন যে তিনি আমাদের সাহায্য করবেনই। তিনি চেয়েছিলেন বাইরের বিশ্বের কাছে আরব আতিথেয়তার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে, যাতে সবাই জানতে পারে যে, অতিথিদের সাহায্য করা সৌদিদের জন্য গর্বের বিষয়। আসলে সৌদি আরবের ৪০ শতাংশেরও কম মানুষ ওয়াহাবি মতাদর্শ অনুসরণ করে। এমনকি ওয়াহাবিদের মধ্যেও অনেকেই নতুন প্রজন্মের জিহাদিদের এই বর্বরতা সমর্থন করেন না।

সেই সফরেই আল-কায়েদার কৌশল আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে আমার কাছে। ওদের মূল লক্ষ্য হলো, 'বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো, আর তার সুফল ঘরে তোলো'। যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সূত্র থেকে আমরা জানতে পারি, উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন বিদেশি কর্মীদের প্রায় ২০ শতাংশই সৌদি আরব ছেড়ে চলে গেছেন। কয়েক মাসের মধ্যে আরও অনেকেই চলে যান। ব্রিটিশ এয়ারওয়েজ এমনকি সৌদিতে ফ্লাইট পরিচালনাই বন্ধ করে দেয় এর কিছুদিন পর। এই ধারা চলতে থাকলে এক সময় দেশটির প্রযুক্তিনির্ভর খাত, বিশেষ করে জ্বালানি খাত সামগ্রিকভাবে থমকে যেত। এই খাতের রাজস্বের ওপরই সৌদি নাগরিকদের ভর্তুকি-নির্ভর জীবনযাত্রা টিকে আছে। অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে পড়লে সরকারের বিরুদ্ধে জন-অসন্তোষ বাড়ত। তাত্ত্বিকভাবে, এই পরিস্থিতিই হয়তো রাষ্ট্রকে দুর্বল করে দিত, আর সেই ফাঁক গলে ক্ষমতায় আসার সুযোগ পেত আল-কায়েদা। এই বিপর্যয় ঠেকাতে সৌদি কর্তৃপক্ষ চূড়ান্ত কঠোর ব্যবস্থা নেয়। তারা এমন দমন-পীড়ন শুরু করে যা ১৯৯০-এর দশকের দমন অভিযানকেও ছাড়িয়ে যায়। কঠোর নজরদারির মাধ্যমে গোয়েন্দা সংস্থাগুলো পরিস্থিতি আবারও নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে এবং দেশটিকে অস্থিতিশীলতার হাত থেকে রক্ষা করে।

সৌদি রাজতন্ত্র সে দফায় টিকে গেলেও বর্তমান নেতৃত্ব এটা ভাল করেই জানে যে চ্যালেঞ্জগুলো এখনও রয়ে গেছে। বর্তমানে নতুন নতুন সংকটের সঙ্গে দেশকে লড়তে হচ্ছে। সেই সঙ্গে এসেছে নতুন একজন নেতা। ২০১৭ সালে বাদশাহ সালমান তার একত্রিশ বছর বয়সী পুত্র মোহাম্মদ বিন সালমানকে 'ক্রাউন প্রিন্স' বা যুবরাজ হিসেবে নিয়োগ দেন। এর আগেই তাকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী বানানো হয়েছিল, অথচ তার সামরিক অভিজ্ঞতা প্রায় নেই বললেই চলে। এই তরুণের এত দ্রুত ক্ষমতার শীর্ষে উঠে আসা সৌদি আরবের অনেকের কাছেই অস্বাভাবিক

লেগেছে। বিশেষ করে রাজপরিবারের সদস্যরা এই ঘটনায় খুবই ক্ষুব্ধ হন। সৌদি রাজতন্ত্রের দীর্ঘদিনের রীতি অনুযায়ী সিংহাসনে আরোহণের পথ নির্ধারিত হয় বয়স ও বংশানুক্রমিক জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে। অনুমান করা হয়, রাজপরিবারে প্রায় ১৫,০০০ সদস্য রয়েছেন, যাদের মধ্যে প্রায় ২,০০০ জন জ্যেষ্ঠ সদস্য। দেশের ক্ষমতা বা সম্পদের নিয়ন্ত্রণও মূলত তাদের হাতেই। রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রতিপক্ষকে দুর্বল করার বহু উপায় ও কৌশল আছে। এই কারণে যুবরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হওয়া খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। তিনি এক অর্থে বেশ নাজুক অবস্থানে আছেন।

সিদ্ধান্তটি ভালো হোক বা মন্দ, আপাতত মোহাম্মদ বিন সালমানকেই সৌদি আরবের ভবিষ্যৎ নেতা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে বহু ক্ষমতার নিয়ন্ত্রণও তার হাতে চলে এসেছে। এমবিএস নামে পরিচিত এই নেতা রাজ্যের চারদিকে তাকিয়ে শুধু সমস্যা দেখতে পাচ্ছেন এবং সক্রিয় পদক্ষেপ নিচ্ছেন।

মোহাম্মদ বিন সালমানের পররাষ্ট্রনীতি বুঝতে গেলে তার পূর্বসূরিদের নীতির পাশাপাশি ইরানের সঙ্গে চলমান আঞ্চলিক স্নায়ুযুদ্ধের প্রসঙ্গটি বোঝা জরুরি। একুশ শতকের শুরু থেকেই এই সংঘাত বিভিন্ন জায়গায় প্রক্সি যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। ইরাকে মার্কিন অভিযান যে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয়েছিল তার ফলে ইরাকে একটি শিয়া-প্রধান সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। আর সেই সরকারের সঙ্গে ইরানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। ইরাকের রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করার জন্য ইরাকের বিভিন্ন শিয়া মিলিশিয়া গোষ্ঠীকে অস্ত্র ও অর্থ সহায়তা দিয়েছিল তেহরান। সৌদি আরব প্রথমে ইরাকের সরকারকে স্বীকৃতি দিতে অস্বীকৃতি জানায়। পাল্টা প্রতিক্রিয়া হিসেবে কিছু সুন্নি মিলিশিয়াকে সহায়তা দেয় রিয়াদ, যাতে শিয়া গোষ্ঠীগুলোর প্রভাব কমানো যায়। কিন্তু এই নীতি খুব একটা সফল হয়নি। তাই ২০১৫ সালে সৌদি আরব তাদের কৌশল পরিবর্তন করে। ইরানের প্রভাব কমানোর জন্য ইরাকের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করা হয় এবং বাগদাদের সঙ্গে অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করা হয়। আসলে সৌদি রাজপরিবারের মূল লক্ষ্য হলো যতটা সম্ভব স্থিতিশীল পরিবেশের মধ্য দিয়ে দেশে এবং মধ্যপ্রাচ্যে আধিপত্য ধরে রাখা।

২০১১ সালের 'আরব বসন্ত' সৌদি আরব ও ইরানের দ্বন্দ্বকে আরও তীব্র করে তোলে। সে বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে যখন বাহরাইনে বিক্ষোভ শুরু হয়, সৌদি সরকার তখন সেটাকে তেহরানের উসকানি বলে দাবি করে এবং দমন-

পীড়নে সাহায্য করতে বাহরাইনে সেনা পাঠায়। এরপর, ২০১২ সালে সিরিয়ার বিদ্রোহ যখন সাম্প্রদায়িক গৃহযুদ্ধে রূপ নেয়, সৌদি সরকার তখন ইরান-সমর্থিত প্রেসিডেন্ট বাশার আল-আসাদকে ক্ষমতা থেকে সরানোর চেষ্টায় যোগ দেয়। বিদ্রোহীদের সংগঠন 'ফ্রি সিরিয়ান আর্মির' মধ্যপন্থী ইউনিটগুলোকে অর্থ ও অস্ত্র দিয়েও সহায়তা করে তারা। সৌদি আরবের দৃষ্টিতে সিরিয়া হচ্ছে ইরানের জন্য একটি ভৌগোলিক করিডোরের অংশ। এই করিডোর তেহরান থেকে শুরু করে বাগদাদ এবং দামেস্ক হয়ে লেবাননের হিজবুল্লাহ পর্যন্ত বিস্তৃত। সৌদি শাসকরা মনে করত আসাদকে যদি ক্ষমতা থেকে সরানো যায়, তাহলে এই করিডোরটি ভেঙে পড়বে। কিন্তু পরিস্থিতি সৌদিদের পক্ষে যায়নি। একদিকে যুক্তরাষ্ট্র সরে দাঁড়ায়, আর অন্যদিকে রাশিয়া ও ইরান আসাদ সরকারকে টিকিয়ে রাখে। ফলে, ইরানের এই ভৌগোলিক প্রভাব বলয় অক্ষতই থেকে যায়। সৌদি আরব একদিকে যেমন ইরানের পারমাণবিক অস্ত্র অর্জনের সম্ভাবনাকে ভয় পায়, অন্যদিকে ইরানের আঞ্চলিক প্রভাব ও সামরিক উপস্থিতিকেও হুমকি হিসেবে দেখে। ইরান যদি সত্যিই পারমাণবিক শক্তিধর রাষ্ট্রে পরিণত হয়, তাহলে সৌদির পক্ষেও একই পথে হাঁটার সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর মোহাম্মদ বিন সালমান সরাসরি আগ্রাসী কৌশল গ্রহণ করেন। ২০১৫ সালে সৌদি আরব কাতারের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করে। তাদের অভিযোগ ছিল, কাতার যে শুধু ইরানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখছে তাই নয়, পাশাপাশি মুসলিম ব্রাদারহুড ও হামাসের মতো উগ্র ইসলামপন্থী গোষ্ঠীগুলোকেও সমর্থন দিচ্ছে। মাত্র তিন মিলিয়ন জনসংখ্যার ছোট দেশ হলেও বিশাল গ্যাস সম্পদের কারণে মধ্যপ্রাচ্যে গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হয়ে উঠেছে কাতার। অন্যান্য উপসাগরীয় দেশগুলোর মতোই তাদেরও রয়েছে আঞ্চলিক নেতৃত্বের উচ্চাকাঙ্ক্ষা। মূলত ১৯৯০-এর দশক থেকেই সৌদি আরব ও কাতারের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়েছিল। পরবর্তীতে এই বিরোধ আরও তীব্র হয় কাতারভিত্তিক টেলিভিশন আল-জাজিরার কার্যক্রমের ফলে। রিয়াদ মনে করে আল-জাজিরা তাদের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায়। এই শীতল সম্পর্ক মূলত মধ্যপ্রাচ্যে শুরু হওয়া স্নায়ু যুদ্ধের অন্যতম অনুঘটক। সৌদি আরবের অবরোধের জবাবে ইরান এবং তুরস্কের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে তোলে কাতার। কারণ ইরানের মতো তুরস্কও সৌদি আরবের প্রতিদ্বন্দ্বী। অন্যদিকে, সৌদি রাজপরিবার দীর্ঘদিন ধরে মিশরের সংগঠন মুসলিম ব্রাদারহুডকে নিজেদের শত্রু হিসেবে দেখে আসছে। কারণ এই সংগঠনটি রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার বিরোধিতা করে। ২০১৩

সালে মিশরে যখন সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ও মুসলিম ব্রাদারহুড নেতা মোহাম্মদ মুরসিকে সরিয়ে দিয়ে জেনারেল সিসি ক্ষমতায় আসেন, তখন রিয়াদ সরাসরি এই পরিবর্তনকে সমর্থন দিয়েছিল।

এদিকে লিবিয়ার গৃহযুদ্ধে তুরস্ক-সমর্থিত 'গভর্নমেন্ট অব ন্যাশনাল অ্যাকর্ড' (GNA)-এর বিরুদ্ধে 'লিবিয়ান ন্যাশনাল আর্মি' (LNA)-কে সমর্থন দেয় সৌদি আরব। সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের বিশ্বাস হলো, GNA মূলত মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রভাবাধীন একটি সরকার এবং তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ানও মুসলিম ব্রাদারহুডের সঙ্গে জড়িত। সংগঠনটি পারস্য উপসাগর অঞ্চলের রাজতন্ত্রগুলোর পতন চায়। ফলে সৌদি আরব ও সংযুক্ত আমিরাত এরদোয়ানকে তাদের নিরাপত্তার জন্য হুমকি হিসেবে দেখে। তাই একদিকে রিয়াদ যেমন মিশরের ব্রাদারহুডের সরকারকে সরিয়ে দেওয়ার পক্ষে ছিল, তেমনি লিবিয়াতেও তারা ব্রাদারহুড-সমর্থিত সরকার গঠন আটকাতে চেয়েছিল। কিন্তু, সৌদির অর্থায়নে লিবিয়ান ন্যাশনাল আর্মি শক্তি বাড়ালেও তুরস্কের অর্থ ও সামরিক হস্তক্ষেপের কারণে রাজধানী ত্রিপোলি দখল করতে ব্যর্থ হয় তারা।

মুহাম্মদ বিন সালমানের আরেকটি বড় পদক্ষেপ ছিল ইয়েমেনে সামরিক হস্তক্ষেপ। ২০১৫ সালে তিনি ইয়েমেনে 'অপারেশন ডিসাইসিভ স্টর্ম' নামে একটি সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন। লক্ষ্য ছিল ইরানের সমর্থনপুষ্ট শিয়া বিদ্রোহী গোষ্ঠী হুথিদের দমন করা। এই অভিযানে বেশিরভাগ উপসাগরীয় দেশই অংশ নিয়েছিল। সৌদি আরব কোনোভাবেই চায় না যে হুথিরা ইয়েমেনের নিয়ন্ত্রণ নেয়। কারণ এটি ইরানের প্রভাব বাড়িয়ে তুলবে এবং সৌদি আরবের সীমান্ত নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়াবে। তাছাড়া, ১৯৩৪ সালে ইয়েমেনের সঙ্গে এক যুদ্ধে সীমান্তবর্তী শিয়া অধ্যুষিত কিছু অঞ্চল দখল করেছিল সৌদি আরব। অনেক ইয়েমেনি এখনো সেই অঞ্চলগুলো ফেরত চায়। বিষয়টি রিয়াদের জন্য একটি কৌশলগত উদ্বেগের বিষয়।

কিন্তু 'অপারেশন ডিসাইসিভ স্টর্ম' ২০১৯ সালের মধ্যে তার লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হয়। সৌদি আরবের লাগাতার বিমান হামলায় ইয়েমেনের শহরগুলোতে ব্যাপক বেসামরিক প্রাণহানি ঘটে। এই হত্যাযজ্ঞ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তীব্র সমালোচনার জন্ম দেয়। অন্যদিকে, হুথিরাও পাল্টা প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং দূরপাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়ে সৌদি আরবের তেল শোধনাগার,

বিমানবন্দর এবং বিভিন্ন জনবসতিতে আঘাত হানে। সে বছরের শেষ দিকে সৌদির দুইটি প্রধান তেল শোধনাগারে হামলা চালানো হয়, যার ফলে কিছু সময়ের জন্য দেশের তেলের উৎপাদন অর্ধেকে নেমে আসে। হুথিরা হামলার দায় স্বীকার করলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দাবি করেছিল যে ক্ষেপণাস্ত্রগুলো এসেছে ইরান থেকে। সৌদি আরবও মার্কিন দাবির বিরোধিতা করেনি।

ইরানের বিরুদ্ধে সৌদি আরবের সামরিক অভিযানের সম্ভাবনা থাকলেও তা কখনো বাস্তবে রূপ নেয়নি। ট্রাম্পের প্রশাসন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল যে, এই ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধ করতে চায় না। অন্যদিকে, সৌদি আরবও একা যুদ্ধ চালানোর মতো শক্তিশালী অবস্থানে ছিল না। ফলে তারা পরিস্থিতি স্বাভাবিক হতে দেয় এবং ২০২০ সাল নাগাদ ধীরে ধীরে ইয়েমেন যুদ্ধ থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজতে থাকে। রিয়াদ এখন হুথিদের সঙ্গে একটি সমঝোতায় পৌঁছাতে চেষ্টা করছে। তাদের লক্ষ্য হলো হুথিদেরকে ইরানের প্রভাব থেকে সরিয়ে আনা। এর বিনিময়ে সৌদি আরব যুদ্ধবিধ্বস্ত ইয়েমেনের পুনর্গঠনে আর্থিক সহায়তা দিতে প্রস্তুত।

মুহাম্মদ বিন সালমানের পররাষ্ট্রনীতিকে বরাবরই আগ্রাসী এবং অবিবেচনাপ্রসূত বলে মনে করা হয়। এর অন্যতম উদাহরণ ছিল ২০১৭ সালের শেষ দিকের এক নাটকীয় ঘটনা। ওই সময় লেবাননের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী সাদ হারিরি সৌদি আরব সফরে গিয়ে আকস্মিকভাবে পদত্যাগ ঘোষণা করেন। হারিরি ভেবেছিলেন, তিনি মুহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গে একটি ক্যাম্পিং ট্রিপে যাচ্ছেন। কিন্তু রিয়াদে পৌঁছানোর পর তার দেহরক্ষীদের আলাদা করে ফেলা হয়, তার মোবাইল ফোন কেড়ে নেওয়া হয় এবং তাকে একা একটি কক্ষে আটকে রাখা হয়। এরপর নিরাপত্তা কর্মকর্তারা তাকে একটি কাগজ ধরিয়ে দেন। এটি ছিল তার পদত্যাগপত্র। তিনি সৌদির টেলিভিশনে এসে হিজবুল্লাহ ও ইরানকে দায়ী করে পদত্যাগের ঘোষণা দেন। এতে মুহাম্মদ বিন সালমানের কূটনৈতিক চাল স্পষ্ট হয়ে যায় এবং বিশ্বজুড়ে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়।

অনুমান করা হয় যে, মুহাম্মদ বিন সালমান আশা করেছিলেন হারিরির পদত্যাগের ফলে লেবাননের জোট সরকার ভেঙে পড়বে এবং এর মাধ্যমে হিজবুল্লাহর শক্তি খর্ব হবে। রিয়াদ কখনোই চায় না যে, ইরানের নিয়ন্ত্রিত কোনো শিয়া গোষ্ঠী রাজনৈতিকভাবে লেবাননে প্রভাবশালী হয়ে উঠুক। কিছু সূত্র আরও দাবি করে যে, হারিরিকে চাপ দেওয়া হয়েছিল লেবাননের ফিলিস্তিনি শরণার্থী শিবিরে থাকা মিলিশিয়াদের হিজবুল্লাহর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নির্দেশ দিতে। এই মত

বিশ্বাস করা কষ্টকর হলেও বিষয়টা পুরোপুরি অসম্ভব নয়। যদিও এটি বাস্তবে কতটা সম্ভব ছিল তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে, কারণ হিজবুল্লাহ লেবাননের সেনাবাহিনীর চেয়েও শক্তিশালী। ফলে এমন কোনো সংঘর্ষ হলে লেবাননের নিরাপত্তা আরও নাজুক হয়ে পড়ত।

পরবর্তী কয়েকদিনে লেবাননের সরকারি কর্মকর্তারা চরম উদ্বেগের মধ্যে পড়ে যান। তারা যুক্তরাষ্ট্র, মিশর, ফ্রান্সসহ বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে জানান যে—তাদের প্রধানমন্ত্রীকে সৌদি আরবে আটকে রাখা হয়েছে। নিউইয়র্ক টাইমসের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, বেশ কয়েকজন পশ্চিমা রাষ্ট্রদূত হারিরির সঙ্গে দেখা করার দাবি জানিয়েছেন। সৌদি কর্তৃপক্ষ শেষ পর্যন্ত অনুমতি দেয়। তবে শর্ত ছিল যে বৈঠকে দুইজন সৌদি নিরাপত্তা কর্মকর্তা উপস্থিত থাকবেন। এই ঘটনার পরপরই আন্তর্জাতিক মহলের তীব্র কূটনৈতিক চাপের মুখে হারিরিকে দেশে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। রিয়াদ ছাড়ার পরপরই তিনি ঘোষণা দেন—তিনি পদত্যাগ করতে রাজি নন!

লেবানন ও হারিরির ওপর যথেষ্ট প্রভাব খাটানোর ক্ষমতা রিয়াদের হাতে রয়েছে। হারিরির পারিবারিক ব্যবসা অনেকাংশেই সৌদি আরবের সহায়তার ওপর নির্ভরশীল। তাছাড়া সৌদি আরবে ২ লাখ ৫০ হাজার লেবানিজ কর্মরত আছেন। যদি তাদের দেশে ফেরত পাঠানো হয়, তবে লেবাননের দুর্বল অর্থনীতির ওপর তা মারাত্মক প্রভাব ফেলবে। সৌদি কর্মকর্তারা দাবি করেন যে হারিরিকে কোনোভাবে জোর করা হয়নি। কিন্তু তিনি কেন পদত্যাগ করলেন এবং পরে কেন সেই সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করলেন, তার কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা তারা দিতে পারেননি।

এই ঘটনার কারণে কূটনৈতিক মহলে ব্যাপক সমালোচিত হন মুহাম্মদ বিন সালমান। তবে এই ঘটনার চেয়েও ভয়াবহ প্রতিক্রিয়া আসে সৌদি সাংবাদিক জামাল খাশোগি হত্যার ঘটনায়। ২০১৮ সালের আগে থেকেই ক্রাউন প্রিন্সের শাসনব্যবস্থার কড়া সমালোচক হয়ে উঠেছিলেন খাশোগি। সে বছরের ২ অক্টোবর কিছু কাগজপত্র সংগ্রহের জন্য ইস্তাম্বুলের সৌদি কনস্যুলেটে প্রবেশ করেন তিনি। কিন্তু প্রবেশ করার পর তিনি আর কখনোই বের হননি। সেদিনই তার বাগদত্তা তাকে নিখোঁজ ঘোষণা করেন।

রিয়াদ দাবি করেছিল যে, খাশোগি কনস্যুলেট থেকে বেরিয়ে গেছেন। কিন্তু তারা কোনো সিসিটিভি ফুটেজ দেখাতে পারেনি। অথচ কনস্যুলেটের প্রতিটি প্রবেশ ও প্রস্থানের জায়গায় ক্যামেরা ছিল। তুরস্কের তদন্তকারীরা দ্রুত প্রমাণ সংগ্রহ

করেন— খাশোগিকে কনস্যুলেটের ভেতরই হত্যা করে টুকরো টুকরো করা হয়েছে। তুর্কি সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়, এই হত্যাকাণ্ড শীর্ষ পর্যায়ের অনুমোদন ছাড়া সম্ভব নয়। তদন্তে বেরিয়ে আসে, ওই দিন সকালেই ১৫ জন সৌদি এজেন্ট ইস্তাম্বুলে এসে রাতেই আবার ফিরে যায়।

খাশোগি হত্যার বিষয়টি ১৯ অক্টোবরের আগ পর্যন্ত সৌদি সরকার স্বীকার করেনি। এর আগে রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে প্রচারিত একটি প্রতিবেদনে দাবি করা হয়—কনস্যুলেটের ভেতরে যে ১৫ জন সৌদি নাগরিককে ঢুকতে ও বের হতে দেখা গিয়েছিল তারা আসলে পর্যটক! পরবর্তীতে সৌদি কর্মকর্তারা দাবি করেন যে খাশোগি আসলে একটি হাতাহাতি বা মারামারির সময় মারা গেছেন। কেউ ইচ্ছা করে তাকে হত্যা করেনি। এরপর আবার গল্পটা পাল্টে বলা হয় যে এটি ছিল 'অবাধ্য গোয়েন্দা সদস্যদের' একটি অপারেশন। তারা বরং বিস্মিতই হয়েছেন যে এমন একটি ঘটনা ঘটতে পারে। ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান নাকি একদমই জানতেন না যে এমন কিছু হতে যাচ্ছে!

কিন্তু এই ব্যাখ্যা বিশ্বাসযোগ্যতা পায়নি। কারণ সৌদি আরবের মতো কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্রের কোনো গোয়েন্দা সদস্য, বিশেষ করে এত উচ্চপর্যায়ের কোনো ব্যক্তির পক্ষে শীর্ষ নেতৃত্বের অনুমতি ছাড়া বিদেশে গিয়ে একটি আলোচিত হত্যাকাণ্ড ঘটানো প্রায় অসম্ভব। যাই হোক, রিয়াদের কাছে এটি পরিষ্কার হয়ে যায় যে এই হত্যাকাণ্ডের জন্য কাউকে না কাউকে শাস্তি পেতেই হবে। লোক দেখাতে কয়েকজন তথাকথিত সন্দেহভাজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। খাশোগির পরিবার তখনো সৌদি আরবেই অবস্থান করছিলেন। তারা পাঁচজন সন্দেহভাজনকে 'ক্ষমা' করে দেন। ফলে তাদের মৃত্যুদণ্ড এড়ানো সম্ভব হয়। শেষ পর্যন্ত ২০২০ সালের শেষ দিকে সৌদি আরবের আদালত চূড়ান্ত রায় দেয়। সাত থেকে বিশ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয় আটজন আসামিকে। তবে সবচেয়ে আলোচিত অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ খারিজ হয়ে যায়। সরকার কেবল এটুকু স্বীকার করে যে, "এটি একটি ভয়ংকর কাজ, একটি গর্হিত অপরাধ"। তবে এর পেছনের প্রকৃত নির্দেশদাতা কে, তা স্পষ্ট করা হয়নি।

একটা সময় পর্যন্ত বিশ্ববাসীর কাছে মুহাম্মদ বিন সালমান একজন সংস্কারক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু খাশোগি হত্যাকাণ্ডের ঘটনা তার সেই ভাবমূর্তিকে চূর্ণবিচূর্ণ করে দেয়। ব্যক্তিগত পর্যায়ে অনেক দেশ তাকে এড়িয়ে চলতে শুরু করে। তবে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সম্পর্ক প্রায় আগের মতোই থেকে যায়। খাশোগি হত্যার কয়েক

সপ্তাহ পর অনুষ্ঠিত এক জি-২০ সম্মেলনে কিছু বিশ্বনেতাকে মুহাম্মদ বিন সালমানের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতে দেখা যায়। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন অবশ্য তাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। পরের বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তান ও ভারতে গিয়েও আন্তরিক সংবর্ধনা পান তিনি। আর চীনে গিয়ে ২৮ বিলিয়ন ডলারের একটি অর্থনৈতিক চুক্তি সম্পন্ন করেন এমবিএস খ্যাত এই সৌদি রাজপুত্র। এমনকি সৌদির আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বী তুরস্ক, অর্থাৎ যে দেশে এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল, তারাও সৌদি আরবের বিরুদ্ধে কোনো কঠোর অর্থনৈতিক পদক্ষেপ নেয়নি। হত্যাকাণ্ডের পরের দুই বছরে দেশ দুইটির মধ্যে বাণিজ্য সামান্য কমলেও পুরোপুরি বন্ধ হয়নি। মূল কথা হলো, তেল মানেই টাকা, আর টাকা সবকিছুর ভাষা বোঝে। বিশ্ব যতদিন সৌদির সম্পদের ওপর নির্ভরশীল থাকবে ততদিন দেশটি বিশ্ব কূটনীতির পরিমণ্ডলে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ধরে রাখতে পারবে। কিন্তু এটা ভুলে গেলেও চলবে না যে, এরও একটা সীমা রয়েছে।

দেশের ভেতরে বসে ক্রাউন প্রিন্স যেসব কর্মকাণ্ড চালান সেসবও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে ব্যাপক আলোচিত হয়েছে। যে সময় লেবাননের প্রধানমন্ত্রীকে সৌদি আরবে দীর্ঘ 'আমন্ত্রণমূলক সফরে' রাখা হয়েছিল, ঠিক একই সময় রিয়াদের বিলাসবহুল রিটজ কার্লটন হোটেলে একের পর এক ঢোকানো হচ্ছিল রাজপরিবারের কিছু শীর্ষস্থানীয় সদস্যকে। এটি নিঃসন্দেহে এক অসাধারণ হোটেল। 'বিলাসিতা' শব্দটিও এই হোটেলের জন্য যথেষ্ট নয়। আপনার হাতে যদি বাড়তি ৮,০০০ পাউন্ড থাকে তাহলে আমি এই হোটেলের রয়্যাল স্যুটটি বুক করার পরামর্শ দিতে পারি। এই ধরনের একটা রুমে মরে গিয়েও শান্তি। তবে সেই সপ্তাহে কিছু অতিথি হয়তো ভাবছিলেন, সেখানে থাকা তাদের জন্য সত্যিই 'জীবন-মরণ' ব্যাপার হয়ে উঠেছে।

এই অতিথিদের জন্য রুম বুকিং দেওয়া হয়েছিল গোয়েন্দা সংস্থার পক্ষ থেকে। নিজ নিজ কামরায় পৌঁছানোর আগ পর্যন্ত অনেকেই জানতেন না যে তাদের জন্য রিজার্ভেশন দেওয়া হয়েছে। আসলে সৌদি আরবে শুরু হয়েছিল এক নজিরবিহীন 'শুদ্ধি অভিযান'। এই অভিযানের আওতায় রাজপরিবারের ১১ জন প্রিন্স এবং রাজনৈতিক, সামরিক ও বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে প্রভাবশালী বহু ব্যক্তিকে রিটজ কার্লটনে আটকে রাখা হয়। তাদের মধ্যে ছিলেন প্রিন্স মিতেব বিন আবদুল্লাহ, যিনি এমবিএসের কাজিন এবং ন্যাশনাল গার্ডের কমান্ডার। ন্যাশনাল গার্ড রাজ পরিবারের সরাসরি অধীনস্থ একটি বাহিনী। এই বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা

নিয়মিত সেনাবাহিনীর সমান। দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা রক্ষা করা এই বাহিনীর দায়িত্ব।

বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যায়, এমবিএস আশঙ্কা করেছিলেন যে, প্রায় ১৫০০০ সদস্যের এই বিশাল রাজপরিবারে আনুগত্যের প্রশ্নে টানাপোড়েন সৃষ্টি হতে পারে। সৌদি অভিজাতদের মধ্যে অনেকেই তাকে শাসক হিসেবে দেখতে চাননি। তারা হয়তো ভেবেছিলেন যে, এমবিএস যেহেতু এখনো সিংহাসনে বসেননি তাই তাকে সরানোর সুযোগ এখনও রয়েছে। গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তোলা হয়েছিল। সৌদি আরবে দুর্নীতির অভিযোগ খুঁজে পাওয়া কোনো কঠিন কাজ নয়। ক্ষমতাসীনরা চাইলে সহজেই এমন দুর্নীতি খুঁজে পাবেন, আর না চাইলে কিছুই খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এই প্রক্রিয়া কয়েক সপ্তাহ ধরে চলে, তবে শেষ পর্যন্ত সফল হয়। যাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছিল তাদের অনেকেই অবাক হয়ে বললেন, "আশ্চর্য! কীভাবে যেন আমার সরকারি হিসাব থেকে মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার উধাও হয়ে গেছে! আমি এখনই সেই অর্থ রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা করে দিচ্ছি।" প্রিন্স মিতেব একদম শুরুর দিকেই হিসাবের এই 'ভুল' বুঝতে পারেন। ভুল শুধরানোর জন্য ১ বিলিয়ন ডলার পরিশোধ করে বিষয়টি মিটিয়ে নেন তিনি। তবে সরকার বরাবরই দাবি করে এসেছে যে, এই পুরো প্রক্রিয়া আসলে দুর্নীতিবিরোধী অভিযানেরই অংশ ছিল।

এমবিএস একাধিক অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জের সঙ্গে লড়াই করছেন। একদিকে রয়েছে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, আরেকদিকে রাষ্ট্রকাঠামোর ভেতরেও বেশ কিছু সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন তিনি। এর মধ্যে সবচেয়ে স্পর্শকাতর চ্যালেঞ্জটি হলো সৌদি আরবের বৃহত্তম সংখ্যালঘু গোষ্ঠী শিয়াদের ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ। সাধারণ শিয়াদের অধিকাংশই সৌদি রাষ্ট্রের পতন চান না। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে শিয়া সমাজের প্রধান ব্যক্তিত্বরা শিয়াদের জীবনমান উন্নয়নে ব্যর্থ হওয়ায় অনেক তরুণই চরমপন্থী শিয়া ইসলামি প্রচারকদের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছেন। এই চরমপন্থীরা মনে করেন, পরিবর্তন আনার একমাত্র উপায় হলো বিদ্রোহ। ২০১১ সালে ইস্টার্ন প্রভিন্সে শিয়াদের এক আন্দোলনকে দমন করা হয়েছিল ভয়াবহ নিষ্ঠুরতার সঙ্গে। আল আওয়ামিয়াহ শহরে সরাসরি গোলাবর্ষণ করা হয়। এমনকি পরে শহরে ঢুকে বহু বাড়িঘরও ধ্বংস করে দেওয়া হয়।

রাষ্ট্র ও শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে চলমান উত্তেজনা নিরসনের একমাত্র পথ হলো অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে তাদের সমান মর্যাদা দেওয়া। তবে শেষের বিষয়টিই সবচেয়ে কঠিন। কারণ, সৌদি আরবের সংখ্যাগরিষ্ঠ ওয়াহাবি জনগোষ্ঠী শিয়াদের ধর্মত্যাগী হিসেবে দেখে। কিছু কট্টরপন্থী তো এতদূর পর্যন্ত বলেন যে, শিয়ারা কখনোই প্রকৃত মুসলমান ছিল না। এই বৈষম্যের শেকড় বহু পুরোনো। এমনকি এই একবিংশ শতাব্দীতেও সৌদি আরবের শীর্ষ আলেমদের কেউ কেউ শিয়াদের 'অবিশ্বাসী' আখ্যা দিয়ে তাদের হত্যা করাকে বৈধ বলে ফতোয়া দিয়েছেন।

স্বৈরতন্ত্রের অভিযোগ এবং নানা কঠোর সমালোচনার পরেও ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ সত্যিই একজন সংস্কারক। তিনি তরুণ উপদেষ্টাদের নিয়ে একটি দল গড়েছেন। তাদের অনেকেই অনেক ক্ষেত্রে ক্রাউন প্রিন্সের মতোই আবেগপ্রবণ। এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সম্ভবত বয়স কম হওয়ায় তারা সবাই পরিবর্তনের প্রতি বেশি উদার দৃষ্টিভঙ্গি রাখেন। এমবিএস নারীদের গাড়ি চালানোর অনুমতি দিয়েছেন। সিনেমা হলগুলো পুনরায় চালু করেছেন। ধর্মীয় বিধানকে আধুনিকতার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিচ্ছেন এবং অর্থনীতিকে পুনর্গঠনেরও চেষ্টা করছেন তিনি। হতে পারে যে তিনি আসলেই একজন নারীবাদী, শিল্প-সংস্কৃতির প্রতি অনুরাগী, ধর্মীয়ভাবে উদারচিন্তার মানুষ এবং মুক্তবাজার অর্থনীতির সমর্থক। আবার এটিও হতে পারে যে তিনি আসলে বাস্তবতা বুঝতে পেরেছেন। পরিবর্তন না আনলে অর্থনীতি ধ্বংসের মুখে পড়বে, অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে এবং রাষ্ট্র ভেঙে পড়বে। আর তখন তিনি শুধু ক্ষমতাচ্যুতই হবেন না, বরং হয়তো জীবনও হারাতে পারেন। এটুকু একজন বুদ্ধিমান মানুষের বুঝে যাওয়া উচিত।

২০১৪ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে তেলের দাম কমে অর্ধেক হয়ে যায়। আর সেই সঙ্গে সৌদি আরবের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৭৩৭ বিলিয়ন ডলার থেকে কমে ৪৭৫ বিলিয়নে নেমে আসে। কারণ সরকার রিজার্ভের অর্থ দিয়ে বাজেটের ঘাটতি পূরণ করতে বাধ্য হয়। তেলের বাজারে ধ্বস এবং জীবাশ্ম জ্বালানির ভবিষ্যৎ সীমিত হয়ে যাওয়ার অর্থ হলো পরিবর্তন। এই বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে রাষ্ট্র থেকে দুর্নীতি নির্মূলের চেষ্টাকে যৌক্তিক মনে হতে পারে। যদিও সেটি আসলে প্রতিদ্বন্দ্বীদের সরিয়ে দেওয়া এবং সরকারি কোষাগারে বড় অংকের অর্থ ফিরিয়ে আনার একটি উপায় মাত্র। তবে এসব কর্মকাণ্ড শুধু স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা নয়,

বরং দীর্ঘমেয়াদি লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে যাওয়া একটি কর্মসূচির অংশ। এই প্রকল্পের নাম 'ভিশন ২০৩০'।

'ভিশন ২০৩০'-এ বলা হয়েছে সৌদির অর্থনীতিকে বহুমুখী করতে হবে। এর পাশাপাশি বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে প্রযুক্তি ও সেবা খাতে। সামনের কয়েক বছরের বাজেটের জন্য যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে, সেখানে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ এবং সার্বভৌম তহবিল থেকে ক্রমান্বয়ে অর্থ ব্যয় করা হবে। সৌদি রাষ্ট্র এখনো জনগণকে অত্যন্ত উদার সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তেল ও গ্যাস থেকে আয় দ্রুত কমতে থাকায় এই ব্যবস্থাপনা দীর্ঘমেয়াদে আর টেকসই নয়। রাষ্ট্রের সামাজিক কল্যাণব্যবস্থা তুলে দিলে এবং উচ্চ বেকারত্ব বজায় থাকলে ব্যাপক অস্থিরতা দেখা দেওয়াটা প্রায় নিশ্চিত। এইসব মাথায় রেখে সরকারি কোষাগার সমৃদ্ধ করার জন্য 'পারিবারিক ধনভাণ্ডারের' একটি অংশ, অর্থাৎ সৌদি আরামকোর ৫ শতাংশ শেয়ার বিক্রির পরিকল্পনা করেছে সৌদি সরকার। কোম্পানিটির মূল্য প্রায় দুই ট্রিলিয়ন ডলার বলে দাবি করেছে তারা। কিন্তু সৌদি আরবের বাইরে খুব কম অর্থনীতিবিদই সৌদি সরকারের প্রস্তাবিত এই মূল্যায়নকে বাস্তবসম্মত বলে মনে করেন। তাদের মতে, তেলের বর্তমান বাজার পরিস্থিতি অনুযায়ী কোম্পানিটির মূল্য বড়জোর এক ট্রিলিয়নের একটু বেশি হতে পারে।

'ভিশন ২০৩০' বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে কিছু কিছু ব্যয় সংকোচন ইতোমধ্যেই শুরু করা হয়েছে। তবে এই মহাপরিকল্পনা এগিয়ে চলছে অত্যন্ত শ্লথগতিতে। কিছু ক্ষুদ্র প্রকল্প আবার এর মধ্যেই বাতিল করা হয়েছে। এর অংশ হিসেবে কর্মক্ষেত্রে দ্রুততম সময়ের মধ্যে 'সৌদিকরণ' বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এর 'সৌদিকরণ' কথাটির অর্থ হলো বিদেশিদের বদলে স্থানীয় কর্মীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করা। নারীদের গাড়ি চালানোর অনুমতি দেওয়ার বিষয়টিও এই নীতির সঙ্গে যুক্ত। অনেক পরিবার এখনো অভিভাবক ছাড়া নারীদের বাইরে যেতে দেয় না। এই কারণে তারা সাধারণত একসঙ্গে ট্যাক্সিতে চড়ে বা বিদেশি চালকদের সাহায্য নেয়। নারীদের গাড়ি চালানোর অনুমতি দিলে পরিবারগুলোর চালক বাবদ খরচ কমবে। ফলে তাদের হাতে থাকবে বাড়তি টাকা। পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে সৌদি নারীদের অংশগ্রহণও বৃদ্ধি পাবে। এই সবকিছুই বিদেশি শ্রমিকদের ওপর নির্ভরতা কমানোর পরিকল্পনার অংশ।

সৌদি আরবে বসবাসরত বিদেশিদের সঠিক সংখ্যা স্পষ্ট নয়। তবে বিভিন্ন দূতাবাসের পরিসংখ্যান বলছে, সৌদি আরবের ৩৪ মিলিয়ন বাসিন্দার মধ্যে ১২ মিলিয়নেরও বেশি বিদেশি নাগরিক। এর মধ্যে রয়েছে ২ মিলিয়ন বাংলাদেশি, ১.৫ মিলিয়ন ফিলিপিনো এবং ১ মিলিয়ন মিশরীয়। সৌদি আরবের জনসংখ্যার এই ব্যাপক বৃদ্ধি, বিদেশি শ্রমিকের আধিক্য এবং দ্রুত নগরায়ণ ঘটেছে একদম সাম্প্রতিক দশকগুলোতে। আর যে গতিতে এসব ঘটেছে তা বিশ্বের অন্য কোথাও কখনো দেখা যায়নি। জেদ্দা বন্দরে আমি একবার কয়েকজন জেলের সঙ্গে কথা বলেছিলাম। তাদের সবাই বাংলাদেশি, একজনও সৌদি নাগরিক ছিলেন না। সৌদির নাগরিকদের জীবনযাত্রা দেখার পর আমি কল্পনাও করতে পারছি না যে কোনো সৌদি নাগরিক নতুন করে পূর্বপুরুষদের মতো মাছ ধরার কৌশল শিখতে আগ্রহী হবেন। দেশটিতে ২৪ বছরের নিচের তরুণদের মধ্যে বেকারত্বের হার প্রায় ২৮ শতাংশ। তবে তার মানে আবার এই নয় যে তারা জেদ্দা বন্দরের পাশে বসে জাল সেলাই করতে আগ্রহী হবে।

বিদেশি শ্রমিকদের সৌদি নাগরিক দিয়ে প্রতিস্থাপন করা এবং তেলনির্ভর অর্থনীতি থেকে প্রযুক্তিনির্ভর অর্থনীতিতে উত্তরণের প্রচেষ্টা একপ্রকার জুয়া খেলা। দেশটির রক্ষণশীলরা এমন সৌদি আরব চান না। এই পরিবর্তন দেশটির ধর্মীয় ও গোত্রগত পরিচয়কেই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে পারে। এই পরিকল্পনার কারণে ইতো¬¬¬মধ্যে আঞ্চলিক বৈষম্যের আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সৌদির ১৩টি প্রশাসনিক অঞ্চলের মধ্যে বিনিয়োগের বেশিরভাগ অংশ ধাবিত হচ্ছে মূলত দুইটি অঞ্চলের দিকে—রিয়াদ ও জেদ্দা। যদি এই প্রবণতা অব্যাহত থাকে তাহলে শিয়া-প্রধান পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ এবং ইয়েমেন সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলো প্রশ্ন তুলতে পারে যে, "এই ভিশন আমাদের জন্য কী বয়ে আনছে?"। এই বঞ্চনার অনুভূতি কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে তাদের সম্পর্কের বন্ধন আরও দুর্বল করে দিতে পারে।

মেগা প্রকল্পগুলোও ধীরে ধীরে নির্ধারিত সময়সীমা থেকে পিছিয়ে পড়ছে। লোহিত সাগরের উপকূলে 'নিওম' নামে ৫০০ বিলিয়ন ডলারের একটি আধুনিক শহর তৈরির পরিকল্পনা ব্যাপক উৎসাহের সঙ্গে ঘোষণা করেছিলেন এমবিএস। এই শহরটি হওয়ার কথা ছিল প্রযুক্তির এক বিস্ময়কর আধার। যেখানে টেকসই জ্বালানির মাধ্যমে শহর পরিচালিত হবে, থাকবে চালকবিহীন গাড়ি। দৈনন্দিন কাজের বড় অংশ সামলাবে রোবটরা এবং নারী-পুরুষ অবাধে মেলামেশা করতে পারবে। এই ধরনের স্বপ্ন আকর্ষণীয় হলেও ২০৩০ সালের মধ্যে এই প্রকল্প

বাস্তবায়িত হওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম। সময় যত গড়াবে এই প্রকল্পের পিছিয়ে পড়া সৌদি সরকারের জন্য আরও বিব্রতকর হয়ে উঠবে।

এর মধ্যে কোভিড-১৯ মহামারির কারণে বাজেটে বড় ধাক্কা লেগেছে। ২০২০ সালে হজ্ব পালন করার অনুমতি পেয়েছিলেন কেবল অল্পসংখ্যক সৌদি নাগরিক। বিদেশি হজ্বযাত্রীদের প্রবেশ নিষিদ্ধ থাকায় কোভিড সংক্রমণ চলাকালে দেশটি প্রায় ১২ বিলিয়ন ডলার রাজস্ব হারিয়েছে।

তবে অর্থনৈতিক দিক থেকে সবকিছু এতটা মন্দও নয়। বিশ্বব্যাপী শিল্প খাতে চাহিদা এমনকি অস্থায়ীভাবে বৃদ্ধি পেলেই তেলের দাম আবার বাড়তে পারে, যা কিনা স্বল্পমেয়াদে হলেও সৌদি আরবের জন্য স্বস্তির কারণ হবে। আর দীর্ঘমেয়াদে সৌদি আরব এখনো জ্বালানি বাজারে নিজেদের আধিপত্য ধরে রাখার মতো অবস্থানে আছে। দেশটি ধীরে ধীরে তার অর্থনীতিকে তেল নির্ভরতা থেকে মুক্ত করার চেষ্টা করছে বটে, তবে এই বাজারে শক্ত অবস্থান ধরে রাখলে বর্তমান আর্থিক ক্ষতির কিছুটা হলেও উঠিয়ে আনা সম্ভব হবে।

এদিকে বিশ্ব যখন ধীরে ধীরে তেলের ওপর নির্ভরতা কমাচ্ছে, তখন সৌদি আরবের অভ্যন্তরীণ তেল ব্যবহার ক্রমশ বাড়ছে। দেশটি তার উৎপাদিত মোট তেলের প্রায় এক চতুর্থাংশ নিজেরাই ব্যবহার করে। এই বিষয়টি সৌদি সরকারের আয়ে বড় ধরনের প্রভাব ফেলে। পেট্রোল এবং বিদ্যুৎ সৌদির জনগণকে এমন দামে সরবরাহ করা হয়, যা উন্নত বিশ্বের সর্বনিম্ন মূল্যের তুলনায়ও অনেক কম। পরিবেশের বিষয়টি চিন্তা না করলে এটি সৌদি নাগরিকদের জন্য একটা বিশাল সুবিধা। প্রচণ্ড গতিতে এসইউভি চালিয়ে বাড়ি ফেরা বা এসি চালু রেখেই পুরো উইকএন্ড বাইরে কাটিয়ে আসা তাদের জন্য খুব স্বাভাবিক ঘটনা। সৌদি আরব বিশ্বের ষষ্ঠ সর্বোচ্চ তেল ভোক্তা দেশ। তেল পুড়িয়েই দেশটির বিদ্যুতের ৪০ শতাংশ উৎপাদিত হয়। আর মোট বিদ্যুতের ৭০ শতাংশই ব্যয় হয় শীতাতপ-নিয়ন্ত্রণে। যারা গ্রীষ্মের তীব্র গরমে সৌদি আরব যেতে চান, তাদের জন্য একটি পরামর্শ হলো, হোটেলে ঢোকার আগে একটি গরম কাপড় হাতে নিন। কারণ হোটেলগুলোর একটা প্রবণতা হলো, ভেতরের পরিবেশটাকে বাড়াবাড়ি রকমের শীতল করে রাখা।

তবে আগামী কিছুদিন সৌদি আরবের জন্য তেল পোড়ানোটা বাধ্যতামূলক। আলো জ্বালানো বা এসি চালু রাখার জন্য যদি তারা তেল খরচ নাও করে, তবুও তাদের পানীয় জল উৎপাদনের জন্য তেল পোড়াতেই হবে। কারণ তাদের হাতে

এর কোনো বিকল্প নেই। দেশটিতে রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড় ডিস্যালিনেশন বা লবণাক্ত জল পরিশোধন ব্যবস্থা। এই পদ্ধতিতেই দেশটি তাদের অভ্যন্তরীণ চাহিদার বড় অংশ মেটায়। বিশাল আকারের এই ডিস্যালিনেশন প্ল্যান্টগুলো চালাতে প্রয়োজন হয় বিপুল পরিমাণ বিদ্যুৎ, আর তা আসে মূলত তেল থেকে। নদীহীন এই দেশে লবণাক্ত জল পরিশোধনই পানীয় জলের একমাত্র বাস্তবসম্মত সমাধান। তবে এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল এবং পরিবেশের জন্য ব্যাপক ক্ষতিকর।

লবণাক্ত পানির বিকল্প খুঁজতে সৌদি সরকার প্রথমে নিজেদের প্রধান জ্বালানি প্রতিষ্ঠান সৌদি আরামকোর দ্বারস্থ হয়েছিল। এই অয়েল জায়ান্ট তাদের প্রযুক্তিগত দক্ষতা ব্যবহার করে দেশের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের মরুভূমির নিচে লুকিয়ে থাকা বিশাল ভূগর্ভস্থ পানির মজুদ খুঁজে বের করে। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে এখানে এত বিপুল পরিমাণ পানি ছিল যে তা দিয়ে অ্যামেরিকার লেক ইরির মতো একটি হ্রদ ভরানো সম্ভব হতো। কিন্তু সেচ ব্যবহার করে অতি-চাষাবাদ এবং অনিয়ন্ত্রিত পানি উত্তোলনের ফলে এই মজুদ দ্রুত কমে আসছে। অন্যদিকে পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত না থাকায় এই পানির স্তর পূরণ হওয়ারও সুযোগ পাচ্ছে না। এই সেচনির্ভর কৃষিজমিগুলোয় দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য খাদ্যশস্য ও পশুপালন করা হয়। তবে উৎপাদিত পণ্যের দাম অত্যন্ত কম। আর এটা সম্ভব হচ্ছে কেবল পানিতে সরকারি ভর্তুকি থাকার কারণে। কৃষকদের মধ্যে পানির সাশ্রয়ী ব্যবহারের কোনো প্রবণতা নেই, কারণ এটি তাদের কাছে খুবই সস্তা একটি সম্পদ। কিন্তু রাষ্ট্রের জন্য এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, এই ভূগর্ভস্থ জলাধারের প্রায় চার-পঞ্চমাংশ ইতোমধ্যেই খরচ হয়ে গেছে এবং ২০৩০-এর দশকের মধ্যেই এটি পুরোপুরি নিঃশেষ হয়ে যেতে পারে। তেলের রাজস্ব দিয়ে এতদিন এই ভর্তুকি চালানো সম্ভব হয়েছে। কিন্তু যখন দেশে পানিই থাকবে না তখন কৃষি উৎপাদনও আর সম্ভব হবে না। ফলে বিদেশে কৃষিপণ্য রপ্তানির স্বপ্নও ফিকে হয়ে যাবে। তখন দেশীয় বাজারেও খাদ্যদ্রব্যের দামও বেড়ে যাবে দ্রুত। বিষয়টি সাধারণ সৌদি নাগরিকদের জন্য উদ্বেগের একটি বড় কারণ হয়ে দাঁড়াবে। এই পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সরকার ফসল উৎপাদনের ধরনে পরিবর্তন আনতে চাইছে। বিশেষ করে গমের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে আনার পরিকল্পনা করছে সরকার। কারণ গম অত্যন্ত পানি-নির্ভর একটি ফসল।একই সঙ্গে দেশের সার্বভৌম সম্পদ তহবিলের (সভারেইন ওয়েলথ ফান্ড) একটি অংশ ব্যয় করা হচ্ছে বিদেশের কৃষিজমি কেনার পেছনে। এর উদ্দেশ্য হলো, অন্য দেশে ফসল উৎপাদন করে সৌদি আরবের খাদ্য চাহিদা মেটানো।

বিদ্যুৎ খাতে সরকারি ভর্তুকির কারণে জনগণ যত বেশি বিদ্যুৎ ব্যবহার করে, সরকারের ব্যয়ও তত বেশি বেড়ে যায়। এই চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে ব্যাপক বিনিয়োগ করছে সৌদি সরকার। দেশের অর্থনীতি বহুমুখীকরণের কাজ শুরু হয়ে গেছে। টেসলার ৫ শতাংশ মালিকানা কিনেছে সৌদি আরব। পাশাপাশি জেনারেল মোটরসের বৈদ্যুতিক গাড়ি তৈরির প্রকল্প এবং বিশ্বের বিভিন্ন নবায়নযোগ্য জ্বালানি উদ্যোগে বিপুল বিনিয়োগ করেছে তারা। দেশের অভ্যন্তরেও সৌদি সরকার বড় বড় পরিকল্পনা করছে। তারা আশা করছে, ২০৩০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য জ্বালানি থেকে কমপক্ষে ৭ শতাংশ বিদ্যুৎ উৎপাদন করবে, যার বেশিরভাগই আসবে সৌরশক্তি থেকে। তাদের দাবি এই নবায়নযোগ্য জ্বালানি খাত অন্তত ৭ লক্ষ ৫০ হাজার নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি করবে। সৌদি আরবে ইতোমধ্যে সৌর প্যানেল তৈরির কারখানা আছে, প্যানেল স্থাপনের জন্য বিশাল জায়গা আছে, আর রয়েছে প্রচুর রোদ। শুধু তাই নয়, সৌদি আরবের সূর্যালোকের গুণগত মানও অত্যন্ত উচ্চমানের। কারণ দেশটি বিশ্বের অন্যতম বেশি সৌর বিকিরণ প্রাপ্ত অঞ্চলগুলোর মধ্যে পড়ে। সৌদি সরকার আরও উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য স্থির করেছে। ২০৩২ সালের মধ্যে সৌরশক্তির অবদান ২০ শতাংশে উন্নীত করার পরিকল্পনা করেছে দেশটি। ব্যবসায়িক ভাষায় একে বলা যায় একটি 'আগ্রাসী লক্ষ্য'।

তবে সৌদি সরকারের সৌরশক্তি সংক্রান্ত ঘোষণাগুলো 'ঐতিহাসিক মুহূর্ত' হিসেবে প্রচার করা হলেও, বাস্তবে এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নে জটিলতা দেখা দিয়েছে। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা এবং প্রযুক্তিগত সমস্যার কারণে কিছু প্রকল্প স্থগিত হয়ে গেছে, আবার কিছু পুরোপুরিই ভেস্তে গেছে। তবে সৌদি কর্তৃপক্ষ ভালো করেই জানে যে তাদের দ্রুত পদক্ষেপ নিতে হবে। সময় দ্রুত ফুরিয়ে আসছে।

অর্থনৈতিকভাবে সৌদি আরবকে এক সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রাখতে হচ্ছে। একদিকে প্রয়োজন তেলের ওপর নির্ভরতা কমানো, কিন্তু একই সঙ্গে তেল-নির্ভর ভর্তুকিগুলো হঠাৎ করে প্রত্যাহার না করে জনগণের ওপর অর্থনৈতিক চাপ এড়ানো। নবায়নযোগ্য জ্বালানি, বৈদেশিক বিনিয়োগ, পর্যটন এবং লোহিত সাগরের বন্দর অবকাঠামোর উন্নয়ন এই রূপান্তরকে সহজ করে তুলতে পারে। তবে তেলের ওপর ভর করে গড়ে ওঠা বিশাল অর্থনীতিকে সম্পূর্ণ নতুন পথে নিয়ে যাওয়াও এক বিশাল চ্যালেঞ্জ।

কৌশলগতভাবে সৌদি আরবকে আগামী বহু বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেই থাকতে হবে, যদি না যুক্তরাষ্ট্র নিজেই সম্পর্ক থেকে সরে আসে। কারণ মার্কিন নিরাপত্তার নিশ্চয়তা ছাড়া ছাড়া সৌদি আরবের সমুদ্রসীমা অরক্ষিত হয়ে যাবে। পারস্য উপসাগর ও লোহিত সাগর উভয়ই সংকীর্ণ। উভয় সাগরের প্রবেশদ্বারেই কৌশলগত চোক পয়েন্ট হিসেবে রয়েছে হরমুজ প্রণালি ও বাবেল মান্দেব প্রণালি। তার ওপর সৌদি আরবের নৌবাহিনী একদমই শক্তিশালী নয়। তাই যুক্তরাষ্ট্র পাশে না থাকলে যেকোনো বৈরী শক্তি চাইলেই দেশটির রপ্তানি পথ বন্ধ করে দিতে পারে। সেক্ষেত্রে ভারত মহাসাগর কিংবা সুয়েজ খালের মাধ্যমে বিশ্ববাজারে পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়বে।

তবে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে নিরাপত্তা সম্পর্ক বজায় থাকলেও সৌদি আরবের সঙ্গে চীনের অর্থনৈতিক সম্পর্ক ক্রমেই আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে। চীন ইতোমধ্যেই সৌদি আরবকে মাঝারি পাল্লার ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহ করেছে। গত কয়েক বছরে চীনে সৌদি আরবের তেল রপ্তানি বেড়েছে ব্যাপকভাবে। চীনা প্রযুক্তি কোম্পানি হুয়াওয়ের সঙ্গে ৫জি প্রযুক্তি নিয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে সৌদি আরব, যা মধ্যপ্রাচ্যে হুয়াওয়ের হাতে আসা বারোটি প্রধান চুক্তির একটি। এর অন্যতম কারণ হলো, ব্যবসায়িক সম্পর্কের ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের মতো মানবাধিকার ইস্যুকে গুরুত্ব দেয় না চীন। একমাত্র ব্যবসায়িক সম্পর্ক বজায় রাখা নিয়েই তাদের যত মাথাব্যথা। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম শীর্ষ রাজনৈতিক বিশ্লেষক মিনা আল-ওরাইবি এ প্রসঙ্গে বলেছেন, "রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের চীনা মডেল অধিকাংশ আরব রাজনীনৈতিক নেতার কাছেই আকর্ষণীয়। এই অঞ্চলের বেশিরভাগ সরকার রাজনৈতিক উদারনীতি ছাড়াই অর্থনৈতিক উদারনীতি পরিচালনা করতে চায়। এই কারণেই গত দুই দশক ধরে মধ্যপ্রাচ্যে চীনের মডেলকে সফল হিসেবে বিবেচনা করা হয়।"

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভবিষ্যতের গতিধারা আবারও বুঝে নিয়েছে সৌদি আরব। ইসরায়েলের বিরুদ্ধে তাদের মৌখিক আক্রমণ অনেকটাই কমে এসেছে। ধীরে ধীরে ইসরায়েরল ও সৌদির মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্ক গড়ে উঠছে, যেন ভবিষ্যতে দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পথ প্রস্তুত থাকে। একসময় ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের শর্ত ছিল স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু এখন সেই শর্ত আগের মতো বাধ্যতামূলক নয়। ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন সালমান সেই আরব নেতাদের মধ্যে একজন, যারা মনে করেন ফিলিস্তিনিরা

আসলে আপস করতে রাজি নয়। ফিলিস্তিনিদের অনড় অবস্থানের প্রতি ধৈর্য হারিয়েছেন তিনি। তবে, তিনি নিজে এই বিষয়ে অগ্রণী ভূমিকায় যেতে চাননি, বরং অন্যদের সামনে এগিয়ে যেতে দিয়েছেন। সংযুক্ত আরব আমিরাতের ডি-ফ্যাক্টো শাসক ক্রাউন প্রিন্স মোহাম্মদ বিন জায়েদের সঙ্গে এমবিএসের রয়েছে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ২০২০ সালে আরব আমিরাত ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে নেয়। একই পথে হাঁটে বাহরাইনও। বাদশাহ সালমান এই পদক্ষেপের বিরোধিতা করলেও এমবিএস মনে করেন, তরুণ সৌদিরা আগের প্রজন্মের মতো এই ইস্যুতে ততটা আগ্রহী নয়। এদিকে, ইসরায়েলের উন্নত প্রতিরক্ষা প্রযুক্তি এবং মরুভূমিকে চাষাবাদযোগ্য করে তোলার সক্ষমতা উপসাগরীয় দেশগুলোর জন্য আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তাছাড়া, ইরান থেকে আসা সম্ভাব্য হুমকির কথাও বিবেচনা করতে হয়। ইসরায়েলের আয়রন ডোম ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পেতে আগ্রহী উপসাগরীয় দেশগুলো। এই আরব-ইসরায়েল মৈত্রী মধ্যপ্রাচ্যের নীতির এক ঐতিহাসিক পরিবর্তন, যা বেশিরভাগ মধ্যপ্রাচ্য বিশ্লেষকের পূর্বাভাসকে ভুল প্রমাণিত করেছে। তারা বলেছিলেন, ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত কোনো আরব দেশ ইসরায়েলের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করবে না। কিন্তু আরব দেশগুলো যখন ফিলিস্তিনের মতো একটি ছোট ভূখণ্ডের দিকে তাকিয়ে ছিল, তখন বাকি বিশ্ব এগিয়ে যাচ্ছিল। বাইডেন প্রশাসনের আমলেও এই বাস্তবতা বদলাবে বলে মনে হয় না। তিনি হয়তো পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি বসতি স্থাপনের ব্যাপারে কঠোর অবস্থান নিতে পারেন, কিন্তু ইসরায়েল-আরব সম্পর্কের নতুন বাস্তবতাকে উল্টে দেওয়ার কোনো কারণ নেই।

সংযুক্ত আরব আমিরাত ও ইসরায়েলের মধ্যে যে চুক্তি হতে চলেছে সে কথা ক্রাউন প্রিন্স বিন সালমান খুব ভালো করেই জানতেন। তবে তার পিতা বাদশাহ সালমানকে বিষয়টি তখন জানানো হয়নি। এমবিএস চুক্তিটিকে অনুমোদন দিয়েছিলেন কারণ একদিকে ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য তাকে প্রতিদিনের রাজনৈতিক কৌশল ঠিক করতে হয়, আর অন্যদিকে তার দৃষ্টি থাকে ভবিষ্যতের দিকে।

আরব জাতীয়তাবাদের বিষয়েও সৌদি আরব সবসময়ই বাস্তববাদী এবং সোজাসাপ্টা অবস্থান নিয়েছে। সমগ্র আরব বিশ্বকে একত্রিত করে একটি বৃহৎ রাষ্ট্র গঠনের ধারণা কখনোই সৌদি শাসকদের আকৃষ্ট করেনি। ১৯৬০ ও ১৯৭০-এর দশকে মিশর, সিরিয়া ও অন্যান্য দেশগুলোর বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদরা প্যান-

আরব ধারণাকে এগিয়ে নিচ্ছিলেন। তখন সৌদি রাজপরিবার এর বিরোধিতা করেছিল। উল্টো জনগণের মধ্যে রাজতন্ত্রের প্রতি আনুগত্য জোরদার করার চেষ্টা চালিয়েছিল সৌদি আরব। গণতন্ত্রের প্রতিও তাদের আগ্রহ কম। কারণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে যদি 'ভুল' নেতা নির্বাচিত হয়ে যায়, তবে তা রাজপরিবারের জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারে। সৌদি আরব বরং আরব অঞ্চলের জন্য একটি শিথিল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ফোরাম গঠনে আগ্রহী। এই ফোরামের স্বতন্ত্র রাজ্যগুলো তাদের নিজস্ব শাসনব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রেখে রাষ্ট্র পরিচালনা করবে। এই নীতির অংশ হিসেবে ১৯৮১ সালে সৌদি আরব 'উপসাগরীয় সহযোগিতা পরিষদ' (Gulf Cooperation Council–GCC) গঠনের মূল উদ্যোক্তা ছিল। সৌদি আরবের নেতৃত্বাধীন জোটের অন্য সদস্যরা হলো সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, বাহরাইন, ওমান ও কাতার। এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য ছিল উপসাগরীয় অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে বাণিজ্য সহজতর করা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

এই অবস্থান বজায় রেখেই সৌদি আরব এগিয়ে যাচ্ছে মোহাম্মদ বিন সালমানের 'ভিশন ২০৩০'-এর দিকে। কিন্তু এমবিএসের এই পথচলা মোটেও সহজ নয়। তিনি একদিকে সংস্কার এবং সংরক্ষণবাদিতার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করছেন, আবার অন্যদিকে আপেক্ষিক উদারনীতির সঙ্গে দমননীতির মিশ্রণ ঘটাচ্ছেন। রাজপরিবারের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো আঞ্চলিক পরিচয়ের উত্থান। সৌদি শাসকরা কখনোই আঞ্চলিকতাকে খুব বেশি শক্তিশালী হতে দিতে চায়নি। কারণ এতে রাষ্ট্রীয় সংহতি বিঘ্নিত হতে পারে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, দেশটির বিভিন্ন অঞ্চলের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক পরিচয় রয়েছে এবং তারা রাষ্ট্র পরিচালনায় নিজেদের মতামতের প্রতিফলন দেখতে চায়। বিশেষত ইস্টার্ন প্রভিন্স ও ইয়েমেন সীমান্তের শিয়া সম্প্রদায়ের বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব সৌদি আরবের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা সংকট। এসব অঞ্চলে অস্থিতিশীলতা বাড়লে তা শুধু অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণই হবে না, বরং এটি দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। অসন্তোষ অনেক সময় সুপ্ত অবস্থায় থাকে, কিন্তু যে কোনো মুহূর্তে একটি ঘটনা বড় ধরনের সহিংসতার সূত্রপাত ঘটাতে পারে। তাই সৌদি শাসকগোষ্ঠীকে প্রতিনিয়ত এই বিষয়গুলো সামাল দিতে হয়।

এমবিএস জনগণের সামনে একটি নতুন সামাজিক চুক্তির প্রস্তাব রেখেছেন। এই চুক্তির অধীনে তারা একটি কম আমলাতান্ত্রিক ও দুর্নীতিমুক্ত রাষ্ট্র পাবে। পাশাপাশি তারা এমন একটি অর্থনীতি পাবে যা ধীরে ধীরে তেলের ওপর নির্ভরতা

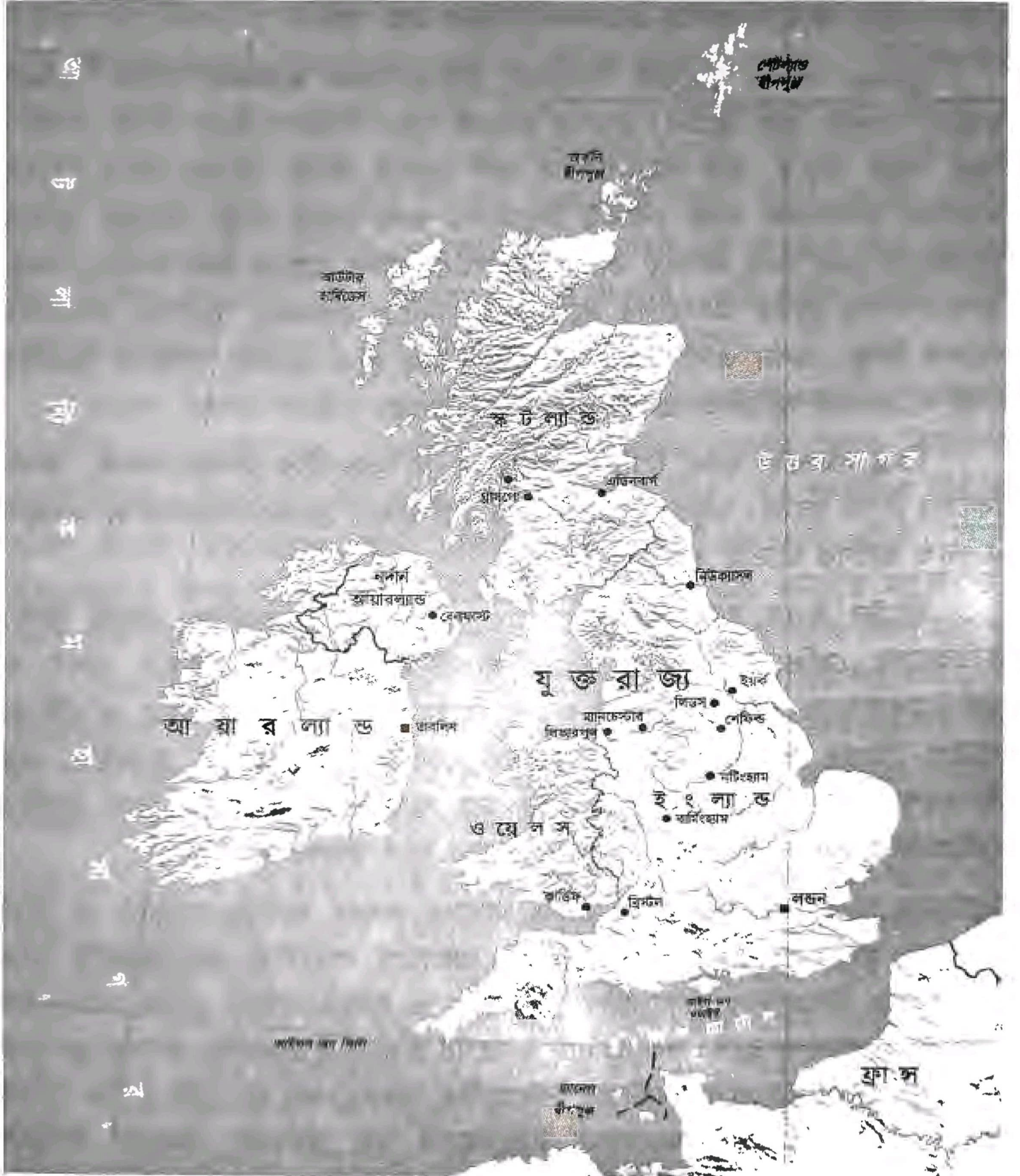
কমিয়ে টিকে থাকতে পারবে। এর সাথে তারা এমন কিছু বিনোদনের সুযোগও পাবে, যা আধুনিক বিশ্বে সাধারণ ব্যাপার হলেও সৌদি আরবের জন্য এতদিন নিষিদ্ধ ছিল। তবে এর বিনিময়ে জনগণকে পরিশ্রম করতে হবে। তাদের এটাও বুঝতে হবে যে তারা যে ভর্তুকিগুলো এতদিন পেয়ে এসেছে তার অনেকটাই ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ধর্মীয় রক্ষণশীলদেরও নতুন বাস্তবতা মেনে নিতে হবে। তারা নিজেদের মতো করে ধর্ম চর্চার স্বাধীনতা পাবে, কিন্তু সমাজের ওপর থেকে তাদের নিয়ন্ত্রণের রাশ আলগা করতে হবে। দেশের আধুনিকায়ন এবং টিকে থাকার জন্য এটি অত্যন্ত জরুরি। সৌদি আরব হয়তো তার ঐতিহ্যবাহী ওয়াহাবি মতবাদ রপ্তানি করাও সীমিত করবে। কারণ বিশ্ব অর্থনীতিতে সৌদির গুরুত্ব কমে গেলে আন্তর্জাতিক মহলও এই মতবাদ নিয়ে আগের মতো সহনশীল থাকবে না। আসলে ওয়াহাবি মতাদর্শ থেকেই ওসামা বিন লাদেন এবং আইএসের মতো চরমপন্থী গোষ্ঠীগুলোর জন্ম হয়েছিল।

সমস্যা হলো, এই ধরনের পদক্ষেপ সৌদি রাজপরিবার ও ওয়াহাবি আলেমদের মধ্যে প্রায় তিনশো বছর আগে স্থাপিত ঐতিহাসিক চুক্তিকে ভেঙে দেওয়ার সমান। সৌদি আরবের প্রতিষ্ঠাতা ইবনে সৌদ জনগণকে একটি সহজ চুক্তির ভিত্তিতে শাসন করেছিলেন—তারা রাজপরিবারের প্রতি আনুগত্য দেখাবে, আর এর বিনিময়ে তেল থেকে প্রাপ্ত অর্থ তাদের একটি স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন এনে দেবে। এমবিএস দিচ্ছেন এই চুক্তির একবিংশ শতাব্দীর সংস্করণ, তবে এতে তেলের ভূমিকা ক্রমশ কমে যাচ্ছে।

এই সংস্কার যদি বাস্তবায়িত না হয় এবং বিশ্ব যদি একসময় সম্পূর্ণভাবে তেল নির্ভরতা থেকে সরে আসে, তাহলে সৌদি আরব বিশ্বকে তখন কী দেবে? শুধু বালি? সৌদি আরবের নেতৃত্বের এখন দরকার একটি নতুন সমাজ, নতুন অর্থনীতি এবং কার্যকর একটি সামরিক বাহিনী গড়ে তোলা। এখনো অ্যামেরিকা সৌদি আরবের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিয়ে চলেছে, কারণ তেল এখনো বিশ্ব অর্থনীতির জন্য অপরিহার্য। কিন্তু ভবিষ্যতে যখন সৌদি আরব শুধু সৌরবিদ্যুৎ উৎপাদন করবে, তখন সেই সোলার প্যানেল রক্ষা করতে হয়তো কেউই তেমন আগ্রহী থাকবে না।

অধ্যায় ৪

যুক্তরাজ্য



"ব্রিটিশরা আসছে! ব্রিটিশরা আসছে!"

-পল রিভিয়েরা

"ব্রিটিশরা আসছে"। এই কথাটি কয়েক শত বছর ধরে উচ্চারিত হয়েছে বিশ্বের নানা প্রান্তে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সে সময় বড় হতে হতে পৃথিবীর প্রায় চার ভাগের এক ভাগের ওপর শাসন কায়েম করেছিল। বর্তমান সময়ে আবার এই কথাটি শোনা যেতে পারে, তবে তা হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক অর্থে।

২০১৬ সালের ব্রেক্সিট গণভোটে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ব্রিটেন। এরপর থেকেই নতুন মিত্রের সন্ধানে আছে দেশটি। কিন্তু সত্যি বলতে, এই অনুসন্ধানের শুরু হয়েছে আরো অনেক আগে। বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই নিজেদের জন্য একটি নতুন বৈশ্বিক ভূমিকা নির্ধারণের চেষ্টা করে আসছে তারা। একসময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ছিল বিশাল। কিন্তু, ঔপনিবেশিক যুগের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে মানচিত্র বদলেছে, ব্রিটেনও হারিয়েছে অনেক কিছু। এখন তারা এমন এক বিশ্বে পথ খুঁজে চলেছে, যেখানে পুরোনো সেই সাম্রাজ্যের স্মৃতিচিহ্ন ক্রমশ ফিকে হয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু সমস্যাটা হলো, ব্রিটিশরা জানে না যে, তারা ঠিক কোথায় যাচ্ছে, কিংবা কিসের দিকে যাচ্ছে। তবুও, নতুন সময়ের এই যাত্রায় তাদের ভৌগোলিক অবস্থান এখনও আগের মতোই গুরুত্বপূর্ণ।

ব্রিটেন উত্তর ইউরোপীয় সমভূমির পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত একটি দ্বীপ। ইতিহাসের বেশিরভাগ সময় জুড়েই দ্বীপটিকে শীতল, বায়ুপ্রবাহ প্রবণ ও তুলনামূলকভাবে পশ্চাৎপদ এক অঞ্চল হিসেবে দেখা হতো। কিন্তু এতকিছুর পরেও বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ সাম্রাজ্যের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিল এই দ্বীপদেশ। আর এই উন্নতির পেছনে মূল কারণগুলোর একটি ছিল তাদের ভৌগোলিক সুবিধা, বিশেষত মহাসাগরগুলোর সঙ্গে তাদের সংযোগ।

ব্রিটেনের চারপাশের জলরাশির গুরুত্ব এখনো তাদের জাতীয় সংস্কৃতি ও চিন্তা চেতনায় গভীরভাবে মিশে আছে। এই জলরাশি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইউরোপের টালমাটাল রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও যুদ্ধের প্রভাব থেকে তাদেরকে অনেকটাই রক্ষা করেছে। সম্ভবত এই কারণেই অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের তুলনায় ব্রিটেনের জনগণের মধ্যে 'একীভূত ইউরোপীয় পরিচয়'-এর অনুভূতি তেমন গভীর হয়নি। দুই বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতা ইউরোপের মূল ভূখণ্ডকে যেভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিল, ব্রিটেন ঠিক ততটা বিপর্যস্ত হয়নি। এই 'বিচ্ছিন্নতার' মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব ঠিক কতটা তা পরিমাপ করা বেশ কঠিন। তবে, ব্রেক্সিট ভোটের সিদ্ধান্তে যে এই মনস্তত্ত্ব কিছুটা ভূমিকা রেখেছে, তা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই।

যুক্তরাজ্য সাম্প্রতিক দশকগুলোতে ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এক ধরনের সেতুবন্ধন হিসেবে ভূমিকা পালন করছে। ভবিষ্যতেও হয়তো তারা এই ভূমিকা ধরে রাখবে, তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই সেতু ব্যবহারের হার কমবে। কারণ ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর জাতীয় স্বার্থ অনেকটাই বদলে যাবে ভবিষ্যতে। তবে বর্তমান অনিশ্চয়তার মধ্যেও যুক্তরাজ্যের সামনে রয়েছে বিশাল সম্ভাবনা। ইউরোপের বিশাল ভোক্তা বাজার তাদের হাতের কাছেই। সরাসরি মহাসাগরের বাণিজ্যিক রুটেও প্রবেশ করতে পারে তারা। এর পাশাপাশি উদ্ভাবন, মানসম্পন্ন শিক্ষা ও ব্যবসায়িক দক্ষতারও এক দীর্ঘ ইতিহাস বহন করে তারা। ফলে দেশটি এখনো বিশ্বের শীর্ষ দশটি অর্থনীতির তালিকায় আছে। তবে এই অবস্থান ধরে রাখতে হলে ভবিষ্যতের জন্য সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়া জরুরি। এই নতুন যাত্রায় বাকি সবকিছুর চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে জাতীয় ঐক্য।

১৭০৭ সালের 'অ্যাক্টস অব ইউনিয়ন' আইনের মাধ্যমে ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড একত্রিত হয়। গঠিত হয় একটি একক রাষ্ট্র। তখন থেকেই মূলত ব্রিটেনের অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি দ্রুত বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। এই আইনের মাধ্যমে পুরো দ্বীপটি প্রথমবারের মতো একক শাসনব্যবস্থার আওতায় আসে। ফলে ইংরেজদের তখন আর স্কটিশ বাহিনীর আক্রমণের শঙ্কায় থাকতে হতো না। পাশাপাশি ইউরোপীয় কোনো দেশ স্কটল্যান্ডকে ব্যবহার করে ইংল্যান্ড দখল করবে, সেই পথও চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়। এখন তিন শতাব্দী পর ব্রেক্সিট গণভোট সেই ইউনিয়নকে ঝুঁকির মুখে ফেলেছে। আজ লন্ডন হয়তো ফরাসি আক্রমণের ভয় পায় না, কিন্তু স্কটল্যান্ড যদি স্বাধীনতা লাভ করে তাহলে অর্থনীতি ও প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ওপর যে প্রভাব পড়বে, তা নিয়ে গভীর উদ্বেগে আছে ব্রিটেন।

অষ্টাদশ শতকের এই রাজনৈতিক ইউনিয়নের প্রায় ৪০০ মিলিয়ন বছর আগে স্বয়ং প্রকৃতি একটা ভিন্ন ধরনের ইউনিয়ন ঘটিয়েছিল এখানে। তখন ইংল্যান্ড ছিল 'অ্যাভালোনিয়া' নামে ক্ষুদ্র একটি মহাদেশের অংশ। ইংল্যান্ডকে সাথে নিয়ে এই মহাদেশটি তখন ধীরে ধীরে উত্তর দিকে সরে যাচ্ছিল। ঠিক একই সময়ে স্কটল্যান্ড ছিল কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে। স্কটল্যান্ড তখন ছিল 'লরেন্টিয়া' নামে বিশাল এক মহাদেশের অংশ। লরেন্টিয়ার সাথে স্কটল্যান্ডও অগ্রসর হচ্ছিল দক্ষিণের দিকে। একটা পর্যায়ে সংঘর্ষ হয় এই দুই মহাদেশের। সংঘর্ষটি ঘটেছিল বর্তমান ইংল্যান্ড-স্কটল্যান্ড সীমান্ত বরাবর। ১২২ সালে রোমান সম্রাট হ্যাড্রিয়ান এই সীমান্ত রেখা ধরে নির্মাণ করেন একটি বিশাল প্রতিরক্ষা প্রাচীর, যা ইতিহাসে হ্যাড্রিয়ানের

প্রাচীর নামে পরিচিত। যদিও অ্যাভালোনিয়া ও লরেন্টিয়ার সংঘর্ষ হিমালয়ের মতো কোনো বিশাল পর্বতশ্রেণী তৈরি করেনি, তবু ছোট এই সংঘর্ষের ফলেই গড়ে ওঠে চেভিয়ট হিলস। এই পাহাড়শ্রেণি আজও ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের প্রাকৃতিক সীমানা নির্ধারণ করে রেখেছে। ভূতাত্ত্বিক সংঘর্ষের এই অধ্যায় অতিক্রম করার পর পৃথিবীতে আসে নানা যুগ। একটা সময় পৃথিবীতে চলেছে রেইনফরেস্টের বিস্তার, পরবর্তীতে ছিল ডাইনোসরের দাপট এবং তারও পরে শুরু হয় ম্যামথদের রাজত্ব। প্রায় ৮ লাখ বছর আগে প্রথম এই অঞ্চলে মানুষের আগমন ঘটে। তবে জলবায়ুর পরিবর্তনগত কারণে মানুষ বারবার এখানে এসেছে, আবার চলেও গিয়েছে। বরফযুগ ফিরে এলে এই অঞ্চলের বসতি ত্যাগ করতে হতো, উষ্ণ আবহাওয়া ফিরে এলে মানুষ আবার ফিরত। এই আসা-যাওয়ার চক্র চলতে থাকে হাজার হাজার বছর ধরে। জলবায়ু স্থায়ীভাবে মানব বসতির জন্য উপযোগী হয়ে ওঠার আগে পর্যন্ত কেউই এই অঞ্চলে স্থায়ীভাবে থাকতে পারেনি।

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১০,০০০ সালে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়তে শুরু করলে আয়ারল্যান্ড ব্রিটেন থেকে আলাদা হয়ে যায়। একই সময়ে পানির নিচে তলিয়ে যায় ব্রিটেন ও ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের মধ্যবর্তী অঞ্চল, যা আজও উত্তর সাগরের নিচে লুকিয়ে আছে। এর ফলে ব্রিটেন মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পরিণত হয় একটি দ্বীপে। তবে এটিকে একক দ্বীপ বলা যায় না, বরং এটি হলো বহু দ্বীপের সমষ্টি। যদি আকার বিচার করা হয় এবং পানির ওপরে থাকা ভূমিখণ্ডগুলোর সংখ্যা গণনা করা হয়, তবে এই সংখ্যা হাজার ছাড়িয়ে যাবে। তবে, এর মধ্যে শুধু ২০০টি দ্বীপে মানুষের বসবাস রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি নাম 'দ্য ইউনাইটেড কিংডম অব গ্রেট ব্রিটেন অ্যান্ড নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড'। স্কটল্যান্ডের উত্তরে অবস্থিত হেব্রিডিস, ওর্কনি ও শেটল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ এবং ওয়েলসের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত আংলেসি দ্বীপ এই রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত। এছাড়া দক্ষিণের আইলস অব স্কিলি এবং আইল অব ওয়াইট দ্বীপগুচ্ছও দেশটির অংশ। ভৌগোলিক অবস্থান ব্রিটেনকে সরাসরি সংযুক্ত করেছে ইংলিশ চ্যানেল, উত্তর সাগর, আইরিশ সাগর এবং আটলান্টিক মহাসাগরের সঙ্গে। প্রস্থের বিচারে মূল ভূখণ্ডের সবচেয়ে প্রশস্ত অংশ মাত্র ৫০০ কিলোমিটার। উপকূলরেখা অত্যন্ত খাঁজকাটা হওয়ায় দেশের কোনো অংশই সমুদ্র থেকে ১২০ কিলোমিটারের বেশি দূরে নয়।

ব্রিটেনের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রথম লিখিত নথি পাওয়া যায় খ্রিস্টপূর্ব ৩৩০ সালে। এই সময় পাইথিয়াস নামে এক গ্রিক অভিযাত্রী এক অভাবনীয় সমুদ্রযাত্রা

সম্পন্ন করেন। তিনি উত্তর দিকে যাত্রা করে সম্ভবত আইসল্যান্ড পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। এই অভিযানের পথে তিনি যে ভূখণ্ডের চারপাশ প্রদক্ষিণ করেছিলেন, সেটিই আজকের ব্রিটেন। তবে সে সময় অধিকাংশ মানুষই পাইথিয়াসের কথা বিশ্বাস করেনি। কারণ তিনি ফিরে এসে বরফের ওপর সাদা ভালুক বসে থাকার গল্প শুনিয়েছিলেন। এমনকি মধ্যরাতে সূর্যের আলো দেখার কথাও বলেছিলেন তিনি। কে বিশ্বাস করবে এসব রূপকথা!

উত্তর সাগরের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা ও উত্তাল জলরাশি আমার একদমই পছন্দ নয়। তাই সাগরপথে কখনো গ্রেট ব্রিটেন ঘুরে দেখা হয়নি আমার। কয়েক বছর আগে ইউরোপের বৃহত্তম এই দ্বীপটি ঘুরে দেখার পরিকল্পনা করি আমি। একটি সাইকেলে চেপে ব্রিটেনের এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত 'ল্যান্ড'স এন্ড টু জন ও'গ্রোটস' বা 'LEJOG' রুট ধরে পুরো দৈর্ঘ্য অতিক্রম করি তখন। এই পথটি প্রায় ১,৬০০ কিলোমিটার দীর্ঘ। সাধারণত দক্ষিণ থেকে উত্তরের দিকে যাত্রা করাই সুবিধাজনক। কারণ তাতে বাতাস পেছন থেকে সহায়তা করে। বারো দিনের এই যাত্রা বেশ কষ্টকর হলেও এটি ছিল আনন্দময় এক অভিজ্ঞতা। তবে প্রতিদিনের পথচলা শেষে উচ্চারণ, উপভাষা ও স্থানের নামের ধরনে পরিবর্তন লক্ষ্য করে আমি সবচেয়ে বেশি বিস্মিত হয়েছি। মাত্র ৫০ কিলোমিটার ব্যবধানেই ভাষার ভিন্নতা ছিল চোখে পড়ার মতো। এর পেছনে রয়েছে ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা ও ঐতিহাসিক প্রভাব। ব্রিটেনের অঞ্চলগুলো বিকশিত হয়েছে অপেক্ষাকৃত বিচ্ছিন্নভাবে। পাশাপাশি বিভিন্ন সময়ে রোমান, অ্যাংলো-স্যাক্সন, ভাইকিং ও নরম্যানদের আগমনের ফলে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে এই দেশ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, স্ক্যান্ডিনেভিয়ানরা ইংল্যান্ডে এসে বসতি স্থাপন করেছিল সেই সময়ের ইস্ট অ্যাংলিয়া রাজ্যে। বর্তমানের নরফোক, সাফোক, কেমব্রিজ ও সাসেক্সের কিছু অংশ মিলে ছিল ওই সময়ের ইস্ট অ্যাংলিয়া। স্ক্যান্ডিনেভিয়া অঞ্চলের ভাইকিংদের ভাষা থেকেই শহরের নামের শেষে "-by" প্রত্যয় যুক্ত হওয়া শুরু হয়েছিল। ডেনিশ ভাষায় 'by' শব্দ দিয়ে 'শহর' বোঝায়। ইংল্যান্ডের পূর্ব উপকূলে গেলেই হুইটবি (Whitby) বা গ্রিমসবি (Grimsby) নামের বহু শহর দেখতে পাওয়া যায়। আবার স্কটল্যান্ডের পার্শ্ববর্তী ইয়র্কশায়ারে এমন অনেক শব্দ প্রচলিত রয়েছে, যা দক্ষিণ ইংল্যান্ডের মানুষ বোঝে না। যেমন 'bairn' মানে শিশু এবং 'beck' মানে ছড়া বা ছোট নদী। পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশেই আঞ্চলিক বৈচিত্র্য দেখা যায়। কিন্তু যুক্তরাজ্যের মতো ছোট একটা দেশে

এত অল্প দূরত্বে এত স্পষ্ট ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য খুব কম দেশেই চোখে পড়ে।

সাধারণত যুক্তরাজ্যের প্রধান ভৌগোলিক বিভাজন দেখা হয় উত্তর-দক্ষিণ অনুযায়ী। তবে উচ্চভূমি ও নিম্নভূমির পার্থক্যের কারণে যুক্তরাজ্যের মূল বিভাজন হয়েছে আসলে পূর্ব-পশ্চিমে। যদি উত্তর-পূর্ব দিকের টিজ নদী থেকে শুরু করে দক্ষিণ-পশ্চিমের ডেভনে অবস্থিত এক্স নদী পর্যন্ত একটি রেখা টানা হয়, তাহলে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের উচ্চভূমি ও নিম্নভূমির বিভক্তি স্পষ্টভাবে বোঝা সম্ভব। এই রেখার পশ্চিমে রয়েছে কঠিন শিলা ও উচ্চভূমি। সেখানে দেখা যায় লেক ডিস্ট্রিক্ট, ক্যাম্ব্রিয়ান পর্বতমালা ও ডার্টমুরের মতো 'মুর তৃণভূমি'। অপরদিকে, পূর্বদিকের ভূমি অপেক্ষাকৃত সমতল এবং এর মাটি তুলনামূলক নরম ও চক শিলাযুক্ত। এর অন্যতম প্রমাণ ডোভার শহরের বিখ্যাত 'হোয়াইট ক্লিফ'। এই ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য যুক্তরাজ্যের পূর্বাঞ্চলের তুলনায় পশ্চিমাঞ্চলকে উষ্ণতর এবং বেশি বৃষ্টিপাতপ্রবণ করেছে। ক্যারিবিয়ান অঞ্চল থেকে উৎপন্ন 'গালফ স্ট্রিম'-এর উষ্ণ স্রোত আটলান্টিক মহাসাগর পেরিয়ে যুক্তরাজ্যের পশ্চিম উপকূলে এসে পৌঁছায়। সাগরের ওপর বয়ে যাওয়া বাতাস এই উষ্ণ স্রোতের আর্দ্রতা শোষণ করে, যা পরবর্তীতে উচ্চভূমিতে বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং বৃষ্টিপাত ঘটায়। এই জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্যের ফলে গ্রীষ্মমণ্ডলীয় স্বর্গরাজ্য না হওয়া সত্ত্বেও, একই অক্ষাংশে অবস্থিত রাশিয়া বা কানাডার তুলনায় অনেক বেশি নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়া উপভোগ করে দেশটি। আর এই আবহাওয়া কৃষির জন্য বিশেষভাবে উপকারী।

অবশ্য উত্তর-দক্ষিণেও বিভাজন রয়েছে। যুক্তরাজ্যের পর্বতমালা মূলত মূল ভূখণ্ডের পশ্চিমাংশে অবস্থিত হলেও যত উত্তরের দিকে যাওয়া যায় পাহাড়গুলো ততই উঁচু হতে থাকে। স্কটল্যান্ডেও বেশিরভাগ উচ্চভূমি উত্তর-পশ্চিম অংশে অবস্থিত। সমতল ভূমিতে নির্মাণকাজ তুলনামূলক সহজ। তাই এই ভৌগোলিক পার্থক্য পরিকাঠামো উন্নয়নের ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলেছে। ইংল্যান্ডের উত্তর-পশ্চিম, ইয়র্কশায়ার ও উত্তর-পূর্ব অংশে অবস্থিত লিডস, শেফিল্ড, ম্যানচেস্টার, লিভারপুল ও নিউক্যাসলের মতো শহরগুলো শিল্পবিপ্লবের সময় গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তবে তুলা শিল্প, কয়লা খনি ও ভারী শিল্পের পতন এই অঞ্চলগুলোতে বড় অর্থনৈতিক ধাক্কা দেয়। অপরদিকে, দক্ষিণ ইংল্যান্ডের দক্ষিণাংশের আবহাওয়া তুলনামূলক উষ্ণ। এই অংশের নদী তুলনামূলক সমতল এবং জমি কৃষির জন্য অনুকূল। পাশাপাশি রাজধানী লন্ডনের প্রভাবের কারণে উত্তরাঞ্চলের তুলনায় এই

দক্ষিণাঞ্চল বেশি উন্নত। এই কারণেই ইংল্যান্ডের আয়তন যুক্তরাজ্যের মোট ভূমির অর্ধেকের সামান্য বেশি হলেও এই অংশে বাস করে যুক্তরাজ্যের ৮৪ শতাংশ জনগণ। এমনকি স্কটল্যান্ডের বেশিরভাগ মানুষের বসবাসও দেশটির দক্ষিণ অংশে ইংল্যান্ড সীমান্তের কাছাকাছি। তাদের শিল্পোন্নত এলাকাগুলোও দক্ষিণে। তবে স্কটল্যান্ডের জনসংখ্যা এমনিতেও তুলনামূলকভাবে অনেক কম। ইংল্যান্ডে বসবাস করে প্রায় ৫৬ মিলিয়ন মানুষ। ওয়েলসে জনসংখ্যা প্রায় ৩ মিলিয়ন, আর উত্তর আয়ারল্যান্ডে প্রায় ২ মিলিয়ন। সেই তুলনায় স্কটল্যান্ডের জনসংখ্যা মাত্র ৫.৫ মিলিয়ন।

দক্ষিণ ইংল্যান্ড আন্তর্জাতিক এবং অভ্যন্তরীণ রেল ও বিমান যোগাযোগের কেন্দ্রস্থল। দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলের কেন্দ্রবিন্দু রাজধানী শহর লন্ডন। এই শহরেই আছে দেশের প্রধান রেলস্টেশনগুলো, রয়েছে হিথ্রো ও গ্যাটউইকের মতো ব্যস্ত বিমানবন্দর। এখান থেকেই যুক্তরাজ্যের মোটরওয়ে নেটওয়ার্ক বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এখানেই রয়েছে যুক্তরাজ্যের ব্যস্ততম সমুদ্রবন্দর, রয়েছে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে সংযোগকারী 'চ্যানেল টানেল'। রাজধানী শহরেই যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্ট, বড় বড় কোম্পানির সদর দপ্তর এবং আর্থিক খাতের প্রতিষ্ঠানগুলোর অবস্থান। যুক্তরাজ্য একটি আধুনিক রাষ্ট্র, যা গড়ে উঠতে লেগেছে দীর্ঘ সময় এবং এর পেছনে রয়েছে প্রচুর রক্তক্ষয়ের ইতিহাস।

কোথা থেকে শুরু করা যায়? এই গল্পের যথার্থ সূচনা হতে পারে ৪৩ খ্রিস্টাব্দ। এই সময়েই ব্রিটেনে প্রথম রোমানদের স্থায়ী দখলদারিত্ব শুরু হয়েছিল। এই ঘটনা ভেঙে দিয়েছিল ব্রিটেনের অতীতের ধারাবাহিকতা, গড়ে দিয়েছিল নতুন শতাব্দীর ভিত্তি, আর রেখে গেছে এমন এক চিহ্ন, যা আজও এই ভূমির বুকে স্পষ্ট।

রোমানদের আগমনের আগে এই ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে বিশাল দ্বীপটি ছিল সভ্যতার মূল কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন। বলতে গেলে ব্রিটেন ছিল দূরবর্তী এক প্রান্তিক ভূখণ্ড। সে সময় এখানে বাস করত অক্ষরজ্ঞানহীন অসংখ্য বুনো গোত্র। জ্ঞানচর্চার পরিবর্তে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষেই ব্যস্ত থাকত তারা। রোমানরা ইংলিশ চ্যানেল ডিঙিয়ে এসে ওয়াইনের নহর বইয়ে দিল, তৈরি করল সুসজ্জিত বাথরুম, আর সেই সঙ্গে নিয়ে এল কঠোর আইন-কানুন।

রোমানরা ব্রিটেনের খবর জানতে পারে মূলত জুলিয়াস সিজারের ব্রিটেন অভিযানের প্রতিবেদন থেকে। সিজার এখানে অভিযান চালিয়েছিলেন আরো প্রায়

এক শতাব্দী আগে। তিনি লিখেছিলেন, ব্রিটেনের অধিবাসীরা নীল রঙে নিজেদের শরীর রাঙায়, তারা বর্বর ও যুদ্ধপ্রিয়। তাই সম্রাট ক্লডিয়াস যখন ব্রিটেন দখলের সিদ্ধান্ত নেন, তখন তিনি কোনো ঝুঁকি না নিয়ে ৪০,০০০ অভিজ্ঞ সৈন্য পাঠিয়েছিল। এই বিপুল শক্তির প্রয়োজনও হয়েছিল। অনেকেই ফরাসি কমিক্সের চরিত্র 'অ্যাসটারিক্স দ্য গল'-এর কথা জানেন। তিনি বর্তমান ফ্রান্সের একটি ছোট্ট ভূখণ্ড রোমানদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। কেল্টিক ব্রিটনরা ছিল তার চাইতেও ভয়ংকর প্রতিপক্ষ।

দক্ষিণ ইংল্যান্ডের অসংখ্য গোষ্ঠীকে সম্পূর্ণভাবে বশে আনতে রোমানদের কয়েক দশক লেগে যায়। এমনকি বিশ বছর পরেও তারা প্রবল বিদ্রোহের মুখে পড়ে। এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিল আইসেনি গোষ্ঠীর রানি বউডিকা। ইতিহাসবিদরা সচরাচর 'রোমান ব্রিটেন' নামটি ব্যবহার করলেও প্রকৃতপক্ষে রোমানরা কখনোই আজকের ওয়েলস ও স্কটল্যান্ড পুরোপুরি জয় করতে পারেনি। ফলে ওই অঞ্চলগুলোর পৃথক সাংস্কৃতিক পরিচয় টিকে গিয়েছে, এমনকি আজও তা দেখতে পাওয়া যায়। রোমানদের দখল করা অঞ্চল যুক্তরাজ্যের পূর্ব-পশ্চিম বিভাজনের সঙ্গে প্রায় মিলে যায়। দখল করা পুরো অঞ্চল জুড়ে সড়কপথ নির্মাণ করেছিল রোমানরা। তারা ফিরে যাওয়ার বহু শতাব্দী পরেও সেই পথগুলোর অনেকাংশই টিকে ছিল। বর্তমান ব্রিটেনের মোটরওয়েগুলো তৈরি হয়েছে সেই পথগুলোর রেখা অনুযায়ী।

রোমান দখলদারিত্বের কাঠামো ব্রিটেনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলেছিল। সম্ভবত এর সবচেয়ে সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত দেখা যায় টেমস নদীর মোহনার কাছে। রোমানরা বুঝতে পেরেছিল, দক্ষিণ ও উত্তর ব্রিটেন দখলের পর এই দুই অঞ্চলকে সংযুক্ত করতে হলে নদী পার হওয়ার একটি উপযুক্ত জায়গা প্রয়োজন। সেটি হতে হবে মোহনার কাছাকাছি, যাতে তাদের জাহাজ ভিড়তে পারে। আবার জায়গাটি হতে হবে নদীর এমন একটি সরু অংশে, যেখানে দুই তীরেই মজবুত ভূমি রয়েছে। তারা এমন একটি জায়গা খুঁজে পায় নদীর উত্তর তীরে দুইটি ছোট পাহাড়ের মাঝে। এই জায়গায়টাতে নদী সরু হয়ে এসেছে। রোমানরা রোম নগরী গড়ে তুলেছিল সাতটি পাহাড়ের ওপর। কিন্তু ব্রিটেনে এসে তারা তাদের প্রথম শহর প্রতিষ্ঠা করে মাত্র দুইটি পাহাড়ের ওপর—লুডগেট হিল ও কর্নহিল। সেখানেই তারা প্রতিষ্ঠা করেছিল লন্ডিনিয়াম, অর্থাৎ আজকের লন্ডন শহর। এখানেই নির্মিত হয়েছিল প্রথম 'লন্ডন ব্রিজ'। রোমানদের ভাষায় এটা ছিল 'ব্রিটানিয়ার প্রবেশদ্বার'।

নবগঠিত এই নগরী দ্রুত সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। রোমানদের নির্মিত সবগুলো প্রধান সড়ক লন্ডিনিয়ামের সঙ্গে সংযুক্ত ছিল। আর এখান থেকেই সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে পণ্য পাঠানো হতো। প্রথম শতকের শেষ দিকে এসে শহরটির জনসংখ্যা ৫০ হাজার ছাড়িয়ে যায়।

তিনশো বছর পর রোমান সেনারা খুবই তাড়াহুড়ো করে ব্রিটেন ছেড়ে যায়। কারণ তাদের কাছে এই অনগ্রসর দ্বীপের চেয়ে বেশি জরুরি ছিল রোমান সাম্রাজ্যের পতন ঠেকানো। তারা যে অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরি করেছিল, তাদের বিদায়ের ফলে তা ধ্বসে পড়ে। নগরগুলো দ্রুত পরিত্যক্ত হয়ে যায় এবং লেখাপড়ার চর্চাও বিলুপ্ত হয়। রোমানরা চলে যাওয়া মাত্রই আগ্রাসীদের লোভনীয় লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয় বৃষ্টিভেজা এই দ্বীপটি। কারণ, রোমান শাসনের অবসানের পর দ্বীপটি পুনরায় ছোট ছোট যুদ্ধবাজ গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। এই দুর্বল পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে একের পর এক দখলদার এসে উপস্থিত হয় এখানে। প্রথমে ডেনমার্ক ও উত্তর জার্মানি থেকে আসে অ্যাঙ্গল, স্যাক্সন ও জুট গোষ্ঠী। রোমানদের মতো তারাও মূলত দ্বীপের পূর্ব অংশেই আধিপত্য বিস্তার করেছিল। স্কটল্যান্ড, ওয়েলস ও কর্নওয়ালের স্থানীয় গোষ্ঠীগুলো আবারও প্রবল প্রতিরোধ গড়ে তোলে। এই নতুন দখলদারদের হাত ধরেই আধুনিক ইংল্যান্ডের সীমানা ফুটে উঠতে শুরু করে। দ্বীপের দক্ষিণ অংশটি 'অ্যাঙ্গলল্যান্ড' নামে নতুন একটি পরিচয় পায়। এটাই পরবর্তীতে 'ইংল্যান্ড' হয়ে ওঠে। কেল্টিক ভাষাগুলো ধীরে ধীরে হারিয়ে যেতে থাকে, আর তার পরিবর্তে জায়গা করে নেয় জার্মানিক ভাষা থেকে উদ্ভূত 'ওল্ড ইংলিশ'। এই ওল্ড ইংলিশই আজকের আধুনিক ইংরেজি ভাষার ভিত্তি।

৬০০ সালের মধ্যে অ্যাংলো-স্যাক্সনরা ব্রিটেনে বেশ কয়েকটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে। এরই মধ্যে আয়ারল্যান্ডের স্কটি জাতিগোষ্ঠী স্কটল্যান্ডের পশ্চিম অংশে আক্রমণ চালিয়ে বসতি স্থাপন করে। আর এই সময় থেকেই ব্রিটেনের উত্তরাঞ্চলের এক-তৃতীয়াংশের নাম হয়ে ওঠে স্কটল্যান্ড।

এরপর দক্ষিণ ইংল্যান্ডে শুরু হয় একের পর এক রাজার পালাবদল। তাদের বেশিরভাগেরই নাম ছিল এডওয়ার্ড, এগবার্ট ইত্যাদি। আবার কিছু নাম শুরু হতো 'e' ধ্বনি দিয়ে, যেমন Æthelred। আর এদের সবারই প্রধান সমস্যা ছিল উত্তর থেকে আসা ভাইকিং আক্রমণ। তবে এদের মধ্যে একজন ছিলেন ব্যতিক্রম। তার নাম ছিল আলফ্রেড। তিনি ওয়েসেক্স ও মের্সিয়া রাজ্য একত্রিত করেন এবং ৮৮৬ সালে ভাইকিংদের হাত থেকে লন্ডন পুনরুদ্ধার করেন। এরপর তার ছেলে

এডওয়ার্ড এবং কন্যা এথেলফ্লেড আরো বড় পরিসরে রাজ্য বিস্তার করেন। তারা ভাইকিংদের রাজধানী ইয়র্ক দখল করে নর্দাম্ব্রিয়া পর্যন্ত নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। এগিয়ে যান পশ্চিমে ওয়েলসের দিকে। এই রাজবংশকে বলা হতো হাউজ অব ওয়েসেক্স। পরবর্তী সময়ে এডওয়ার্ডকে 'ইংরেজদের রাজা' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। কেউ কেউ অবশ্য তাকে 'ব্রিটেনের রাজা' বলারও চেষ্টা করেন, তবে সেটা আসলে অতিরঞ্জিত দাবি। ইংল্যান্ডের ব্রিটেন হয়ে উঠতে তখনো বাকি কয়েকশত কিলোমিটার ভূখণ্ড আর কয়েকশত বছর সময়।

ইংল্যান্ডের শাসনভার হাউজ অব ওয়েসেক্সের হাতেই ছিল। এডওয়ার্ডের পর আসেন এডমুন্ড, এড্রেড এবং এমনকি এডউইগ নামের এক রাজা। এরপর এলেন কিং এডগার দ্য পিসফুল (শাসনকাল ৯৫৯-৯৭৫)। তার শান্ত স্বভাবের বাইরে ইতিহাসে তার গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল রাজ্যকে বিভিন্ন 'কাউন্টি' বা 'শায়ারে' বিভক্ত করা। কাউন্টিগুলোর নাম এখনো প্রচলিত আছে। এই সময়ের মধ্যে নিজস্ব সংস্কৃতি ও আত্মপরিচয়ের এক ক্রমবর্ধমান বোধ নিয়ে ইংল্যান্ডের একটি স্বতন্ত্র পরিচয় গড়ে ওঠে। একইভাবে, স্কটল্যান্ডও যুদ্ধবাজ গোষ্ঠীগুলোর অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে সরে এসে একটি ঐক্যবদ্ধ রাজ্যের রূপ নিতে শুরু করে।

অষ্টম ও নবম শতকে ভাইকিংরা ইংল্যান্ডে আসত মূলত লুটপাট করতে। তবে রাজা আলফ্রেডের সময়েই পূর্ব ও উত্তরাঞ্চলে ড্যানিশরা বেশ কিছু স্থায়ী বসতি গড়ে তুলেছিল। ১০ম শতাব্দীর শেষভাগে এডগারের পুত্র এথেলরেড দ্য আনরেডির শাসনামলে আবারও ভাইকিংরা হানা দিতে শুরু করে। শুরুতে লুটপাটের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও ৯৯১ সালে তারা বিশাল নৌবহর নিয়ে দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে এসে হাজির হয়। ম্যালডোনের যুদ্ধে ইংরেজরা পরাজিত হওয়ার পর বিপুল অর্থ দিয়ে ডেনিশদের শান্ত রাখার কৌশল নেন রাজা এথেলরেড। তবে ভাইকিংদের লুটপাট থামেনি। তারা বারবার হামলা চালিয়ে রাজার কাছে অর্থ দাবি করতে থাকে। ১০০১ সালে একটি ডেনিশ বহর হামলা চালায় সাসেক্সের উপকূলে। ১০০২ সালের এপ্রিলে এথেলরেড আবারও বিপুল অর্থ দিয়ে তাদের শান্ত করেন। তবে এরপরে তিনি এক নিষ্ঠুর পদক্ষেপ নেন। সেই বছরের নভেম্বর মাসে ইংল্যান্ডে বসবাসরত সকল ড্যানিশ পুরুষকে হত্যার নির্দেশ দেন তিনি।

এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নিতে ডেনমার্কের রাজা স্ভেইন ফর্কবিয়ার্ড ১০০৪ সালে ইংল্যান্ডে এক ব্যাপক দখল অভিযান শুরু করেন। ১০১৩ সালে পুরো ইংল্যান্ড তার দখলে আসে এবং এথেলরেড পরিবারসহ ইংলিশ চ্যানেলের অপরপারে

ফ্রান্সের নরম্যান্ডিতে পালিয়ে যান। পরে স্ভেইনের পুত্র ক্যানিউট ইংল্যান্ড শাসন করতে শুরু করেন।

১০৩৫ সালে ক্যানিউটের মৃত্যুর পরে ডেনিশ শাসন দ্রুত দুর্বল হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত ১০৪২ সালে ক্যানিউটের বংশ নিঃশেষ হয়ে এথেলরেডের আরেক ছেলে এডওয়ার্ড দ্য কনফেসর ইংল্যান্ডের রাজা হন। তিনি রাজত্ব করেন ১০৬৬ সাল পর্যন্ত। সমস্যা হলো, এডওয়ার্ড দ্য কনফেসরের কোনো সন্তান ছিল না। তখনকার প্রথা অনুযায়ী, বৈধ উত্তরাধিকারীর খোঁজ করতে গিয়ে ইংল্যান্ডে ডাকা হয় নির্বাসিত রাজপুত্র এডওয়ার্ড দ্য এক্সাইলকে। বহু বছর বিদেশে কাটানোর পর ১০৫৭ সালে ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন তিনি। কিন্তু দেশে ফিরেই হঠাৎ মৃত্যু হয় তার। সমকালীন সূত্র অনুযায়ী এটি ছিল খুবই রহস্যজনক মৃত্যু। তার অকালমৃত্যুর পর উত্তরাধিকারী হন তার ছেলে এডগার দ্য এথেলিং। কিন্তু ১০৬৬ সালে যখন এডওয়ার্ড দ্য কনফেসর মারা গেলেন, এডগার তখনও অপ্রাপ্তবয়স্ক। তাই তাকে সিংহাসনের যোগ্য উত্তরাধিকারী মনে করা হয়নি। এই পরিস্থিতিতে অভিজাতদের সমর্থন পেয়ে সিংহাসনে বসেন এডওয়ার্ডের ঘনিষ্ঠতম উপদেষ্টা হ্যারল্ড গডউইনসন। আর এরপরই ঘটে নরম্যানদের আগমন।

১০৬৬ সালটি সম্ভবত যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে বেশি পরিচিত ঐতিহাসিক সময়। হ্যারল্ড গডউইন সিংহাসনে বসলেও সে বছরের ঘটনার ঘনঘটা তখনও শেষ হয়নি। ইংলিশ চ্যানেলের অপর পারে ফ্রান্সের নরম্যান্ডি অঞ্চলে নরম্যানদের বাস। এডওয়ার্ড দ্য কনফেসর জীবনের একপর্যায়ে নির্বাসনে নরম্যান্ডিতে ছিলেন এবং সেখানকার ডিউক পরিবারের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরি করেছিলেন তিনি। এডওয়ার্ড দ্য কনফেসারের মৃত্যুর পর নরম্যান্ডির ডিউক উইলিয়াম দাবি করেন, এডওয়ার্ড নাকি তাকে সিংহাসনের উত্তরসূরি করে গিয়েছিলেন। আরো দাবি করা হয়, হ্যারল্ড গডউইনসন নরম্যান্ডিতে এসে শপথ করেছিলেন যে তিনি উইলিয়ামের দাবিকে সমর্থন করবেন। কিন্তু বাস্তবে হ্যারল্ড নিজেকে রাজা ঘোষণা করলে উইলিয়াম এটিকে বিশ্বাসঘাতকতা বলে ঘোষণা করেন।

এই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে ইংল্যান্ডের দক্ষিণ উপকূলে অবতরণ করেন ডিউক উইলিয়াম। হেস্টিংসের যুদ্ধে হ্যারল্ডের বাহিনীকে পরাজিত করে লন্ডনের দিকে অগ্রসর হন তিনি। ডিসেম্বর মাসে লন্ডন দখল করে নিজেকে ইংল্যান্ডের রাজা ঘোষণা করেন উইলিয়াম। লন্ডনের ওয়েস্টমিনস্টার অ্যাবেতে অনুষ্ঠিত সেই অভিষেক অনুষ্ঠানটি ছিল প্রতীকীভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে আসলে

ইংল্যান্ডে অ্যাংলো-স্যাক্সন শাসনের সমাপ্তি ঘটে। শুরু হয় নরম্যান শাসনের। ভিত্তি তৈরি হয় হয় আধুনিক ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের। এই বিশেষ ঘটনা পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে ইংরেজ সমাজ, প্রশাসন, আইন, এমনকি ভাষাকেও গভীরভাবে প্রভাবিত করে। লন্ডন তখনও রাজধানী হিসেবে আনুষ্ঠানিক মর্যাদা পায়নি। সেই স্বীকৃতি পেতে লেগেছিল প্রায় এক শতাব্দী। তবে উইলিয়ামের শাসনামলেই শহরটির গুরুত্ব দ্রুত বাড়তে শুরু করে। তিনি টেমস নদীর তীরে বিশাল দুর্গ 'টাওয়ার অব লন্ডন' নির্মাণ করেন, যা কেবল প্রতিরক্ষা-স্থাপনা নয়, বরং রাজকীয় কর্তৃত্ব ও নরম্যান শক্তির প্রতীক হয়ে ওঠে। এর ফলে লন্ডন ধীরে ধীরে একটি প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে বিকশিত হয়। পরবর্তী সময়ের ঐতিহাসিকরা উইলিয়ামকে অভিহিত করেছেন 'উইলিয়াম দ্য কনকারার' নামে।

নরম্যান আক্রমণ ছিল রোমানদের বিদায়ের পর ব্রিটিশ ইতিহাসে ঘটে যাওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নরম্যানরা স্ক্যান্ডিনেভিয়ার সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্ক ছিন্ন করে পশ্চিম ইউরোপমুখী করে তোলে ইংল্যান্ডকে। নরম্যানদের শাসনব্যবস্থা লন্ডনকে নরম্যান ফ্রান্সের সঙ্গে সংযুক্তি স্থাপনের কৌশলগত কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে। ইংরেজি ভাষায় প্রবেশ করতে শুরু করে ফরাসি ভাষার শব্দ। ফরাসি শৈলীতে নির্মাণ করা হয় বিশাল বিশাল সব ক্যাথেড্রাল। আর নতুন ফরাসি জমিদাররা নিজেদের রক্ষার জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নির্মাণ করতে থাকে দুর্গ। কারণ সাধারণ জনগণের মধ্যে তাদের শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল।

এই উত্তেজনা চলতে থাকে কয়েক দশক ধরে। একাধিক বিদ্রোহও সংঘটিত হয়, যার অন্যতম ছিল এডোগার দ্য এথলিং-এর বিদ্রোহ। কিন্তু নতুন দখল করা ভূখণ্ডের ওপর নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে সক্ষম হয় নরম্যানরা। নরম্যানদের পরে পর ইংল্যান্ডের ক্ষমতায় আসে হাউজ অব প্লান্টাজেনেট। এই ফরাসি রাজবংশ ইংল্যান্ড শাসন করে ১১৫৪ থেকে ১৪৮৫ সাল পর্যন্ত। তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন রাজা জন। গৃহযুদ্ধ এড়ানোর লক্ষ্যে ১২১৫ সালে 'ম্যাগনা কার্টা' নামক এক ঐতিহাসিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন তিনি। ইংলিশ আইনি ব্যবস্থার ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয় এই দলিল। ম্যাগনা কার্টা রাজাকে তার ক্ষমতায় কিছু সীমাবদ্ধতা মানতে বাধ্য করেছিল, ফলে রাজা ও অভিজাতদের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরি হয়। কিন্তু তৎকালীন সাধারণ জনগণের অধিকারের ওপর এটি তেমন প্রভাব ফেলেনি। তবে স্বাধীনতার প্রতীকী দলিল হিসেবে ইতিহাসে জায়গা করে নিয়েছে

এই ম্যাগনা কার্টা। আজও যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন রাজনৈতিক বিতর্কে এই দলিলের প্রসঙ্গ উঠে আসে। যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানেও ম্যাগনা কার্টা গভীর প্রভাব ফেলেছিল। বিশ শতকের অন্যতম শ্রদ্ধেয় ব্রিটিশ বিচারপতি লর্ড ডেনিং এই চুক্তিকে 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সাংবিধানিক দলিল' হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন।

পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে ইংরেজরা যেমন একদিকে স্কটল্যান্ড ও ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে, তেমনি নিজেদের ভেতরেও গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। ১৪৮৫ সালে প্লান্টাজেনেটদের বিদায় করে ক্ষমতায় আসে টিউডর রাজবংশ। এই বংশের সবচেয়ে পরিচিত রাজা ছিলেন অষ্টম হেনরি (শাসনকাল ১৫০৯–১৫৪৭)। আইনসভার মাধ্যমে এক বাস্তবতাকে স্বীকৃতি দেন তিনি। ইংরেজরা আগে থেকেই ওয়েলস নিয়ন্ত্রণ করছিল, তবে হেনরির 'অ্যাক্টস অব ইউনিয়ন' ঘোষণা করল যে, ইংল্যান্ডের আইন এখন ওয়েলসেও কার্যকর হবে এবং সেখানকার আদালতের একমাত্র ভাষা হবে ইংরেজি। কিন্তু ওয়েলসের অধিকাংশ মানুষ তখনো কেবল ওয়েলশ ভাষায় কথা বলত। ফলে ওয়েলস অঞ্চলে এই আইনের নানারকম প্রভাব পড়ে। একদিকে দোভাষীদের ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়, অন্যদিকে ওয়েলশ ভাষার ব্যবহার ধীরে ধীরে কমে যেতে থাকে। পরবর্তী কয়েক শতকের মধ্যে ওয়েলশ ভাষা প্রায় বিলুপ্তির পথে চলে যায়। এই কারণে লন্ডনের প্রতি এক ধরনের দীর্ঘস্থায়ী ক্ষোভ জন্ম নেয় ওয়েলসবাসীর মধ্যে। তবে, এই ঘটনা যুক্তরাজ্য গঠনের পথে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হয়ে ওঠে।

অষ্টম হেনরি ইতিহাসে সবচেয়ে বেশি পরিচিত তার ছয় বিবাহের জন্য। ১৫৩৩ সালে তিনি তার প্রথম স্ত্রী ক্যাথরিনের সঙ্গে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটান এবং অ্যান বোলিনকে বিয়ে করেন। তার গর্ভে জন্ম নেন ভবিষ্যতের রানি এলিজাবেথ। কিন্তু ক্যাথলিক চার্চ বিবাহ বিচ্ছেদ স্বীকৃতি দেয় না। কারণ তাদের মতে বিবাহ হলো আজীবন চলমান এবং ভঙ্গ করা যায় না এমন এক ধর্মীয় চুক্তি। ফলে, পোপ তাকে ক্যাথলিক চার্চ থেকে বহিষ্কার করেন। এর জবাব হিসেবে পোপবিরোধী প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদকে রাজনৈতিক ছত্রছায়া দেন অষ্টম হেনরি। এই ঘটনা 'ইংলিশ রিফর্মেশন'-এর সূচনা করে। এই রিফর্মেশন বা সংস্কারের মধ্য দিয়ে তিনি চার্চকে রাজ্যের অধীন আনেন। প্রতিষ্ঠা করেন 'চার্চ অফ ইংল্যান্ড'। নিজেকে চার্চ অব ইংল্যান্ডের সর্বোচ্চ নেতা ঘোষণা করেন তিনি। বন্ধ করে দেওয়া হয় ক্যাথলিক চার্চের আওতাধীন ৮০০টি মঠ। সেগুলোর জমি ও সম্পদ নিজের দখলে নিয়ে নেন হেনরি।

তার কন্যা প্রথম এলিজাবেথ (শাসনকাল ১৫৫৮–১৬০৩) ইংল্যান্ডকে আরো দৃঢ়ভাবে প্রোট্যাস্ট্যান্ট ধর্মের দিকে এগিয়ে নেন। যদিও এর ফলে ইউরোপ ও স্কটল্যান্ডের ক্যাথলিক শক্তির তীব্র বিরোধিতার মুখে পড়তে হয় তাকে। ১৫৮৭ সালে নিজের চাচাতো বোন, স্কটল্যান্ডের রানি মেরিকে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড দেন তিনি। এলিজাবেথের শাসনামলেই ইংল্যান্ড সত্যিকারের শক্তিধর হয়ে ওঠে। এই সময়টি ছিল আবিষ্কারের যুগ। ওই সময়েই ফ্রান্সিস ড্রেক ও ওয়াল্টার র‍্যালি নানা অভিযানে বের হয়েছিলেন। যদিও এদের অভিযানগুলো অনেকাংশেই ছিল জলদস্যুতার কাছাকাছি। এই সময়েই ইংলিশ নেভির হাতে স্প্যানিশ আর্মাডার পরাজয় ঘটে এবং শেক্সপিয়ারের কালজয়ী সাহিত্যকর্মের আবির্ভাব হয়। এরপর ইংল্যান্ডের সিংহাসনে বসেন রাজা প্রথম জেমস। তবে তার বিষয়টি একটু ব্যতিক্রমী। তিনি কেবল ইংল্যান্ডের রাজাই ছিলেন না, একই সঙ্গে ছিলেন স্কটল্যান্ডের রাজা ষষ্ঠ জেমস। অর্থাৎ প্রথমবারের মতো একই ব্যক্তি ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ড উভয় অঞ্চলের মুকুট একত্রে ধারণ করলেন। মজার বিষয় হলো, এই একই ব্যক্তি ইংল্যান্ডে এবং স্কটল্যান্ডে দুই নামে পরিচিত ছিলেন। এই দ্বৈত রাজমুকুট ছিল যুক্তরাজ্য গঠনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তবে তার আগে ইংল্যান্ডকে পার করতে হয়েছে নানা সংকট—রাজা প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদ, একটি রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধ (১৬৪২–১৬৫১), সামরিক শাসন (অলিভার ক্রমওয়েল) এবং শেষ পর্যন্ত রাজতন্ত্রের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। অবশেষে ১৭০৭ সালে ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের সঙ্গে স্কটল্যান্ডের সংযুক্তি ঘটে, যা ছিল ব্রিটিশ ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মোড়।

শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বহিঃশত্রুর মোকাবিলা করতে করতে ইংরেজরা বুঝে গিয়েছিল যে, ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের দেশগুলোর জনসংখ্যা তাদের তুলনায় অনেক বেশি। ফলে এই দেশগুলো বিশাল বাহিনী গড়ে তুলতে সক্ষম। তারা দেখেছে কীভাবে রোমান, ভাইকিং এবং নরম্যানরা শক্তিশালী বাহিনী নিয়ে ইংল্যান্ড আক্রমণ করেছিল। তবে এর থেকেও বড় সমস্যা রয়েছে। স্কটল্যান্ডকে যখন ইউরোপের কোনো শক্তিশালী সাম্রাজ্য মিত্র হিসেবে পেয়ে যেত তখন ইংল্যান্ডের জন্য তৈরি হতো মারাত্মক বিপদ। কারণ শত্রুরা তখন স্কটল্যান্ড হয়ে উত্তর দিক থেকে অনায়াসে হামলা চালাতে পারত। অনেকসময় একযোগে উত্তর ও দক্ষিণ দুই দিক থেকেই আক্রমণের মুখে পড়ত ইংল্যান্ড।

এই সমস্যা সমাধানের জন্য ইংরেজরা নানা ধরনের কৌশল গ্রহণ করে। তারা ইউরোপে কখনোই কোনো একক শক্তির উত্থান হতে দিতে চাইত না। বরং

কেউ খুব বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠলে ইংরেজরা তাদের প্রতিপক্ষদের সঙ্গে জোট বাঁধত। এই ধরনের 'অফশোর ব্যালান্সিং' কৌশলের পাশাপাশি তাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল পুরো দ্বীপটিকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনা।

অন্যদিকে স্কটল্যান্ডের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল একদমই আলাদা। স্বল্প জনসংখ্যা ও সীমিত সম্পদের কারণে স্কটল্যান্ড কখনোই ইংল্যান্ডকে পরাজিত বা দমন করার অবস্থানে ছিল না। তাই নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তারা বরাবরই ইংল্যান্ডের শত্রুদের পাশে মিত্র হিসেবে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেছে। বিশেষ করে ফ্রান্সের সঙ্গে ছিল তাদের সবথেকে দীর্ঘস্থায়ী মিত্রতা চুক্তি। স্কটল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে প্রথম আনুষ্ঠানিক চুক্তি হয় ১২৯৫ সালে। সেখানে বলা হয়, ইংল্যান্ড যদি ফ্রান্সে আক্রমণ চালায়, তাহলে স্কটল্যান্ড ইংল্যান্ডে আক্রমণ করবে। ফলে একসঙ্গে দুই ফ্রন্টে যুদ্ধ বাঁধবে। এই চুক্তির খবর পাওয়া মাত্র ইংরেজরা স্কটল্যান্ডে হামলা চালায়। তবে আক্রমণ করে খুব একটা সুবিধা হয়নি। এরপর পরবর্তী প্রায় আড়াইশত বছর ধরে স্কটল্যান্ড ও ফ্রান্সের সব নেতাই এই চুক্তি নবায়ন করে গেছেন। শুধু ফ্রান্সের রাজা একাদশ লুই ছিলেন এর ব্যতিক্রম। এই দীর্ঘস্থায়ী জোট পরে পরিচিত হয় 'অল্ড অ্যালায়েন্স' নামে। ফ্রান্স স্কটিশ বাহিনীকে অর্থ ও অস্ত্র সহায়তা দিত এবং ইংল্যান্ডে আক্রমণ চালাতে উৎসাহিত করত। স্কটিশ ও ফরাসি সেনারা শত শত বছর ধরে একে অপরের হয়ে যুদ্ধে লড়েছে।

তবে ১৭০৭ সালে নানা কারণে পরিস্থিতি বদলে যায়। ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের মধ্যকার 'অ্যাক্টস অব ইউনিয়ন' বাস্তবায়িত হয়। এই ঘটনার এক শতাব্দী আগে দুই দেশের রাজমুকুট একীভূত হওয়ায় দ্বন্দ্ব কিছুটা কমে গিয়েছিল। দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যও ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তাছাড়া ইংরেজরা ইতোমধ্যে উত্তর অ্যামেরিকা, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, ভারত ও আফ্রিকায় উপনিবেশ গড়ে তুলেছিল। এতে একদিকে তারা দ্রুত ধনী হয়ে উঠছিল, পাশাপাশি শিল্প বিপ্লবের প্রথম ইঙ্গিতও দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু স্কটল্যান্ডের অবস্থা ছিল ভিন্ন। ১৬৯০-এর দশকে টানা কয়েক বছর ফসল নষ্ট হওয়ার কারণে হাজার হাজার মানুষ অনাহারে মারা যায়। অর্থনৈতিকভাবে লাভবান হওয়ার জন্য তাদের কোনো উপনিবেশও ছিল না। এই দুর্বল অবস্থা নিয়ে নতুন শতাব্দীতে প্রবেশের জন্য প্রস্তুত ছিল না তারা।

স্কটল্যান্ড একবার উপনিবেশ গঠনের চেষ্টা করেও দুর্ভাগ্যজনকভাবে ব্যর্থ হয়। ১৬৯৮ সালে পাঁচটি স্কটিশ জাহাজের একটি বহর উপনিবেশ স্থাপনের লক্ষ্য নিয়ে পানামার উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। ব্যাপক দেশপ্রেমের ঢেউয়ে ভাসিয়ে সাধারণ

জনগণের কাছ থেকেই এই অভিযানের জন্য তহবিল সংগ্রহ করা হয়। তবে বাস্তবতা ছিল নির্মম। অধিকাংশ স্কটিশরা সেখানে পৌঁছানোর পরপরই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। বাকি জীবিতরা স্প্যানিশ নৌবাহিনীর অবরোধের মুখে পরে উপনিবেশ ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়। স্কটল্যান্ডের আশা ছিল এই উপনিবেশ থেকে প্রচুর সম্পদ আসবে, যার মাধ্যমে তারা পাল্লা দিতে পারবে স্পেন, পর্তুগাল এবং ইংল্যান্ডের মতো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ফলাফল হলো মৃত্যুর মিছিল এবং বিপর্যয়। এই ব্যর্থতা স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতার অবসানে বড় ভূমিকা রাখে। আজকের দিনের পানামার মানচিত্রেও 'পুন্তা এসকোসেস' বা 'স্কটিশ পয়েন্ট' নামে এই ঘটনাটির একটি ছাপ রয়ে গেছে।

এই ব্যর্থ উদ্যোগের ক্ষয়ক্ষতি নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও অনেকেই ধারণা করেন, স্কটল্যান্ডের মোট সম্পদের অন্তত এক-পঞ্চমাংশ এই অভিযানে নষ্ট হয়েছিল। কেউ কেউ তো বলেন আরো বেশি। ফলে বিশাল ঋণের চাপ পড়ে যায় দেশটি। এই কারণেই ১৭০৭ সাল নাগাদ দারিদ্র্যপীড়িত স্কটল্যান্ডের জন্য ইংল্যান্ডের বাজারে প্রবেশাধিকার পাওয়া খুব জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। অন্যদিকে এই ইউনিয়ন করার ব্যাপারে ইংল্যান্ডেরও স্বার্থ ছিল। ফ্রান্সের জনসংখ্যা তখন ইংল্যান্ডের প্রায় দ্বিগুণ। ইংরেজরা একদমই চাইত না যে স্কটল্যান্ড আবার ফ্রান্সের সঙ্গে পুরোনো 'অল্ড অ্যালায়েন্স'-এর পথে ফিরে যাক। স্কটল্যান্ডকে ফ্রান্সের থেকে দূরে রাখার জন্য ইংল্যান্ড একটি চুক্তি করে স্কটল্যান্ডের সাথে। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ইংল্যান্ড স্কটল্যান্ডকে তাদের দেনা শোধ করতে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ দেয়। উভয় দেশের পার্লামেন্টে পাশ হয় 'অ্যাক্টস অব ইউনিয়ন'। আর এর মধ্য দিয়ে গোটা দ্বীপটি প্রথমবারের মতো একটি একক সরকার পায়।

পরবর্তী দুই শতকে ব্রিটেন যে তার শক্তির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছে গিয়েছিল, তা মোটেই কাকতালীয় নয়। আগে নিজেদের সীমান্ত রক্ষার জন্য স্কটল্যান্ড ও ইংল্যান্ডকে পৃথক সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে হতো। কিন্তু এখন সেই অর্থ ব্যবহার করা হলো ইউরোপীয় শক্তিগুলোর আক্রমণ ঠেকানোর কাজে। পাশাপাশি সাম্রাজ্য সম্প্রসারণেও কাজে লাগল এই বাড়তি অর্থ। জনসংখ্যা বেড়ে গেল, যার ফলে সম্ভব হলো আরো বড় সেনাবাহিনী গঠন করা। আর যেসব সম্পদ, সময় ও শক্তি আগে নিজেদের মধ্যকার দ্বন্দ্বে ব্যয় হতো, তা এখন বাইরের দিকে কাজে লাগানো গেল। আর বাইরে বলতে ব্রিটিশরা বুঝত গোটা পৃথিবীকে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য দ্রুতই বিস্তৃতি লাভ করতে থাকল। আর যতই বিস্তৃত হলো, ততই তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা কঠিন হয়ে পড়ল। এই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি ছিল সমুদ্র-নিয়ন্ত্রণ। আর শুধু ধনী রাষ্ট্রই পারে এমন একটি নৌবহর গড়ে তুলতে, যা একইসঙ্গে সমুদ্রপথ নিয়ন্ত্রণ করবে এবং পাশাপাশি প্রতিদ্বন্দ্বী নৌবাহিনীর মোকাবিলাতেও সক্ষম হবে। ব্রিটেন তার বিশাল ওক গাছের বনভূমির সর্বোচ্চ ব্যবহার করেছিল। এই গাছের কাঠ অত্যন্ত শক্ত। এমনকি ওই আমলের কামানের গোলা প্রতিরোধেও সক্ষম ছিল এই কাঠ। এই ধরনের একটা সম্পদ সমুদ্রের অজানা পথে ভেসে চলা বড় জাহাজের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ওক কাঠের আরো একটি গুণ ছিল। এই কাঠ পোকামাকড় ও পচনের বিরুদ্ধে প্রাকৃতিকভাবেই প্রতিরোধী। ফলে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর জাহাজগুলো অনেক বেশিদিন সমুদ্রে থাকতে পারত। অন্যদের নৌবহরের মতো মেরামতের জন্য ঘন ঘন ড্রাই ডকে ফিরে আসতে হতো না। লর্ড নেলসনের 'এইচএমএস ভিক্টরি' এবং ক্যাপ্টেন কুকের 'এইচএমএস এনডেভার'—এই দুইটি ঐতিহাসিক জাহাজই ছিল ওক কাঠ দিয়ে তৈরি। এমনকি ব্রিটিশ রয়্যাল নেভির রণসঙ্গীতের নাম রাখা হয়েছিল 'হার্ট অব ওক'। এই বিষয়টা থেকেই ইংল্যান্ডের ইতিহাসে ওক কাঠের গুরুত্ব বোঝা যায়। এছাড়া ব্রিটেনের উপকূলরেখা অনেক জায়গাতেই ভেতরের মূল ভূমির দিকে ঢুকে গিয়েছে। এই ধরনের উপকূল প্রাকৃতিকভাবেই গভীর সমুদ্রবন্দর তৈরি করার জন্য আদর্শ। এই কারণে সাগরপথে বাণিজ্য চালানো তাদের জন্য খুব সহজ হয়ে যায়। ফলে ব্রিটেনকে টেক্কা দিতে হলে একটা প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের দরকার হতো একাধারে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, বিশাল নৌবহর, গভীর সমুদ্রবন্দর, জাহাজ নির্মাণ উপযোগী কাঠ এবং সর্বাধুনিক প্রযুক্তি।

কিন্তু ব্রিটেনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ফ্রান্স ও স্পেন এই দিক থেকে পিছিয়ে ছিল। আগের শতাব্দীগুলোতে ইউরোপজুড়ে অবিরাম স্থলযুদ্ধ চালিয়ে নিজেদের সম্পদ যথেষ্ট পরিমাণে নষ্ট করেছিল তারা। পাশাপাশি দেশের উন্নতির দিকে তাদের মনোযোগও ছিল খুব কম। শিল্প বিপ্লবে ব্রিটেনের তুলনায় অনেক ধীরগতিতে এগোচ্ছিল তারা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৭৮০ সালে ব্রিটেনে যেখানে প্রায় ২০,০০০টি সুতা কাটার যন্ত্র ছিল, ফ্রান্সে তখন এই যন্ত্রের সংখ্যা ছিল মাত্র ৯০০টি। আকারেও ফ্রান্স ও স্পেন ছিল যুক্তরাজ্যের দ্বিগুণ, ফলে তাদের পরিবহন খরচও পড়ত বেশি। অন্যদিকে ব্রিটেনের অবস্থান ছিল সমুদ্রের মধ্যে, আর তাদের দেশটিও ছিল বেশ সরু। দেশের নানা প্রান্তে থাকা নদী ও খাল পথে কম খরচেই কাঁচামাল শিল্পাঞ্চলে পৌঁছাত। এতে সময়ও লাগত কম। অন্যদিকে, তৈরি হওয়া পণ্য এইসব

জলপথে সহজেই দেশীয় ও বৈদেশিক বাজারে পাঠানো যেত। ব্রিটেনের আরো বড় সুবিধা ছিল তাদের বিপুল কয়লার মজুদ। এগুলোর অবস্থান ছিল মূলত শিল্পাঞ্চলগুলোর কাছাকাছি। ১৮৩০-এর দশকে রেলওয়ে নেটওয়ার্ক গড়ে উঠতে শুরু করলে কাঁচামাল পরিবহনের গতি আরো বৃদ্ধি পায়। ফলে ব্রিটেনের শিল্প বিপ্লব আরো গতি পায়।

১৮০১ সালে আরেকটি 'অ্যাক্টস অব ইউনিয়ন'-এর মাধ্যমে আয়ারল্যান্ডও ব্রিটেনের সাথে যুক্ত হয়। যদিও বাস্তবে ইংল্যান্ড ২৫০ বছরেরও বেশি সময় ধরে আয়ারল্যান্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে আসছিল। এই আইনের ফলে প্রথমবারের মতো 'United Kingdom of Great Britain and Ireland' নামে একটি একীভূত রাষ্ট্র গঠিত হয়। এরপর ইউরোপে একের পর এক যুদ্ধ চললেও যুক্তরাজ্য সেগুলো থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করত। কারণ, তারা চেয়েছিল ইউরোপের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলো পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে দুর্বল হয়ে পড়ুক। তবে যখনই ব্রিটেনের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়ছে বলে মনে হয়েছে, তখনই যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তারা। ১৮০০'র শতকের শুরুর দিকে তাদের জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি হয়ে ওঠে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। নেপোলিয়নের বিরুদ্ধেও ব্রিটেন সেই পুরোনো অফশোর ব্যালান্সিং কৌশলই অবলম্বন করেছিল। তবে খুব বেশি পরিশ্রম তাদের করতে হয়নি। নেপোলিয়ন এতটাই হুমকি সৃষ্টি করেছিলেন যে প্রায় পুরো ইউরোপই তাঁর বিরোধিতায় যুক্ত হয়ে পড়ে। ১৮০৩ সালে নেপোলিয়ন সিদ্ধান্ত নিলেন, অ্যামেরিকানদের কাছ থেকে 'লুইজিয়ানা' বিক্রির বিনিময়ে পাওয়া অর্থ ব্যবহার করে ব্রিটেন আক্রমণ করবেন তিনি। এই ঘোষণার পর ব্রিটেনের সামরিক বাহিনী ও সাধারণ জনগণের মধ্যে নজিরবিহীন যুদ্ধ-প্রস্তুতি শুরু হয়।

নেপোলিয়ন ছিলেন ব্রিটেনের দুঃস্বপ্নের এক বাস্তব রূপ। তিনি ইউরোপের মূল ভূখণ্ডে একচ্ছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করছিলেন। তাঁর পরিকল্পনা ছিল এমন এক রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক ব্যবস্থা চালু করা, যার সম্মিলিত ক্ষমতা দিয়ে ব্রিটেনকে হয় পরাজিত করা হবে, নয়তো অন্ততপক্ষে ইচ্ছামতো পরিচালনা করা যাবে। তাই, নেপোলিয়নের আক্রমণ আসার আগেই ব্রিটেন বুঝে গিয়েছিল যে, এই যুদ্ধ কোনোকিছুর বিকল্প নয়। বরং এই যুদ্ধ অপরিহার্য হয়ে উঠেছে।

নেপোলিয়নের যুদ্ধের আক্রমণ এবং প্রতিরক্ষার ভৌগোলিক কৌশল আশ্চর্যজনকভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর দিকের কৌশলের সঙ্গে মিলে যায়। নেপোলিয়নের পরিকল্পনা ছিল শিরনেস ও চাথাম উপকূলে সৈন্য নামিয়ে চার

দিনের মধ্যেই লন্ডনে পৌঁছে যাওয়া। ফরাসি সৈন্যদের ইংলিশ চ্যানেল পার করার জন্য বোলন শহরের দুই পাশের উপকূলজুড়ে অসংখ্য বার্জ প্রস্তুত করা হয়। অন্যদিকে ব্রিটিশরা সেনা ও মিলিশিয়া বাহিনী মোতায়েন করেছিল কেন্ট ও সাসেক্স উপকূলজুড়ে। সেখানে নতুন করে দূর্গ ও কামান বসানোর স্থান নির্মাণ করা হয়। সেইসব দুর্গ ও কামানঘর এখনো অনেক জায়গায় রয়ে গেছে। তবে নৌবাহিনীর দুর্বলতাসহ বিভিন্ন কারণে শেষ পর্যন্ত এই আক্রমণ পরিকল্পনা বাতিল করেন নেপোলিয়ন। এর বদলে তিনি মনোযোগ দেন ইউরোপের দিকে। এক পর্যায়ে বর্তমান বেলজিয়ামের ওয়াটারলুতে শুরু হয় ওয়াটারলুর যুদ্ধে। সেখানে সম্মিলিত ইউরোপীয় বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিলেন তিনি। এই যুদ্ধের পরে ইউরোপীয় সেনাবাহিনী ক্লান্ত ও দুর্বল হয়ে পড়ে। ফলে ব্রিটেন আবারও মনোযোগ দেয় বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা তাদের সাম্রাজ্যের দিকে।

ব্রিটিশ নৌ-শক্তির ধারাবাহিক শ্রেষ্ঠত্বের ফলে পৃথিবীর নানা প্রান্তে তারা ইচ্ছামতো দখলদারিত্ব চালাত। অষ্টাদশ শতকে ব্রিটিশরা জিব্রাল্টার দখল করে নেয়। ফলে ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের সংযোগস্থল জিব্রাল্টার প্রণালি নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি চলে আসে তাদের হাতে। ঊনবিংশ শতকে জিব্রাল্টারকে ব্যবহার করা হতো অন্তর্বর্তীকালীন প্রস্তুতির বন্দর হিসেবে। আফ্রিকা যাওয়ার পথে ব্রিটিশ জাহাজগুলো সেখানে থামত জ্বালানি, খাদ্যসামগ্রী, সরঞ্জাম বা লোকবল সংগ্রহ করার জন্য। এখান থেকে জাহাজ যেত আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের বন্দরগুলোয়, তারপর এগিয়ে যেত 'কেপ অব গুড হোপ' এর দিকে। এরপর আফ্রিকার পূর্ব উপকূল ধরে এগিয়ে গেলেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সবথেকে মূল্যবান উপনিবেশ ভারত। পরবর্তীতে মালয়েশিয়া ব্রিটিশদের দখলে এলে মালাক্কা প্রণালিও তাদের নিয়ন্ত্রণে আসে। আর এই মালাক্কা প্রণালিই ছিল চীনে প্রবেশের প্রধান সমুদ্রপথ। ব্রিটিশদের এই ভৌগোলিক শ্রেষ্ঠত্ব আরো বৃদ্ধি পায় ১৮৬৯ সালে সুয়েজ খালের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে। এরপর থেকে ব্রিটিশ জাহাজগুলোকে আর গোটা আফ্রিকা ঘুরে যেতে হতো না; সুয়েজ খাল পেরিয়েই তারা সরাসরি পৌঁছে যেত ভারতে। বলা চলে, এই সময়েই ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তার চূড়ায় পৌঁছায়।

ব্রিটেনের জন্য এটি ছিল একটা 'শুভচক্র'। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি তাদের এনে দিয়েছিল সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তি, আর সেই শক্তি তাদের সাম্রাজ্যকে আরো বড় করে তুলেছিল। ইউরোপজুড়ে যখন একের পর এক যুদ্ধ আর বিপ্লব হচ্ছে, ব্রিটেন সেগুলোর বেশিরভাগকেই পাশ কাটিয়ে যেতে সক্ষম হয়। তবে দেশটির

সেনাবাহিনী পুরোপুরি চুপচাপ বসে ছিল না। তারা ব্যস্ত ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা, বার্মা, ক্রিমিয়া আর ভারতের মতো দূরবর্তী সব অঞ্চলে। এসব জায়গা সম্পর্কে সাধারণ জনগণ তখন জানত খুব কম। তারা শুধু জানত ব্রিটেন এসব জায়গা থেকে প্রচুর লাভবান হয়। উপনিবেশগুলো থেকে বিপুল পরিমাণ কাঁচামাল প্রবাহিত হতো ব্রিটেনের কলকারখানায়। তৈরি হতো মালিকদের সম্পদ এবং শ্রমিকদের কর্মসংস্থানের সুযোগ।

মূলত নৌ-শক্তির ওপর দাঁড়িয়েই তৈরি হয় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য। রয়্যাল নেভি একদিকে যেমন ছিল অন্যান্য দেশে আধিপত্য বিস্তারের একটি উপায়, তেমনি বাহিনীর অভ্যন্তরেও ছিল ঔপনিবেশিক বর্ণবাদী মানসিকতার ছায়া। তবে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর একটি মানবিক দিকও ছিল। বহু বছর ধরে দাসপ্রথার অন্যতম প্রধান কারবারি হিসেবে ভূমিকা রাখার পর ১৮০৭ সালে দাসব্যবসা নিষিদ্ধ করে ব্রিটেন। পরবর্তী কয়েক দশকে দাসব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে প্রায় দেড় লাখ মানুষকে মুক্ত করে রয়্যাল নেভি। পাশাপাশি আফ্রিকার বিভিন্ন গোত্রপ্রধানদের আর্থিক প্রণোদনা দেওয়া হয় যেন তারা দাসপ্রথা পরিত্যাগ করে। ব্রিটেনের মূল ভূখণ্ডে দাসপ্রথা আগে থেকেই আইনগতভাবে অবৈধ হলেও দাসপ্রথা তখনো বিলুপ্ত হয়নি। পরে ১৮৩৩ সালে আইন করে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণে থাকা সকল অঞ্চলে দাসপ্রথা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়।

এক সময় বলা হতো, 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য কখনো অস্ত যায় না'। মজার বিষয় হলো, এই উক্তিটি আজও আংশিকভাবে সত্য। কারণ ব্রিটেনের একসময়ের বিশাল সাম্রাজ্যের কিছু অংশ এখনো 'ব্রিটিশ ওভারসিজ টেরিটোরি' হিসেবে টিকে আছে। এই ধরনের টেরিটোরির মোট সংখ্যা চৌদ্দটি। পৃথিবীর কোথাও না কোথাও তাদের অন্তত একটি অঞ্চলে সবসময়ই দিন থাকে। ক্যারিবিয়ান সাগরের কেম্যান দ্বীপপুঞ্জে যখন মধ্যরাত, তখনও দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরের পিটকেয়ার্ন দ্বীপপুঞ্জে সূর্যের আলো থাকে। তবে সব কিছুরই শেষ আছে। ভালো জিনিস যেমন চিরকাল টেকে না, তেমনি খারাপ জিনিসও চিরকাল স্থায়ী হয় না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সুদিনও একসময় শেষ হতোই। সেই শেষের সূচনা হয়েছিল নতুন দুইটি শক্তি বিশ্ব মঞ্চে উঠে আসার পর। আর সেই দুই শক্তি হলো জার্মানি এবং যুক্তরাষ্ট্র।

জার্মানিক রাষ্ট্রগুলো একে অপরের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে অবশেষে ১৮৭১ সালে এসে তারা একীভূত হয়। আর এর ফলে গঠিত হয় পশ্চিম ইউরোপের সবচেয়ে বড় ও জনবহুল দেশ জার্মানি। অল্প সময়ের মধ্যেই অর্থনীতির

দিক থেকেও সবচেয়ে গতিশীল হয়ে ওঠে তারা। এর সঙ্গে যুক্ত হয় তাদের শক্তিশালী অস্ত্রশিল্প ও জাহাজ নির্মাণশিল্প। নেপোলিয়নের পর আবারও ব্রিটিশদের সামনে এমন এক মহাদেশীয় শক্তির আবির্ভাব ঘটল, যারা গোটা ইউরোপে আধিপত্য বিস্তারের সামর্থ্য রাখে। ঠিক সেই সময়েই আরেক নাটকীয় পরিবর্তন ঘটতে থাকে আটলান্টিকের অপর পারে। ব্রিটেনের মতো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে শিল্প বিপ্লবও এগিয়ে যেতে শুরু করে জোরেশোরে। তৈরি হতে থাকে বিপুল পরিমাণ পণ্য। এইসব পণ্য বিশ্বের বড় বড় বাজারে ব্রিটেনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে প্রস্তুত। সেইসাথে অ্যামেরিকানরা গড়ে তোলে বিশ্বের সকল প্রান্তে ছড়িয়ে যাওয়ার উপযোগী গভীর সমুদ্রগামী নৌবাহিনী।

জার্মানি শক্তিশালী হয়ে যাওয়ার পর ইংল্যান্ড ও জার্মানির মধ্যে শুরু হয় এক ভয়ানক অস্ত্র প্রতিযোগিতা। ইতিহাসবিদদের মতে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অনেকগুলো জটিল কারণের মধ্যে অন্যতম ছিল এই উত্তেজনা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ছিল এক ভয়াবহ বিপর্যয়। ইতিহাস বলে, ব্রিটেন বিজয়ী পক্ষের অংশ ছিল। কিন্তু বাস্তবে এই যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল সবাই। ইউরোপজুড়ে এমন এক ধ্বংসযজ্ঞ চলেছিল যা সরাসরি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পথ তৈরি করে দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ফলে ব্রিটেন দুর্বল হয়ে পড়ে, একই পরিণতি হয় ফ্রান্সেরও। আর জার্মানি তখনও ইউরোপের বৃহত্তম দেশ। জার্মানির অনেক নাগরিক মনে করত তারা তাদের নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতার শিকার হয়েছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে হেরে যাওয়ার পর ১৯১৮ সালের আত্মসমর্পণের শর্তগুলো তাদের কাছে ছিল বিশাল এক অপমান। এই ক্ষোভ, অপমান আর অস্থিরতাই পরে ইতিহাসকে ঠেলে দেয় আরো বড় সংঘাতের দিকে।

মাত্র ২১ বছর পর ইউরোপ আবারও বিপর্যয়ের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছায় এবং শেষ পর্যন্ত অতল গহ্বরে তলিয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ হয়ে ওঠে প্রথমটির চেয়েও ভয়ংকর, বর্বর এবং রক্তক্ষয়ী। মূলত এই যুদ্ধই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড ভেঙে দেয়।

১৯৪০ সালে এসে যুক্তরাজ্য আবারও ১৮০৩ সালের মতো একই দুঃস্বপ্নের মুখোমুখি হয়। এক অপ্রতিরোধ্য শত্রুর আক্রমণে উত্তর ফ্রান্সের ডানকার্ক থেকে লজ্জাজনকভাবে পিছু হটতে বাধ্য হয় ব্রিটিশ সৈন্যরা। সেই শক্তিধর প্রতিপক্ষ ছিল হিটলারের নাৎসি বাহিনী। জার্মানি ফ্রান্সের উপকূল ঘেঁষে এমনভাবে সেনা মোতায়েন করেছিল যেন মনে হচ্ছিল তারা ইংল্যান্ড আক্রমণ করতে চায়। এই আগ্রাসন শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। তবে সে সময়ের আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার

পরিকল্পনাগুলো খুব স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেয় যে, কীভাবে ভূগোল আর অর্থনীতি মিলে যুক্তরাজ্যের সামরিক কৌশল নির্ধারণ করে। আজকের দিনেও যদি ব্রিটেন এমন হুমকির মুখে পড়ে, তাহলে প্রতিরোধ পরিকল্পনার রূপরেখা হয়তো অনেকটা একইরকম হবে।

হিটলার 'অপারেশন সি লায়ন' নামে একটি উভচর অভিযানের পরিকল্পনা করেছিলেন। পরিকল্পনা ছিল প্রথমে সৈন্য-ভর্তি জাহাজ বহর ফ্রান্সের রটারডাম ও কালে বন্দর থেকে রওনা দিয়ে ইংল্যান্ডের কেন্ট ও সাসেক্স উপকূলে অবতরণ করবে। একই সময়ে প্যারাট্রুপার নামিয়ে ব্রাইটন শহর এবং ডোভার বন্দরসংলগ্ন উঁচু অঞ্চল দখল করা হবে। দ্বিতীয় দফার আক্রমণ হবে ফ্রান্সের শেরবুর্গ থেকে। এখান থেকে সৈন্যরা অবতরণ করবে ডরসেট ও ডেভনের উপকূলে। সেসব জায়গায় ঘাঁটি গেড়ে নেওয়ার পর এই দুই বাহিনী একযোগে পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম দিক থেকে লন্ডনের দিকে অগ্রসর হবে। বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে স্কটল্যান্ডেও আক্রমণের ভান করা হবে, যাতে করে দক্ষিণ অঞ্চল থেকে কিছু ব্রিটিশ সেনা উত্তরে সরে যায়।

জার্মানদের পরিকল্পনা সুনির্দিষ্টভাবে জানত না ব্রিটিশরা। তবে ভূগোলের ভিত্তিতে তারা কিছুটা আন্দাজ করে নিয়েছিল। ব্রিটিশদের প্রথম প্রতিরক্ষা লাইন ছিল দক্ষিণ উপকূল। অবতরণের সম্ভাব্য স্থানগুলোতে মাইন বসানো হয়। এর একটু ওপরের দিকে পিলবক্স তৈরি করে ছোট ছোট দলে সেনা মোতায়েন করেছিল ব্রিটিশরা। পিলবক্স বসানো হয়েছিল প্রায় ২৮,০০০। উপকূল জুড়ে কাঁটাতারের বেড়া টানা হয় এবং অনেক জেটি খুলে ফেলা হয় যাতে শত্রুরা সহজে ভিড়তে না পারে। এমনকি রমনি মার্শ জলাভূমির কিছু অংশ ইচ্ছাকৃতভাবে প্লাবিত করা হয়। এই প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে বলা হতো 'কোস্টাল ক্রাস্ট'। আর এর পেছনে ছিল 'স্টপ লাইন' নামের আরেক স্তরের প্রতিরক্ষাব্যবস্থা, যা গড়ে তোলা হয়েছিল শত্রুর অগ্রযাত্রা রুখে দেওয়ার জন্য। জার্মানরা উপকূল থেকে ভেতরে ঢুকে পড়লে রাজধানী লন্ডন, মিডল্যান্ডসের শিল্পাঞ্চল এবং উত্তর ব্রিটেনকে রক্ষার জন্য এই প্রতিরক্ষাব্যবস্থা ব্যবহার করা হতো। এই স্টপ লাইনগুলো এমনভাবে সাজানো হয়, যাতে শত্রুর গতিবেগ কমিয়ে দেওয়া যায়। এই প্রতিরক্ষা-কৌশলের মূল লক্ষ্য ছিল জার্মান ট্যাঙ্কবহর থামানো। নাৎসিরা বেলজিয়াম আর ফ্রান্সে ট্যাংকবহর নিয়ে 'ব্লিৎসক্রিগ' বা বিদ্যুৎগতির আক্রমণ চালিয়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করেছিল। ফলে ব্রিটেন চাইছিল সেই বিপর্যয়ের পুনরাবৃত্তি যেন তাদের মাটিতে না হয়।

এই প্রতিরক্ষা-কৌশলের প্রধান ভিত্তি ছিল 'জেনারেল হেডকোয়ার্টার্স লাইন' বা 'জি এইচ কিউ লাইন'। এই প্রতিরক্ষাব্যূহ ব্রিস্টল শহর থেকে শুরু হয়ে লন্ডনের দক্ষিণে এসে পৌঁছায়, এরপর লন্ডনকে ঘিরে উত্তর দিকে উঠে যায়। এরপর ক্যামব্রিজ, মিডল্যান্ডস ও ইয়র্কশায়ারের লিডসসহ অন্যান্য শিল্পনগরীর পাশ দিয়ে এগিয়ে যায় স্কটল্যান্ডের দিকে। এই প্রতিরক্ষা-রেখা তৈরি করা হয়েছিল বনভূমি, নদী, খাল, রেলপথের উঁচু বাঁধ ইত্যাদি প্রাকৃতিক ও কৃত্রিম প্রতিবন্ধককে একত্রে যুক্ত করে। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল জার্মানির ট্যাঙ্ক চলাচল ঠেকিয়ে দেওয়া। সেতুগুলোতে বিস্ফোরকের সংযোগ দিয়ে রাখা হয়েছিল, যাতে প্রয়োজন হলেই সেগুলো উড়িয়ে দেওয়া যায়। বিমানবন্দর ও পেট্রোল স্টেশনগুলোকেও ধ্বংস করার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছিল। সম্ভাব্য আক্রমণের ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় লাখ লাখ বেসামরিক নাগরিককে। আর যারা রয়ে গিয়েছিল, তাদের নিয়ে গড়ে তোলা হয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিরক্ষা বাহিনী 'হোম গার্ড'।

তবে কিছু সময় পর কৌশল পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয় ব্রিটিশ সরকার। এবার লক্ষ্য ঠিক করা হয়—শত্রু যেন উপকূলে নামতেই না পারে। আর যদি কোনোভাবে নেমেও যায়, তাহলে যেন তাদের উপকূলেই আটকে রাখা যায়। অর্থাৎ ব্রিটিশরা চেয়েছিল জার্মান বাহিনী যেন দেশের ভেতরে ঢুকতেই না পারে। তবে, সেই গ্রীষ্মেই ঘটে এক মোড় ঘোরানো ঘটনা, 'ব্যাটল অব ব্রিটেন'। ব্রিটেনে হামলা চালানোর জন্য জার্মানি পাঠায় বিশাল এক বিমানবহর। কিন্তু ব্রিটিশ রয়্যাল এয়ারফোর্স সাফল্যের সঙ্গে জার্মান বিমানবহরকে পরাজিত করে পিছু হটতে বাধ্য করে। ফলে, আকাশের নিয়ন্ত্রণ ব্রিটিশদের হাতেই থেকে যায়। পাশাপাশি সমুদ্রপথের আধিপত্যও ধরে রাখে ব্রিটিশ রয়্যাল নেভি। এর পরিপ্রেক্ষিতে হিটলার তার 'অপারেশন সি লায়ন' পরিকল্পনা স্থগিত করে দেন। পরবর্তী সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে আক্রমণ চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়ায় অন্য ফ্রন্টে ব্যস্ত হয়ে পড়ে জার্মান বাহিনী। জার্মানি ইউরোপে কোনো বড় সামুদ্রিক আক্রমণ চালায়নি। চার বছর পরে আরেকটি উভচর অভিযানের প্রয়োজন হয়েছিল তাদের, তবে সেই অভিযানে উল্টো জার্মানিকেই আক্রমণ করা হয়। এটা ছিল ১৯৪৪ সালের 'ডি-ডে' অভিযান। মিত্রবাহিনী ফ্রান্সে অবতরণ করে জার্মানদের পিছু হটতে বাধ্য করে এবার। একদিকে রুশ বাহিনী পূর্ব দিক থেকে এগিয়ে আসছিল, অন্যদিকে পশ্চিমে ছিল ব্রিটিশ-অ্যামেরিকান সৈন্যদের তাণ্ডব। ইউরোপ দখলের জন্য নতুন যে শক্তিটি আবির্ভূত হয়েছিল, সেই নাৎসি জার্মানির পতন হয় এই সম্মিলিত আঘাতে।

তবে এর মূল্য ব্রিটেনকে চুকাতে হয় তার সাম্রাজ্যের বিনিময়ে। দেশটির অর্থনীতি প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল এই সময়। লড়াই চালিয়ে যেতে যুদ্ধজাহাজের বিনিময়ে বেশিরভাগ সামরিক ঘাঁটি অ্যামেরিকানদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয় ব্রিটিশরা। এতগুলো ঘাঁটি পেয়ে যাওয়াটা ছিল ওয়াশিংটনের জন্য খুবই সুবিধাজনক। আগে থেকেই অ্যামেরিকানদের কাছে প্রচুর যুদ্ধজাহাজ ছিল, আর আর এখন তো ঘাঁটিরও অভাব রইল না। এর ফলে বৈশ্বিক ক্ষমতার ভারসাম্য আটলান্টিক পার হয়ে অ্যামেরিকার দিকে হেলে পড়ে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য আর আগের মতো শক্তিশালী রইল না, সাম্রাজ্য ধরে রাখার ক্ষমতাও ক্রমশ বিলীন হয়ে গেল। তখনই প্রশ্ন জাগে, এবার কী হবে?

আগের দাপট যেহেতু নেই, তাই ব্রিটেনের এবার প্রয়োজন হলো নতুন একটি ভূমিকায় নিজেকে খুঁজে পাওয়া। 'প্ল্যান এ' ছিল অ্যামেরিকার সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ মিত্র হয়ে থাকা, যেন এই বন্ধুত্বের ছায়ায় সাম্রাজ্যকে ধরে রাখা যায়। কিন্তু বাস্তবে এটা কোনো কার্যকর কৌশল ছিল না। কারণ, ব্রিটিশরা এভাবে ভাবলেও অ্যামেরিকানদের মনে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন চিন্তা। তারা কখনোই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভক্ত ছিল না। তাছাড়া বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী স্নায়ু যুদ্ধের সময় বিশ্বজুড়ে বিপ্লবী আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠছিল। এই বিপ্লবীদেরকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের কথা মনে করিয়ে দেওয়ার সুযোগ সোভিয়েত রাশিয়াকে দিতে চায়নি ওয়াশিংটন। তাই ন্যাটোর মতো মার্কিন নিয়ন্ত্রিত সংগঠনে যুক্তরাজ্য যোগ দিলেও তাদের মাঝেমাঝেই স্পষ্টভাবে জানিয়ে দেওয়া হতো যে, সাম্রাজ্যবাদের পুরোনো যুগ শেষ। ১৯৫৬ সালে সুয়েজ খালকে কেন্দ্র করে মার্কিনিদের তোপের মুখে পড়ে ব্রিটেন। ব্রিটিশ ও ফরাসি বাহিনী মিলে সুয়েজ খাল দখলের পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু, তারা ভুলে গিয়েছিল অ্যামেরিকানদের না জানিয়ে এমন কিছু করার পরিণতি কতটা ভয়াবহ হতে পারে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেনহাওয়ারকে না জানিয়েই মিশরে সেনা পাঠায় এই দুই দেশ। ফলে রীতিমতো ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। দ্রুত কূটনৈতিক ও অর্থনৈতিক চাপ প্রয়োগ করে ব্রিটেনকে পিছু হটতে বাধ্য করেন তিনি। এতদিনে এসে স্পষ্ট হয় যে ব্রিটেনের 'প্ল্যান এ' আসলে পুরোপুরি ব্যর্থ।

এরপর এল 'প্ল্যান বি'। এবারে পরিকল্পনা ছিল সাম্রাজ্যের চিন্তা বাদ দিয়ে অ্যামেরিকার সবচেয়ে কাছের বন্ধু হয়ে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করা। কিন্তু শুরুটা এখানেও খুব একটা সুখকর ছিল না। প্রেসিডেন্ট কেনেডির বিশেষ উপদেষ্টা ডিন

অ্যাচেসন ১৯৬২ সালে বলেছিলেন, “ব্রিটেন তার সাম্রাজ্য হারিয়েছে, কিন্তু এখনো নতুন কোনো ভূমিকা খুঁজে পায়নি তারা।” বেশ কড়া কথা! এই বক্তব্য ওই সময়ের ব্রিটিশ অভিজাত সমাজে একপ্রকার ধাক্কার মতোই লেগেছিল। তবে, শুধু এটুকু বলেই থামেননি অ্যাচেসন। তিনি ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন, “ইউরোপ থেকে আলাদা হয়ে কেবল যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্কের ওপর নির্ভর করে বা কমনওয়েলথের নাম করে যদি ব্রিটেন আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজের প্রভাব ধরে রাখার চেষ্টা করে, তাহলে সেটি দীর্ঘস্থায়ী হবে না।”

এই মন্তব্য থেকেই উঠে আসে ‘প্ল্যান সি’—ব্রিটেনকে ইউরোপের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত হতে হবে। নিজেকে ‘সাগরের অপর পারের একক শক্তি’ হিসেবে না দেখে, বরং ইউরোপীয় গঠনপ্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে নিজেকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করতে হবে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যে ইউরোপ থেকে তারা নিজেদের বিচ্ছিন্ন রাখতে চেয়েছিল, সেই ইউরোপের দিকেই এবার ঝুঁকতে হলো নতুন ভূমিকায় জায়গা করে নিতে।

নতুন ভূমিকাটি ছিল একধরনের সংকর রূপ। এক পা ছিল অ্যামেরিকার শিবিরে, আরেক পা ইউরোপীয় ইউনিয়নের পূর্বসূরি কাঠামোয়। ব্রিটেন তার এই দ্বৈত অবস্থান ধরে রেখেছিল চার দশকেরও বেশি সময় ধরে। দেশটি ধীরে ধীরে ইউরোপীয় জোটের সঙ্গে একীভূত হতে থাকলেও এই বিষয়টা তারা নিশ্চিত করেছিল যে, ন্যাটোভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে অ্যামেরিকার পরে তাদের সামরিক বাহিনীই যেন সবচেয়ে শক্তিশালী হয়। এখানে বলে রাখা ভাল, এই ইউরোপীয় জোটই পরবর্তীতে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে রূপ নেয়। এর পাশাপাশি, মার্কিনিদের প্রয়োজন হলে ব্রিটিশ সেনাবাহিনী যে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত, সেটাও তারা প্রমাণ করেছিল। এক্ষেত্রে অবশ্য ব্যতিক্রম ছিল ভিয়েতনাম। কারণ ব্রিটিশ জনগণের প্রবল বিরোধিতা এবং লেবার পার্টির আপত্তির কারণে তারা ভিয়েতনামের যুদ্ধে জড়ায়নি। এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ গোয়েন্দা সহায়তা এবং কূটনৈতিক সমর্থন দিয়ে নিয়মিতভাবে অ্যামেরিকার পাশে থাকে ব্রিটেন। অনেক সমালোচক অ্যামেরিকা আর ব্রিটেনের ‘বিশেষ সম্পর্ক’ কথাটি বলে থাকেন মূলত ব্যঙ্গ করে, তবে বাস্তবে এটি সত্যিই ছিল। এমনকি এখনো সেই সম্পর্কের কিছুটা রয়ে গেছে। তার মানে এই নয় যে উভয় পক্ষের বাস্তববাদীরা কোনো রকম রোমান্টিক আবেগে বিভোর। যারা বাস্তবতা বুঝতেন তারা জানতেন যে, প্রথমত অ্যামেরিকাই এখানে জ্যেষ্ঠ অংশীদার। আর দ্বিতীয়ত, অ্যামেরিকানরা কখনোই সত্যিকারভাবে বিশ্বাস করেনি

যে ব্রিটেন হবে তাদের 'গ্রিস', আর অ্যামেরিকা হবে 'রোম'। কিন্তু তারপরও, একই ভাষা, ইতিহাস ও রাজনৈতিক সংস্কৃতির অভিন্নতার একটি বাস্তব ভিত্তির ওপর এই সম্পর্ক দাঁড়িয়ে ছিল। সেই হিসেবে অন্য যেকোনো ইউরোপীয় দেশের তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ব্রিটেনের সম্পর্ক নিঃসন্দেহে 'স্পেশাল'। আবার ইউরোপের সঙ্গে ব্রিটেনের সম্পর্কটিও ছিল 'স্পেশাল', তবে সেটা ভিন্ন মাত্রায়।

ইউরোপিয়ান ইকোনমিক কমিউনিটিতে (EEC) যোগ দেওয়া নিয়ে ব্রিটেন যতটা দ্বিধায় ছিল, ফ্রান্সও ব্রিটেনের প্রতি ঠিক ততটাই সন্দেহপ্রবণ ছিল। ১৯৬০-এর দশকে ফ্রান্স দুইবার ব্রিটেনের সদস্যপদ আবেদনে ভেটো দেয়। এই দুইবারই এই সিদ্ধান্তের পেছনে ছিলেন জেনারেল শার্ল দ্য গল। গল চেয়েছিলেন ইউরোপীয় এই সংস্থা ফ্রান্সের প্রভাবাধীন থাকুক। কারণ এখানে ব্রিটেন যুক্ত হলে ফ্রান্সের সেই আধিপত্য হুমকির মুখে পড়বে। এছাড়া, দ্য গল মনে করতেন যে অ্যাংলো-স্যাক্সনদের স্বভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি ইউরোপীয় ঐক্য প্রকল্পের সঙ্গে মানানসই নয়। ১৯৬৩ সালে প্রথমবার ব্রিটেনের আবেদনে ভেটো দেওয়ার সময় তিনি বলেছিলেন, "আসলে ইংল্যান্ড হলো দ্বীপ-রাষ্ট্র। তারা সামুদ্রিক শক্তি। তাদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম, বাজার ও সরবরাহ লাইন বিশ্বের নানা দেশে বিস্তৃত। তাদের অর্থনীতি মূলত শিল্প ও বাণিজ্যভিত্তিক, কৃষির ভূমিকা সেখানে নগণ্য। তাদের সমস্ত কর্মকাণ্ডে রয়েছে স্বতন্ত্র এবং মৌলিক ঐতিহ্য ও অভ্যাস।"

দ্য গল বিশ্বাস করতেন, EEC-তে যোগ দিলেও যুক্তরাজ্য তার দীর্ঘদিনের নীতি বজায় রাখবে। এই জোটের মধ্যে যদি কোনো একটি শক্তি ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে, তখন ব্রিটেন তার বিপরীতে জোট গড়ে তুলবে। এই ক্ষেত্রে ফ্রান্সই ছিল সেই সম্ভাব্য প্রভাবশালী শক্তি। তিনি এমন একটি প্রভাবশালী দেশকে নিজেদের সম্প্রদায়ের অংশ করতে চাননি। ব্রিটেনের অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ফ্রান্সের চেয়ে একদমই আলাদা। ব্রিটেনের অর্থনীতি মূলত বেসরকারি বিনিয়োগনির্ভর, রাষ্ট্রের ভূমিকা সেখানে সীমিত। কিন্তু ফ্রান্সের অর্থনীতিতে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ছিল প্রবল। দ্য গলের আরেকটি ভয় ছিল, ব্রিটেন হয়তো EEC-তে যুক্তরাষ্ট্রের 'ট্রোজান হর্স' হিসেবে প্রবেশ করতে চায়। অর্থাৎ, অ্যামেরিকা যাতে ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের কার্যকলাপ সরাসরি পর্যবেক্ষণ করতে পারে সে কারণেই ব্রিটেন এখানে যুক্ত হতে চাইছে। পরবর্তীতে দেখা গেছে, তার সন্দেহ পুরোপুরি অমূলকও ছিল না।

দ্য গল ১৯৭৩ সালে রাজনীতির মঞ্চ থেকে সরে দাঁড়ান। এরপর ব্রিটেন ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠীতে যোগ দেয়। তবে সেটা পুরোপুরি হৃদয় থেকে ছিল না, অনেকটা অনাগ্রহ নিয়েই শর্তসাপেক্ষে যুক্ত হয়েছিল তারা। ব্রিটেন কখনোই এই সংস্থার মূল ধারণাকে অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মতো পুরোপুরি গ্রহণ করেনি। এর পেছনে ঐতিহাসিক কারণ যেমন ছিল, তেমনি ছিল সমসাময়িক অভিজ্ঞতাও। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেন ব্যাপক ক্ষতির শিকার হলেও ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের দেশগুলোর মতো বিভীষিকার মুখোমুখি হয়নি। তারা যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখেছে, ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করেছে, কিন্তু ইউরোপের অন্য দেশের মতো সরাসরি স্থল হামলা সহ্য করতে হয়নি। তাদের সীমান্তে শত্রু আসেনি, দেশের ভেতরে লড়াই হয়নি। এই পার্থক্য একটি বড় মনস্তাত্ত্বিক ব্যবধান তৈরি করেছিল। ইউরোপের দেশগুলো সে সময় বিশ্বাস করছিল, গোষ্ঠীবদ্ধতাই ভবিষ্যতের যুদ্ধ এড়ানোর একমাত্র উপায়। কিন্তু ব্রিটেনের আগ্রহ ছিল ভিন্ন। তারা এতে যুক্ত হয়েছিল মূলত অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা পাওয়ার আশায়। দেশের অর্থনীতি নিয়ে এক ধরনের ভয় কাজ করছিল ব্রিটেনের মধ্যে। মূলত ইউরোপের ক্রমবর্ধমান বাজারে পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কা থেকেই তারা যুক্ত হয়েছিল এই জোটে। বর্তমান সময়ের ভাষায় এই ভয়কে বলা যায় 'ফিয়ার অব মিসিং আউট' বা ফোমো (FOMO)।

পরবর্তী তেতাল্লিশ বছর ব্রিটেন মূলত ইউরোপীয় জোটের সাথে পুরোপুরি একীভূত হওয়ার বিরোধিতা করেই কাটিয়ে দিয়েছে। অনেক নীতিমালার ক্ষেত্রেও নিজেদের প্রত্যাহার করে নিয়েছে তারা। অন্যদিকে ফ্রান্স-জার্মানির নেতৃত্বাধীন এই কাঠামোর ভারসাম্য রক্ষার জন্য তারা প্রায়ই ছোট দেশগুলোর সঙ্গে জোট গড়েছে। যখনই ইউরোপ রাজনৈতিকভাবে আরো ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছে, ব্রিটেন তখন শুধু অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিস্তারে মনোযোগ দিয়েছে। ব্রিটেন চেয়েছে আরো দেশ যেন এই গোষ্ঠীতে যুক্ত হয়, যাতে বড় বড় দেশের একচ্ছত্র প্রভাব কিছুটা হলেও হ্রাস পায়। তবে শুধু ব্রিটেন নয়, আরো অনেক দেশ রয়েছে যারা এই ঘনিষ্ঠ ঐক্যের ধারণার প্রতি সন্দিহান ছিল। তাদের কাছে অভিন্ন বাজারই ছিল প্রধান লক্ষ্য। তারা চেয়েছিল যাতে সমৃদ্ধি বজায় থাকে, কিন্তু রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা যায়।

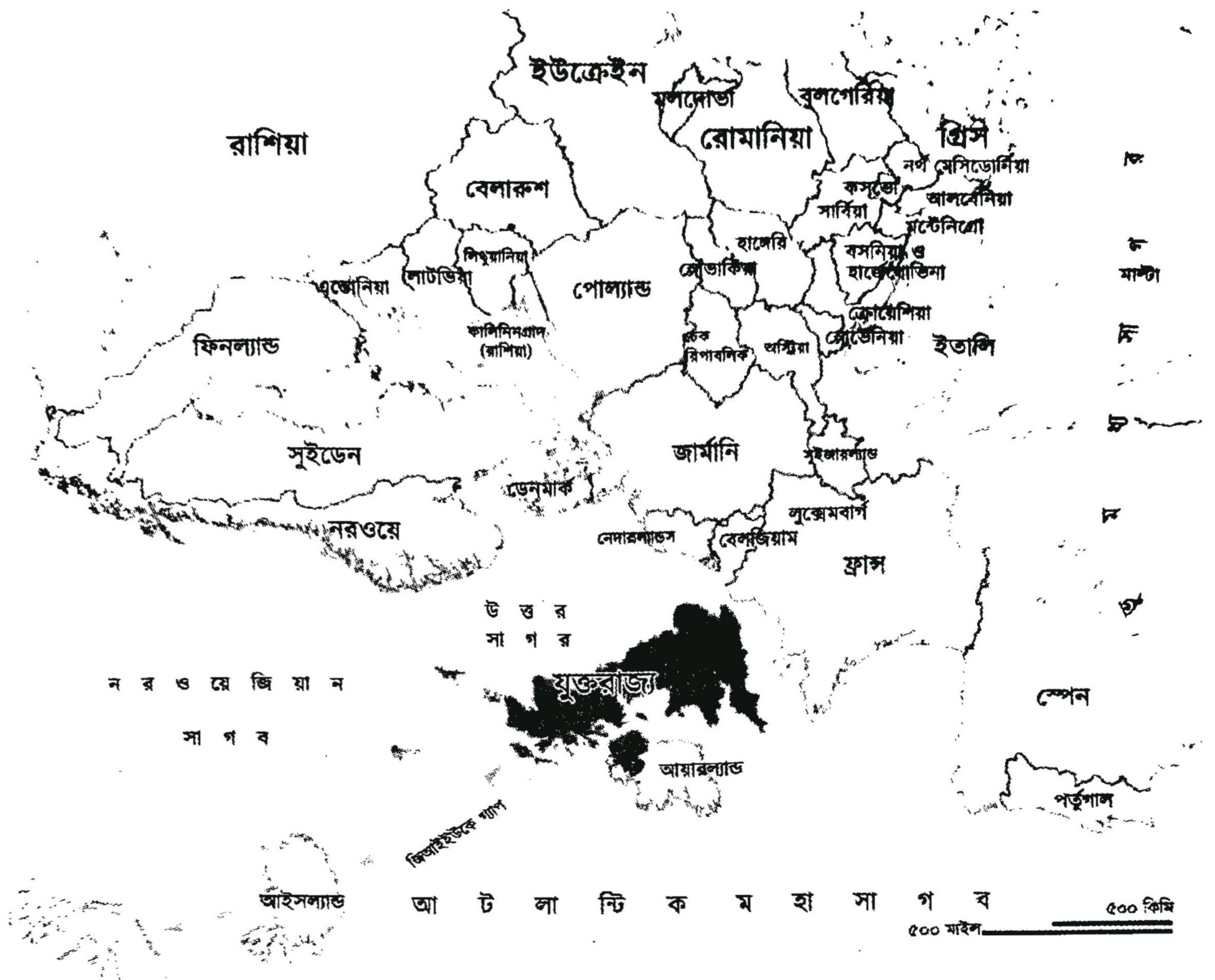
ব্রিটেনের জন্য এই সমঝোতা কয়েক দশক ভালোভাবেই কাজ করেছে। এটি একদিকে তাদের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারে সাহায্য করেছে, অন্যদিকে ওয়াশিংটনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখারও সুযোগ দিয়েছে।

অ্যামেরিকানরাও এতে সন্তুষ্ট ছিল। কারণ ব্রিটেন মূলত ন্যাটো ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে একধরনের ভূরাজনৈতিক সেতু হিসেবে কাজ করছিল। তবে একবিংশ শতাব্দীতে এসে অনেক কিছু বদলে যেতে শুরু করে। সময়ের সঙ্গে বদলাতে থাকে ব্রিটিশ জনগণের মনোভাবও।

ইউরোপকে একটি একক রাজনৈতিক সত্তা হিসেবে গড়ে তোলার পথে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ ছিল ইউরোর প্রচলন। তবে সুইডেন ও ডেনমার্কের পাশাপাশি ব্রিটেনও এই মুদ্রা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। ইউরোপীয় সেনাবাহিনী গঠনের আলোচনা লন্ডনে বরাবরই উদ্বেগ তৈরি করত। তবে এসব বিষয় জনসাধারণের আলোচনায় খুব একটা জায়গা করে নিতে পারেনি। ২০১৬ সালের ব্রেক্সিট গণভোটে ইউরো বা সেনাবাহিনীর ধারণার চেয়েও বড় প্রভাব ফেলেছিল অর্থনীতি।

২০০৮ সালের অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের পর বিশ্বায়ন ও বহুজাতিক জোটগুলোর উপযোগিতা নিয়ে গোটা বিশ্বেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করে। ইউরোপীয় ইউনিয়নে সদস্যপদ নেওয়ার মূল শর্তটা ছিল সার্বভৌমত্বের কিছু অংশ বিসর্জন দিয়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির আশ্বাস পাওয়া। কিন্তু সমস্যা হলো, যদি আপনি নিজে সেই সমৃদ্ধির স্বাদ না পান, তাহলে সার্বভৌমত্ব বিসর্জনের যুক্তি আপনার কাছে মূল্যহীন হয়ে পড়বে। ব্রিটেনের অনেক নাগরিকের ক্ষেত্রে ঠিক সেটাই হয়েছিল। এই কারণে ব্রেক্সিটের সিদ্ধান্ত দেশে তীব্র বিতর্কের জন্ম দেয় এবং সমাজে বিভাজন তৈরি করে। ২০১৬ সালের সেই গণভোট ব্রিটিশ সমাজে এখনো তীব্র মতপার্থক্য ও বাকবিতণ্ডার উৎস হয়ে আছে।

ব্রেক্সিটের পেছনে কারণ অবশ্য এই দুই-চারটি নয়, এর পেছনে আরো অনেক জটিল বাস্তবতা কাজ করেছে। ২০০৮ সালের অর্থনৈতিক বিপর্যয় ছিল এই পরিবর্তনের অন্যতম প্রধান উস্কানিদাতা। সেই সাথে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ভবিষ্যৎ নিয়েও ছিল কিছুটা সংশয়। ইউরোপের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার পাশাপাশি একটু দূরত্ব বজায় রাখার ব্রিটিশ প্রবণতাও ছিল একটি বড় কারণ। আসলে অনেকগুলো কারণ মিলিয়ে এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল।



চিত্র: প্রচলিত ধারার মানচিত্রে যুক্তরাজ্যকে ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন একটি দ্বীপরাষ্ট্র হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। তবে মানচিত্রকে যদি ভিন্ন একটি কোণ থেকে দেখা হয়, তাহলে ইউরোপীয় দেশগুলোর দৃষ্টিকোণ থেকে যুক্তরাজ্যের কৌশলগত অবস্থান স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ব্রেক্সিটের পর নতুন নতুন কৌশল উদ্ভাবন করা হচ্ছে ঠিকই, তবে সেসব কৌশল এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। কারণ, শুধু ব্রিটেনই নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার অবসানের এই সময়ে অনেক দেশই নিজেদের পথ খুঁজে নিতে ব্যস্ত।

২০১৬ সালের পর ব্রিটেনের স্বাভাবিক প্রবণতা ছিল ওয়াশিংটনের দিকে ফিরে তাকানো। যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা বিবেচনায় এটি যৌক্তিকও। তবে একবিংশ শতকে এসে ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট কিছুটা ভিন্ন। যেমন, স্নায়ু যুদ্ধের সময় রাশিয়ার সঙ্গে বড় কোনো বাণিজ্য চুক্তি করা

একদিকে যেমন রাজনৈতিকভাবে অগ্রহণযোগ্য ছিল, তেমনি অর্থনৈতিক দিক থেকেও সেটি তেমন লাভজনক ছিল না। কিন্তু একবিংশ শতকের চীন একদমই ভিন্ন বাস্তবতা। যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের পাশাপাশি চীনও বর্তমানে বিশাল ক্রয়ক্ষমতা সম্পন্ন একটি রাষ্ট্র। ফলে ব্রিটেনকে এখন এমন এক মিশ্র কৌশল নিতে হবে, যাতে একদিকে ওয়াশিংটনের সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী সম্পর্কও বজায় থাকে, আবার অন্যদিকে বেইজিংয়ের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সুসম্পর্কের সম্ভাবনাও উন্মুক্ত রাখা যায়। পররাষ্ট্র দপ্তরের কূটনীতিকদের ভাষায়, এটি হবে 'একটি চ্যালেঞ্জিং বিষয়'!

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এখনো চায় ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকায় স্থিতিশীলতা বজায় থাকুক। কারণ এসব অঞ্চলে তাদের গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ জড়িত রয়েছে। তবে পাশাপাশি তারা বেশ স্পষ্টভাবেই তাদের কৌশলগত মনোযোগকে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দিকে সরিয়ে নিচ্ছে। এই 'পিভট টু এশিয়া' বা 'এশিয়ার দিকে ঝুঁকে পড়া' কেবল কথার কথা নয়, এটি বর্তমান বাস্তবতা। এমন পরিস্থিতিতে যুক্তরাষ্ট্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এবং তাদের বিশাল ভোক্তা বাজারে সুবিধাজনক অবস্থান পেতে চাইলে ব্রিটেনকে ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও প্রশান্ত মহাসাগর এই চারটি অঞ্চলেই যুক্তরাষ্ট্রকে সক্রিয় সমর্থন দিতে হবে। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চায় ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো নিজেদের মহাদেশ ও আশেপাশের অঞ্চলের নিরাপত্তার ভার আরো বেশি মাত্রায় নিজেদের কাঁধে তুলে নিক। এতে ওয়াশিংটন প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে আরো বেশি মনোযোগ দিতে সক্ষম হবে। এখন ব্রিটেনকে যদি একটি কার্যকর সামরিক শক্তি হিসেবে বিদেশে লড়াই করার সক্ষমতা ধরে রাখতে হয়, সেক্ষেত্রে খরচ হবে বিপুল পরিমাণ। তবে, বিশ্বের প্রধান পরাশক্তির সঙ্গে মৈত্রী বজায় রাখতে চাইলে এই ব্যায় মেনে নিতে হবে ব্রিটেনকে।

সম্ভবত যুক্তরাজ্য ভবিষ্যতেও চেষ্টা করে যাবে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের দূরত্ব বাড়ার প্রক্রিয়াটিকে ধীর করতে। কিংবা সুযোগ পেলে তারা বিষয়টা উল্টে দিতেও চেষ্টা করবে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, অভিবাসন ও বৈচিত্র্যের জোয়ারে অ্যামেরিকা ধীরে ধীরে নতুন রূপ নিচ্ছে। অ্যামেরিকার যেসব নাগরিকের পারিবারিক শিকড় ইউরোপ ও ব্রিটেনের সঙ্গে জুড়ে ছিল, তাদের সংখ্যা ক্রমেই কমে আসছে। এই বদলে যাওয়া জনসংখ্যার সঙ্গে সঙ্গে পুরোনো আবেগীয় সম্পর্কগুলোও শিথিল হয়ে যাচ্ছে। পাশাপাশি বদলে যাচ্ছে অ্যামেরিকার ভূরাজনৈতিক অগ্রাধিকারও। তারা

এখন আগের চেয়ে অনেক বেশি মনোযোগ দিচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে। এই পরিবর্তনের কিছু আভাস পাওয়া গিয়েছিল ওবামা প্রশাসনের সময়েই। যুক্তরাজ্য যদি অ্যামেরিকার কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়েই থাকতে চায়, তাহলে তাকে অ্যামেরিকার কৌশলগত পরিকল্পনাতে কখনো অর্থনৈতিক, কখনো কূটনৈতিক, কখনো বা সামরিকভাবে সহযোগিতা করতে হবে। তবে ইরাক যুদ্ধের অভিজ্ঞতা প্রমাণ করেছে, এই ভূমিকা সবসময় ইতিবাচক ফল বয়ে আনে না। দাবার কৌশলের ভাষায় বললে বলা যায়— যুক্তরাষ্ট্র হলো 'রাজা', অর্থাৎ যার নির্দেশে খেলা চলে, আর তার পররাষ্ট্রনীতি হচ্ছে 'মন্ত্রী' যে পুরো বোর্ডজুড়ে বিচরণ করে। এই খেলাতে যুক্তরাজ্য হতে পারে একটি 'ঘোড়া', অর্থাৎ যার নিজস্ব চাল দেওয়ার মতো ক্ষমতা থাকলেও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে তাকে রাজা ও মন্ত্রীর কৌশলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে হয়। ১৯৫৬ সালের সুয়েজ সংকট আমাদের দেখিয়েছে যে, প্রয়োজনে নিজের মিত্রদের ছুড়ে ফেলে দিতেও পিছপা হয় না ওয়াশিংটন। যদিও এমন ঘটনা অত্যন্ত বিরল, তবুও এই বাস্তবতা মাথায় রাখতে হয়। তবে যুক্তরাজ্যের জন্য একটি বড় সুবিধাও রয়েছে। গত তিন শতকের ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা এখনো তাকে গুরুত্বপূর্ণ করে তোলে। তাদের অন্যতম একটি কৌশলগত সুবিধা হলো তারা 'ফাইভ আইজ' গোয়েন্দা সহযোগিতা জোটের অন্যতম সদস্য। এই জোটের অন্য চার সদস্য হলো—যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড। পরিধি এবং সক্ষমতার দিক থেকে বিশ্বে এই জোটের সমতুল্য কিছুই নেই। এই জোটের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো এমন এক তথ্যভাণ্ডারে প্রবেশাধিকার পায় যা তাদের নীতিনির্ধারণে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

বৃহত্তর অর্থনৈতিক কৌশলের অংশ হিসেবে যুক্তরাজ্য চায় ফাইভ আইজ জোটকে একটি শিথিল বাণিজ্যিক অংশীদারিত্বে রূপ দিতে। এই জোটের সদস্যরা সেক্ষেত্রে একে অপরের সঙ্গে সুবিধাজনক শর্তে বাণিজ্য করতে পারবে। কিছু উৎসাহী ব্রিটিশ মনে করেন যে, এটি ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি কার্যকর বিকল্প হতে পারে। তবে এই ধারণার সবচেয়ে বড় সীমাবদ্ধতা হলো ভৌগোলিক দূরত্ব। 'ফাইভ আইজ'-এর সম্মিলিত জনসংখ্যা ও অর্থনীতি ইউরোপের চেয়ে শক্তিশালী হতে পারে, কিন্তু এই জোটের কোনো দেশই ইউরোপীয় ভূখণ্ডের মতো ব্রিটেনের উপকূল থেকে মাত্র ৩৩ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত নয়। তবুও এই প্রস্তাবের কিছু দিক রয়েছে যা সব পক্ষের জন্যই আকর্ষণীয়—যেমন নির্ধারিত বাজার, বাণিজ্যিক মানদণ্ডের অঙ্গীকার এবং এমনসব দেশের সঙ্গে লেনদেন, যারা দুর্নীতির মাপকাঠিতে তুলনামূলকভাবে অনেক স্বচ্ছ।

যুক্তরাজ্য এখন স্বাধীনভাবে যেকোনো দেশের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করতে পারে। জাপানের মতো কিছু দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যাচ্ছে একাও পথ চলা সম্ভব। ২০২১ সালের শেষ দিকে যুক্তরাজ্য ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে একটি চুক্তিতে পৌঁছায় এবং তখন থেকে একটি একক দেশ হিসেবে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে। এছাড়াও মেক্সিকো এবং কানাডার মতো অনেক দেশের সঙ্গেই বেশ কিছু বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন হয়েছে ব্রিটেনের। তবে চীন, যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের মতো বৃহৎ শক্তিধর অর্থনীতির বেলায় যুক্তরাজ্য অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম অর্থনীতি হিসেবে মর্যাদা পেলেও, একবিংশ শতকের এই তিনটি অর্থনৈতিক দানবের তুলনায় যুক্তরাজ্য খুবই ছোট। ফলে, পর্যাপ্ত রাজনৈতিক ছাড় না দিয়ে ভালো বাণিজ্যিক শর্ত আদায় করা যুক্তরাজ্যের পক্ষে কঠিন হবে। যেমন, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সঙ্গে ভবিষ্যতে বাণিজ্য চুক্তি করতে চাইলে হয়তো কিছু জিনিস যুক্তরাজ্যকে মেনে চলতেই হবে। হয়তো ইইউ সামরিক জোটে ‘সহযোগী সদস্যপদ’ গ্রহণে যুক্তরাজ্যের রাজি না হলে চুক্তি কার্যকর হবে না। আবার, অ্যামেরিকা চাইতে পারে যে যুক্তরাজ্য যেন এমন যেকোনো উদ্যোগ থেকে নিজেকে দূরে রাখে। চীনের ক্ষেত্রেও এমন রাজনৈতিক স্পর্শকাতরতা রয়েছে। তিব্বতের স্বাধীনতার প্রশ্নে চীনের অবস্থান খুবই কঠোর। কোনো ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী যদি দালাই লামাকে ডাউনিং স্ট্রিটে চায়ের দাওয়াত দেন, তাহলে সেটি চীনের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তির পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। ২০১২ সালে এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল। ব্রিটেনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন দালাই লামাকে ডাউনিং স্ট্রিটে আমন্ত্রণ জানান। পরের বছর এপ্রিল মাসে ক্যামেরন যখন বেইজিং সফরের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন দেখা গেল চীনের কোনো শীর্ষ নেতাই তার সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য সময় বের করতে পারছেন না। ফলে সফর বাতিল হলো। পরে ডাউনিং স্ট্রিট ইঙ্গিত দিল যে, তারা দালাই লামার ব্যাপারে ভিন্নভাবে ভাবছে। আর তারপর নভেম্বরেই ক্যামেরন বেইজিং গেলেন এবং যুক্তরাজ্যের পারমাণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে চীনের বিনিয়োগ নিশ্চিত করলেন।

রাজনৈতিক দিক থেকে বিবেচনা করলে বর্তমানে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ভিতর লন্ডনের প্রভাব অনেকটাই কমে গেছে। তবে তার অর্থ এই নয় যে সদস্য দেশগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখতে পারবে না তারা। কিছু নির্দিষ্ট দেশ তাদের ঘনিষ্ঠ মিত্র হয়ে উঠতে পারে—যেমন পোল্যান্ড। পোল্যান্ড হয়তো খুব শীঘ্রই পূর্ব ইউরোপের নেতৃত্বে চলে আসবে। তারা ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ন্যাটোর বিষয়ে

কিছু ব্রিটিশ দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে একমত। তাদের মতে ইইউ-এর এমনভাবে কাজ করা উচিত, যাতে জার্মানিকে স্রেফ একটি সফল বাণিজ্যিক জোটের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা যায়। কিন্তু সেইসঙ্গে তারা চায় ইইউ যেন কখনো একক রাজনৈতিক সত্তায় পরিণত না হয়। পাশাপাশি, ন্যাটোকে এটা নিশ্চিত করতে হবে যে, রাশিয়া যেন পশ্চিম দিকে আর এগিয়ে আসতে না পারে। যুক্তরাজ্য যখন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্য ছিল, তখন এই দুইটি দেশ অনেক সময় একসঙ্গে একই নীতির পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দিয়েছে। এখন যুক্তরাজ্য ইইউ থেকে বেরিয়ে এলেও এই অভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বদলায়নি। সম্পর্কের রূপ বদলেছে, কিন্তু মনের সেতু এখনো অটুট।

ব্রেক্সিট-পরবর্তী ব্রিটেনের সামনে পোল্যান্ড ছাড়াও আরো কিছু সম্ভাব্য কৌশলগত মিত্র আছে। ইইউ মানেই যেমন পুরো ইউরোপ নয়, তেমনি ইউরোপ মানেই শুধু ইইউ নয়। সামরিক ও কূটনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, পোল্যান্ডের পাশাপাশি ফ্রান্সের সঙ্গে যুক্তরাজ্যের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ার পক্ষেও শক্তিশালী যুক্তি আছে। যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্সকেই ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী সামরিক শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। রাশিয়ার বিভিন্ন কার্যকলাপ নিয়ে উভয় দেশই চিন্তিত। উত্তর আফ্রিকার সাহেল ও সাহারা অঞ্চলে চলমান অস্থিরতা ও তার ফলে ইউরোপমুখী অভিবাসনপ্রবণতা নিয়ন্ত্রণের বিষয়েও উদ্বিগ্ন এই দেশ দুইটি। এর মধ্যেই তারা একটি 'যৌথ নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষা নীতি' নিয়ে কাজ করছে। যতক্ষণ পর্যন্ত এই নীতি ন্যাটোর ভিত্তি দুর্বল না করে ফেলছে, ততক্ষণ সেটিকে আরো জোরদার করতে আগ্রহী যুক্তরাজ্য। ইইউ ও ন্যাটোর কাঠামোর বাইরে থেকেও একাধিকবার একত্রে সামরিক অভিযান চালিয়েছে ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য। তারা লিবিয়ায় একসঙ্গে সক্রিয় ছিল, এখনো সিরিয়ায় তাদের উপস্থিতি আছে এবং সম্প্রতি সাহেল অঞ্চলে থাকা ৬,০০০ ফরাসি সৈন্যকে সহায়তা করতেও এগিয়ে এসেছে যুক্তরাজ্য।

যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জার্মানির মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে প্রতিষ্ঠিত কূটনৈতিক সহযোগিতার একটি কাঠামো হলো 'ই-থ্রি'। এই তিন দেশ একসঙ্গে কাজ করে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করেছে। এর মধ্যে অন্যতম উদাহরণ হচ্ছে ইরানের পারমাণবিক চুক্তি। আবার ইউরোপের উত্তর দিকে তাকালে দেখা যায়—যুক্তরাজ্য, নরওয়ে, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড ও সুইডেনের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বজায় রাখা তাদের সকলের স্বার্থেই অত্যন্ত জরুরি। এই দেশগুলোর মধ্যে মাত্র তিনটি দেশ ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য। এতেই বোঝা যায় যে, যুক্তরাজ্য ইইউ-এর বাইরে থেকেও ইউরোপে শক্তিশালী জোট গঠন করতে

সক্ষম। রাশিয়ার আগ্রাসী নীতির বিষয়ে যদি ইইউ-ভুক্ত ন্যাটো দেশগুলো যথেষ্ট কঠোর অবস্থান না নেয়, তাহলে বাল্টিক রাষ্ট্র এস্তোনিয়া, লাটভিয়া ও লিথুয়ানিয়ার পাশাপাশি পোল্যান্ড ও রোমানিয়াও যুক্তরাজ্যের সমর্থনকে স্বাগত জানাবে। এমনকি সীমিত পর্যায়ে ডেনমার্ক, নরওয়ে ও সুইডেনের মতো স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোকেও পাশে পাবে তারা। গত এক দশকে বার্লিন ও প্যারিসে এমন একটি 'পোস্ট-আটলান্টিক' চিন্তাধারা দেখা গেছে। অর্থাৎ আটলান্টিকের দুই পারের দেশগুলোর ঐতিহ্যগত সম্পর্ক থেকে সরে আসার বিষয়ে ফ্রান্স ও জার্মানি কিছু বিষয়ে ইতোমধ্যেই একমত। এই বিষয়টি ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোর মধ্যে উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। বিশেষ করে ফরাসি প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাক্রোঁ যখন ন্যাটোকে 'মৃতপ্রায়' বলে উল্লেখ করেন, তখন তা এই উদ্বেগকে আরো তীব্র করে তোলে। আর এরপর থেকেই আলোচনা শুরু হয়—ইউরোপের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে একটি স্বতন্ত্র ইউরোপীয় সামরিক কাঠামো গড়ে তোলা যায় কি না। কিন্তু বাস্তবতা হলো, ইউরোপের বেশিরভাগ দেশ প্রতিরক্ষা খাতে অর্থ ব্যয় করতে চায় না। পাশাপাশি দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রেও তারা বেশ ধীরগতির। ফলে এমন চিন্তাভাবনা অনেক পূর্ব ইউরোপীয় এবং ন্যাটো-ঘেঁষা রাষ্ট্রকে উদ্বিগ্ন করে তুলছে।

যুক্তরাজ্য ইউরোপের মূল ভূখণ্ড থেকে কিছুটা দূরে সাগরের ওপারে বসে সতর্ক নজরে ইউরোপের গতিপ্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে এবং নিজের সম্ভাবনাগুলো যাচাই করে। ইইউ-এর ভাঙন তাদের স্বার্থের পরিপন্থী। ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন শক্তিশালী থাকলে তা একদিকে ব্রিটিশ পণ্য ও বিনিয়োগের জন্য সমৃদ্ধ বাজার খোলা রাখবে, অন্যদিকে ইউরোপের স্থিতিশীলতাও বজায় থাকবে। গ্রিস, পর্তুগাল, স্পেন, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, ক্রোয়েশিয়া এবং জার্মানির কিছু অংশ গত শতকেই স্বৈরশাসনের অধীনে ছিল। এই দেশগুলোর উদারনৈতিক আইনি কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়লে ইউরোপ আবার ফিরে যেতে পারে সেই পুরোনো যুগের অন্ধকার দিনে। আর এই বিষয়টি ব্রিটেনসহ কেউই চায় না। তবে, ইইউ যদি কোনোভাবে ভেঙে পড়ে, তাহলে যুক্তরাজ্য চেষ্টা করবে নতুন করে গড়ে ওঠা শক্তির ভারসাম্যে নিজেকে গুছিয়ে নিতে। অন্যদিকে, ইইউ যদি শক্তিশালী হয়, তাহলে যুক্তরাজ্য দূরত্ব বজায় রেখে হলেও তার সঙ্গে কাজ চালিয়ে যাবে।

যুক্তরাষ্ট্রের জিপিএস ব্যবস্থার বিকল্প হিসেবে গ্যালিলিও স্যাটেলাইট নেভিগেশন সিস্টেম গড়ে তুলেছিল ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন। কিন্তু ২০১৮ সালে

ব্রাসেলস যুক্তরাজ্যকে এই নেভিগেশন সিস্টেমের সুরক্ষিত অংশে প্রবেশাধিকার দিতে অস্বীকৃতি জানায়। ফলে কৌশলগত স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে নিজস্ব উপগ্রহ প্রকল্প নিয়ে ভাবতে বাধ্য হয় যুক্তরাজ্য। যদিও সেই লক্ষ্য এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি।

স্নায়ু যুদ্ধ পরবর্তী বহু ভাগে বিভক্ত বিশ্বের নতুন বাস্তবতায় প্রতিটি দেশই এখন নতুনভাবে তাদের অবস্থান নির্ধারণ করছে। সেই পরিবর্তনের মধ্যে যুক্তরাজ্যের সামনে আসবে নানা সুযোগ ও চ্যালেঞ্জ। তখনই বোঝা যাবে, যুক্তরাজ্য আসলেই উপনিবেশবাদী মানসিকতা পেছনে ফেলে নতুন বিশ্বে নিজের অবস্থান কৌশলীভাবে নির্ধারণ করতে পেরেছে কিনা।

অর্থনীতি, রাজনীতি ও সামরিক শক্তির দিক থেকে যুক্তরাজ্য এখনো এক ধরনের 'দ্বিতীয় স্তরের প্রথম সারির শক্তি'। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচ স্থায়ী সদস্যের একটি যুক্তরাজ্য। ন্যাটো, জি-৭ এবং কমনওয়েলথের মতো গুরুত্বপূর্ণ বৈশ্বিক সংস্থায় দেশটি এখনো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এখনো লন্ডন বিশ্বের অন্যতম প্রধান আর্থিক কেন্দ্র। এই লন্ডন শহরটি যদি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হতো, তবে এটি হতো আর্জেন্টিনার চেয়েও বড় অর্থনীতি। লন্ডনকে তখন বিশ্বের ২০তম বৃহত্তম অর্থনৈতিক শক্তি হিসেবে গণ্য করা হতো। শুধু অর্থনীতি নয়, 'সফট পাওয়ার'-এর দিক থেকেও যুক্তরাজ্য বিশ্বের অগ্রগামী দেশগুলোর অন্যতম। যুক্তরাজ্যের সাংস্কৃতিক উপাদানগুলো অবিশ্বাস্য রকমের সমৃদ্ধ, যা পুরো বিশ্বে সাড়া ফেলতে সক্ষম।

এই সাংস্কৃতিক আধিপত্যের পেছনে ইংরেজি ভাষার বিশাল ভূমিকা রয়েছে। ইংরেজি এখনো বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী ভাষা। প্রথম ভাষা হিসেবে প্রায় ৫০ কোটিরও বেশি মানুষ ইংরেজি ব্যবহার করে, আর দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ব্যবহার করে আরো একশত কোটির বেশি মানুষ। আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও আইনগত চুক্তিতে আজও ইংরেজিই মূল মাধ্যম। পাশাপাশি যুক্তরাজ্যের উচ্চশিক্ষা ব্যবস্থা বিশ্বের অন্যতম সেরা হিসেবে বিবেচিত হয় এবং এটি সারা বিশ্বের মেধাবী শিক্ষার্থীদের আকৃষ্ট করে চলেছে। বিশ্বের সেরা দশ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তিনটিই যুক্তরাজ্যে—অক্সফোর্ড, কেমব্রিজ ও ইম্পেরিয়াল কলেজ লন্ডন। এই শিক্ষাব্যবস্থা শুধু দেশের অর্থনীতির জন্যই গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং ভবিষ্যৎ ব্রিটেনের 'সফট পাওয়ার'-এর বলয়ও গড়ে দেয়। কারণ, এদেশে পড়াশোনা করা অনেকেই

পরবর্তীকালে নিজ নিজ দেশে উচ্চপদস্থ রাজনীতিবিদ, নীতিনির্ধারক বা উদ্যোক্তা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবেন।

ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন বা বিবিসির প্রভাব আজকাল কিছুটা কমে এসেছে। একসময় বলা হতো, Britannia rules the airwaves! তবে আজ আর তা বলা চলে না। কিন্তু তারপরও বিবিসির অনুষ্ঠান বিশ্বজুড়ে মানুষ শোনে ও দেখে। ব্রিটেনের পুরোনো প্রিন্ট পত্রিকাগুলোর মধ্যে অনেকেই বর্তমানে ডিজিটাল মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী প্রভাব বিস্তার করছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, দ্য ইকোনমিস্ট, দ্য গার্ডিয়ান এবং ডেইলি মেইল যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশে বিপুল পাঠকপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

খেলাধুলাও যুক্তরাজ্যের অন্যতম বড় অর্থনৈতিক খাত হয়ে উঠেছে। বিশেষ করে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ জায়গা করে নিয়েছে বিশ্বজুড়ে কোটি কোটি মানুষের হৃদয়ে। একইভাবে, সংগীত, শিল্প এবং পর্যটনও দেশটির অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। এমনকি কোভিড-১৯ পরিস্থিতিও যুক্তরাজ্যের পর্যটন খাতে খুব বেশি প্রভাব ফেলতে পারেনি। আজও বহু মানুষ যুক্তরাজ্যে বেড়াতে আসে। কেউ আসে রাজপরিবারের ঐতিহ্য দেখতে, আবার কেউ আসে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সিংহাসনের টানে। আর সেই সিংহাসন হলো 'আয়রন থ্রোন'। উত্তর আয়ারল্যান্ডের পর্যটন বোর্ডের ২০১৯ সালের এক প্রতিবেদনে বলা হয় যে, সে বছর প্রায় ৩ লাখ ৫০ হাজার পর্যটক সেখানে এসেছিলেন মোর্ন পর্বতমালা ও কেয়ার্ন ক্যাসেলসহ 'গেম অব থ্রোনস' সিরিজের বিভিন্ন শুটিং লোকেশন দেখতে।

এই ধরনের সফট পাওয়ার ধরে রাখার জন্য চাই একটি মজবুত অর্থনীতি। কারণ, একটি দেশের অর্থনৈতিক ভিত যত সুদৃঢ় হয়, সেই দেশের কূটনৈতিক ও সামরিক শক্তি ততটাই স্থায়ী হয়। যুক্তরাজ্য যে দ্বিতীয় সারির হলেও অন্যতম প্রভাবশালী একটি রাষ্ট্র হিসেবে এখনো টিকে আছে, তার পেছনে এই সফট পাওয়ার এবং অর্থনৈতিক সক্ষমতা একটা বড় ভূমিকা রাখে। তবে এই অবস্থান কতটা বজায় থাকবে তা নির্ভর করবে ভবিষ্যতের নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্তগুলোর ওপর।

যুক্তরাজ্যের সামনে এখন অনেক চ্যালেঞ্জ। দেশে রাজনৈতিক বিভাজন তৈরি হয়েছে, যা এই দেশের নাগরিকদের জন্য অনেকটাই অস্বস্তিকর ও অচেনা। পাশাপাশি, দেশটি কূটনৈতিক ও সামরিক পরিসরে নিজেকে কীভাবে সংজ্ঞায়িত করবে, তা নিয়েও আছে একধরনের অনিশ্চয়তা। যদিও অন্যান্য ভূমিকাগুলোর

তুলনায় প্রতিরক্ষার বিষয়টি আপাতদৃষ্টিতে সবচেয়ে স্পষ্ট। তবে, স্কটল্যান্ড যদি স্বাধীন হয়ে যায়, তাহলে এই হিসাবও বদলে যেতে পারে। ১৭২০-এর দশকে ইংল্যান্ড ও স্কটল্যান্ডের সংযুক্তির সুফল মিলতে শুরু করেছিল। ঠিক তেমনি, ২০২০-এর দশকও হতে পারে ব্রিটেনের জন্য এক নতুন সময়। তবে সময় বদলালেও ভূগোল তো আর বদলায় না। আর সেই ভূগোলই গত ৩০০ বছর ধরে যুক্তরাজ্যের নিরাপত্তার অন্যতম প্রধান হাতিয়ার।

এই মুহূর্তে যুক্তরাজ্যের সামনে সরাসরি কোনো সামরিক হুমকি নেই। হ্যাঁ, রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কটা বন্ধুত্বপূর্ণ নয়, কিন্তু তারা এখনই সৈন্য পাঠিয়ে উত্তর ইউরোপের সমভূমি পেরিয়ে পশ্চিম ইউরোপে হামলা চালাবে—এমন আশঙ্কাও নেই। জার্মানি ও ফ্রান্স ব্রিটেনের মিত্র এবং নিকট ভবিষ্যতেও তারা সেভাবেই মিত্র থাকবে বলে ধরে নেওয়া যায়। আগের আলোচনা থেকে আমরা দেখেছি, একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে ফ্রান্সই হয়তো ইউরোপে যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক সহযোগী হয়ে উঠবে।

আর যদি ভবিষ্যতে নতুন কোনো হুমকি উঁকি দেয়, তাহলেও যুক্তরাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান তার পক্ষেই কাজ করবে। ইংল্যান্ড-স্কটল্যান্ডের ঐক্যের পর থেকে যে ভৌগোলিক সুবিধা তৈরি হয়েছে, তা অনেকটাই নিশ্চিত করে দিয়েছে যে ব্রিটেনের মূল ভূখণ্ডের বাইরে থেকে আক্রমণ করা অতটা সহজ হবে না। বাস্তবিকভাবে যুক্তরাজ্যে আক্রমণের মতো সক্ষমতা রাখে এমন দেশের তালিকাও খুবই ছোট—চীন আর বড়জোর রাশিয়া। অন্য দেশগুলোর পক্ষে এটি প্রায় অসম্ভব। কেননা, যুক্তরাজ্যে আক্রমণ করতে হলে হয় একটি শক্তিশালী বিমানবাহী রণতরী বহর থাকতে হবে, না হয় ব্রিটেনের আশেপাশে কোনো দেশ দখল করে সেখান থেকে আকাশ আধিপত্য গড়ে তুলতে হবে। তবে তা করতে গেলে সময় লাগবে। আর সেই সময়ের মধ্যেই যুক্তরাজ্য নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে নতুন করে গড়ে তুলবে। এমনকি কোনো প্রতিবেশী দেশও যদি শত্রুতে পরিণত হয়, সেক্ষেত্রেও একই ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আক্রমণ চালিয়ে স্থলবাহিনী মোতায়েন করতে চাইল শত্রুপক্ষকে আগে ২০০টি ব্রিটিশ ফাইটার জেট এবং রয়্যাল নেভির প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা পরাস্ত করতে হবে। আর এটি মোটেই সহজ কাজ হবে না।

ব্রিটিশ নৌবাহিনী হয়তো অতীতের তুলনায় ছোট হয়ে এসেছে, তবে এটি এখনো একটি শক্তিশালী নৌবহর। রয়্যাল নেভিতে বর্তমানে সদ্য নির্মিত দুইটি বিমানবাহী রণতরীর পাশাপাশি রয়েছে বিশ্বের অন্যতম সর্বাধুনিক ছয়টি ডেস্ট্রয়ার

যুদ্ধজাহাজ। যুক্তরাজ্যে ঢুকতে হলে আগে এই যুদ্ধজাহাজগুলোর মুখোমুখি হতে হবে। এছাড়াও, ব্রিটিশ সাবমেরিন বহরে রয়েছে চারটি ভ্যানগার্ড-ক্লাস সাবমেরিন। এগুলোর প্রতিটিতেই রয়েছে পারমাণবিক অস্ত্র। এর অন্তত একটি সবসময়ই সমুদ্রে থাকে। আর সেটিও থাকে শত্রুর চোখের আড়ালে লুকিয়ে অন্ধকার সমুদ্রে। সমুদ্রপথে কোনো আক্রমণ এলে প্রতিরক্ষাকারীই সাধারণত সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে। এমনকি শত্রুপক্ষ যদি ব্রিটেনের উপকূলে নামতেও সক্ষম হয়, পুরো দ্বীপের নিয়ন্ত্রণ নেওয়া তখনো এক কঠিন চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। রোমান, ভাইকিং বা নরম্যানরা কেউই কখনও পুরো দ্বীপের দখল নিয়ে নিতে পারেনি। তাই প্রতিরক্ষা দপ্তরের কর্মকর্তাদের রাতের ঘুম হারাম করে দেওয়ার মতো তেমন কোনো বিষয় নয় এটি। বরং তাদের প্রধান উদ্বেগ হলো ব্যাপক প্রাণহানি ঘটানো সন্ত্রাসী হামলা, পারমাণবিক হামলা ও সাইবার আক্রমণ। আর এর সঙ্গে নতুন করে যুক্ত হয়েছে অস্থির ও স্বাধীনতাকামী স্কটল্যান্ড।

কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, স্কটল্যান্ড যদি স্বাধীন হয়ে যায় তাহলে কী হবে? প্রথমত, যুক্তরাজ্যের সামরিক শক্তি বড় ধরনের পরিবর্তনের মুখে পড়বে। যুক্তরাজ্যের যেসব সামরিক সম্পদ স্কটিশ ভূখণ্ডে রয়েছে, তার একটা 'ন্যায্য হিস্যা' স্কটল্যান্ড দাবি করতেই পারে। যেমন যুদ্ধবিমান, হেলিকপ্টার, ট্যাঙ্ক ও যুদ্ধজাহাজ এগুলোর একটা ভাগ হয়ত তখন স্কটল্যান্ডকে দিতে হবে। স্কটল্যান্ডের পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত ফাসলেইন নৌঘাঁটির কথা ভাবলে বিষয়টা আরো জটিল হয়ে যায়। রয়্যাল নেভির পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত সাবমেরিনগুলো এই ঘাঁটিতেই থাকে। কাছেই আছে কুলপোর্ট, যেখানে এসব সাবমেরিনের অস্ত্র সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়। স্কটল্যান্ড স্বাধীন হলে তারা নিঃসন্দেহে এই ঘাঁটি সরিয়ে নিতে বলবে। কিন্তু সমস্যা হলো, ফাসলেইন একটি আদর্শ সাবমেরিন ঘাঁটি। এখানে গভীর পানি আছে এবং এখান থেকে দ্রুত উত্তর সাগরে প্রবেশ করা যায়। উত্তর সাগর থেকে খুব সহজেই দক্ষিণের ইংলিশ চ্যানেলে যাওয়া যায় কিংবা উত্তর দিকে পাড়ি দেওয়া যায় গিউক গ্যাপের দিকে। এই গিউক গ্যাপ স্নায়ু যুদ্ধের সময় অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ 'কিল জোন' ছিল। এখানে সোভিয়েত নৌবহরের গতিবিধি নজরে রাখার জন্য পশ্চিমা দেশগুলো সবসময় তৎপর থাকত। শুধু ফাসলেইনই নয়, প্রশ্ন আরো আছে। স্কটল্যান্ড কি ন্যাটোর সদস্য থাকবে? উত্তর স্কটল্যান্ডের গুরুত্বপূর্ণ বিমানঘাঁটিগুলোর ভবিষ্যৎ কী হবে? 'ফাইভ আইজ' গোয়েন্দা জোটে তখন স্কটল্যান্ডের অবস্থান কী হবে?

ট্যাঙ্ক, যুদ্ধজাহাজ ও অন্যান্য সামরিক সম্পদের বণ্টন তুলনামূলকভাবে সহজ। জনসংখ্যা, অর্থনীতি এবং সামরিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে এসব ভাগ করা সম্ভব। কিন্তু ফাসলেইনের বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন মাত্রার এক যন্ত্রণা। রয়্যাল নেভি তো আর চাইলেই একদিনে ঘাঁটি গুটিয়ে নিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে না। তাহলে এই পারমাণবিক সাবমেরিনগুলো যাবে কোথায়? স্কটল্যান্ড স্বাধীন হলে যুক্তরাজ্য এক ঝটকায় তার 'সমুদ্রে সদা কার্যকর' পারমাণবিক প্রতিরোধ সক্ষমতা হারিয়ে ফেলবে। নতুন করে এই ধরনের একটি ঘাঁটি তৈরি করতে বহু বছর সময় লাগবে এবং ব্যয় হবে কয়েক বিলিয়ন পাউন্ড। সম্ভাব্য পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কিছু পরিকল্পনা হাতে নিলেও সেসব এখনো পুরোপুরি বাস্তবসম্মত স্তরে পৌঁছায়নি। এর প্রমাণ হিসেবে ২০১৩ সালে পার্লামেন্টে দেওয়া রয়্যাল নেভির রিয়ার অ্যাডমিরাল মার্টিন আলাবাস্টারের সাক্ষ্যের কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি বলেছিলেন, "এই ঘাঁটির বাইরে যুক্তরাজ্যের অন্য কোথাও কৌশলগত পারমাণবিক প্রতিরোধ পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো গড়ে তোলা অত্যন্ত কঠিন হবে। আমি আসলে বলতে চাই এটি প্রায় অকল্পনীয়।" এছাড়াও স্কটল্যান্ডের লসিমাউথ ও লুচার্সে অবস্থিত বিমানঘাঁটি খোয়ানো রয়্যাল এয়ারফোর্সের জন্য বড় মাথাব্যাথার কারণ হয়ে উঠতে পারে। রাশিয়ার যুদ্ধবিমানগুলো প্রায়ই উত্তর সাগরের আকাশপথে ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার খোঁজ খবর নিতে আসে। স্কটল্যান্ডের বিমানঘাঁটিগুলো এই আকাশসীমার প্রতিরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। স্কটল্যান্ডের বিমানঘাঁটিগুলো হারালে রয়্যাল এয়ারফোর্স মারাত্মক চাপের মুখে পড়বে। সাময়িকভাবে ঘাঁটি রাখার অনুমতি পেতে স্বাধীন স্কটল্যান্ডের সঙ্গে দরকষাকষি করতে হবে দেশটিকে। এমনকি যুক্তরাজ্যকে বড় ধরনের ছাড়ও দিতে হতে পারে। এই ধরনের ঘটনা দুই দেশের মধ্যেই ক্ষোভের সৃষ্টি করবে।

ন্যাটোতে স্কটল্যান্ডের সদস্যপদ পাওয়ার বিষয়টিও হবে বেশ জটিল। এতে বছরের পর বছর সময় লাগতে পারে। বিষয়টি আরো জটিল হয়ে উঠবে এডিনবরার পারমাণবিক অস্ত্রবিরোধী অবস্থানের কারণে। ন্যাটো চাইবে পারমাণবিক শক্তিচালিত কিংবা পারমাণবিক অস্ত্রবাহী নৌযানগুলো স্কটল্যান্ডের বন্দরে প্রবেশের অনুমতি পাক। আর 'ফাইভ আইজ' গোয়েন্দা জোটের কথা যদি বলি, এটি মূলত 'দেওয়া-নেওয়ার' সম্পর্কের ওপর নির্ভরশীল। নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়ের পর্যাপ্ত সামর্থ্য না থাকায় স্কটল্যান্ডের সামনে এই জোটে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা কম। নিঃসন্দেহে স্বাধীন স্কটল্যান্ডের নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী থাকবে এবং যুক্তরাজ্যের সঙ্গে কিছুটা সহযোগিতাও বজায় থাকতে পারে।

তবে যেদিক থেকেই হিসাব করা হোক না কেন, একক ভূখণ্ড হিসেবে ব্রিটেনের যে কৌশলগত ও ভূ-রাজনৈতিক সুবিধা ছিল, স্কটল্যান্ড বিচ্ছিন্ন হলে তা আর থাকবে না।

স্কটল্যান্ড বিচ্ছিন্ন হলে বাকি যে যুক্তরাজ্যটুকু থাকবে সেই নতুন যুক্তরাজ্যের নাম ও পতাকা তখন ঠিক করতে হবে নতুন করে। সেই রাষ্ট্র হারাবে তার ৮ শতাংশ জনসংখ্যা, ৩২ শতাংশ ভূমি এবং স্কটিশ সরকারের হিসাব অনুযায়ী প্রায় ১৮,০০০ কিলোমিটার দীর্ঘ উপকূলরেখা। এটি শুধু ভৌগোলিক বা রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জই তৈরি করবে না, বরং নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও নিয়ে আসবে বড় ধরনের ঝুঁকি। যুক্তরাজ্যের সামরিক সক্ষমতা ব্যাপকভাবে কমে যাবে। রাশিয়ার দিক থেকে আসা সম্ভাব্য আক্রমণের ক্ষেত্রে দ্রুত সতর্কবার্তা পাওয়ার যে ব্যবস্থাপনা রয়েছে, তা হয়ে পড়বে দুর্বল। কারণ এই নজরদারি ব্যবস্থার কিছু অংশ স্কটল্যান্ড থেকে সরিয়ে নিতে হবে, অথচ স্কটল্যান্ডই নরওয়েজিয়ান সাগরের সবচেয়ে কাছে। পারমাণবিক সাবমেরিনের মাধ্যমে যে নিউক্লিয়ার প্রতিরোধ ক্ষমতা গড়ে তোলা হয়েছে তাও বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। যতদিন না যুক্তরাজ্যে নতুন কোনো ঘাঁটি তৈরি হয় ততদিন সাবমেরিনগুলোকে সাময়িকভাবে অ্যামেরিকা পাঠিয়ে রাখা যেতে পারে। কিন্তু এটি এমন এক জটিল ব্যবস্থা, যা প্রতিরক্ষা বাহিনীর শীর্ষ নেতারা একদমই পছন্দ করবেন না। এই ধরনের প্রতিরোধ ব্যবস্থা থাকা কেন জরুরি এর পক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে সমর্থকরা রাশিয়া, উত্তর কোরিয়া ও ইরানের সম্ভাব্য হুমকির কথা বলেন। ইরানের পারমাণবিক ওয়ারহেডযুক্ত ক্ষেপণাস্ত্র লন্ডনের দিকে ধেয়ে আসবে, এমন সম্ভাবনা আপাতত নেই। কিন্তু কৌশলগত পরিকল্পনায় ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তাকে সব সময় বিবেচনায় রাখতে হয়। ১৯৩২ সালে জার্মানির ওয়েইমার প্রজাতন্ত্র ছিল ধ্বংসপ্রায়, তার সামরিক শক্তিও ছিল ভার্সাই চুক্তি দ্বারা সীমিত। অথচ মাত্র নয় বছর পর নাৎসি জার্মানি এসে দাঁড়ায় মস্কোর দরজায়।

স্কটল্যান্ড যদি সত্যিই একদিন স্বাধীনতা পায়, তাহলে সেটাই হয়তো বিচ্ছিন্নতার শেষ ধাপ হবে না। এর ফলে উত্তর আয়ারল্যান্ডেও বিচ্ছিন্নতাবাদ দানা বাঁধতে পারে। আরো বেশি সংখ্যক মানুষ মনে করতে পারে যে, আয়ারল্যান্ড প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে একীভূত হওয়াই তাদের জন্য ভালো বিকল্প। এই বিষয় নিয়ে আলোচনা ধীরে ধীরে জোরালো হয়ে উঠছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মাধ্যমে ১৯২২ সালে আয়ারল্যান্ড প্রজাতন্ত্র স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। আর এর মাধ্যমেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্যাস্তের সূচনা হয়।

এই আধুনিক বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা সরাসরি ব্রেক্সিটের সঙ্গে সম্পর্কিত। ২০১৪ সালের স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতার গণভোটে ৫৫ শতাংশ মানুষ যুক্তরাজ্যে থাকার পক্ষে রায় দিয়েছিল। তবে, তখন যুক্তরাজ্য ছিল ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য। কিন্তু ব্রেক্সিট গণভোটে দেখা যায়, ইংল্যান্ডের তুলনায় স্কটল্যান্ড এবং উত্তর আয়ারল্যান্ডের মানুষের ইউরোপীয় ইউনিয়নের প্রতি সমর্থন ছিল অনেক বেশি। তাই আজকের অনেক স্কট বা উত্তর আয়ারল্যান্ডবাসীর জন্য একটা সহজ সমীকরণ দাঁড়িয়ে গেছে—একটি ইউনিয়নে থাকতে চাইলে, আরেকটি ছাড়তেই হবে।

এখানে স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতার পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়নি, এমনকি স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষের অর্থনৈতিক দিকগুলোও আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। তবে একটি যুক্তি দেওয়া যায় যে, যদি স্কটল্যান্ড সত্যিই যুক্তরাজ্য থেকে বেরিয়ে যায়, তাহলে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যুক্তরাজ্যের মর্যাদায় যে ধাক্কা লাগবে, তা হয়তো ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেয়েও বড় হবে। সম্ভবত সবচেয়ে বেশি আনন্দিত হবে রাশিয়া। কারণ, এর ফলে ইউরোপের প্রধান দুই সামরিক শক্তির একটি দুর্বল হয়ে যাবে। ইউরোপে ঐক্যবদ্ধ সামরিক শক্তি গঠনের পরিকল্পনায় বাধা হয়ে দাঁড়ানো জাতিটি যে তার অর্থনৈতিক শক্তি হারাচ্ছে, সে বিষয়টি প্যারিস এবং বার্লিনের জন্যও নিশ্চিতভাবেই সুবিধাজনক হবে। তবে অন্য দেশগুলো হয়তো সক্রিয়ভাবে এই বিচ্ছেদকে স্বাগত জানাবে না।

এই সবকিছুই আপাতত ভবিষ্যতের জল্পনা-কল্পনা। কিন্তু যুক্তরাজ্যের সামনে এখন এমনই কিছু কঠিন সিদ্ধান্ত অপেক্ষা করছে। সামনের সময়গুলো তাদের জন্য খুব একটা সহজ হবে না। এই যাত্রাপথে নানা প্রতিকূলতার মুখোমুখি হতে হবে, কারণ ব্রিটেন আবারও পৃথিবীর মহাসাগরের বুকে এক অনিশ্চিত অভিযাত্রায় বেরিয়ে পড়ছে।

১৯০২ সালে যুক্তরাজ্যের বিখ্যাত ভূরাজনীতি বিশ্লেষক স্যার হ্যালফোর্ড ম্যাকিন্ডার একটি মন্তব্য করেছিলেন, যা আজও স্মরণীয়—"ব্রিটেন এমন একটি দ্বীপপুঞ্জ যা গড়ে উঠেছে মহাসাগরের বুকে, তবে এটি ইউরোপ মহাদেশের উপকূলের কাছেই অবস্থিত। উভয় পাড়ের উপকূলের গঠনই খাঁজকাটা। আর এই ভৌগোলিক গঠনই ভবিষ্যতে তাদের ভাগ্য বা পরিণতিকে নির্ধারণ করবে।"

ম্যাকিন্ডারের লেখা অনেকেই পছন্দ করেন না, কারণ একদিকে তিনি ছিলেন সাম্রাজ্যবাদী, অন্যদিকে কৌশলগত পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থানের

গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছিলেন। তবে এটিও সত্য যে, তিনি গণতন্ত্রের সমর্থক ছিলেন। পরাশক্তিগুলোর মধ্যে উত্তেজনা প্রশমনে 'লিগ অব নেশনস'-এর ধারণাকেও সমর্থন করেছিলেন তিনি। তার কিছু চিন্তাভাবনা নাৎসি নেতাদের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করলেও নাৎসিবাদের উত্থানে তিনি গভীরভাবে বিচলিত হয়েছিলেন। তবে তার ধারণাগুলোর অপব্যবহার হওয়ার অর্থ এই নয় যে, ওপরের উদ্ধৃতিটি ভুল। বাস্তবতা হচ্ছে, ব্রিটেন এখনো সেই একই দ্বীপপুঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে এবং দেশটি একটি বিশাল মহাদেশের উপকূলে অবস্থিত। আর সেই মহাদেশ ও দ্বীপপুঞ্জ উভয়ের উপকূলরেখা খাঁজকাটা, যা গভীর পানির বন্দর তৈরির সুবিধা দেয়। এই ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশ থাকলে বিশ্বজুড়ে সমুদ্রপথে বাণিজ্য করা সহজ হয়। ম্যাকিন্ডারের কাজ বোঝার সঠিক উপায় হলো, ভৌগোলিক বাস্তবতাকে স্বীকার করা, তবে সেটাকে আগ্রাসনের ন্যায্যতা দেওয়ার মাধ্যম হিসেবে না দেখা।

অ্যামেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় বিশ্বজুড়ে ব্রিটিশদের উপস্থিতি ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতীক। আড়াই শতাব্দী পর তারা আবারও বিশ্বজুড়ে নিজেদের অবস্থান তৈরি করতে চায়। কিন্তু এবারের উদ্দেশ্য উপনিবেশ গড়া নয়, বরং বন্ধুত্ব ও সমান মর্যাদার সম্পর্ক নিয়ে হাজির হতে চায় তারা। তবে বাস্তবতা হলো, সম্পর্ক সব সময় বন্ধুত্ব বা সমতার ভিত্তিতে গড়ে ওঠে না।

অধ্যায় ৫

গ্রিস

“দেবী লিবার্টি বললেন, আলো আসুক!
সাগরের বুক চিরে সূর্যোদয়ের মতো উঠে এল এথেন্স!”

- ‘হেলাস’, পার্সি বিশি শেলি

পূর্ব ভূমধ্যসাগরে কিংবা এজিয়ান সাগরে গ্রীষ্মকালীন ছুটি কাটানোর বিষয়টি শুনতে বেশ চমৎকার শোনায়। তবে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই অঞ্চলটি বেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। আর তার পেছনে আবহাওয়ার পাশাপাশি রয়েছে আরো বেশ কিছু কারণ।

দশকের পর দশক ধরে এই অঞ্চলটি তুলনামূলকভাবে শান্ত থাকলেও, আবারও ভূরাজনৈতিক অস্থিরতার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে অঞ্চলটি। সাগরতলে নতুন গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার পুরোনো ও নতুন সংঘাতকে একসূত্রে গেঁথে দিয়েছে। এই সংঘাতের কেন্দ্রে রয়েছে গ্রিস ও তুরস্ক। আর সেই দ্বন্দ্বে ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়ছে আরো অনেক দেশ। গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কারের আগেও এই অঞ্চলের জলসীমা নিয়ে এই দুই দেশের মধ্যে বিরোধ ছিল। তবে এই নতুন সম্পদ তাদের সম্পর্কের মধ্যে নতুন তিক্ততা তৈরি করেছে।

ভূরাজনীতি নিয়ে জানতে আগ্রহী যেকোনো শিক্ষার্থীর কাছে গ্রিসের একটা বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। কারণ এই শাস্ত্রটির সূচনাই হয়েছিল গ্রিসে। পশ্চিমা জগতে এই শাস্ত্রের জনক বলে যাকে ধরা হয়, তার নাম থুসিডাইডিস (খ্রিস্টপূর্ব ৪৬০-৪০০)। 'হিস্ট্রি অব দ্য পেলোপোনেশিয়ান ওয়ার' বইতে তিনি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষণমূলক দৃষ্টিভঙ্গির সূচনা করেছিলেন। তাঁর কাজ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে গবেষকদের অনুপ্রেরণা যুগিয়ে আসছে। এমনকি আজকের দিনেও বৈশ্বিক ঘটনাপ্রবাহ বিশ্লেষণেও তার মতবাদকে বিবেচনায় নেওয়া হয়। প্রাচীনকালে শুধু এথেন্সের উত্থান ও স্পার্টার ভীতির ব্যাখ্যা করার জন্য 'থুসিডাইডিসের ফাঁদ' কথাটি ব্যবহার করা হতো। কিন্তু বর্তমান সময়ে পরাশক্তি হিসেবে চীনের উত্থানের ফলে যুক্তরাষ্ট্রে যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে, সেই বিষয়টা ব্যাখ্যা করতেও ব্যবহৃত হয় তাঁর এই তত্ত্ব।

থুসিডাইডিস ওই সময় যে তত্ত্ব দিয়েছিলেন, বর্তমান সময়ের জন্যও সেই ব্যাখ্যা সত্য। গ্রিসের মূল ভূখণ্ডের উত্তরে রয়েছে পার্বত্য অঞ্চল। এই পাহাড়ি এলাকা একদিকে যেমন গ্রিসের বাণিজ্যের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, অন্যদিকে স্থলপথে শত্রুর আগ্রাসনের বিরুদ্ধেও প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা হিসেবে কাজ করে। কিন্তু কেবল এই প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষার ভরসায় থাকলে গ্রিসের চলবে না। নিজের দেশকে নিরাপদ রাখতে চাইলে এবং অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন করতে হলে গ্রিসকে অবশ্যই এজিয়ান সাগর অঞ্চলে একটি শক্তিশালী সামুদ্রিক শক্তি হয়ে উঠতে হবে। গ্রিসের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বোঝার মূল চাবিকাঠি হলো এই দুই প্রাকৃতিক উপাদান—সমুদ্র ও পর্বত।

এথেন্স বর্তমান আধুনিক গ্রিসের রাজধানী। দেশটির সীমার মধ্যে রয়েছে ছয় হাজারেরও বেশি দ্বীপ। গ্রিসের কোনো স্থানই উপকূল থেকে ১০০ কিলোমিটারের বেশি দূরে নয়। বলকান উপদ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে দেশটির অবস্থান। গ্রিসের

উত্তরে রয়েছে আলবেনিয়া, ম্যাসিডোনিয়া এবং বুলগেরিয়ার সীমান্ত, আর উত্তর-পূর্ব দিকে সীমান্ত রয়েছে তুরস্কের সঙ্গে। গ্রিসের স্থলসীমান্তের মোট দৈর্ঘ্য ১,১৮০ কিলোমিটার হলেও তাদের সবচেয়ে দীর্ঘ সীমান্ত আসলে তাদের সমুদ্রসীমা।

গ্রিসের মূল ভূখণ্ডকে ঘিরে রেখেছে তিনটি সাগর—এজিয়ান সাগর, ভূমধ্যসাগর ও আইওনিয়ান সাগর। এর মধ্যে এজিয়ান সাগরের অবস্থান গ্রিস ও তুরস্কের মাঝখানে। এই সাগর মর্মর সাগরের মাধ্যমে যুক্ত হয়েছে বসফরাস প্রণালির সঙ্গে। এই প্রণালি আরো উত্তর-পূর্ব দিকে এগিয়ে গিয়ে পড়েছে কৃষ্ণ সাগরে। কৃষ্ণ সাগর অঞ্চলে রাশিয়াই সবথেকে প্রভাবশালী শক্তি। এই কারণে শুধু গ্রিসের নিরাপত্তার জন্যই নয়, বরং তুরস্ক, ন্যাটো, যুক্তরাষ্ট্র, এমনকি রাশিয়ার জন্যও কৌশলগতভাবে এজিয়ান সাগর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজিয়ান সাগরের সবচেয়ে বড় দ্বীপ ক্রিট আবার গ্রিসের অংশ। দোদেকানিজ দ্বীপপুঞ্জের অবস্থানও এই সাগরে। এই দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে রয়েছে রোডস দ্বীপ, যার অবস্থান আবার তুরস্কের উপকূলের খুব কাছাকাছি। এই দ্বীপগুলোর অবস্থানের কারণে এজিয়ান সাগরকে অনেক সময় 'গ্রিক হ্রদ' বলা হয়। আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইনে প্রতিটি দেশের উপকূল থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত সেই দেশের এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন (EEZ) বলে ধরা হয়। এই ২০০ নটিক্যাল মাইলের মধ্যে যদি অন্য কোনো দেশ পড়ে, তাহলে এই অর্থনৈতিক অঞ্চল দুই দেশের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয়। এই নিয়ম অনুসারে, ক্রিট, রোডস এবং লেসবসের মতো দ্বীপগুলোর চারপাশের জলসীমা গ্রিসের আওতায়। ফলে এজিয়ান সাগরের বেশির ভাগ অংশই গ্রিসের নিয়ন্ত্রণাধীন। কিন্তু গ্রিসের এই দাবিকে তুরস্ক কখনোই স্বীকৃতি দেয়নি।

গ্রিস, ইতালি ও আলবেনিয়ার মাঝে রয়েছে আইওনিয়ান সাগর। গ্রিসের অন্যান্য প্রধান দ্বীপগুলোর অবস্থান আইওনিয়ান সাগরের উত্তর-পশ্চিম অংশে। এই দ্বীপগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো করফু ও পাক্সোস। ক্রিট দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব দিকে শুরু হয়েছে পূর্ব ভূমধ্যসাগর। তুরস্ক, সিরিয়া, লেবানন, ইসরায়েল, মিশর ও লিবিয়া পূর্ব ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী দেশ। এছাড়াও এই অঞ্চলে রয়েছে সাইপ্রাস দ্বীপ। এই দ্বীপটির সঙ্গে গ্রিসের ঐতিহাসিক ও কৌশলগত সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। তবে বর্তমানে দ্বীপটির একাংশ তুরস্ক দখল করে রেখেছে।

প্রাচীন যুগে এই সাগরগুলোই ছিল পরিচিত বিশ্বের সংযোগপথ। এই সমুদ্রপথ তৎকালীন সভ্যতাগুলোর মধ্যে যোগাযোগ এবং বাণিজ্যের মাধ্যমে নতুন

নতুন ধারণা ও সম্পদ বয়ে আনতো। সেইসাথে বয়ে আনতো সংঘাত। এই ভৌগোলিক পরিস্থিতির কারণে আজকের দিনে গ্রিসকে একদিকে যেমন ইউরোপের দিকে নজর রাখতে হয়, তেমনই সচেতন থাকতে হয় মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা নিয়েও। প্রাচীনকাল থেকেই গ্রিসের ভৌগোলিক অবস্থান একদিকে যেমন তাকে সীমাবদ্ধ করে রেখেছে, অন্যদিকে দেশটিকে পরিণত করেছে বিশ্ব-রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়ে। ইউরোপের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে দাঁড়িয়ে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী তুরস্কের মোকাবিলা করতে করতে দেশটি এখন ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন, রাশিয়া, ন্যাটো, মধ্যপ্রাচ্যের অস্থিরতা এবং চলমান অভিবাসন সংকটের অন্যতম কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

প্রাচীন গ্রিক কিংবদন্তিতে বলা হয়, ঈশ্বর একসময় ছাঁকনির মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মাটি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। সব কাজ শেষ করার পর ঈশ্বর লক্ষ্য করলেন এখনো অনেক পাথরের টুকরো বাকি পড়ে আছে। সেই অবশিষ্ট টুকরোগুলো একত্র করে তিনি গড়ে তুললেন গ্রিস। এই কাহিনীর বাস্তব প্রতিফলন আজও দেখা যায়। যেদিক থেকেই গ্রিসের মূল ভূখণ্ডের দিকে এগিয়ে যান না কেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে পাহাড়গুলো যেন পানি থেকে সোজা উঠে দাঁড়িয়েছে। হেলেনিক রিপাবলিক নামে পরিচিত গ্রীস দেশটির চার-পঞ্চমাংশই পর্বতময়। এই পার্বত্য অঞ্চলে রয়েছে খাড়া সুউচ্চ পর্বতশৃঙ্গ ও চোখজুড়ানো গভীর গিরিখাত। গ্রিসের মূল ভূখণ্ডের কেন্দ্রজুড়ে আছে পিন্ডোস পর্বতমালা। এই পার্বত্য অঞ্চল আলবেনিয়া ও উত্তর ম্যাসিডোনিয়ার সীমান্ত অঞ্চল থেকে শুরু হয়ে দক্ষিণ দিকে নেমে এসেছে। পূর্ব-পশ্চিমে এর প্রস্থ প্রায় ৮০ কিলোমিটার, যার অনেক অংশ এতটাই দুর্গম যে এখানে চলাচল করাই অত্যন্ত কঠিন। এই পর্বতশ্রেণীতে দেখা যায় খাড়া ঢাল বিশিষ্ট পাথুরে পর্বতশৃঙ্গ। এসব জায়গায় হয়তো কিছু ছাগল পালন করা যায়, কিন্তু বড় পরিসরে কৃষিকাজ সম্ভব নয়। তবে, পার্বত্য অঞ্চলের পূর্ব পাশে, অর্থাৎ সাগরঘেঁষা অঞ্চলগুলোতে—বিশেষ করে গ্রিক ম্যাসিডোনিয়া ও থেসালি অঞ্চলে রয়েছে বেশ কিছু সংকীর্ণ উর্বর সমভূমি। এখানেই কিছুটা বৃহৎ পরিসরে কৃষিকাজ সম্ভব। এই অঞ্চলটি যে বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্য যোগান দিতে সক্ষম হবে তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। ফলে এই অঞ্চল একসময় হয়ে উঠেছিল গ্রিসের ইতিহাসের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। আর এখান থেকেই উঠে এসেছিল আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের সাম্রাজ্য। তবে গ্রিসের বেশিরভাগ ভূমিই হয় পর্বতময়, নয়তো ঘন জঙ্গলে আচ্ছাদিত, কিংবা এতটাই অনুর্বর যে সেখানে কৃষিকাজ প্রায় অসম্ভব।

প্রাচীন গ্রিক নগর-রাষ্ট্রগুলো যখন গড়ে ওঠে, তখন পাহাড়গুলো তাদের পেছনে প্রাকৃতিক দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। ফলে সীমানা সম্প্রসারণের সুযোগ খুব একটা পাওয়া যায়নি। তাছাড়া প্রাচীন গ্রিসে বড় পরিসরের কৃষিকাজ চালিয়ে বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য জোগাড় করার মতো অবকাঠামো গড়ে তোলাও ছিল অসম্ভব। এমনকি এই নগর-রাষ্ট্রগুলো নিজেদের মধ্যেও ভালোভাবে সংযুক্ত ছিল না। ফলে অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য, যোগাযোগ ও জনসংখ্যা বৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হতো। সেই প্রাচীনকালে এইসব নগররাষ্ট্রকে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করাও ছিল কঠিন। বর্তমান গ্রিস রাজনৈতিকভাবে একীভূত থাকলেও এই ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতার কারণেই গ্রিসের বিভিন্ন অঞ্চল তাদের নিজেদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য ধরে রেখেছে।

বড় পরিসরে কৃষিকাজ করার সুযোগ গ্রিসে বরাবরই ছিল সীমিত। আর এই কারণে আজকের দিনেও দেশটির জিডিপির মাত্র ৪ শতাংশের মতো আসে কৃষি খাত থেকে। দেশটির সংকীর্ণ উপকূলীয় সমভূমিতে কৃষিকাজ সম্প্রসারণ করা কঠিন। ফলে, গ্রিস এখন যে পরিমাণ খাদ্য রপ্তানি করে তার চেয়ে অনেক বেশি তাদের আমদানি করতে হয়। এমনকি এখনো পর্যন্ত দেশটির ভেতরে সড়ক বা রেলপথ নির্মাণ করা বেশ দুরূহ কাজ। উপরন্তু, গ্রিস থেকে বলকান অঞ্চল বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নভুক্ত অন্যান্য দেশে সহজে প্রবেশ করার মতো ভালো নদীপথ নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অ্যাক্সিওস নদী উত্তর ম্যাসিডোনিয়া থেকে গ্রিসে প্রবাহিত হয়ে এজিয়ান সাগরে গিয়ে মিশেছে। কিন্তু এর সর্বোচ্চ গভীরতা মাত্র ৪ মিটার। এই ধরনের অগভীর নদী বাণিজ্যিক নৌযান চলাচলের জন্য একদমই অনুকূল নয়। বুলগেরিয়া থেকে দক্ষিণে নেমে আসা স্ট্রুমা নদীর পরিস্থিতিও একই।

অপরদিকে, এই ভৌগোলিক পরিস্থিতির কারণে গ্রিসকে আক্রমণ করা খুব কঠিন। আর তা হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে প্রাচীন এবং আধুনিক যুগের বহু রাষ্ট্রই। এটি কৌশলগত গভীরতার একটি ব্যতিক্রমধর্মী রূপ। প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী কৌশলগত গভীরতা বলতে বোঝানো হয়—একটি দেশের মূল শিল্প অঞ্চল ও প্রশাসনিক কেন্দ্রগুলো থেকে শত্রুর অবস্থানের দূরত্ব কতটা। এই দূরত্ব যত বেশি হয়, প্রতিরক্ষা তত সহজ হয়। এর অন্যতম উদাহরণ হলো রাশিয়া। দেশটির কেন্দ্র পর্যন্ত পৌঁছাতে চাইলে শত্রুপক্ষকে বহুদূর পাড়ি দিতে হয়। রাশিয়ার কৌশলগত গভীরতা এতই বেশি যে, আক্রমণের মুখে পড়লে প্রতিরক্ষা বাহিনী কেন্দ্রীয় অঞ্চলের আরো গভীরে সরে গিয়ে প্রতিরোধ চালিয়ে যেতে পারে।

গ্রিসের সেই সুবিধা নেই, কারণ দেশটি ছোট। কিন্তু, এখানে কৌশলগত প্রতিরক্ষার একটি বিকল্প উপায় আছে। প্রতিরোধকারীরা চাইলে পাহাড়ি উচ্চভূমিতে পিছু হটে গিয়ে লড়াই চালিয়ে যেতে পারে। শত্রুবাহিনী যদি গ্রিসের মূল কেন্দ্রগুলোতে পৌঁছাতেই না পারে, তাহলে যুদ্ধের প্রয়োজনই পড়বে না। গ্রিস একদিকে যেমন তার উত্তরাঞ্চলের প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষার ওপর ভরসা করে, যুদ্ধের সম্ভাবনা ঠেকাতে তেমনি সাগরের দিকেও নজর রাখে তারা।

গ্রিসের দুর্গম ভূপ্রকৃতিই প্রাচীনকালে সমুদ্র অভিযানের দক্ষতা গড়ে তুলতে বাধ্য করেছিল তাদেরকে। মূল ভূখণ্ডের মধ্যে স্থলপথে বাণিজ্য করা অতীতে যেমন কঠিন ছিল, এখনো তেমনই রয়ে গেছে। প্রাচীন গ্রিক ব্যবসায়ীরা বাণিজ্য শুরু করেছিল উপকূল ঘেঁষে সাগরপথে। ভৌগোলিক কারণে গ্রিস বিকশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র-বাণিজ্যের ওপর তাদের নির্ভরশীলতাও বাড়তে থাকে। আর বাণিজ্য পথ নিরাপদ রাখতে প্রয়োজন পড়ে শক্তিশালী নৌবাহিনী। আজও সেই প্রয়োজন রয়ে গেছে।

এমনই এক অঞ্চলে গড়ে ওঠে প্রাচীন গ্রিক নগর-রাষ্ট্র এথেন্স। ধীরে ধীরে এথেন্স পরিণত হয় পশ্চিমা বিশ্বের সবচেয়ে অগ্রসর শহরে। ফলে প্রাচীন গ্রিক নগররাষ্ট্রগুলোর মধ্যে এই নগরটিই প্রাচীন গ্রিসের সমার্থক হয়ে আছে বহু মানুষের কাছে। প্রাচীন গ্রীস মানেই যেন এথেন্স। শহরটি গড়ে উঠেছিল এজিয়ান উপকূলবর্তী সমতলের একটি উঁচু পাহাড়কে কেন্দ্র করে, যেখানে এখন অ্যাক্রোপলিস দাঁড়িয়ে আছে। এই স্থানটি বেছে নেওয়ার কারণ ছিল—এখান থেকে চারপাশের সমতল ভূমিতে নজর রাখা যেত। এমনকি নজর রাখা সম্ভব ছিল প্রায় ৬.৫ কিলোমিটার দূরে এজিয়ান সাগর পর্যন্ত। তাই প্রতিরক্ষার জন্য জায়গাটি ছিল খুবই সুবিধাজনক। প্রাচীন গ্রিক ভাষায় 'অ্যাক্রোপলিস' শব্দের অর্থই হলো 'উঁচু নগরী'। আনুমানিক ৪০০০ খ্রিস্টপূর্ব নাগাদ এখানে প্রথম বসতি গড়ে ওঠে। এরপরে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ সালে অ্যাক্রোপলিস ও তার আশেপাশে বড় ধরনের নির্মাণকাজ শুরু হয়। এমনকি সেই সময় একটি প্রাসাদও নির্মাণ করা হয় এখানে। খ্রিস্টপূর্ব ১২০০ সালের দিকে এথেন্স ঘিরে একটি প্রতিরক্ষামূলক প্রাচীর গড়ে তোলারও প্রমাণ পাওয়া গেছে।

উঁচু ভূমি, সাগরে সহজ প্রবেশাধিকার এবং নৌ-শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হওয়ার প্রবল আকাঙ্ক্ষা স্পার্টাসহ অন্যান্য গ্রিক নগররাষ্ট্রের তুলনায় এথেন্সকে এগিয়ে রেখেছিল। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের মধ্যে এথেন্স একটি আঞ্চলিক শক্তিতে

পরিণত হয়। তবে পারস্য সাম্রাজ্যের মতো সুসংগঠিত ও বিশাল সামরিক বাহিনীর আক্রমণ প্রতিহত করার মতো শক্তিশালী ছিল না এই নগর-রাষ্ট্র।

খ্রিস্টপূর্ব ৪৮০ সালে পারস্যের একটি বিশাল সেনাদল এথেন্স থেকে প্রায় ১৩৫ কিলোমিটার দূরে অবতরণ করে। লক্ষাধিক পারসিক সৈন্য কয়েকশত মিটার এগিয়ে গেলে সামনে পায় একটি সংকীর্ণ উপকূলীয় পথ। তারা ধারণা করেছিল যে, এই সরু উপকূলীয় পথই সম্ভবত গ্রিসের ভেতরে ঢোকার একমাত্র রাস্তা। এরপর সংঘটিত হয় থার্মোপিলির যুদ্ধ, যা প্রাচীন ইতিহাসের অন্যতম বিখ্যাত সংঘর্ষ। এই যুদ্ধ শুধু ইতিহাসের পাতাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, ২০০৬ সালে হলিউডের ব্লকবাস্টার চলচ্চিত্র 'থ্রি হান্ড্রেড'-এর মাধ্যমে পপ কালচারেও জায়গা করে নিয়েছে।

পারসিক বাহিনীর মোকাবিলায় স্পার্টানদের নেতৃত্বে গ্রিক নগররাষ্ট্রগুলো সামরিক জোট গঠন করেছিল। এই সংকীর্ণ পথে পারসিক বাহিনীকে আটকে দেওয়ার জন্য স্পার্টার রাজা লিওনিডাসের নেতৃত্বে হাজির হয় গ্রিক সেনারা। সংখ্যায় অত্যন্ত কম হওয়া সত্ত্বেও গ্রিক বাহিনী পারসিকদের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সাধন করে। তবে পারসিকরা একটি ভেড়া চরানোর পথ খুঁজে পায়। সেই পথ ব্যবহার করে গোপনে গ্রিক বাহিনীর পেছনে গিয়ে তাদের ঘিরে ফেলে তারা। লিওনিডাস তখন অধিকাংশ সৈন্যকে পশ্চাদপসরণ করার নির্দেশ দেন এবং মাত্র ৩০০ স্পার্টান যোদ্ধা নিয়ে এক মহাকাব্যিক শেষ প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। তবে বাস্তবে প্রতিরোধকারী সেনার সংখ্যা ছিল প্রায় ২০০০। আর তাদের মধ্যে ৩০০ জন ছিলেন স্পার্টান। বুঝতেই পারছেন 'প্রায় ২,০০০' নামটা তো আর সিনেমার নাম হিসেবে জমে না।

শেষ পর্যন্ত পারসিক বাহিনী গ্রিসের একটি বড় অংশ দখল করে নিতে সক্ষম হলেও পরের বছরেই গ্রিকরা পারসিকদের পরাজিত করে। এই যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে এথেনীয়রা উপলব্ধি করেছিল যে, তারা শহরটিকে প্রায় অজেয় করে তুলতে পারবে। তবে এর জন্য প্রয়োজন হবে এথেন্স শহর থেকে শুরু করে সাড়ে ছয় কিলোমিটার দূরের পিরাইউস বন্দর পর্যন্ত প্রায় ২০০ মিটার চওড়া একটি প্রাচীরপথ। আর এই বন্দরকে ঘিরে যদি শক্তিশালী নৌবাহিনী মোতায়েন করা হয়, তাহলে অবরোধের সময়ও শহরটিতে সহজেই প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ পৌঁছানো সম্ভব হবে। এই প্রতিরক্ষা কৌশলের মূল শিক্ষা ছিল সমুদ্র শক্তির গুরুত্ব, যা গ্রিকরা কখনোই ভোলেনি।

পারস্যের সাথে গ্রিসের যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে খ্রিস্টপূর্ব ৪৪৯ সালে, আর পেলোপনেশীয় যুদ্ধের সূচনা হয় খ্রিস্টপূর্ব ৪৩১ সালে। এই দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী সময়ে গ্রিসের সবচেয়ে প্রভাবশালী নগররাষ্ট্রে পরিণত হয় এথেন্স। বিশেষ করে বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষেত্রে এথেন্স ছিল অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ওই সময়ে এথেন্সে এমনসব চিন্তাধারা ও ব্যক্তির জন্ম হয়েছে, যাদের প্রভাব টিকে আছে পরবর্তী আড়াই হাজার বছর ধরে। আসলে এটা ছিল মানব ইতিহাসের এক উদ্দীপনাময় মুহূর্ত। শান্তি ও সমৃদ্ধির আবহে শিক্ষা, স্থাপত্য, বিজ্ঞান, বিতর্ক, শিল্প এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা একসাথে বিকশিত হয়েছিল গ্রিসের এই ছোট্ট নগরে। লেখক এরিক ওয়েইনার তার 'দ্য জিওগ্রাফি অব জিনিয়াস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "অন্যান্য গ্রিক নগর-রাষ্ট্র ছিল আয়তনে বড় যেমন সিরাকিউস, আবার অনেক নগর ছিল সম্পদে সমৃদ্ধ যেমন করিন্থ, কিংবা অনেক নগর ছিল সামরিক শক্তিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী যেমন স্পার্টা। কিন্তু সক্রেটিস থেকে শুরু করে অ্যারিস্টটল পর্যন্ত যত মনীষী এথেন্স তৈরি করেছে, পৃথিবীর আর কোনো স্থান এই সময়ের আগে বা পরে কখনোই এতটা অর্জন করতে পারেনি।"

এথেনীয়রা ভিনদেশে যেতে ভালোবাসত। তারা শিখত বিভিন্ন সংস্কৃতি থেকে। দার্শনিক প্লেটো একবার অকপট ভাষায় বলেছিলেন, "গ্রিকরা বিদেশ থেকে যা কিছু ধার করে আনে, সেটাকেই তারা নিখুঁত করে তোলে।" আর এই নিখুঁত করার মধ্য দিয়েই তারা আমাদের মূল্যবান জ্ঞান উপহার দিয়েছে। এথেন্সের কাছ থেকেই আমরা উপহার পেয়েছি নগর পরিকল্পনার জনক হিপ্পোডামাসকে, এরিস্টটলের মতো মহান দার্শনিককে, চিকিৎসাশাস্ত্রের জনক হিপোক্রেটিসকে, গণিতশাস্ত্রে পিথাগোরাসকে এবং বিশ্বের প্রথম পরিচিত নারী গণিতবিদ হাইপেশিয়াকে। ধারণা করা হয় প্রায় ১,৫০,০০০ ইংরেজি শব্দ গ্রিক ভাষা থেকে ইংরেজিতে এসেছে। এর মধ্যে রয়েছে ডেমোক্রেসি, অ্যাক্রোব্যাট এবং সার্কাজমের মতো শব্দও। এমনকি, অতি দীর্ঘ শব্দ বোঝানোর জন্য ব্যবহৃত hippopotomonstrosesquipedalian শব্দটিও গ্রিক ভাষারই দান!

এথেন্স ও স্পার্টার মধ্যকার সংঘাত বা পেলোপনেশীয় যুদ্ধ স্থায়ী হয়েছিল প্রায় তিরিশ বছর। এই দীর্ঘ ও ক্লান্তিকর সংঘাত চরম দুর্দশা এনে দিলেও এথেন্স শেষ পর্যন্ত বেশ বড় অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ লাভ করে। বিশেষ করে এজিয়ান সাগরের অপর পারে আনাতোলিয়ার পশ্চিম উপকূলের কিছু অংশ দখল করতে সক্ষম হয় তারা। এটি এখন তুরস্কের অংশ। এথেন্সের অধিকৃত এই অঞ্চলই পরবর্তী

শতাব্দীগুলোতে সংঘাত ও বিরোধের অন্যতম কারণ হয়ে ওঠে। এমনকি আজও এই বিষয়টি ভূরাজনৈতিক দ্বন্দ্বের ভিত্তি হিসেবে রয়ে গেছে। স্পার্টার সাথে যুদ্ধের ঠিক এক শতাব্দী পর এথেন্স আবারো এক প্রতিবেশীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এবার প্রতিপক্ষ ছিলেন ম্যাসিডোনিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ, যিনি পরে পুরো গ্রিসকে ম্যাসিডোনীয় নেতৃত্বের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করেন। গ্রিক নগররাষ্ট্রগুলো সে সময় ম্যাসিডোনিয়াকে পশ্চাৎপদ অঞ্চল হিসেবে দেখত। কিন্তু ম্যাসিডোনিয়ার ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। আর তা হলো, নদী ব্যবহার করে সেচ দেওয়ার মতো পর্যাপ্ত কৃষিজমি। এই জমি স্থানীয় জনগোষ্ঠীর খাদ্য চাহিদা মেটাতে সক্ষম। অন্যদিকে, এথেন্সসহ গ্রিক নগররাষ্ট্রগুলোর পক্ষে পর্যাপ্ত খাদ্য উৎপাদন করা ছিল কঠিন। তাদের নির্ভর করতে হতো সামুদ্রিক বাণিজ্যের ওপর। ফিলিপ ও তার পুত্র আলেকজান্ডার দ্য গ্রেট এই কৃষির সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে গড়ে তুলেছিলেন বিশাল সাম্রাজ্য।

তবে উর্বর জমির অভাবে ভুগছিল গ্রিসের মূল ভূখণ্ড। ফলে যতটুকু খাদ্য উৎপাদন হতো তা দিয়ে আসলে বিপুল জনসংখ্যার খাদ্য জোগাড় করা সম্ভব ছিল না। এদিকে আইওনিয়ান সাগরের অপর পারে আবির্ভূত হচ্ছিল এক নতুন শক্তি, যাদের হাতে ছিল সমৃদ্ধ কৃষিজমি। আর সেই বিস্তীর্ণ উর্বর উপত্যকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতো আরনো, টাইবার ও পো নদী। এই শক্তিটি ছিল রোম। রোমানরা প্রথমে করফু দ্বীপ দখলের মাধ্যমে গ্রিস অঞ্চলে প্রবেশ করে। ইতালির মানচিত্র খেয়াল করে দেখুন, ওপরের দিক থেকে শুরু করে নিচ পর্যন্ত অনেকটা বুট জুতা আকৃতির। করফু দ্বীপের অবস্থান বুটের গোড়ালি থেকে ঠিক ডান পাশে। এই দ্বীপ পশ্চিম দিক থেকে গ্রিসের মূল ভূখণ্ড পাহারা দিয়ে রাখে। তবে এই অবস্থানের একটি অসুবিধাও আছে। যেকোনো শক্তিশালী প্রতিপক্ষের জন্য এই দ্বীপ হতে পারে একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি। খ্রিস্টপূর্ব ২৯৯ সালে রোম এই দ্বীপ দখল করে নেয় এবং গ্রিসে আক্রমণের কমান্ড সেন্টার হিসেবে ব্যবহার করে।

রোমান শাসনের অধীনে গ্রিক নগররাষ্ট্রগুলো একটা নির্দিষ্ট মাত্রার স্বায়ত্তশাসন বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল। অপরদিকে এথেন্সের প্রতিষ্ঠানগুলো রোমান দর্শনে গভীর প্রভাব ফেলে। রোমান সাম্রাজ্যের অংশ হওয়ায় গ্রিক ভাষা ছড়িয়ে পড়ে পুরো ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে। আর এই বিষয়টিই মূলত গ্রিক সংস্কৃতিকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে টিকিয়ে রাখে। তবে এই সময় থেকে প্রাচীন গ্রিসের রাজনৈতিক ক্ষমতার যুগ পুরোপুরি শেষ হয়ে যায়। ক্ষমতার কেন্দ্র থেকে

গ্রিস পিছিয়ে পড়ে এবং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি হয়ে ওঠে বিশ্বের একটি প্রান্তিক অঞ্চল। এরপর অন্যান্য বৃহৎ রাষ্ট্রগুলোও গ্রিসে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য লড়াই চালিয়ে যেতে থাকে। অ্যামেরিকান রম্য লেখক ডেভিড সেডারিস মজা করে বলেছেন, "গ্রিকরা গণতন্ত্র আবিষ্কার করল, অ্যাক্রোপলিস বানাল, তারপর কাজ শেষ বলে ধরে নিল।" এই কথাটা একটু বেশিই নিষ্ঠুর। বাস্তবতা হলো, পরবর্তী ২,০০০ বছর ধরে রোমান, বাইজেন্টাইন, অটোমান, ব্রিটিশ এবং রুশরা কখনো একসঙ্গে আবার কখনো আলাদাভাবে কাজ করেছে যেন গ্রিস কখনোই নিজের ভাগ্য নিজে নিয়ন্ত্রণ করতে না পারে। উদ্দেশ্য ছিল একটাই, গ্রিস যেন আর কখনো ভূরাজনৈতিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে না পারে। কারণ, তারা সবাই এজিয়ান সাগর ও পূর্ব ভূমধ্যসাগরের নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে রাখতে চেয়েছে। আর গ্রিসের দুর্বল থাকাটা ছিল তাদের সেই লক্ষ্য অর্জনের পক্ষে সহায়ক।

চতুর্থ শতকে খ্রিস্টীয় রোমান সাম্রাজ্য দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এর পূর্বাংশের রাজধানী স্থাপন করা হয় গ্রিকভাষী দূর্গ-শহর বাইজান্টিয়ামে। অবশ্য এর আগেই শহরটির নাম পরিবর্তন করে কনস্টান্টিনোপল রাখা হয়েছিল। প্রায় এক হাজার বছর ধরে কনস্টান্টিনোপলে বসে শাসনকার্য পরিচালনা করে বাইজেন্টাইনরা। দূর্গ-শহর পরিণত হয় মহাদূর্গ, মহানগরে। এই মহানগর ও তার আশেপাশের অঞ্চলের সংস্কৃতি ছিল হেলেনিক বা আদি গ্রিক। প্রায় পুরো বাইজেন্টাইন আমল জুড়েই সেই পরিচয় ধরে রেখেছিল তারা। এই অঞ্চল থেকেই খ্রিস্টীয় ধর্মের ইস্টার্ন অর্থোডক্স বা গ্রিক অর্থোডক্স মতাদর্শের জন্ম হয়েছে। এই দীর্ঘ সময়কালে গ্রিসও ছিল বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের আওতায়। তবে বাস্তবে বাইজেন্টাইন শাসন মূলত সীমাবদ্ধ ছিল উপকূলীয় সমভূমি, প্রধান প্রধান শহর এবং মূল দ্বীপগুলোতে। পাহাড়ি অঞ্চলে বিভিন্ন স্বাধীন গোষ্ঠী ও গোত্র নিজেদের শাসন কায়েম রেখেছিল। বাইজেন্টাইন আমলে একের পর এক ভাগ্য বিড়ম্বনার শিকার হয় গ্রিস। বিভিন্ন সময় ফ্রাঙ্ক, সার্ব এবং ভেনিশীয়রা এর কিছু কিছু অংশ নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিতে থাকে। তার পরেও ১৪৫৩ সাল পর্যন্ত বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যই ছিল গ্রিসের প্রধান রাজনৈতিক ভিত্তি।

১৪৫৩ সালে অটোমানদের হাতে কনস্টান্টিনোপলের পতনের মাধ্যমে এই অধ্যায়ের ইতি ঘটে। নতুন এই শক্তিশালী সাম্রাজ্যের উত্থানের সময় থেকে ইতিহাসের মূল ঘটনাপ্রবাহে গ্রিস একেবারেই প্রান্তিক হয়ে পড়ে। আর সেখানেই থেকে যায় দীর্ঘ সময়। খ্রিস্টান ইউরোপ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মুসলিম সাম্রাজ্যের

আওতাধীন অবস্থায় থাকলেও অধিকাংশ গ্রিকই তাদের খ্রিস্টীয় বিশ্বাস বজায় রেখেছিল। পরবর্তী দুই শতাব্দী ধরে বিভিন্ন দ্বীপপুঞ্জ, মূল ভূখণ্ডের আশেপাশের সমুদ্র এবং স্থলভাগের কিছু অংশ ছিল অটোমানদের নিয়ন্ত্রণে। মূল ভূখণ্ডের পার্বত্য অঞ্চলগুলো এতটাই দুর্গম ছিল যে অনেক অঞ্চলে অটোমানরা কখনো প্রবেশই করতে পারেনি। তবে সেসব নিয়ে তাদের খুব একটা মাথাব্যথাও ছিল না। তাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এজিয়ান সাগরের দ্বীপগুলো। পরবর্তী সময়ে বলকান অঞ্চলের প্রায় পুরোটা জয় করে উত্তরে ভিয়েনা পর্যন্ত পৌঁছে যায় অটোমানরা। কিন্তু ১৬৮৩ সালে ভিয়েনা অবরোধে তাদের বড় ধরনের পরাজয় ঘটে। এই পরাজয় ছিল তাদের পতনের সূচনা। আর সেখান থেকেই শুরু হয় সেই দীর্ঘ পথ, যা শেষ পর্যন্ত গ্রিসের স্বাধীনতার সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেয়।

পরবর্তী এক শতাব্দীজুড়ে বলকান অঞ্চলের ওপর অটোমান সাম্রাজ্যের নিয়ন্ত্রণ ক্রমেই দুর্বল হয়ে আসতে থাকে। একদিকে অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্য, অন্যদিকে রাশিয়ান সাম্রাজ্যের ক্রমবর্ধমান প্রভাব স্পষ্ট করে দেয় যে অটোমানদের দখলদারিত্ব আর দীর্ঘস্থায়ী হবে না। সুযোগ বুঝে ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দের প্রথম দশকে গ্রিসে বিদ্রোহের সূত্রপাত হয়। এই বিদ্রোহ ছিল একটি দীর্ঘ সংগ্রামের সূচনা, যার লক্ষ্য ছিল প্রাচীন গ্রিক নগররাষ্ট্রগুলোকে কেন্দ্র করে একটি আধুনিক গ্রিক পরিচয় গড়ে তোলা। ১৮৩২ সালে ইউরোপের প্রধান শক্তিগুলো গ্রিসকে একটি সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। তবে এটি ছিল নামেমাত্র সার্বভৌমত্ব। এই সিদ্ধান্তে গ্রিকদের কোনো অংশগ্রহণ ছিল না। এমনকি গ্রিকভাষী জনগোষ্ঠীর দুই-তৃতীয়াংশই নবঘোষিত রাষ্ট্রের সীমানার বাইরে রয়ে যায়। পরবর্তী ১১৫ বছর ব্যয় করেও এই সীমান্ত সমস্যা মেটাতে পারেনি গ্রিস। এই প্রচেষ্টা ছিল 'মেগালি ইডিয়া' অর্থাৎ মহান অভিলাষের বাস্তবায়ন। এই ধারণার মূলভাব ছিল সব গ্রিক জনগোষ্ঠীকে একটি বৃহত্তর রাষ্ট্রের সীমার মধ্যে আনা। এই স্বপ্নকে ধারণ করে তখন একটি জনপ্রিয় স্লোগান ছড়িয়ে পড়েছিল, "সময়ের পর সময় পেরিয়ে একদিন এগুলো আবার আমাদের হবে!" এই ধারণার কিছু চরমপন্থী সমর্থক মনে করতেন, এই লক্ষ্য পূরণ মানে হচ্ছে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের পুনর্জন্ম ঘটানো, যার হাতে থাকবে কৃষ্ণসাগর, কনস্টান্টিনোপল এবং সেন্ট্রাল আনাতোলিয়া। কিন্তু সেই ভূখণ্ডগুলো তখন অটোমান সাম্রাজ্যের কেন্দ্র, আর ভবিষ্যতে সেসব অঞ্চল আধুনিক তুরস্কের অংশ হবে।

এই বিষয়ে ইউরোপীয় পরাশক্তিগুলোর প্রতিক্রিয়া ছিল ঠান্ডা এবং বাস্তববাদী—"স্বপ্ন দেখে যাও, তবে বাস্তবে তা হবে না।" তারা সবাই বসে সিদ্ধান্ত নিল যে, গ্রিস একটি ছোট আকারের রাজ্য হিসেবেই থাকবে। এই নতুন রাজ্যের সিংহাসনে বসার জন্য নির্বাচিত হন মাত্র ১৭ বছর বয়সী এক ব্যাভারিয়ান রাজপুত্র, অটো অব উইটেলসবাখ। সামরিক বাহিনীও গঠন করা হয় ব্যাভারিয়ানদের নিয়ে। এই সিদ্ধান্ত গ্রিকদের মোটেও ভালো লাগেনি। তবুও ১৮৬২ সাল পর্যন্ত কোনোভাবে তিনি ক্ষমতায় টিকে ছিলেন। তারপর অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। এই বিশৃঙ্খলার সমাধান হিসেবে আবারও আনা হলো এক সতেরো বছর বয়সী বিদেশিকে। এবার রাজা হিসেবে ছিলেন ডেনমার্কের প্রিন্স উইলিয়াম। তিনি গ্রিসের মুকুট পরেছিলেন হেলেনিকদের রাজা প্রথম জর্জ নামে। তবে গ্রিকরা চেয়েছিল কোনো ব্রিটিশ রাজপুত্রকে। তাদের আশা ছিল, ব্রিটেন যদি তাদের রাজা দেয়, তবে ইউরোপের প্রভাবশালী এই দেশ তাদের ভূখণ্ড সম্প্রসারণে সহায়তা করবে। কিন্তু রানি ভিক্টোরিয়া তার পুত্র প্রিন্স আলফ্রেডকে গ্রিসে পাঠাতে রাজি হলেন না। গ্রিকদের হতাশা ছিল প্রবল। কিন্তু পরে রানি একপ্রকার উপহার হিসেবেই আইওনিয়ান দ্বীপপুঞ্জ গ্রিসকে দিয়ে দেন। এই দ্বীপগুলো তখন ছিল ব্রিটিশদের নিয়ন্ত্রণে। আর এই দ্বীপগুলোর মধ্যেই ছিল সেই করফু, যে দ্বীপ থেকে ২,২০০ বছর আগে রোমানরা গ্রিক সভ্যতা ধ্বংসের অভিযান শুরু করেছিল। এভাবেই ইতিহাসের চক্র পূরণ হলো।

রুশ ও ব্রিটিশ রাজপরিবারের সঙ্গে নিজের আত্মীয়তার সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে গ্রিসের ভূখণ্ড সম্প্রসারণের চেষ্টা চালিয়ে যান রাজা জর্জ। এই কৌশলে কিছুটা সাফল্যও আসে। থেসালি অঞ্চলের অধিকাংশই গ্রিসের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রায় ১,৬০০ বছরের বিরতির পর ১৮৯৬ সালে অলিম্পিক গেমস আবারও ফিরে আসে এথেন্সে। এই অনুষ্ঠান ছিল গ্রিসের সার্বভৌমত্ব ফিরে পাওয়ার এক প্রতীকী উদযাপন। ম্যারাথনে জয়ী হয়ে সেই প্রতীকী মুহূর্তকে আরো অর্থবহ করে তোলেন একজন গ্রিক মেষপালক। তার নাম ছিল স্পাইরিডন লুইস। তিনি ফিনিশ লাইনে পৌঁছানোর পর রাজা জর্জ নিজে গ্যালারিতে দাঁড়িয়ে করতালি দিয়ে তাকে অভিনন্দন জানান।

অটোমানদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের পরেও গ্রিস আসলে অন্যান্য পরাশক্তির নজরদারির মধ্যেই ছিল। ১৮৪১ সালে গ্রিসে নিযুক্ত ব্রিটিশ দূত স্যার এডমন্ড লায়নস বলেছিলেন, "সত্যিকারের স্বাধীন গ্রিস একটা হাস্যকর ধারণা।

গ্রিস হয় ব্রিটিশদের হবে, নয়তো রুশদের। আর যেহেতু এটি রুশদের হতে পারে না, তাই এটি ব্রিটিশ হওয়া আবশ্যক।" ঊনবিংশ শতকের ইউরোপে যে ভয়াবহ কূটনৈতিক প্রতিযোগিতা চলছিল, তার এক বড় উদ্দেশ্য ছিল মধ্যপ্রাচ্য এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে রাশিয়ার প্রভাব প্রতিহত করা। ১৮৭০-এর দশকে ব্রিটিশ ও রুশ সাম্রাজ্যের মধ্যে সম্পর্কের আরো অবনতি ঘটে। বিশেষ করে আফগানিস্তান নিয়ে তাদের দ্বন্দ্ব তুঙ্গে ওঠে। ব্রিটিশদের ভয় ছিল, মস্কো আফগানিস্তানকে ব্যবহার করে তাদের সাম্রাজ্যের সবচেয়ে মূল্যবান রত্ন ভারতবর্ষে প্রবেশের চেষ্টা করতে পারে। আরো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল সুয়েজ খাল। ব্রিটিশরা চায়নি রাশিয়া এমন কোনো অবস্থানে পৌঁছে যাক, যেখান থেকে তারা ভূমধ্যসাগরের প্রবেশপথ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। কারণ, সেক্ষেত্রে ভারতে যাতায়াতের সহজ পথটিও হুমকির মুখে পড়ত। এই পুরো সময় জুড়ে এমনকি বিশ শতকের প্রথম দিকেও ব্রিটিশরা নিজেদের দাবি করত গ্রিক জাতির 'রক্ষক' হিসেবে। তবে গ্রিসকে রক্ষা করা নিয়ে তাদের কোনো মাথাব্যথা ছিল না। তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল নিজেদের সাম্রাজ্যের স্বার্থ সুরক্ষিত রাখা।

ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগে অটোমান সাম্রাজ্য ধ্বংসের একেবারে দ্বারপ্রান্তে চলে আসে। তাদেরকে তখন বলা হতো 'ইউরোপের রুগ্ন পুরুষ'। একের পর এক জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়তে থাকে অটোমানদের অধিকৃত বিভিন্ন অঞ্চলে। এর ফলে শুরু হয় জমি দখলের প্রতিযোগিতা। এই টানাপোড়েন আজও বলকান অঞ্চলে সীমান্ত বিরোধ হিসেবে রয়ে গেছে। পশ্চিম ইউরোপের বেশিরভাগ মানুষ ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত সময়কে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়কাল হিসেবে চিহ্নিত করলেও, গ্রিকদের কাছে এই সময়সীমা কিছুটা ভিন্ন। তারা যুদ্ধকাল ধরে ১৯১২ থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত। কারণ এই এক দশকের মধ্যেই ঘটেছে ২ টি বলকান যুদ্ধ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং গ্রিক-তুর্কি যুদ্ধ।

১৯১২ সালে শুরু হয় প্রথম বলকান যুদ্ধ। ছোট্ট দেশ মন্টিনিগ্রো অটোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। গ্রিস, সার্বিয়া ও বুলগেরিয়াকেও এতে অংশ নিতে উৎসাহিত করে তারা। গ্রিকরা বিশ শতকের প্রথম দশকটা ব্যয় করেছিল সুশৃঙ্খল ও প্রশিক্ষিত সেনাবাহিনী গঠনের কাজে। যুদ্ধ শুরুর কয়েকদিনের মধ্যেই কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ বন্দর নগরী সালোনিকায় প্রবেশ করে গ্রিক সেনারা। সালোনিকা দখলের দৌড়ে বুলগেরিয়ানরা মাত্র কয়েক ঘণ্টা পিছিয়ে ছিল। কিছুদিন পরেই গ্রিসের রাজা প্রথম জর্জ শহরটিতে বিজয় মিছিল করেন। এর পরের বছরই

ইউরোপের পরাশক্তিরা এই শহরকে গ্রিসের অংশ হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু এর আগেই ঘটে এক মর্মান্তিক ঘটনা। রাজা জর্জ খুন হন, পেছন থেকে গুলি করে হত্যা করা হয় তাকে। লন্ডন টাইমসের শিরোনাম ছিল, "হেলেনদের রাজা নিহত। সালোনিকায় এক উন্মাদ ব্যক্তির গুলিতে মৃত্যু।" হত্যাকারী আলেকজান্দ্রোস স্কিনাসকে গ্রেফতার করা হয়ে। কিন্তু ছয় সপ্তাহ পর পুলিশ স্টেশনের জানালা থেকে পড়ে গিয়ে রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয় তার। ধারণা করা হয়, তিনি হয়তো সত্যিই পাগল ছিলেন!

১৯১৩ সালে শুরু হয় দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ। প্রথম বলকান যুদ্ধে সবাই একসঙ্গে তুরস্কের বিরুদ্ধে লড়েছিল; কিন্তু এবার সবাই মিলে যুদ্ধে নামে বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে। সালোনিকা দখলে ব্যর্থ হওয়ার পর গ্রিক ও সার্বিয়ান অবস্থানগুলোর ওপর হামলা চালায় ক্ষুব্ধ বুলগেরিয়ান বাহিনী। তবে রোমানিয়ার সৈন্যরা এসে যুদ্ধে যোগ দিলে খুব দ্রুতই পিছু হটতে বাধ্য হয় বুলগেরিয়ানরা। তারপর হামলা চালায় তুর্কিরাও। রোমানিয়ার বাহিনী যখন বুলগেরিয়ার রাজধানী সোফিয়ার কাছে পৌঁছে যায়, তখন বুলগেরিয়ানরা বুঝতে পারে যে তারা ভয়ংকর ভুল করে ফেলেছে। নতজানু হয়ে শান্তি চুক্তির জন্য আবেদন জানায় তারা। এই যুদ্ধে চারটি দেশের কাছেই ভূমি হারায় বুলগেরিয়া।

এই দুই যুদ্ধে গ্রিস অন্তত ৯,৫০০ সৈন্য হারায়। তবে তার ভূখণ্ড বৃদ্ধি পায় ৭০ শতাংশ এবং জনসংখ্যা ২০ লাখ বেড়ে গিয়ে ৪৮ লাখে পৌঁছায়। অবশেষে মেগালি আইডিয়া বাস্তবায়িত হতে শুরু করল। কিন্তু এরপরই আসে নতুন এক সন্ধিক্ষণ, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এই বিশ্বযুদ্ধ গ্রিসকে এক কঠিন দ্বিধার মধ্যে ফেলে দেয়—আপাতত শক্তি সংহত করবে, নাকি ঝুঁকি নিয়ে যুদ্ধে যোগ দিয়ে ভাগ্য পরীক্ষা করবে?

১৯১৪ সাল থেকে পরবর্তী তিন বছর নিরপেক্ষ থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল গ্রিস। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত দেশটির রাজনীতিতে মারাত্মক বিভাজন সৃষ্টি করে। দেশের অভ্যন্তরে একদল ছিল যুদ্ধ অংশগ্রহণের পক্ষে, আরেকদল ছিল বিপক্ষে। ফলে দেশ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত তারা মিত্রপক্ষে যোগ দেয় এবং দেশের সম্পূর্ণ সেনাবাহিনী পাঠানো হয় ম্যাসিডোনিয়ান ফ্রন্টে। সেখানে তারা যুক্ত হয় ব্রিটিশ, ফরাসি ও সার্বিয়ার সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে। এই সম্মিলিত আক্রমণে বুলগেরিয়ার প্রতিরক্ষা ভেঙে ফেলা সম্ভব হয়। এরই ফল হিসেবে প্যারিস শান্তি সম্মেলনে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় গ্রিস। এই সম্মেলনকে তারা কূটনৈতিক এক

পাটাতন হিসেবে ব্যবহার করে আরো কিছু ভূখণ্ড দাবি করার জন্য। এর মধ্যে অন্যতম ছিল তৎকালীন স্মার্না বন্দরনগরী অর্থাৎ বর্তমান তুরস্কের ইজমির। ১৯১৯ সালে গ্রিক বাহিনী স্মার্নায় অবতরণ করে। মিত্রশক্তির পক্ষ নেওয়ার পুরস্কার হিসেবে গ্রিসকে এই বন্দর উপহার দেওয়া হলেও আসলে এই শহর এবং আশেপাশের উপকূল ও অভ্যন্তরীণ এলাকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্রিক ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী বসবাস করত। তখন মিত্রবাহিনী কনস্টান্টিনোপল দখল করে রেখেছিল। ফলে গ্রিক জাতীয়তাবাদীরা ভাবতে শুরু করেছিল যে, স্মার্নাই হবে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য পুনর্জাগরণের প্রথম ধাপ।

অন্যদিকে, তুর্কি জাতীয়তাবাদীরা গ্রিক বাহিনীর আগমনকে তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা বলে মনে করে। গ্রিক বাহিনী তুরস্কের অভ্যন্তরে অনেক দূর পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। কিন্তু ১৯২২ সালের গ্রীষ্মে এসে ভয়াবহ পরাজয়ের সম্মুখীন হয় তারা। মুস্তাফা কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে তুর্কি সেনাবাহিনী গ্রিকদের পিছু হটিয়ে একদম উপকূলে গিয়ে দাঁড়াতে বাধ্য করে। শেষ পর্যন্ত কামালের সেনারা স্মার্নায় প্রবেশ করলে যুদ্ধ শেষ হয়। শহরটি আগুনে পুড়ে ছারখার হয়ে গিয়েছিল, নিহত হয়েছিল হাজার হাজার মানুষ। এই আগুন শুধু স্মার্না শহরকেই নয়, গ্রিকদের বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধারের স্বপ্নকেও ছাই করে দেয়।

১৯২৩ সালে 'লুজান চুক্তি'র মাধ্যমে রাষ্ট্র হিসেবে তুরস্কের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেয় মিত্রপক্ষ। তবে, তুরস্কে বসবাসরত গ্রিকরা রাজনীতিবিদদের সিদ্ধান্তের অপেক্ষা করেনি। হত্যাকাণ্ড ও গ্রাম জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনার মুখে পড়ে জন্মভূমি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয় অন্তত দশ লাখ গ্রিক। এই ঘটনার কয়েক মাস পরে অনুষ্ঠিত লুজান চুক্তির সময় গ্রিস ও তুরস্ক জানিয়ে দেয়, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। ফলে দুই দেশের মধ্যে জনবিনিময়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিন্তু তা বাস্তবায়ন করা হয় জোরপূর্বক। সব মিলিয়ে মোট ১৫ লাখ গ্রিক অর্থোডক্স তুরস্ক ছাড়তে বাধ্য হয়। আর এর বিপরীতে প্রায় ৪ লাখ মুসলিমকে গ্রিস থেকে তুরস্কে পাঠানো হয়েছিল তখন। বিংশ শতকের প্রথম দুই দশক জুড়ে ঘটতে থাকা এই সমস্ত দুঃখজনক ঘটনাই পরবর্তী সময়ের ইতিহাস নির্ধারিত করে দিয়েছে। এই ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব আজও গ্রিস ও তুরস্কের সম্পর্কের উত্তেজনার ভিত্তি হয়ে আছে।

এই বিশাল জনপ্রবাহ স্বাভাবিকভাবেই গ্রিসের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলে। থেসালোনিকা ছিল বলকান অঞ্চলের সবচেয়ে বড় ইহুদি জনবসতি।

কিন্তু শরণার্থীদের আগমনের কারণে চাকরির প্রতিযোগিতা বেড়ে যাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ে ইহুদিবিদ্বেষ। এর ফল হিসেবে অনেক ইহুদি জায়নবাদি আন্দোলনের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে, এবং অনেকে 'ফিলিস্তিন ম্যান্ডেট' এলাকায় (জেরুজালেমসহ তৎকালীন ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চল, পরবর্তীতে ইসরায়েল) চলে যায়। তুরস্ক থেকে আগত শরণার্থীদের একাংশকে রাখা হয় 'নতুন গ্রিস' নামে পরিচিত এলাকাগুলোতে। এসব এলাকা বিগত দশকে গ্রিসের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। এলাকাগুলো বাসযোগ্য ছিল না বললেই চলে। ফলে পরবর্তী বছরগুলোতে এই শরণার্থীদের অনেকেই কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি আকৃষ্ট হয়। আর এটিই পরোক্ষভাবে পরবর্তী সময়ের সামরিক অভ্যুত্থান এবং স্বৈরশাসনের উত্থানে ভূমিকা রাখে।

১৯২০ ও ১৯৩০-এর দশক জুড়ে গ্রিস ছিল বিভাজন, অস্থিরতা এবং সেনাশাসনের এক ধারাবাহিক ঘটনাপ্রবাহ। এই সময়কালে ফ্যাসিবাদের সঙ্গেও কিছুটা মাখামাখি শুরু হয় তাদের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে গ্রিস প্রবেশ করে স্বৈরশাসক জেনারেল ইওআনিস মেটাক্সাসের নেতৃত্বে। তিনি চেয়েছিলেন গ্রিস নিরপেক্ষ থাকুক। কিন্তু ইতালির দুইটি আগ্রাসন অভিযান রুখে দেওয়ার পর জার্মানদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয় গ্রিস। এরপর দেশটি জার্মান, ইতালীয় এবং বুলগেরীয় বাহিনীর নির্মম দখলের আওতাধীন হয়ে পড়ে। তবে গ্রিসের ভৌগোলিক পরিস্থিতি দখলদারদের জন্য আগের মতোই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। দেশটির অভ্যন্তরীণ পাহাড়ি অঞ্চলগুলো পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি দখলদার বাহিনী। এই পার্বত্য ভূখণ্ড কাজে লাগিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম হয় গ্রিক প্রতিরোধ বাহিনী। তবে, এই প্রতিরোধের মূল্য দিতে হয় সাধারণ মানুষকে। প্রতিশোধ নিতে আক্রমণ চালিয়ে ৭০,০০০ গ্রিক নাগরিককে হত্যা করা হয় এবং জ্বালিয়ে-পুড়িয়ে ধ্বংস করা হয় শত শত গ্রাম। এসব এলাকায় মজুদ সকল খাদ্যবস্তু লুট করে নিয়ে যায় অক্ষশক্তি। ফলে খাদ্য সংকটের কারণে অনাহারে মারা যায় আরো হাজার হাজার মানুষ। মারা যায় প্রায় ৬০,০০০ গ্রিক ইহুদি। তাদের বেশিরভাগকে পাঠানো হয়েছিল অসউশভিৎস মৃত্যুশিবিরে। থেসালোনিকির মাত্র ৯ শতাংশ ইহুদি এই যুদ্ধের প্রলয় থেকে বাঁচতে পারে।

১৯৪৪ সালের অক্টোবর মাসে জার্মানরা গ্রিস ছেড়ে চলে যায়। আর ব্রিটিশ সেনারা প্রবেশ করে এথেন্সে। শহরজুড়ে আনন্দ উল্লাসে ফেটে পড়ে মানুষ। আনন্দের সেই লহর কিন্তু বেশি দিন স্থায়ী হয়নি। ডিসেম্বর মাসে আবারও বন্দুকের

গর্জন শোনা যায় এথেন্স শহরে। এটি ছিল নতুন এক সংঘাতের সূচনা, গ্রিক গৃহযুদ্ধের আগমনী বার্তা। এই গৃহযুদ্ধের শিকড় ছিল বহু পুরোনো। ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় শুরু হওয়া রাজতন্ত্রপন্থী ও রাজতন্ত্রবিরোধীদের দ্বন্দ্ব থেকেই এর উৎপত্তি। জার্মানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময়ে দুইটি প্রধান প্রতিরোধ গোষ্ঠী কমিউনিস্ট EAM-ELAS এবং মধ্য-ডানপন্থী EDES মাঝেমধ্যে একসঙ্গে কাজ করেছিল, কিন্তু জার্মানদের চলে যাওয়ার পর তারা কেউই চায়নি যে গ্রিসের নিয়ন্ত্রণ অন্যপক্ষের হাতে যাক। এই দ্বন্দ্বই ধীরে ধীরে দেশকে পূর্ণাঙ্গ গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দেয়।

১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে রাজতন্ত্রপন্থীরা সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল। কিন্তু এই নির্বাচনে কমিউনিস্টরা অংশ নেয়নি এবং নির্বাচনের ফলাফল মানতে অস্বীকার করে তারা। এরপরই পুরোমাত্রায় গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ঘটনাপ্রবাহ ভিন্নরকম হলে হয়তো এই যুদ্ধে কমিউনিস্টরাই জয়ী হতো। কিন্তু, বলকান অঞ্চলে সোভিয়েত প্রভাব বৃদ্ধির ব্যাপারে পশ্চিমা দেশগুলোর শঙ্কা পুরো পরিস্থিতিকে পাল্টে দেয়। গ্রিসের রাষ্ট্রীয় বাহিনীকে অস্ত্র ও সহায়তা দিতে শুরু করে অ্যামেরিকানরা।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ সরকার উপলব্ধি করেছিল যে, তারা আর গ্রিসের প্রতিরক্ষায় জড়িত থাকতে পারবে না। ব্রিটেনের এই ভূমিকা তখন হাতে তুলে নেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। ওয়াশিংটন গ্রিক সেনাবাহিনীকে সরাসরি সমর্থন দিতে শুরু করে। অস্ত্র ও রসদ সরবরাহ করে তাদের আরো শক্তিশালী করে তোলে মার্কিনিরা। শক্তি বৃদ্ধি পাওয়ার পর সেনাবাহিনী গ্রিসের পাহাড়ি অঞ্চলে থাকা কমিউনিস্টদের ঘাঁটি একের পর এক দখল করতে থাকে। আগের শতাব্দীগুলোর মতোই এই সময়েও ঘটনার নিয়ন্ত্রণ চলে যায় এক বহিঃশক্তির হাতে। আর আগের মতোই মূল উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়া বা তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নকে ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ঢুকতে বাধা দেওয়া।

যুগোস্লাভিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক ছিন্ন করলে বিদ্রোহীদের জন্য আরো বড় এক আঘাত আসে। এরপর বেলগ্রেড বিদ্রোহীদের প্রতি তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয় এবং ১৯৪৯ সালে তাদের সীমান্ত বন্ধ করে দেয়। ফলে কমিউনিস্টদের পালিয়ে যাওয়ার পথও বন্ধ হয়ে যায়। অবশেষে ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে কমিউনিস্ট বাহিনীর অধিকাংশ আলবেনিয়ায় পালিয়ে যায় এবং শেষ পর্যন্ত অবসান ঘটে গৃহযুদ্ধের। এই রক্তক্ষয়ী সংঘাতে আনুমানিক

৫০,০০০ যোদ্ধা প্রাণ হারান, বাস্তুচ্যুত হন প্রায় পাঁচ লাখ মানুষ। গ্রিসের জনসংখ্যা তখন ৮ মিলিয়নেরও কম। স্বল্প জনসংখ্যার একটি দেশের জন্য এটি ছিল ভয়াবহ ক্ষতি।

দীর্ঘ গৃহযুদ্ধ এবং ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয়ের পর ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে গ্রিস প্রবেশ করে এক বিভক্ত সমাজ নিয়ে। গৃহযুদ্ধের রেশ তখনও কাটেনি। এদিকে গ্রিসের সামরিক বাহিনী নিজেকে শুধু দেশের রক্ষকই নয়, বরং রাজনৈতিক সংস্কৃতির অভিভাবক হিসেবেও ভাবতে শুরু করেছিল। গৃহযুদ্ধের পরবর্তী অভিঘাত ও অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় ক্রমেই পিছিয়ে পড়তে থাকে গ্রিস। এদিকে সামরিক বাহিনীর নজর তখন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলো দুর্বল করে নিজেদের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার দিকে। গ্রিক জনসাধারণ এই সময়ে পশ্চিম ইউরোপের সাংস্কৃতিক প্রভাবের সাথে আরো বেশি পরিচিত হয়ে উঠলেও রাজনৈতিকভাবে তারা রয়ে যায় শৃঙ্খলিত। ১৯৬৭ সালের মে মাসে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। মধ্যপন্থী বাম ঘরানার একটি দল সেই নির্বাচনে জয়ী হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা তৈরি করেছিল। দলটি চেয়েছিল সামরিক প্রভাব কমিয়ে আনতে। আর তাই নির্বাচন ঘনিয়ে আসতেই সেনাবাহিনীর কিছু অংশ উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। সে বছরের ২১শে এপ্রিল ভোরে এথেন্সের বাসিন্দাদের ঘুম ভাঙে ট্যাংকের গর্জন আর বিচ্ছিন্ন গোলাগুলির শব্দে। রেডিওতে রণ সঙ্গীত বাজতে দেখে অনেকেই অনুমান করে নিয়েছিল কী ঘটতে চলেছে। অবশেষে ঘোষণা এলো, "হেলেনিক সশস্ত্র বাহিনী দেশের শাসনভার গ্রহণ করছে।" সবচেয়ে বিস্ময়কর হলো, অভ্যুত্থানটি পরিচালনা করেছিলেন কিছু নিম্নপদস্থ কর্নেল।

'দ্য কর্নেলস' নামে পরিচিত এই সামরিক জান্তা প্রথমেই গুরুত্বপূর্ণ রাজনীতিবিদদের গ্রেফতার করে। বন্দি করা হয় সেনাপ্রধানকেও। তারপর আগে থেকে তৈরি করা ১০,০০০ নামের তালিকা অনুযায়ী বহু মানুষকে ধরে নিয়ে যায় তারা। তাদের মধ্যে অনেকেই নির্মম নির্যাতনের শিকার হন। ১৯৫২ সালেই গ্রিস ন্যাটো জোটে যোগ দিয়েছিল। দেশটি স্বৈরশাসনের অধীনে চলে গেলেও তার সদস্যপদ অটুট থাকে ঠিকই। এই ঘটনাটি প্রমাণ করে দেয়, পশ্চিমা শক্তিগুলোর কাছে গ্রিস কৌশলগতভাবে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এমনকি সামরিক স্বৈরশাসন মেনে নিতেও তাদের কোনো আপত্তি নেই।

অবশেষে ১৯৭৪ সালে গণতন্ত্র পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয় গ্রিসে। ১৯৮১ সালে গ্রিস যোগ দেয় 'ইউরোপিয়ান ইকোনমিক কমিউনিটিতে। এই সদস্যপদ গ্রিসের

অর্থনীতিকে উন্নত করতে সহায়তা করেছিল। তবে ভালো সড়কপথ না থাকায় যোগাযোগ ও বাণিজ্যে কিছু সমস্যা থেকেই যায়। তবুও গ্রিসের সামগ্রিক পরিস্থিতি উন্নতির দিকেই যাচ্ছিল। কিন্তু তারপর আসে একবিংশ শতাব্দী। আর ভূগোল ও রাজনীতি মিলিয়ে গ্রিসকে দাঁড় করায় ইউরোপীয় ইউনিয়নের সবচেয়ে বড় দুই সংকটের কেন্দ্রবিন্দুতে।

একবিংশ শতকের প্রথম দশকের স্থিতিশীল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং অলিম্পিক গেমসের সফল আয়োজন গ্রিসের অর্থনীতির কিছু গঠনগত দুর্বলতাকে আড়াল করে রেখেছিল। কিন্তু ২০০৮-০৯ সালের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট সবকিছু উন্মোচিত করে দেয়। তখন স্পষ্ট হয় যে, গ্রিসের বিভিন্ন সরকার বহু বছর ধরে ব্যাপক হারে ঋণ নিয়ে এসেছে এবং সেই ঋণের হিসাব বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে অর্থনীতিকে টেকসই দেখানোর চেষ্টা করেছে। অথচ বাস্তবে গ্রিসের অর্থনীতিতে সরকারি খাতের অংশ ছিল জিডিপির মাত্র ৪০ শতাংশ। ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দেওয়ার জন্য এথেন্স হিসাব জালিয়াতি করেছিল। আর ইউরোজোনের অন্যান্য সদস্য রাষ্ট্রগুলো ইচ্ছাকৃতভাবে সেই বিষয়ে চোখ বন্ধ রেখেছিল। কিন্তু সংকট আঘাত হানার পর গ্রিসের পুরো অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ে। দেশজুড়ে শুরু হয় ধর্মঘট ও দাঙ্গা। পুরো গ্রিসজুড়ে এমন সামাজিক বিপর্যয় নেমে আসে, যা আগের কয়েক দশকেও দেখা যায়নি। আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল আইএমএফ তখন এগিয়ে এসে গ্রিসকে ঋণ দিলেও শর্ত হিসেবে কঠোর ব্যয়সংকোচন নীতিমালা চাপিয়ে দেয়। এই সংকটের মধ্যে গ্রিক সমাজে পুরোনো এক আতঙ্ক আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে—বাইরের শক্তির কর্তৃত্বের শঙ্কা। একইসঙ্গে দেশের রাজনীতিতেও বড়সড় পরিবর্তন ঘটে। রাজনীতির মধ্যপন্থী ধারা সংকুচিত হয়ে পড়ে এবং চরমপন্থী ডান এবং বাম দলগুলো অভাবনীয় জনপ্রিয়তা লাভ করতে থাকে।

ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে গ্রিসের সম্পর্কও এই সময় থেকে টানাপোড়েনে জড়িয়ে পড়ে। শুধুই আর্থিক বিষয় নয়, ভূগোলও একটি বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়। গ্রিস যেহেতু ইউরোপীয় ইউনিয়নের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে অবস্থিত, তাই এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে ইউরোপে প্রবেশের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশদ্বারে পরিণত হয়েছে দেশটি। ২০০০-এর দশক থেকে অভিবাসী ও শরণার্থীদের ঢেউ গ্রিসে এসে পৌঁছাতে শুরু করে। এই শরণার্থীদের লক্ষ্য ছিল বলকান রুট ধরে ইউরোপের ধনী দেশগুলোতে ঢোকা। গ্রিসের অভিযোগ, ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও অন্যান্য সদস্য

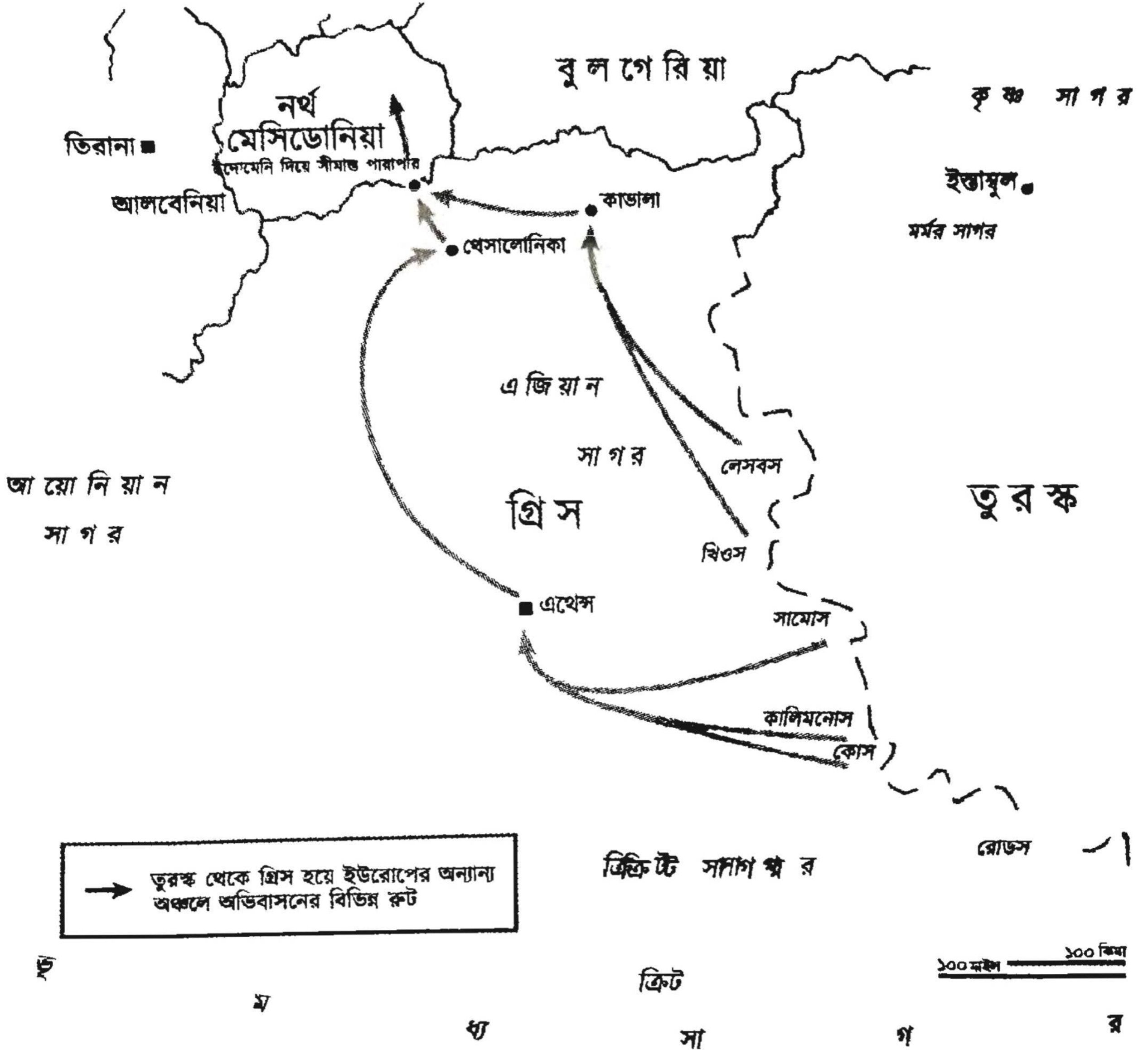
রাষ্ট্রগুলো এই সংকটে তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহায়তা দিচ্ছে না। তাদের মনে হতে থাকে, ইউরোপ গ্রিস এবং ইতালিকে তার সীমান্তরক্ষী হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছে, কিন্তু এর বিনিময়ে অর্থনৈতিক বা অবকাঠামোগত সহায়তা দিচ্ছে না।

গ্রিসের শেষ প্রান্তের দ্বীপগুলো তুরস্কের উপকূল থেকে খালি চোখে দেখা যায়। অনেকেই জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তুরস্ক ও গ্রিসের মাঝখানের বিক্ষুব্ধ এজিয়ান সাগর পার হয়ে গ্রিক দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছানোর চেষ্টা করে। সামোস দ্বীপ আনাতোলিয়ান উপকূল থেকে মাত্র দেড় কিলোমিটার দূরে। ২০১৫ সালে হাজার হাজার শরণার্থী ও অভিবাসনপ্রত্যাশীর কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয় এই দ্বীপটি। মাত্র ১৩ কিলোমিটার প্রশস্ত এবং ৪৪ কিলোমিটার দীর্ঘ এই ছোট্ট দ্বীপে এক বছরের মধ্যেই এক লাখেরও বেশি মানুষ এসে পৌঁছায়। ২০১৫ সালে শুধু গ্রিসেই ঢুকেছিল ৮ লাখ ৫০ হাজারের বেশি মানুষ। সেইসব মানুষের মধ্যে অনেক শিশুও ছিল। এজিয়ান সাগর পাড়ি দিতে গিয়ে প্রাণ হারায় শত শত মানুষ। এই সংকটের প্রতীক হয়ে উঠেছিল তিন বছরের শিশু আয়লান কুর্দির নিথর দেহের ছবি। তুরস্কের উপকূলে ভেসে আসা আয়লানের মৃতদেহের সেই হৃদয়বিদারক ছবি শরণার্থী সংকট নামক মানবিক বিপর্যয়ের এক জোরালো প্রতীকে পরিণত হয়।

এই ভয়াবহ পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার মতো অবস্থায় গ্রিস ছিল না। একদিকে অর্থনৈতিক বিপর্যয়, অন্যদিকে একসঙ্গে বিপুল মানুষের আগমন—গ্রিসের জন্য এটি ছিল এক অসম্ভব চাপ। দ্বীপগুলোতে জায়গা সংকুলান হচ্ছিল না, রাষ্ট্রের নিজস্ব প্রশাসনিক ও অবকাঠামোগত সক্ষমতা ছিল সীমিত, আর বাইরের বিশ্ব থেকেও কার্যকর কোনো সহায়তা আসেনি। ২০১৬ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এক ধরনের ঘুষ দেওয়ার মাধ্যমে তুরস্ককে এই অভিবাসন প্রবাহ ঠেকাতে উৎসাহিত করলে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে। বিনিময়ে তুরস্ককে দেওয়া হয় কয়েক বিলিয়ন ইউরো সহায়তা এবং তুর্কি নাগরিকদের জন্য ইউরোপ ভ্রমণে ভিসামুক্ত সুবিধার প্রতিশ্রুতি। এরপর থেকে সাগর পাড়ি দেওয়া মানুষের সংখ্যা নাটকীয়ভাবে কমে আসে।

কিন্তু হাজার হাজার মানুষ তখনও গ্রিসের দ্বীপগুলোর শরণার্থী শিবিরে বস্তির মতো অস্বাস্থ্যকর, দুর্বিষহ পরিবেশে বাস করছে। আগের তুলনায় কম হলেও প্রতিদিনই নতুন করে কিছু মানুষ ঢুকছে গ্রিসে। এই সংকটের সহজ কোনো সমাধান নেই। ইউরোপের উত্তর দিকের দেশগুলোতে অভিবাসনবিরোধী মনোভাব আরো শক্তিশালী হচ্ছে। ফলে এসব দেশ আর শরণার্থী নিতে আগ্রহী নয়। যুদ্ধ,

দারিদ্র্য, জলবায়ু পরিবর্তনের মতো সংকটের মূল কারণগুলো কাটিয়ে ওঠা যে দীর্ঘমেয়াদি একটি প্রক্রিয়া, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ফলে বাস্তবতা হলো, কিছু গ্রিক দ্বীপ কার্যত বন্দিশিবিরে পরিণত হয়েছে। এই অবস্থা সহজে পরিবর্তন হওয়ার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।



চিত্র: অভিবাসন প্রত্যাশীদের কাছে গ্রিস হলো ইউরোপের প্রধান প্রবেশপথ। বিশেষ করে যে সকল অভিবাসী তুরস্ক হয়ে আসে, তারা গ্রিসকেই মূল লক্ষ্য হিসেবে নেয়।

এই অভিবাসী সংকট গ্রিস ও তুরস্কের মধ্যে তীব্র উত্তেজনার অন্যতম কারণ হয়ে উঠেছে। গ্রিসের বিশ্বাস, তুরস্ক ইচ্ছাকৃতভাবে তার সীমান্ত খুলে দিয়ে অভিবাসী ও শরণার্থীদের প্রবেশে সহায়তা করে। ঠিক কখন এবং কোন সীমান্ত দিয়ে তারা আসবে, সেটা ঠিক করে আঙ্কারাই। আঙ্কারা অবশ্য এই অভিযোগ অস্বীকার করে আসছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেছে, তুরস্কের স্থানীয় প্রশাসন অনেক সময় অভিবাসন

প্রত্যাশীদের শহরাঞ্চল থেকে সীমান্তের দিকে পাঠিয়ে দেয়। এর ফলে বিভিন্ন সময়ে সীমান্ত এলাকায় বিশৃঙ্খল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় এবং বহু মানুষ সহিংসতার মধ্যে পড়ে যায়। একে তুরস্কের সরকার-সমর্থিত নীতি হিসেবে দেখানোর মতো সুস্পষ্ট প্রমাণ কখনো মেলেনি। তবে মানুষের এই চলাচলকে যে তুরস্ক কৌশলগতভাবে ব্যবহার করছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। এর মাধ্যমে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছে তারা। এর প্রতিক্রিয়ায় জল ও স্থলসীমান্তে অতিরিক্ত বাহিনী মোতায়েন করেছে গ্রিস, যেন এই অনুপ্রবেশ ঠেকানো যায়।

গ্রিস ও তুরস্কের মধ্যে বেশকিছু পুরোনো বিবাদ এই পরিস্থিতিকে আরো জটিল করে তুলেছে। গ্রিস ও তুরস্কের শত্রুতা বহু শতাব্দী পুরোনো। নানা ঐতিহাসিক ঘটনার মাধ্যমে জন্ম নিয়েছে এই বিরোধ। তুর্কি নাগরিকদের একটা কাল্পনিক বিশ্বাস আছে যে, প্রায় তিন হাজার বছর আগে ট্রয়ের যুদ্ধের সময় এই দুই জাতির প্রথম সংঘর্ষ ঘটেছিল। সেই যুদ্ধে বিখ্যাত 'ট্রোজান হর্স' কৌশলের মাধ্যমে জয় লাভ করে গ্রিকরা। যদিও ঐতিহাসিকভাবে এই যুদ্ধের বাস্তবতা বা ট্রয়ের লোকজন আদৌ আধুনিক তুর্কিদের পূর্বপুরুষ কি না, তা নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। তবে এই বিতর্কের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, দুই জাতির মধ্যে এক আদিম প্রতিদ্বন্দ্বিতার ধারণা, যা বহু শতাব্দী ধরে টিকে আছে।

ঐতিহাসিকভাবে আরো নিশ্চিত ঘটনা হচ্ছে পূর্ব তুরস্কের মানজিকার্তে ১০৭১ সালের যুদ্ধ। ঐ যুদ্ধকে সাধারণভাবে বাইজেন্টাইন গ্রিকদের সঙ্গে সেলজুক তুর্কিদের সংঘর্ষ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। তবে, প্রকৃতপক্ষে এই যুদ্ধে আরো অনেকগুলো পক্ষ ছিল। সেই যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল বাইজেন্টাইনরা। গ্রিসের ইতিহাসে একে কনস্টান্টিনোপলের পতনের সূচনারূপে দেখা হয়। গ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী, এরপর প্রায় ৪০০ বছর তারা তুর্কি শাসনের অধীনে ছিল। আধুনিক যুগে এসে গ্রিক স্বাধীনতা যুদ্ধ (১৮২১-১৮৩০) এবং ১৯১৯-২২ সালের গ্রিস-তুরস্ক যুদ্ধের স্মৃতি উভয় জাতির কাছেই এখনো তাজা এবং সংবেদনশীল ঘটনা।

এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির মাঝেই মঞ্চে প্রবেশ করেন তুরস্কের জাতীয়তাবাদী প্রেসিডেন্ট রেজেপ তাইয়িপ এরদোয়ান। তার ভাষা ও বক্তব্য তুর্কিদের মধ্যে বিদেশি-বিদ্বেষী মনোভাব উসকে দিচ্ছে। তুরস্কের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে প্রায়ই বিশেষ একটি মানচিত্র দেখানো হয়, যা গ্রিসের উদ্বেগ আরো বাড়িয়ে তুলেছে। এই মানচিত্রটি 'জাতীয় চুক্তি' নামে পরিচিত ১৯২০ সালের একটি তুর্কি দলিলের ভিত্তিতে তৈরি। সেই দলিলে বলা হয়েছিল, নবগঠিত তুরস্ক প্রজাতন্ত্র পরাজিত

অটোমান সাম্রাজ্যের কিছু অংশের জন্য লড়াই করবে। এই দাবির মধ্যে রয়েছে এজিয়ান সাগরের বেশ কয়েকটি গ্রিক দ্বীপ এবং গ্রিক মূল ভূখণ্ডের কিছু অংশ। ২০১৯ সালে ইস্তাম্বুলের ন্যাশনাল ডিফেন্স ইউনিভার্সিটি সফরের সময় এরদোয়ান এমন এক মানচিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তোলেন, যেখানে এজিয়ান সাগরের প্রায় অর্ধেকটাই তুরস্কের অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছিল। এই ধরনের প্রতীকী কার্যক্রম গ্রিসের জন্য ভয়াবহ বার্তা বহন করে।

গ্রিসের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের জাতীয় প্রতিরক্ষা মূলত মূল ভূখণ্ড ও এজিয়ান সাগরের ওপর নির্ভরশীল। এই সাগরের নিয়ন্ত্রণ হারালে মূল ভূখণ্ডের সরবরাহ পথ বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে পারে এবং দেশটি বহিরাগত আগ্রাসনের শিকার হতে পারে। গ্রিক ভূরাজনৈতিক বিশ্লেষক ইয়োয়ানিস মিচালেতোস এক সাক্ষাৎকারে এজিয়ান দ্বীপগুলোর সামরিক গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন, "এই দ্বীপগুলো ভাসমান বিমানঘাঁটির মতো। এগুলোতে বিমান, ক্ষেপণাস্ত্র এবং সেনাদল মোতায়েন করে অনাতোলিয়ার অভ্যন্তর এবং পূর্ব ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী দেশগুলো পর্যন্ত শক্তি প্রদর্শনের সক্ষমতা অর্জন করেছে গ্রিস। এই দ্বীপগুলো ছাড়া গ্রিস শুধুই একটুকরো পাহাড়ি বলকান উপদ্বীপ, যে দেশকে পূর্ব দিক থেকে সহজে রক্ষা করা যায় না, বরং সহজেই সেখানে শত্রুর নৌ অবতরণ ও অবরোধ সম্ভব। সংক্ষেপে বললে, এসব দ্বীপ হারালে তা গ্রিসের জন্য একরকম সামরিক আত্মহনন হয়ে দাঁড়াবে।"

এরদোয়ানের জাতীয়তাবাদী বক্তব্য হয়তো অনেকাংশেই তুরস্কের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির কৌশল। তার নিজস্ব ভোটব্যাংকের আবেগকে উস্কে দিতেই হয়তো আক্রমণাত্মক কথাবার্তা বলেন তিনি। কিন্তু যখন তিনি "ইতিহাসের ভুল ধারা শোধরানো এখন ন্যায়সঙ্গত প্রয়োজনীয়তা" জাতীয় উসকানিমূলক কথাবার্তা বলেন, তখন তা এথেন্সের সামরিক পরিকল্পকারীদের রাতের ঘুম কেড়ে নেয়। একই সঙ্গে গ্রিসের প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়ানো নিয়ে তাদের লবিংয়ের পক্ষে একটি শক্তিশালী অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায় এরদোয়ানের এই বক্তব্য।

গ্রিসের প্রতিরক্ষা খরচ দীর্ঘদিন ধরে দেশটির অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুর্দশার অন্যতম কারণ হয়ে আছে। বিশেষ করে ২০১০ সালের ঋণসঙ্কট শুরু হওয়ার পর থেকে আরো প্রবল হয়েছে এই বোঝা। সংকট মোকাবেলার লক্ষ্যে বাধ্য হয়েই প্রতিরক্ষা খাতে কাটছাঁট করেছে সরকার। ১৯৮১ সালে গ্রিসের সামরিক বাজেট ছিল দেশের মোট জিডিপির ৫.৭ শতাংশ। তুলনামূক বিচারে এই

বাজেট ছিল ন্যাটোর ইউরোপীয় সদস্য দেশগুলোর মধ্যে সর্বোচ্চ। তবে ২০০০ সালে সেটি কমে দাঁড়ায় ৩.৬ শতাংশে এবং ২০১৮ সাল নাগাদ নেমে আসে ২.৪ শতাংশে।

গ্রিসের বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১৫ মিলিয়ন। দেশটির বেশিরভাগ মানুষের বসবাস মূল ভূখণ্ড ও উপদ্বীপ অঞ্চলে। এর মধ্যে রাজধানী এথেন্স ও এর বৃহত্তর মহানগর এলাকাতে বাস করে দেশটির এক-তৃতীয়াংশ নাগরিক। তবে এজিয়ান সাগরের দ্বীপগুলোতেও লক্ষ লক্ষ মানুষের বসবাস। কেবল ক্রিট দ্বীপেই আছে ছয় লাখের বেশি মানুষ। রোডস এবং করফু উভয় দ্বীপেই প্রায় এক লাখ মানুষ রয়েছে । আরো অনেক ছোট ছোট দ্বীপে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা জনবসতি আছে গ্রিসের। এর মধ্যে রয়েছে একুশটি দ্বীপ, যেগুলোর প্রতিটিতে বাস করে ৫,০০০ থেকে ৫০,০০০ মানুষ। আরো আছে বত্রিশটি দ্বীপ, যেগুলোর জনসংখ্যা ৭৫০ থেকে ৫,০০০ এর মধ্যে। এমনকি পঁয়ত্রিশটি দ্বীপ রয়েছে যেগুলোতে এক শতেরও কম মানুষের বাস। কিন্তু প্রতিটি দ্বীপই গ্রিসের সার্বভৌম ভূখণ্ড, তাই প্রতিটি দ্বীপকেই রক্ষা করতে হয়।

এই ছয় হাজারের মতো দ্বীপ টহল দিতে গিয়ে গ্রিসের প্রয়োজন হয় একটি বিশাল নৌবাহিনী। ফলে খরচও হয় অনেক। কিন্তু যখন এর সঙ্গে যুক্ত হয় তুরস্কের সঙ্গে দীর্ঘ শত্রুতার ইতিহাস, তখন এই খরচ হয়ে ওঠে আকাশচুম্বী। বহু দশক ধরে একের পর এক গ্রিক সরকার তুরস্ককে হুমকি হিসেবে বিবেচনা করেছে। আর তারই প্রতিফলন ঘটেছে প্রতিরক্ষা খাতে। এর ফলে গ্রিসে রয়েছে এক আধুনিক নৌবাহিনী, বিশাল সেনাবাহিনী এবং অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমানে সমৃদ্ধ একটি বিমানবাহিনী। গ্রিসের বৈমানিকরা ইউরোপের অন্যতম দক্ষ পাইলট হিসেবে বিবেচিত হন। সেটি হওয়াই স্বাভাবিক। কারণ প্রায় প্রতিদিনই এজিয়ান সাগরের আকাশে তুর্কি পাইলটদের সঙ্গে 'মক ডগফাইট' বা ছদ্ম আকাশযুদ্ধে জড়াতে হয় তাদের। সেই অভিজ্ঞতাই তাদের দক্ষতাকে শাণিত করে রেখেছে।

স্থলভাগে গ্রিসের প্রতিরক্ষা কৌশলের অন্যতম প্রধান অংশ হলো অ্যাক্সিওস নদী উপত্যকার নিয়ন্ত্রণ যতটা সম্ভব ধরে রাখা। এই উপত্যকা প্রবাহিত হয়েছে উত্তর মেসিডোনিয়ার দিকে। শুধু গুরুত্বপূর্ণ কৃষিজমির জন্যই নয়, ইউরোপের সঙ্গে সংযোগকারী রুট হিসেবেও এই উপত্যকা অঞ্চল গুরুত্বপূর্ণ। তবে তুরস্কের সঙ্গে দীর্ঘদিনের বিরোধ ছাড়াও একবিংশ শতকের গ্রিসকে বেশ কিছু নতুন সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। এর মধ্যে একটি ছিল 'ম্যাসিডোনিয়া' নাম নিয়ে। গ্রিস

আশঙ্কা করেছিল, প্রতিবেশী রাষ্ট্র 'রিপাবলিক অব ম্যাসিডোনিয়া' গ্রিসের উত্তরাঞ্চলীয় প্রদেশ ম্যাসিডোনিয়ার ওপর দাবি জানাতে পারে। সেই আশঙ্কা থেকেই দেশটিকে স্বীকৃতি দিতে অসম্মতি জানায় গ্রিস। দেশটির বিরুদ্ধে তারা চাপিয়ে দেয় অর্থনৈতিক অবরোধ। এই বিরোধের অবসান ঘটে অনেক পরে। ২০১৮ সালে দেশটির নাম পাল্টে 'নর্থ ম্যাসিডোনিয়া' রাখার ব্যাপারে দুই দেশই সম্মত হয়। তবে, এই চুক্তি গ্রিসের ভেতরে ব্যাপক ক্ষোভের জন্ম দেয়। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকারীরা মনে করেন, গ্রিসের ইতিহাস ও পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশকে কোনোপ্রকার বিনিময় মূল্য ছাড়াই সমঝোতার মাধ্যমে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। তবে, এই চুক্তির ফলে উত্তর মেসিডোনিয়ার জন্য ন্যাটোতে যোগদানের পথ সুগম হয়।

গ্রিসের আরেকটি প্রধান প্রতিরক্ষামূলক লক্ষ্য হলো আইওনিয়ান সাগরে করফু দ্বীপের ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা। বর্তমান পরিস্থিতিতে করফুকে ঘিরে তেমন কোনো হুমকি নেই। প্রাচীনকালের মতো পশ্চিমদিকে সেনা পাঠিয়ে সামরিক প্রভাব বিস্তারের কোনো আগ্রহও নেই গ্রিসের। ফলে প্রতিরক্ষার মূল মনোযোগ রাখা হচ্ছে এজিয়ান সাগরের দিকে, বিশেষ করে রোডস ও ক্রিট দ্বীপপুঞ্জে। এছাড়া আরো পূর্ব দিকে রয়েছে ভূমধ্যসাগরের গুরুত্বপূর্ণ দ্বীপ সাইপ্রাস। এই দ্বীপকে আজও নিজেদের সুরক্ষাধীন এলাকা বলে মনে করে গ্রিস।

সাইপ্রাস অবস্থান করছে পূর্ব ভূমধ্যসাগরের একদম কেন্দ্রস্থলে। গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বাণিজ্যপথ এবং সাম্প্রতিক সময়ে আবিষ্কৃত গ্যাসক্ষেত্রগুলো রয়েছে এই অঞ্চলেই। ফলে, দ্বীপটির ওপর নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখা কেবল সামরিক কৌশলগত নয়, বরং অর্থনৈতিক ও জ্বালানি নিরাপত্তার জন্যও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। তিন শতকেরও বেশি সময় ধরে অটোমান শাসনের অধীনে থাকার পর ১৮৭৮ সালে ব্রিটিশরা প্রশাসনিকভাবে সাইপ্রাসের দায়িত্ব নেয় এবং ১৯১৪ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বীপটি দখল করে। ইতিহাসের প্রতিটি পরাশক্তির মতো ব্রিটেনও জানত, এজিয়ান সাগর ও লেভান্ত অঞ্চলের সামরিক ও বাণিজ্যিক গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য সাইপ্রাস কৌশলগতভাবে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। স্নায়ু যুদ্ধের সময় গুরুত্বপূর্ণ রাডার লিসেনিং পোস্ট হয়ে ওঠে এই দ্বীপটি। শুধু ভূমধ্যসাগরে নজরদারির জন্যই নয়, মধ্য এশিয়ায় সোভিয়েতদের পারমাণবিক পরীক্ষা পর্যবেক্ষণের জন্যও ব্যবহৃত হতো এই রাডার ঘাঁটি। ব্রিটেন এখনো সাইপ্রাসে

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিমানঘাঁটি ধরে রেখেছে। কয়েক হাজার ব্রিটিশ সৈন্যও মোতায়েন রয়েছে সেখানে।

১৯৬০ সালে স্বাধীনতা লাভের পর সাইপ্রাসে গ্রিক সংখ্যাগরিষ্ঠ ও তুর্কি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে জাতিগত সহিংসতা শুরু হয়। পরিস্থিতি সামলাতে শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠিয়ে দ্বীপটিকে বিভক্ত করে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি 'গ্রিন লাইন' স্থাপন করে জাতিসংঘ। পরবর্তী ঘটনাগুলো স্নায়ু যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে দেখলে ভালো বোঝা যাবে। সোভিয়েত ইউনিয়নও তখন ভূমধ্যসাগরে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালাচ্ছিল। ভূমধ্যসাগরে একটি সামরিক ঘাঁটি পেতে তুমুল আগ্রহী ছিল তারা। এই পরিস্থিতিতে ১৯৭৪ সালে এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সাইপ্রাসের প্রেসিডেন্ট আর্চবিশপ ম্যাকারিওসকে অপসারণ করে গ্রিসের সামরিক জান্তা। তাদের লক্ষ্য ছিল সাইপ্রাসকে গ্রিসের সঙ্গে একীভূত করা। যুক্তরাষ্ট্র এতে নীরব সমর্থন দিয়েছিল। কিন্তু ফল হয় উল্টো। এই অভ্যুত্থানকে অজুহাত বানিয়ে তুরস্ক সাইপ্রাসে সামরিক আগ্রাসন চালায়।

কয়েক সপ্তাহের তীব্র যুদ্ধের পর উত্তর উপকূলীয় শহর কিরেনিয়ায় তুরস্ক একটি শক্তিশালী অবস্থান তৈরি করে এবং সেটিকে তুর্কি-সাইপ্রায়ট অধ্যুষিত অঞ্চলের সঙ্গে সংযুক্ত করে। এর ফলে সাইপ্রাসের ৩৭% অংশের নিয়ন্ত্রণ চলে আসে তুরস্কের হাতে। তুরস্ক ন্যাটোর সদস্য হলেও সাইপ্রাস ন্যাটো সদস্য ছিল না। ফলে পশ্চিমা শক্তির পক্ষে সামরিক হস্তক্ষেপের খুব একটা সুযোগ নেই। এই সংকটের ফলেই গ্রিসের সামরিক সরকারের পতন ঘটে এবং আধুনিক গণতন্ত্রের সূচনা হয়। ১৯৮৩ সালে তুরস্কের অধিকৃত উত্তরাঞ্চল নিজেদেরকে 'টার্কিশ রিপাবলিক অব নর্দার্ন সাইপ্রাস' হিসেবে ঘোষণা করে। এই রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়েছে মাত্র দুইটি পক্ষ। তারা নিজেরা এবং তুরস্ক। জাতিসংঘ আজও এই অঞ্চলকে 'রিপাবলিক অব সাইপ্রাস'-এর অংশ হিসেবে দেখে এবং তুর্কি অধিকৃত ভূখণ্ড বলেই গণ্য করে।

এরই মধ্যে পূর্ব ভূমধ্যসাগরে বিশাল প্রাকৃতিক গ্যাসের মজুত আবিষ্কৃত হওয়ায় পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে ওঠে। মিশর, ইসরায়েল, সাইপ্রাস ও গ্রিসের উপকূলে একাধিক গ্যাসক্ষেত্র পাওয়া গেছে। কিন্তু তুরস্কের নিজের সমুদ্রসীমায় উল্লেখযোগ্য গ্যাস পাওয়া না যাওয়ায় সাইপ্রাস ও গ্রিসের জলসীমায় অনুসন্ধান শুরু করেছে তারা। একই সঙ্গে লিবিয়ার সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে সেখানেও অনুসন্ধান কার্যক্রম চালানোর পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে তুরস্ক। এদিকে, একটি

গ্যাসক্ষেত্রের মালিকানা নিয়ে ইসরায়েলের সঙ্গে লেবাননের সামুদ্রিক বিরোধ চলছে। আন্তর্জাতিক শক্তিশালী কোম্পানিগুলো যেমন BP, Total, Eni, Exxon Mobil নেমে পড়েছে গ্যাস অনুসন্ধান ও উত্তোলনের কাজে। আর রাশিয়া সবকিছু পর্যবেক্ষণ করছে সতর্ক দৃষ্টিতে। কারণ এই নতুন গ্যাসক্ষেত্রগুলোর কারণে ইউরোপে প্রাকৃতিক গ্যাস সরবরাহে তাদের একাধিপত্য এখন হুমকির মুখে।

একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে সাইপ্রাস তার উপকূলবর্তী জলসীমায় খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান ও খননের পূর্ণ অধিকার রাখে। কিন্তু এই অধিকারকে চ্যালেঞ্জ করে উত্তর সাইপ্রাসে একটি বড় নৌঘাঁটি গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেয় তুরস্ক। এই পরিকল্পনার খবরে নিকোশিয়া ও এথেন্সে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে। তবে জ্বালানিকেন্দ্রিক সঙ্কট তখনো পুরোপুরি মাথাচাড়া দিয়ে ওঠেনি।

২০১৯ সালের গ্রীষ্মে পরিস্থিতি আরো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। নৌবাহিনীর পাহারায় সাইপ্রাসের উত্তর উপকূলে উপস্থিত হয় একটি তুর্কি ড্রিলিং জাহাজ। আঙ্কারার দাবি ছিল, তারা যে এলাকায় খনন করছে সেটি টার্কিশ রিপাবলিক অব নর্দার্ন সাইপ্রাসের জলসীমা এবং তুরস্কের মহীসোপানের অংশ। অর্থাৎ তাদের ভাষ্যমতে তাদের আইনগত অধিকার আছে। এদিকে সাইপ্রাস তৎক্ষণাৎ ইউরোপীয় ইউনিয়নের শরণাপন্ন হয়। ইইউ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেয় যে তুরস্কের এই কর্মকাণ্ড অবৈধ এবং এর ফলে আঙ্কারার সঙ্গে তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। সাইপ্রাস, গ্রিস এবং মিশর একসঙ্গে ভূমধ্যসাগরে গ্যাস উত্তোলন প্রকল্পে কাজ করছে। এক যৌথ বিবৃতিতে তারা জানায় যে তুরস্ক আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করছে।

২০২০ সালের জুন মাসে তুরস্ক ঘোষণা দেয়, রোডস ও ক্রিটসহ বিভিন্ন দ্বীপের কাছাকাছি গ্যাস অনুসন্ধান শুরু করতে যাচ্ছে তারা। এই ঘোষণার পর গ্রিসে চরম প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এথেন্সে নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূতকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তলব করে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয় যে, গ্রিস এটিকে উসকানি হিসেবে দেখছে এবং প্রয়োজন হলে কঠোর প্রতিক্রিয়া জানাবে। এই আগ্রাসী অবস্থানের পেছনে তুরস্ক একটি চমকপ্রদ কৌশল গ্রহণ করেছিল। ২০১৯ সালের শেষদিকে লিবিয়ার সঙ্গে একটি সমুদ্রসীমা চুক্তি করে তারা। এই চুক্তিতে তারা ভূমধ্যসাগরের ওপর একটি এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোন তৈরি করে, যেটি তুরস্কের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূল থেকে লিবিয়ার উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত একটি করিডোর আকারে বিস্তৃত। কিন্তু এই জোনটি গ্রিসের আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ইকোনমিক জোনের ওপর দিয়ে

গেছে। এই চুক্তির মাধ্যমে তুরস্ক কার্যত একটি সম্ভাব্য গ্যাস পাইপলাইনের পথ আটকে দেয়। পাইপলাইনটি ইসরায়েল ও সাইপ্রাসের উপকূল থেকে ক্রীট হয়ে গ্রিসের মূল ভূখণ্ড পেরিয়ে ইউরোপের গ্যাস নেটওয়ার্কে যুক্ত হওয়ার কথা ছিল। এই চুক্তির মূল শর্ত ছিল ত্রিপোলির তৎকালীন সরকারকে ক্ষমতায় রাখা, যাদের সঙ্গে তুরস্ক এই চুক্তি করেছে। তাই লিবিয়ার গৃহযুদ্ধে তুরস্কের সামরিক হস্তক্ষেপ রাজনৈতিক এবং ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থে ছিল অনিবার্য। কারণ, ত্রিপোলির সরকার পতন মানেই সেই চুক্তি বাতিল হয়ে যাওয়া। জাতিসংঘের নির্ধারিত EEZ সীমারেখা স্বীকার করে না তুরস্ক। এর পরিবর্তে নিজেদের মহীসোপান সংক্রান্ত দাবির ওপর ভিত্তি করে জলসীমার অধিকার দাবি করে তারা। তুরস্কের মহীসোপান ভূমধ্যসাগরের গভীর পর্যন্ত প্রসারিত। অন্যদিকে, রাশিয়া এই পরিস্থিতিকে ভিন্নভাবে দেখে। মস্কো চায় না যে তুরস্ক বা পূর্ব ভূমধ্যসাগরের অন্য কোনো দেশ বড় পরিসরে গ্যাস উৎপাদন করুক। তারা চায় সবাইকে রাশিয়ার গ্যাস সরবরাহের ওপর নির্ভরশীল রাখতে।

ভূমধ্যসাগরে তুরস্কের চলমান কার্যক্রমের পেছনে রয়েছে দুইটি বড় উদ্দেশ্য। প্রথমত, অঞ্চলটির প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা, এবং দ্বিতীয়ত, সেই অজুহাতে গ্রিসকে কৌশলগতভাবে অস্থিরতা ও চাপের মধ্যে রাখা। এমন উত্তেজনাকর পরিস্থিতিতে এর আগেও যুদ্ধ বেধেছে। বর্তমান দ্বন্দ্ব অতীতের চেয়েও অনেক বড় পরিসরের। আগামী এক দশকে এই অঞ্চলে আরো অনেক 'ফ্ল্যাশপয়েন্ট' তৈরি হতে পারে। অর্থাৎ এমন সংকটময় মুহূর্ত আসতে পারে, যেখানে সামান্য ভুল বোঝাবুঝিতেই বড় ধরনের সংঘাত শুরু হয়ে যেতে পারে। এমনকি যদি দুই দেশ পূর্ণমাত্রার যুদ্ধ নাও চায়, তবুও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সামরিক দিক থেকে গ্রিস ও তুরস্ক প্রায় সমান শক্তিশালী। উভয় দেশই ন্যাটোর সদস্য। তবে গ্রিসের অর্থনৈতিক সংকটের (২০১০-২০১৮) সময়কালে তুরস্ক তাদের নৌবাহিনী আধুনিকীকরণে ব্যাপক বিনিয়োগ করেছে। কারণ তারা জানত যে ঋণ পুনর্গঠনের চাপে গ্রিসের হাতে তখন প্রতিযোগিতা করার মতো তহবিল নেই। তবে সাবমেরিনের দিক দিয়ে গ্রিক নৌবাহিনী এখনো এগিয়ে। অন্যদিকে সেই দুর্বলতাকে পুষিয়ে দিতে সাবমেরিনবিরোধী প্রযুক্তি ও কৌশলে বিনিয়োগ বাড়িয়েছে তুরস্ক। তবে সামরিক জনশক্তির বিচারে তুরস্ক অনেক এগিয়ে। এটি গ্রিসের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এই কারণেই গ্রিস এখনো

বাধ্যতামূলক সামরিক প্রশিক্ষণ বজায় রেখেছে, যেন তারা প্রয়োজনে অল্প সময়ের মধ্যে সেনাবাহিনীর জনবল বাড়াতে পারে।

তবে সামরিক শক্তির বাইরেও গ্রিসের একটি বিশেষ কূটনৈতিক সুবিধা রয়েছে। তাদের বেশকিছু আঞ্চলিক মিত্র রয়েছে, যা তুরস্কের নেই। ২০১৯ সালে গ্রিসের উদ্যোগে 'ইস্ট মেডিটারেনিয়ান গ্যাস ফোরাম' নামে মিশরভিত্তিক একটি জ্বালানি জোট গঠিত হয়। এই জোটের সদস্য দেশগুলো হলো ইতালি, ফ্রান্স, সাইপ্রাস, মিশর, জর্দান, ইসরায়েল ও ফিলিস্তিন। এটি শুধু জ্বালানিকেন্দ্রিক উদ্যোগ নয়, এর মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা উপাদানও রয়েছে। সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে নিয়মিতভাবে সমুদ্র নিরাপত্তা বিষয়ক সহযোগিতা ও যৌথ নৌ-মহড়া অনুষ্ঠিত হচ্ছে। গ্রিস-তুরস্ক যুদ্ধ শুরু হলে এই ফোরামের অন্য দেশগুলো হয়তো সরাসরি যুদ্ধে অংশ নেবে না। তবে তারা কাকে নীরবে সমর্থন করবে, তা নিয়ে খুব একটা সন্দেহ নেই। বিশেষ করে মিশর ও তুরস্ক আগে থেকেই বিভিন্ন আঞ্চলিক ইস্যুতে একে অপরের প্রতিপক্ষ। ফলে মিশরের অবস্থান একদম স্পষ্ট।

এই জটিল উত্তেজনা যেকোনো সময় বিস্ফোরিত পারে। অতীতে বহুবার এর প্রমাণ মিলেছে। ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তুরস্কের ফ্রিগেটগুলো যখন সাইপ্রাসের গ্যাসক্ষেত্রের কাছাকাছি অবস্থান নেয়, তখন ফ্রান্স তাদের বিমানবাহী রণতরী শার্ল দ্য গলকে পাঠিয়েছিল 'নিরবভাবে পর্যবেক্ষণ' করতে। বিষয়টি মজার। কারণ ফ্রান্স ও তুরস্ক উভয়েই ন্যাটোর সদস্য। এই ঘটনাটি ফ্রান্স-তুরস্ক সম্পর্কের দীর্ঘস্থায়ী শীতলতাকে আবার প্রকাশ্য নিয়ে আসে। ১৯৭৪ সালে তুরস্ক যখন সাইপ্রাসে সেনা অভিযান চালিয়েছিল, তখন ফরাসি প্রেসিডেন্ট জিস্কার দ্য'এস্তাঁ কড়া ভাষায় এর নিন্দা জানান। আর্মেনীয় গণহত্যা নিয়ে ফ্রান্সের সাম্প্রতিক অবস্থান এই দ্বন্দ্বকে আরো তীব্র করে তুলেছে। ফ্রান্স ২০১৯ সালে প্রথমবারের মতো আনুষ্ঠানিকভাবে 'আর্মেনীয় গণহত্যা স্মরণ দিবস' ঘোষণা করে, যা তুরস্কের জন্য স্পষ্টতই অস্বস্তিকর। কারণ, তুরস্ক এই গণহত্যাকে স্বীকার করে না।

বর্তমানে তুরস্ক ও গ্রিসের দ্বন্দ্ব শুধু দুই দেশের মধ্যকার ইস্যু নয়। এই দ্বন্দ্ব এখন বৃহত্তর আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির এক উত্তাল অক্ষ। শক্তি, সম্পদ ও কূটনীতি—এই তিনের দ্বন্দ্বে ভূমধ্যসাগরের পূর্বাঞ্চল বর্তমানে এক অনিশ্চিত আগ্নেয়গিরিতে পরিণত হয়েছে। যেকোনো সময় ছড়িয়ে পড়তে পারে এই চাপা আগুন। ২০২০ সালের জুন মাসে লিবিয়া উপকূলে তুরস্ক ও ফ্রান্সের নৌবাহিনীর মধ্যে এক উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। ফ্রান্সের অভিযোগ, তুরস্কের

নৌবাহিনী তাদের একটি ফ্রিগেট লক্ষ্য করে অস্ত্র-নির্দেশনা ব্যবস্থা চালু করেছিল। ঘটনাটি ঘটে এমন এক সময়, যখন লিবিয়ার ত্রিপোলিভিত্তিক মিত্র সরকারকে অবৈধ অস্ত্রবাহী জাহাজ পাঠানোর চেষ্টা করছিল তুরস্ক। ত্রিপোলির এই সরকারের সঙ্গেই ২০১৯ সালে তুরস্ক বিতর্কিত ইইজেড চুক্তিটি করেছিল। এই ধরনের সংকটপূর্ণ মুহূর্তে খুব সহজেই ভুল বোঝাবুঝি ঘটতে পারে, এমনকি তা গোলাগুলিতেও গড়াতে পারে। তবে তার মানে এই নয় যে সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। কিন্তু এমন ঘটনাই প্রমাণ করে দেয়, ন্যাটো সদস্যদের নিজেদের মধ্যেও বর্তমানে কতটা চাপা উত্তেজনা কাজ করছে। আর তাতে কতটা ঝুঁকি রয়েছে।

ন্যাটোর গঠনতন্ত্রে একটি বিখ্যাত অনুচ্ছেদ আছে, "এক সদস্যের ওপর আক্রমণ মানেই অন্য সব সদস্যের উপর আক্রমণ।" এই বিধান মূলত বাইরের শত্রুর কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় দেখা যাচ্ছে, যদি কোনো ন্যাটো সদস্য আরেক সদস্যের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়, তাহলে সেই অনুচ্ছেদ কার্যকর হয় না। এটিই এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় সমস্যার জায়গা। ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাক্রোঁ তার একটি বিখ্যাত মন্তব্য সমর্থন করতে এই ঘটনাকে অন্যতম প্রমাণ হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন যে, ন্যাটো এখন 'কার্যত মৃত' একটি সংগঠন। তবে এই মন্তব্য শুধু বাস্তব পরিস্থিতির মূল্যায়ন নয়, বরং এটি মূলত ইউরোপের জন্য একটি স্বাধীন সামরিক শক্তি গঠনের রাজনৈতিক কৌশল। মাক্রোঁ চান একটি শক্তিশালী ইউরোপীয় সামরিক বাহিনী গড়ে তুলতে, যা ন্যাটোর ওপর নির্ভরশীল না হয়ে নিজস্ব প্রতিরক্ষা নীতিতে চলতে সক্ষম হবে। কিন্তু এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা খুব সহজ নয়। জার্মানি এখনো দ্বিধাগ্রস্ত। কারণ তারা চায় না যে ইউরোপীয় প্রতিরক্ষা নীতির ভার এককভাবে ফ্রান্সের হাতে চলে যাক। ব্রিটেন ইতোমধ্যে ইইউ থেকে বেরিয়ে গেছে। ফলে তাদের সমর্থন নেই। হোয়াইট হাউসে বসে আছেন একজন আটলান্টিকপন্থী প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন, যিনি ইউরোপকে ন্যাটোর বলয়ের মধ্যে রাখার পক্ষপাতী।

তবে তুরস্ক এখন ন্যাটোর ভেতর একটি আধা বিচ্ছিন্ন সদস্যে পরিণত হয়েছে। বিগত এক দশকে গ্রিসের সরকারগুলো সেই পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেছে গভীর আগ্রহ নিয়ে। কারণ, তাদের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রটি যদি ধীরে ধীরে ন্যাটো থেকে দূরে সরে যায়, তাহলে সেটি গ্রিসের জন্য বড় কৌশলগত সুযোগ। গ্রিস এখন বুঝে গেছে, যুক্তরাষ্ট্র নতুন কোনো আঞ্চলিক মিত্র খুঁজছে। তারা এমন একটি

দেশকে চায়, যাকে তারা তুরস্কের তুলনায় বেশি নির্ভরযোগ্য মনে করতে পারে। এই সুযোগটাই কাজে লাগাতে চায় গ্রিস। তারা চায়, এজিয়ান সাগর অঞ্চলে তুরস্কের বদলে তারাই হয়ে উঠুক ন্যাটোর প্রধান ভরসার জায়গা।

দশকের পর দশক ধরে জনমত জরিপে দেখা গেছে যে, গ্রিসের জনগণের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি একধরনের শীতল মনোভাব রয়েছে। তবে সাম্প্রতিক সময়ে সেই মনোভাব পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে। বিশেষ করে সরকারি পর্যায়ে এক ধরনের ঐকমত্য তৈরি হয়েছে। গ্রিসের সরকার কূটনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে অ্যামেরিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়ে থাকতে চায়, যেন তারা 'কমরেড ইন আর্মস' হয়ে উঠতে পারে। ক্রিট দ্বীপের সৌদা বে'তে ইতোমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ নৌঘাঁটি রয়েছে। এটি অত্যন্ত কৌশলগত একটি অবস্থান। ২০২০ সালে দুই দেশের মধ্যে একটা প্রতিরক্ষা চুক্তি হালনাগাদ করা হয়। নতুন চুক্তিবলে প্রশিক্ষণ, জ্বালানি সরবরাহ এবং জরুরি পরিস্থিতিতে গ্রিসের সামরিক ঘাঁটিগুলো ব্যবহার করার অনুমতি পায় মার্কিন বাহিনী। এই চুক্তিতে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ সংযোজন ছিল গ্রিসের উত্তরাঞ্চলের বন্দর আলেক্সান্দ্রুপোলিসে অবাধ প্রবেশাধিকার। এই বন্দরটি মর্মর সাগরে প্রবেশপথের ঠিক মুখে অবস্থিত, যেখান থেকে সরাসরি কৃষ্ণসাগরে পৌঁছানো যায়। যুক্তরাষ্ট্রের এই অবস্থান কেবল বর্তমান কৌশলগত প্রয়োজনে নয়, বরং এক ঐতিহাসিক ভূরাজনৈতিক নীতির ধারাবাহিকতা। এই নীতির মূল কথা হচ্ছে রাশিয়াকে গ্রিস থেকে দূরে রাখা। বর্তমানে কৃষ্ণসাগর উপকূলে ক্রিমিয়ার সেভাস্তপোলে রাশিয়ার প্রধান নৌঘাঁটি অবস্থিত। এখান থেকে বসফরাস প্রণালি পেরিয়ে মর্মর সাগর, আর সেখান থেকে এজিয়ান হয়ে ভূমধ্যসাগরে পৌঁছাতে পারে রাশিয়া। আগে ব্রিটিশরা যেমন চাইতো না, তেমনি মার্কিনিরাও চায় না যে রাশিয়া এই পথ ব্যবহার করে বলকান অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করুক। রাশিয়ানরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এই প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। এই কারণেই সাইপ্রাস বর্তমানে এত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আর এই কারণেই যুক্তরাজ্য এখনো সেখানকার সামরিক ঘাঁটি ছাড়তে চায় না। মস্কো বারবার সাইপ্রাসকে 'বিদেশি সৈন্যমুক্ত অঞ্চল' করার দাবি তোলে। কারণ তারা জানে, এই দাবি পূরণ হলে পূর্ব ভূমধ্যসাগরে ন্যাটোর সামরিক উপস্থিতি দুর্বল হয়ে যাবে। তখন পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার উপকূলীয় অঞ্চলে ন্যাটোর প্রভাব হ্রাস পাবে।

এমন এক অবস্থায় এথেন্স বর্তমানে নিজেকে ওয়াশিংটনের অপরিহার্য মিত্র হিসেবে গড়ে তুলছে। অ্যামেরিকার লক্ষ্য এখানে দ্বিমুখী। একদিকে তারা গ্রিসে নিজেদের জন্য সামরিক প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করছে, অন্যদিকে তুরস্ককে চাপে রাখছে যেন তারা আবার ন্যাটো জোটে দায়িত্বশীল অবস্থানে ফিরে আসে। তুরস্কের ইনজিরলিক বিমানঘাঁটি ব্যবহারের অধিকার অ্যামেরিকা এখনো বজায় রাখতে চায়। কারণ এই ঘাঁটি সিরিয়া সীমান্তের খুব কাছাকাছি অবস্থিত হওয়ায় মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে সামরিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ফলে, গ্রিসের প্রতি এই ঘনিষ্ঠতা এক ধরনের কৌশলগত বাজি, যার মাধ্যমে তুরস্ককেও নিজেদের পক্ষে ধরে রাখার চেষ্টা করছে তারা।

অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে গ্রিস অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও ভৌগোলিক অবস্থান ও ইতিহাসের কারণে দেশটি এখনো প্রতিরক্ষা খাতে সমমাপের অর্থনীতির অন্যান্য দেশের চেয়ে অনেক বেশি ব্যয় করে যাচ্ছে। এটি ওয়াশিংটনের কানে ভালোই শোনায়। বহুদিন ধরেই আমেরিকার বিভিন্ন মহল থেকে দাবি উঠছে, ন্যাটোর সদস্য দেশগুলোর সামরিক ব্যয় আরো বাড়ানো উচিত। এতে জোট রক্ষার পুরো দায়িত্ব আর শুধু আমেরিকার রক্ত ও অর্থের ওপর নির্ভর করবে না। ভবিষ্যতে যদি তুরস্কের সঙ্গে পশ্চিমা বিশ্বের সম্পর্ক পুরোপুরি খারাপ হয়ে যায় এবং আঙ্কারা ন্যাটো ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে গ্রিস হয়ে উঠবে ন্যাটোর সর্বদক্ষিণের প্রতিরক্ষা কবচ। অন্যদিকে, রাশিয়াও সুযোগ নিতে ছাড়ছে না। তারা একদিকে যেমন তুরস্কের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলছে, অন্যদিকে গ্রিক নেতাদের দিকেও হাত বাড়িয়ে রাখছে। প্রেসিডেন্ট পুতিন জানেন, গ্রিসকে নিজের দিকে টেনে আনা কঠিন। তবুও ভূমধ্যসাগরে একটি রাশিয়ান নৌঘাঁটি বসাতে পারলে তা রাশিয়ার কৌশলগত স্বপ্ন পূরণে সহায়ক হবে। সেক্ষেত্রে এই ঘাঁটি হবে বর্তমানে সিরিয়ায় অবস্থিত তাদের ছোট ঘাঁটিটির পরিপূরক।

বর্তমান গ্রিস আর আগেকার মতো 'ব্রিটেনপন্থী', 'রাশিয়াপন্থী' বা 'অ্যামেরিকাপন্থী' হতে চায় না। গ্রিস এখন শুধু গ্রিসপন্থী থাকতে চায়। কিন্তু ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা বলছে, দেশটি আবারও বিদেশি শক্তিগুলোর কৌশলগত আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে। যেকোনো সংকটকালে গ্রিস একটি বিকল্প প্রতিরক্ষা ঘাঁটি হতে পারে। বিশেষ করে কোনো শত্রুপক্ষ যদি কৃষ্ণসাগর থেকে ভূমধ্যসাগরে প্রবেশের চেষ্টা করে, সেক্ষেত্রে গ্রিস একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত প্রতিরক্ষাবিন্দু হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারে। তাছাড়া, ইউরোপের অভিবাসন

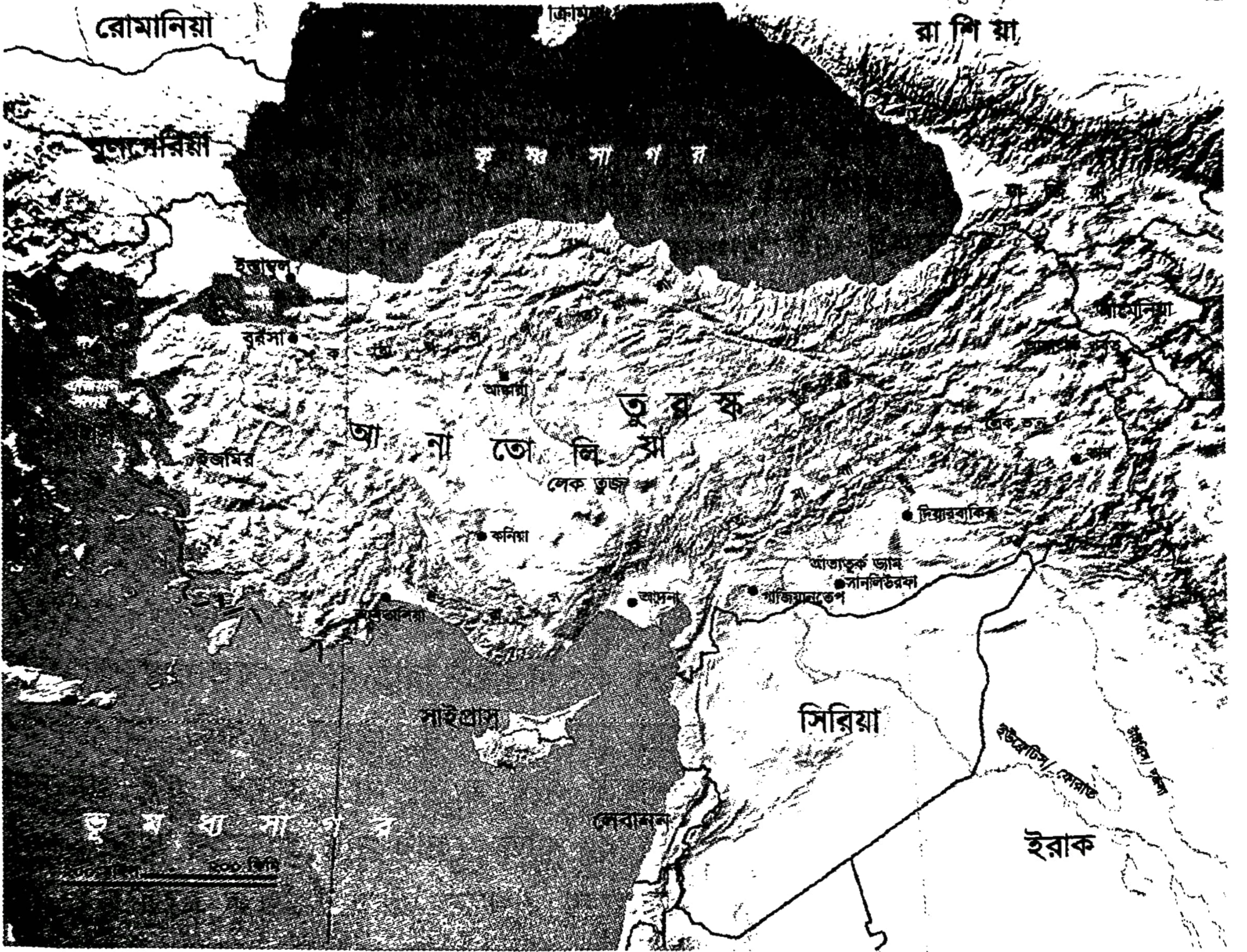
সংকটের একেবারে সম্মুখসারিতে রয়েছে দেশটি। এশিয়া ও আফ্রিকা থেকে আসা অভিবাসীরা প্রথমেই পা রাখে গ্রিসে। পাশাপাশি, পূর্ব ভূমধ্যসাগরের গ্যাস পাইপলাইনগুলো ইউরোপে টানতে চাইলে গ্রিস হয়ে উঠবে অনিবার্য ট্রানজিট রুট।

রাশিয়ার সঙ্গে পশ্চিমা বিশ্বের সম্পর্ক, অভিবাসী সংকট এবং তুরস্কের সঙ্গে দীর্ঘকালীন বৈরিতা—এই তিনটি বিষয় ভবিষ্যতে ইউরোপের নিরাপত্তা-নীতিতে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে থাকবে। পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের কোনো লক্ষণ রাশিয়া দেখাচ্ছে না। গ্রিসকেও আগামী বহু বছর ধরে অভিবাসী ও শরণার্থী শিবির হিসেবেই কাজ চালিয়ে যেতে হবে। আর তুরস্কের সঙ্গে উত্তেজনা কমারও কোনো সম্ভাবনা নেই। ফলে, সামরিক উত্তেজনা ও সংঘাতের ঝুঁকি দীর্ঘ সময় ধরে রয়ে যাবে গ্রিসে।

দেশের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির দিক থেকে দেখলে গ্রিসের প্রাচীন ভৌগোলিক বিভাজন এখনো আগের মতোই আছে। রাজধানী এথেন্সের প্রতি দেশের বিভিন্ন অঞ্চল এখনো সন্দেহপ্রবণ। দেশটির বেশকিছু অভ্যন্তরীণ অঞ্চল এখনো রাষ্ট্রের নিয়মিত কার্যক্রম থেকে বিচ্ছিন্ন। তবুও সব গ্রিক নাগরিক এখনো সমুদ্র থেকে ১০০ কিলোমিটারের মধ্যেই বাস করে। তাদের জীবনধারা, বাণিজ্য ও ব্যবসায়িক উদ্যোগ সবকিছুতেই সমুদ্রের প্রভাব এখনো গভীর। কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে গ্রিকদের উদ্বেগ আজও প্রায় আগের মতোই রয়ে গেছে। এককালে তারা অলিম্পাস পর্বতে জিউস, অ্যাপোলো আর অ্যাফ্রোদিতির দিকে তাকিয়ে থাকত। দেবতারা চলে গেছেন, সাম্রাজ্য উঠে এসেছে, আবার পতন হয়েছে, মিত্রতার মানচিত্র পাল্টেছে, তবু পর্বতমালা ও সাগর গ্রিকদের জন্য অপরিবর্তনীয়ই রয়ে গেছে।

অধ্যায় ৬

তুরস্ক



"স্বকীয়তাই আমাদের আত্মপরিচয়"

- মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক

তুর্কি জনগোষ্ঠীর নাম শোনার পর মনে হতে পারে তুর্কিরা বুঝি তুরস্কেরই আদি বাসিন্দা। দেশটির 'Türkiye' নামের অর্থও 'তুর্কিদের দেশ'। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা এই অঞ্চলে এসেছিল বহু দূর থেকে। তুর্কি জনগোষ্ঠীর উদ্ভব আসলে মঙ্গোলিয়ার আলতাই পর্বতমালার পূর্বদিকে! সেখান থেকে আজকের তুরস্ক নামক ভূখণ্ডে তারা এসে পৌঁছেছে দীর্ঘ এক অভিযাত্রার মধ্য দিয়ে। আর এই জায়গাটিকে শেষমেশ 'তুর্কিয়ে' নামে পরিচিত করাও ছিল একটা দীর্ঘ যাত্রা।

প্রথমে তাদের অতিক্রম করতে হয়েছিল বিশাল আনাতোলিয়া মালভূমি। তারপর তারা এসে পৌঁছায় বর্তমান তুরস্কের পশ্চিম প্রান্তে। পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও মর্মর সাগর এবং এর পূর্ব-পশ্চিম উপকূলীয় নিম্নভূমি বর্তমান তুরস্ক রাষ্ট্রের প্রাণকেন্দ্র। এই অঞ্চলে হয়তো বিস্তীর্ণ সমতলভূমি নেই, নেই সহজে মালপত্র পরিবহণ করার মতো দীর্ঘ নদীপথও, তবে এখানে আছে উর্বর জমি। আছে পর্যাপ্ত সুপেয় পানি। এই প্রাকৃতিক সম্পদটি বড় একটি জনগোষ্ঠীর জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। তাছাড়াও মর্মর সাগর এমন এক জলরাশি, যা অনেকটাই হ্রদের মতো। সহজেই এই সাগরের এপার-ওপার যাতায়াত করা যায়। ফলে বাণিজ্যের জন্য খুবই উপযুক্ত এই সাগর। দেশটির আরেকটি বড় সুবিধা হলো তাদের রাজধানী ও প্রধান নগরী ইস্তাম্বুল জলপথ থেকে আক্রমণের মুখে প্রতিরোধযোগ্য। মর্মর সাগরের পশ্চিম প্রান্তে রয়েছে দার্দানেলিস প্রণালি। এই প্রণালি যুক্ত হয়েছে এজিয়ান সাগরের সঙ্গে। পূর্ব প্রান্তে রয়েছে বসফরাস প্রণালি, যার সবচেয়ে সরু অংশ মাত্র এক কিলোমিটার প্রশস্ত। এমন দুইটি সরু জলপথের নিয়ন্ত্রণ যেকোনো রাষ্ট্রের জন্যই বিশাল এক প্রতিরক্ষা সুবিধা।

শুধু এইটুকু অঞ্চল নিয়েই চাইলে একটা ছোট রাষ্ট্র গড়া যেত। ধরুন তার নাম দেওয়া হলো 'মারমারিয়া'। কিন্তু সমস্যা হলো, এমন একটা আকর্ষণীয় ভৌগোলিক অবস্থানের স্থায়িত্ব খুব একটা দীর্ঘ হতো না। কারণ এই ধরনের গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক স্থান সবসময় বাইরের শক্তিগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণমুখী বাণিজ্যপথগুলো এখানে এসে মিলিত হয়েছে। এই পথগুলো বাণিজ্য করার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হওয়ায়, চাইলে এই পথগুলোর ওপর সহজেই শুল্ক আরোপ করা যায়। গ্রিকরা যখন এই অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করত, তারাও বিষয়টিকে এভাবেই দেখেছিল। একইভাবে দেখেছিল রোমানরা, তারপর বাইজেন্টাইনরা এবং পরবর্তীতে অটোমান বা উসমানি সাম্রাজ্যের মাধ্যমে তুর্কিরাও।

এই কৌশলগত ভূখণ্ডকে কাজে লাগিয়ে উসমানিরা নিজেদের শক্তি বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছিল। মধ্যপ্রাচ্য, আফ্রিকা ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ জুড়ে শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল তারা। এরপর সেই সাম্রাজ্য সংকুচিত হয়ে উত্তরসূরিদের হাতে এসেছে এক খর্বকায় রাষ্ট্র হিসেবে। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিমের সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে আধুনিক তুরস্ক আবারও বিশ্বমঞ্চে নিজের ভূমিকা নির্ধারণ করছে। বর্তমানে এই দেশটি ইউরোপে প্রবেশ করতে চাওয়া অভিবাসীদের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ প্রবেশদ্বার

নিয়ন্ত্রণ করছে। আর সেই দ্বাররক্ষীর ভূমিকাই তাকে দিয়েছে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ক্ষমতা। তুরস্ক দিন দিন জড়িয়ে পড়ছে আরব বিশ্বের নানা সংঘাতে। বিশেষ করে সিরিয়া ও লিবিয়ায় তাদের স্বার্থ আঞ্চলিক অন্যান্য শক্তিগুলোর সঙ্গে সংঘর্ষের পথে নিয়ে যাচ্ছে। তুরস্কের বর্তমান নীতিতে এক ধরনের 'নব্য-উসমানিবাদ' ক্রমেই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। এটি একটি আগ্রাসী মানসিকতা। এর লক্ষ্য চারদিকে প্রভাব বিস্তার করা। আশেপাশের অঞ্চলের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা। আর আধুনিক তুরস্কের এই নীতির গভীর প্রভাব পড়ছে ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য এবং মধ্য এশিয়ায়।

পশ্চিম থেকে পূর্ব পর্যন্ত তুরস্কের দৈর্ঘ্য প্রায় ১,৬০০ কিলোমিটার। উত্তর থেকে দক্ষিণে দেশটির প্রস্থ ৫০০ থেকে ৮০০ কিলোমিটারের মধ্যে। দেশটির মোট ভূখণ্ডের প্রায় ৯৭ শতাংশই অবস্থিত এশিয়ায়, যার বৃহত্তর অংশই আনাতোলিয়া উপদ্বীপে বিস্তৃত। বর্তমান তুরস্কের সঙ্গে আটটি দেশের সীমান্ত আছে—গ্রিস, বুলগেরিয়া, জর্জিয়া, আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, ইরান, ইরাক ও সিরিয়া। পার্শ্ববর্তী এসব অঞ্চলই প্রাথমিকভাবে উসমানিদের চোখে সম্ভাবনাময় সাম্রাজ্য গড়ার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল।

যাযাবর তুর্কি গোত্রগুলো স্তেপ অঞ্চলের পূর্বদিক অর্থাৎ বর্তমান মঙ্গোলিয়া থেকে যাত্রা শুরু করে নবম শতাব্দীতে। প্রথমে তারা অতিক্রম করে আলতাই পর্বতমালা, তারপর পাড়ি দেয় পশ্চিম স্তেপ অঞ্চল অর্থাৎ বর্তমান কাজাখস্তান। এরপর মধ্য এশিয়ায় বাঁক নিয়ে তারা পৌঁছে যায় কাস্পিয়ান সাগরের তীরে। সেখানে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় তাদের। এরই মধ্যে তারা আসে পারস্য অঞ্চলে ইসলাম ধর্মের সংস্পর্শে। প্রাচীন পৌত্তলিক বিশ্বাস পরিত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণ করে তারা। একাদশ শতকের দিকে তারা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের পূর্ব সীমান্তে হাজির হয় এবং আনাতোলিয়ার ভেতর ঢুকে লুটপাট শুরু করে। ১০৩৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় তুর্কি সেলজুক রাজ্য। এই রাজ্যের অবস্থান ছিল বাইজেন্টাইন ভূখণ্ডের সীমানা ঘেঁষে, বর্তমান আর্মেনিয়া অঞ্চলে। এরপর সেলজুক সুলতানের নজর পড়ে জর্জিয়ার দিকে, যা বাইজেন্টাইন সম্রাট চতুর্থ রোমানাস ডায়োজেনেসের জন্য চরম উদ্বেগের বিষয় হয়ে ওঠে। কিছু একটা করতেই হতো...

১০৭১ সালে মানজিকার্ত অঞ্চলে বাইজেন্টাইন সেনাবাহিনীর সঙ্গে সেলজুকদের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। মানজিকার্তের অবস্থান ভান হ্রদের কাছাকাছি। জায়গাটি বর্তমান তুরস্ক-ইরান সীমান্ত থেকে ১২০ কিলোমিটার দূরে। এই যুদ্ধে

ভয়াবহ পরাজয়ের সম্মুখীন হয় বাইজেন্টাইনরা। ফলে তুর্কি যাযাবর গোত্রগুলোর জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায় আনাতোলিয়ার দুয়ার। দলে দলে আনাতোলিয়ায় প্রবেশ করে তারা এবং বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠা করে ছোট ছোট আমিরাত। এক দশকের মধ্যেই তুর্কিরা কনস্টান্টিনোপলের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায় এবং দখলকৃত নতুন ভূখণ্ডের নাম দেয় 'সালতানাত-ই-রুম'। এটি একটি ব্যতিক্রমী নামকরণ। 'রুম' ছিল তুর্কি ভাষায় 'রোম' শব্দের একটি অপভ্রংশ। এই ধরনের নামকরণকে হয়তো সেই সময়কার এক ধরনের কটাক্ষও বলা যেতে পারে।

আনাতোলিয়ার বেশিরভাগ মানুষ তখন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় কথা বলত। আলেকজান্ডার দ্য গ্রেটের বিজয়ের পর তারা ধীরে ধীরে গ্রিক সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিল। বাইজেন্টাইন আমলে এসে তারা খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত হয়। এই অঞ্চলের মানুষ ছিল জাতিগতভাবে মিশ্র—আর্মেনীয়, কুর্দি ও গ্রিক মিলিয়ে এক জটিল জনমিতি। পরবর্তী কয়েক শতাব্দী ধরে এই অধিবাসীদের অনেকেই তুর্কি সংস্কৃতির মধ্যে মিশে যায়। এদের মধ্যে কেউ কেউ সুন্নি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে, এমনকি তুর্কি ভাষাও বলতে শুরু করে অনেকে। উল্টোদিকে তুর্কিরাও জাতিগতভাবে আনাতোলিয়ান জনগোষ্ঠীর সঙ্গে মিশে যেতে থাকে। কাজাখদের মতো আদি তুর্কি জনগোষ্ঠীর তুলনায় আর্মেনীয় ও গ্রিকদের সঙ্গেই আধুনিক তুর্কিদের জেনেটিক মিল অনেক বেশি। গবেষণায় দেখা গেছে, তুরস্কের তুর্কিদের জিনে মধ্য এশীয় উৎসের উপস্থিতি মাত্র ৯ থেকে ১৫ শতাংশ।

ত্রয়োদশ শতকের শেষভাগে উত্তর-পশ্চিম আনাতোলিয়ায় প্রতিষ্ঠিত ছোট ছোট বহু আমিরাতের মধ্যে একটি ছিল উসমান গাজির নেতৃত্বাধীন। তিনি ছিলেন একজন যুদ্ধবাজ নেতা। একটা পর্যায়ে শক্তি সঞ্চয় করে বাইজেন্টাইনদের এলাকায় আক্রমণ শুরু করেন তিনি। প্রচন্ড আক্রমণ চালিয়ে কৃষ্ণসাগরের উপকূলীয় অঞ্চল দখল করে আনাতোলিয়ার কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হয় তার বাহিনী। তার অনুসারীরা পরবর্তিতে নিজেদের 'উসমানলি' বলতে শুরু করে, যার অর্থ 'উসমানের অনুসারী'। উসমান নামটির আরবি উচ্চারণ অনেকটা 'উথমান'-এর কাছাকাছি। এই 'উথমান' শব্দই বিকৃত হয়ে পশ্চিম ইউরোপে 'অটোমান' নামে পরিচিত হয়। তুর্কি শক্তিগুলোর মধ্যে উসমানি আমিরাত হয়তো সবচেয়ে শক্তিশালী ছিল না, কিন্তু নিজেদের প্রাথমিক সাফল্যকে ভিত্তি করে বাইজেন্টাইনদের কাছ থেকে আরো এলাকা দখল করতে থাকে তারা। পাশাপাশি অন্যান্য তুর্কি আমিরাতের বিরুদ্ধেও

তারা অভিযান চালাতে থাকে। এভাবেই ধীরে ধীরে উসমানি সাম্রাজ্যের ভিত্তি গড়ে উঠেছিল।

১৩২৬ সাল নাগাদ কনস্টান্টিনোপল থেকে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত বুরসার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় উসমানি আমিরাত। এরপরে তাদের লক্ষ্য ছিল বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের সর্বশেষ শক্তিশালী ঘাঁটি কনস্টান্টিনোপল। ধীরে ধীরে চারপাশের অঞ্চল দখল করে কনস্টান্টিনোপলকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে তারা। সাম্রাজ্যের অবশিষ্ট প্রতীক কনস্টান্টিনোপল ১৪৫৩ সালের মধ্যেই একপ্রকার একঘরে হয়ে পড়ে। শহরটির সুবিশাল প্রাচীর এক হাজার বছর ধরে টিকে ছিল। কিন্তু উসমানি বাহিনী ৫১ দিন ধরে টানা আঘাত করে একপাশের প্রাচীর ভেঙে ফেলতে সক্ষম হয়। সেই ফাঁক গলে তারা ঢুকে পড়ে শহরে।

এরপর উসমানিদের সামনে ছিল দুইটি পথ—অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হওয়া অথবা ধীরে ধীরে ধ্বংস হয়ে যাওয়া। মর্মর সাগরের আশেপাশের সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলো যেন কোনো আক্রমণের শিকার না হয়, তা নিশ্চিত করতে চেয়েছিল তারা। তাদের প্রাথমিক প্রতিরক্ষা নীতির লক্ষ্য ছিল প্রধানত দুইটি। একদিকে, আনাতোলিয়ার মালভূমিতে যেন কোনো নতুন শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী উঠে আসতে না পারে। অন্যদিকে, মধ্যপ্রাচ্য থেকে বড় কোনো সেনাবাহিনী এসে যেন সহজে তাদের ওপর আঘাত হানতে না পারে।

এই বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের সবচেয়ে দুর্বল জায়গাটি হলো সেই সরু ভূসংযোগ, যেখানে সমতলভূমি সঙ্কুচিত হয়ে এসে ইস্তাম্বুলে মিলেছে। এই ধরনের ভূমি গঠনকে বলা হয় 'isthmus'। কোনো সেনাবাহিনী যদি পর্যাপ্ত সেনা জড়ো করে এই পথে অগ্রসর হয়, তাহলে গোটা অঞ্চলটাই হুমকির মুখে পড়বে। তাই প্রতিরক্ষার মূল কৌশল ছিল দুইটি। প্রথমে একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী গড়ে তোলা, যেন সমুদ্রের চোক পয়েন্টগুলো শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করা যায়। এরপরে দরকার ছিল শত্রু শক্তিকে মূল অঞ্চল থেকে যতটা সম্ভব দূরে রাখা। এই কাজটি করতে হলে কেন্দ্রীয় অঞ্চলকে বড় করতে হতো, যাতে মূলকেন্দ্রে পৌঁছানোর আগেই বহু স্তরের প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়।

মারমারিয়া অঞ্চল দখল করার পর সেটাকে শুধু রক্ষা করাই নয়, বরং আরো সম্প্রসারিত করাও জরুরি হয়ে পড়ে। তুর্কিরা প্রথমেই তাদের আগমনের পথটিকে নিরাপদ করতে চাইল। এজন্য তারা আনাতোলিয়ার বিশাল অংশ দখল করেছিল। কিন্তু কৌশলগত গভীরতা ছাড়া এই অঞ্চলে তাদের জন্য তেমন কিছু ছিল না।

অঞ্চলটির বেশিরভাগ অংশই শুষ্ক, দুর্গম এবং পাহাড়ে ঘেরা। কৃষিকাজের জন্যও খুব বেশি সুযোগ নেই এখানে। দক্ষিণ আনাতোলিয়ার সমুদ্রতট অনেক জায়গায় মসৃণ, কিন্তু উপযুক্ত বন্দর খুব কম। ফলে বাণিজ্যের সুযোগও সীমিত। আর উপকূলীয় সমতল এতটাই সংকীর্ণ যে, সেখানে চাষাবাদের জমির খুব অভাব। ফলে আনাতোলিয়ার অভ্যন্তরীণ অঞ্চলগুলোতে বসতি স্থাপন বা উন্নয়ন করা উসমানিদের কাছে তেমন আকর্ষণীয় মনে হয়নি। এই অঞ্চলের শক্তিশালী কেন্দ্রগুলো প্রায়শই অশান্ত হয়ে উঠত, তাই তাদেরকে নিয়ন্ত্রণেও রাখতে হতো। উসমানি সাম্রাজ্যের দীর্ঘ ইতিহাসজুড়েই আনাতোলিয়ায় বিদ্রোহ দমন ছিল এক বড় চ্যালেঞ্জ। আধুনিক তুরস্কও কুর্দি বিদ্রোহের রূপে এই সমস্যাটির উত্তরাধিকার বহন করছে।

তবে এলাকাটি আকর্ষণীয় না হলেও উসমানিদের অন্যতম অগ্রাধিকার ছিল প্রতিরক্ষার জন্য আনাতোলিয়াকে ব্যবহার করা। এই অঞ্চল পুরোপুরি তাদের দখলে আসার ফলে বড় আকারের আক্রমণের সুযোগ কার্যত বন্ধই হয়ে যায়। তাছাড়া, আনাতোলিয়ার উঁচু মালভূমি পেরিয়ে আক্রমণ চালানোর মতো প্রতিদ্বন্দ্বীও তখন খুব বেশি ছিল না। উত্তর-পশ্চিম দিকে তারা পৌঁছে যায় বলকান পর্বতমালা পর্যন্ত। এই পর্বতমালাও একটা প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা প্রাচীর। ওই দিক থেকে আসা শত্রুকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য একদম আদর্শ বলা যায়। এইসব দিক সুরক্ষিত হয়ে যাওয়ার পরে কনস্টান্টিনোপলকে সাম্রাজ্যের রাজধানী হিসেবে গড়ে করে তোলায় মনোযোগ দেয় তারা। শহরটির প্রাচীর মেরামত করা হয় এবং হাজার হাজার মুসলিম, খ্রিস্টান ও ইহুদিকে এই শহরে পুনর্বাসিত করার মাধ্যমে নতুন করে জনবসতি গড়ে তোলা হয়। এরপর তাদের দৃষ্টি যায় আরো দূরে, দিগন্তের ওপারে।

উসমানিরা ইতোমধ্যেই ইউরোপীয় ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছিল। ১৩০০-এর শতক থেকেই বলকান উপদ্বীপে হানা দিতে শুরু করেছিল তারা। ১৪৮০-এর দশকে তারা কৃষ্ণসাগরের তীরবর্তী কিছু বন্দর দখল করে নেয়। এই অঞ্চল বর্তমানে ইউক্রেনের মধ্যে পড়েছে। ততদিনে তাদের নৌ-দক্ষতাও অনেক বেড়ে গিয়েছিল। ফলে ধীরে ধীরে শক্তিশালী হতে থাকা রুশদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে সক্ষম হয় তারা। এরপরে তাদের তাদের দৃষ্টি যায় পশ্চিম দিকে। এখানে আজকের আধুনিক রাষ্ট্রগুলোর মতোই ভূরাজনৈতিক সুযোগ ও চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয় তারা। ইস্তাম্বুল থেকে সোজা পশ্চিমে এগিয়ে গেলে মারিৎসা নদী উপত্যকায় পৌঁছানো যায়। এরপর, বলকান পর্বতমালার ডানদিকে ঘুরে এগিয়ে গেলেই

পৌঁছানো যায় ইউরোপের দ্বিতীয় দীর্ঘতম নদী দানিউবের তীরে। দানিউব নদীর এই অংশটির অবস্থান বেসারাবিয়ান গ্যাপ এবং আয়রন গেটের মাঝামাঝি।

কার্পাথিয়ান পর্বতমালা যেখানে শেষ হয়ে কৃষ্ণসাগরের উপকূল শুরু হয় সেই সমতল ভূমিকেই মূলত বেসারাবিয়ান গ্যাপ বলা হয়। কার্পাথিয়ান পর্বতমালা প্রায় ১,৫০০ কিলোমিটার দীর্ঘ একটি খিলানের মতো বিস্তৃত হয়ে পোল্যান্ডের উত্তরাঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। এই পর্বতমালার দুইপাশে রয়েছে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ পথ। উত্তর দিকে রয়েছে উত্তর ইউরোপীয় সমভূমি, যা বাল্টিক সাগরের পাশ দিয়ে পশ্চিমে চলে গেছে। অন্যটি হলো দক্ষিণে কৃষ্ণ সাগরের তীরে অবস্থিত বেসারাবিয়ান গ্যাপ। যে শক্তি বেসারাবিয়ান গ্যাপ দখলে রাখতে পারবে, তারা দক্ষিণের পূর্ব থেকে পশ্চিমগামী একমাত্র পথটি নিয়ন্ত্রণ করতেও সক্ষম হবে।

অন্যদিকে, আয়রন গেট হলো সেই স্থান যেখানে কার্পাথিয়ান পর্বত রোমানিয়ার ভেতর দিয়ে বাঁক নিয়ে এসে বলকান পর্বতমালার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। বর্তমানে জায়গাটি বুলগেরিয়ায় পড়েছে। দানিউব নদী এখানে একটি সরু উপত্যকার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়। প্রাচীনকাল থেকেই এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ চোক পয়েন্ট। ১৯৬০-এর দশকে একটি বাঁধ নির্মাণের আগে পর্যন্ত এখানে এক ভয়ানক নদীপ্রবাহ ছিল। কয়েক মাইল জুড়ে অবস্থিত চারটি সরু গিরিপথের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হতো ভয়ংকর স্রোতের ধারা। বর্তমানে জলপ্রবাহ অনেক শান্ত হলেও আয়রন গেট এখনো একটি কৌশলগত চোক পয়েন্ট। আয়রন গেট দখলে রাখলে এটিকে একটি স্থায়ী শক্ত প্রতিরক্ষা অবস্থান হিসেবে ব্যবহার করা যায়। এমনকি সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার মঞ্চ হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। উসমানিরা দ্বিতীয় পন্থাকেই বেছে নিয়েছিল।

আয়রন গেটের ঠিক উত্তরে কার্পেথিয়ান ও আল্পস পর্বতমালার মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত প্যানোনিয়ান সমভূমি। এই সমভূমিতেই ভিয়েনার অবস্থান। দানিউব নদী ভিয়েনার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে আয়রন গেট অতিক্রম করে শেষ পর্যন্ত কৃষ্ণসাগরে গিয়ে মিশেছে। উসমানিদের আত্মবিশ্বাসী ছিল যে, আয়রন গেটের দক্ষিণে তাদের সাম্রাজ্য একদম নিরাপদ। তবে বিশাল ও উর্বর প্যানোনিয়ান সমভূমি সম্পূর্ণভাবে নিজেদের দখলে রাখতে হলে ভিয়েনা দখলের কোনো বিকল্প ছিল না।

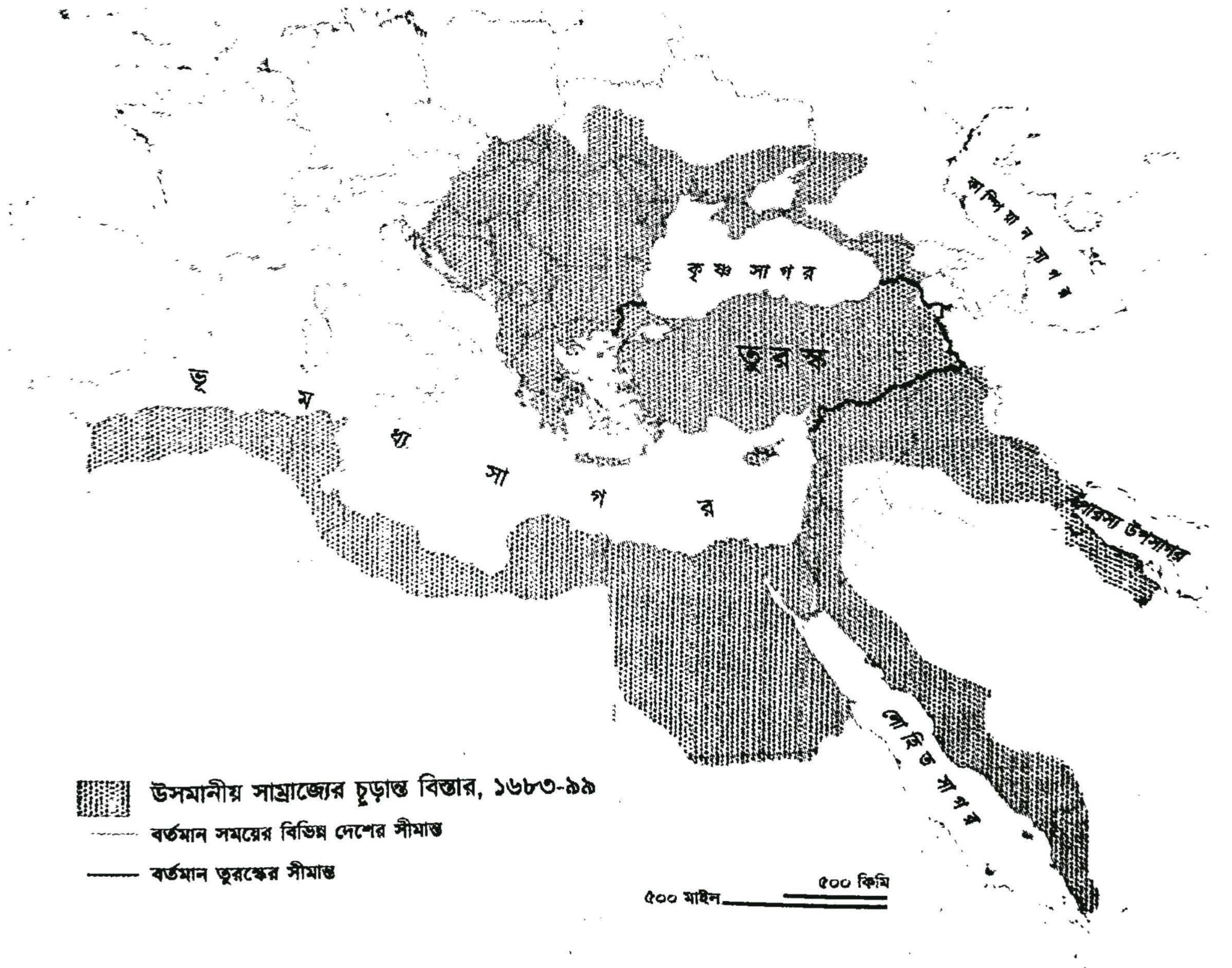
ভিয়েনা দখল করার জন্য তিনবার চেষ্টা করেছিল উসমানিরা। তবে তৃতীয় প্রচেষ্টার সময় শুধু আয়রন গেটের উত্তরেই নয়, ‘মারমারিয়ার’ চারদিকেই তাদের

সাম্রাজ্য বিস্তৃত হয়েছিল। ষোড়শ শতকে বলকান উপদ্বীপের বেশিরভাগ অংশই উসমানি সাম্রাজ্যর নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। বর্তমান হাঙ্গেরিও ছিল তাদের অধীনে। উত্তর-পশ্চিমে তারা ভিয়েনা পর্যন্ত অগ্রসর হয়েছিল। সোজা উত্তরে কৃষ্ণসাগরের নিয়ন্ত্রণও ছিল তাদের হাতে। আর দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব দিকে তারা আধিপত্য বিস্তার করেছিল বর্তমান সিরিয়া, ইরাক, সৌদি আরব, মিশর ও আলজেরিয়া পর্যন্ত। অবশ্য পূর্ব দিকের ককেশাস অঞ্চল নিয়ে পারস্যের সাথে নিয়মিত টানাপোড়েন চলত তাদের। উসমানিরা ছিল এক বহুজাতিক ও বহুসাংস্কৃতিক সাম্রাজ্য। নির্মম নির্দয় শাসনের জন্য কুখ্যাতি থাকলেও উসমানিরা তাদের অধিকৃত অঞ্চলের জনগণকে সবসময় সুন্নি ইসলামে ধর্মান্তরিত হতে বাধ্য করেনি। অবশ্য খ্রিস্টান ও ইহুদিদেরকে বিবেচনা করা হতো নিম্নশ্রেণির নাগরিক হিসেবে। তাদেরকে বলা হতো 'ধিম্মি'। সাধারণভাবে অনুবাদ করলে যার অর্থ দাড়ায় 'সুরক্ষিত'। যদিও বাস্তবে এই শব্দের অর্থ ছিল 'সুরক্ষা করের আওতায় রাখা'। কারণ তাদেরকে 'জিজিয়া' নামে একটি বিশেষ কর দিতে হতো। জিজিয়াকে অবশ্য অনেকেই 'সুরক্ষা কর' না বলে 'জবরদস্তিমূলক চাঁদাবাজি' হিসেবে উল্লেখ করেছেন। অবশ্য আরব অঞ্চলের মুসলিমদের জন্য পরিস্থিতি ছিল তুলনামূলকভাবে সহজ। কিন্তু সবকিছুর পরেও বিজিত অঞ্চলের জনগণকে কখনোই ভুলতে দেওয়া হতো না যে, আসল ক্ষমতা কার হাতে। বর্তমানে তুরস্ক যখন পুনরায় আরব বিশ্বের নানা অঞ্চলে হস্তক্ষেপ করছে, তখন সেই পুরোনো অভিজ্ঞতার কারণেই বহু আরব দেশে তাদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ দেখায়। যেমন, রিয়াদের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার নাম ছিল 'সুলতান সুলেমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্ট স্ট্রিট'। সিরিয়া ও লিবিয়ায় তুরস্কের হস্তক্ষেপের প্রতিক্রিয়া হিসেবে ২০২০ সালে এই নাম বদলে দেয় সৌদি আরব।

উসমানি শাসকদের দৃষ্টিতে সপ্তদশ শতক ছিল চূড়ান্ত গৌরবময় সময়। এই সময়ের উসমানি সাম্রাজ্যকে সাধারণত রোমান সাম্রাজ্যের সঙ্গে তুলনা করা হতো। ১৬৮৩ সালে ভিয়েনার নগরপ্রাচীরে হ্যাবসবুর্গ সাম্রাজ্যের হাতে পরাজিত হওয়ার আগে পর্যন্ত ছিল তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের সর্বোচ্চ সীমা। সেই মুহূর্ত থেকেই শুরু হয় উসমানি সাম্রাজ্যের দীর্ঘ অবক্ষয়ের অধ্যায়। আর এর পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯২৩ সালে উসমানি সাম্রাজ্যের পতনের মধ্য দিয়ে।

ভিয়েনার ফাঁক গলে ঢুকতে না পারার ফলে উসমানিরা শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে যেতে বাধ্য হয়। প্রথমে তারা পিছু হটে আয়রন গেট পর্যন্ত। তারপর সেখান থেকেও তারা আরো দক্ষিণে সরে আসে। এই এলাকাগুলো ছিল তাদের সাম্রাজ্যের

সবচেয়ে লাভজনক অংশ। এগুলো রাজধানীর কাছাকাছি হওয়ায় শাসন ও কর আদায়ও ছিল তুলনামূলক সহজ। তাই উত্তর আফ্রিকার দূরবর্তী অঞ্চলগুলোর তুলনায় এসব অঞ্চল ধরে রাখার চেষ্টা করাই ছিল বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তাদের সাম্রাজ্য ততদিনে মাত্রাতিরিক্ত প্রসারিত হয়ে পড়েছিল এবং এই সময় থেকেই সেই চাপ স্পষ্ট হতে শুরু করে। ওদিকে দ্রুত শিল্পায়নের ফলে পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রগুলো প্রযুক্তি ও সামরিক শক্তিতে এগিয়ে যাচ্ছিল। বিশেষ করে ব্রিটেন ও ফ্রান্স ততদিনে মহাশক্তিশালী। ফলে, তাদের সাথে প্রতিযোগিতায় উসমানি সাম্রাজ্য আর কুলিয়ে উঠতে পারছিল না। এই নতুন শক্তিধর ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো একের পর এক পদক্ষেপ নিয়ে মধ্যপ্রাচ্য থেকে উসমানিদের ঠেলে বের করে দিতে শুরু করে।



চিত্র: ক্ষমতার শীর্ষে থাকাকালে উসমানি সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল ইউরোপ, এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার বিশাল অঞ্চল জুড়ে।

'ইউরোপের রুগ্ন পুরুষ' উসমানি সাম্রাজ্য প্রকৃতপক্ষে কতটা দুর্বল হয়ে পড়েছে তা স্পষ্ট করে দেয় ১৯১২-১৩ সালের দুইটি বলকান যুদ্ধ। এই সময় বুলগেরীয় বাহিনী কনস্টান্টিনোপল প্রায় দখল করেই ফেলেছিল। এরপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে উসমানিরা যোগ দেয় ভুল পক্ষে। এই সময় কার্যত তারা নিজেদের মৃত্যুদণ্ডই নিশ্চিত করে ফেলে। অবশ্য ১৯১৬ সালে গ্যালিপোলির যুদ্ধে ব্রিটিশ বাহিনীকে পরাজিত করেছিল তারা। এই বিজয় বর্তমান তুরস্কের জাতীয় পরিচয়ের অংশ হয়ে আছে। তুর্কিদের রাষ্ট্রগঠনের ইতিহাসে গৌরবময় অধ্যায় হিসেবে স্থান পেয়েছে এই পর্বটি। কিন্তু সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য এই বিজয় যথেষ্ট ছিল না। বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত হয় উসমানিরা। ফলে ১৯১৮ সালের ১৩ অক্টোবর মিত্রপক্ষের সাথে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরে বাধ্য হয় তারা। চুক্তির শর্ত অনুযায়ী ব্রিটিশ, ইতালীয় ও ফরাসি সেনারা তাদের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল দখল করে নেয়। অবশেষে এভাবেই অটোমান সাম্রাজ্যের পতন ঘটে, 'সালতানাত' বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং নতুন করে নির্ধারণ করে দেওয়া হয় সীমানা। অবশ্য অনেক তুর্কিভাষী জনগোষ্ঠীই নতুন নির্ধারিত সীমানার বাইরে থেকে যায়, বিশেষত গ্রিস ও সাইপ্রাস দ্বীপে। অপরদিকে, তুরস্কের নতুন সীমানার ভেতরে রয়ে যায় ১০ লাখেরও বেশি গ্রিক ভাষাভাষী।

পরবর্তী সময়ের গ্রিক-তুর্কি যুদ্ধে (১৯১৯-১৯২২) তুর্কিদের নেতৃত্বে ছিলেন জেনারেল কামাল আতাতুর্ক। এই যুদ্ধে তুর্কিরাই বিজয়ী হয়েছিল। এরপর দুই দেশের মধ্যে সাক্ষরিত হয় জনবিনিময়ের চুক্তি। চুক্তি অনুযায়ী গ্রিসে থাকা জাতিগত তুর্কিদের তুরস্কে আনা হয়, আর তুরস্কে থাকা গ্রিকদের পাঠানো হয় গ্রিসে। তবে এই বিনিময়ের পরও উভয় দেশেই কিছু সংখ্যালঘু গ্রিক ও তুর্কি জনগোষ্ঠী থেকে যায়। আর এর ফলে গত একশত বছরে একাধিকবার দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। তুর্কি উপকূলের নিকটবর্তী বেশিরভাগ দ্বীপ গ্রিসের হাতে চলে যাওয়াকে তুর্কিরা তখন মেনে নেয়নি, আজও তা তারা মানে না সেটা। একইভাবে, সিরিয়ার কাছে কুর্দি ও আরব অধ্যুষিত অঞ্চল হারানো নিয়েও তুরস্কের একটি অংশে ক্ষোভ রয়ে গেছে।

নতুন সীমানা অনুযায়ী তুরস্ক রাষ্ট্র গঠিত হয় ১৯২৩ সালে। নবগঠিত দেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট ছিলেন কামাল আতাতুর্ক। ক্ষমতা হাতে নিয়েই তুরস্ককে রিপাবলিক বা প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করেন তিনি। নতুন রাষ্ট্রের রাজধানী হিসেবে বেছে নেওয়া হয় আঙ্কারাকে। কনস্টান্টিনোপলের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে পরিবর্তন করে রাখা হয় ইস্তাম্বুল। ধারণা করা হয়, নামটি এসেছে গ্রিক

ভাষাভাষীদের কথ্যভাষা থেকে। তারা যখন শহরে যাওয়ার কথা বলত, তখন বলত eis ten polin—অর্থাৎ 'শহরের ভেতরে'। সময়ের সঙ্গে সেই শব্দটাই বিকৃত হয়ে 'ইস্তাম্বুল' নামে পরিচিত হয়।

আতাতুর্ক শব্দের অর্থ 'তুর্কদের জনক'। কামাল আতাতুর্ক তুরস্কের শাসনক্ষমতায় ছিলেন প্রায় পনেরো বছর। এই সময়ের মধ্যেই তিনি তার দেশকে আমূল পাল্টে দেন। তিনি বিশ্বাস করতেন আধুনিকীকরণ মানে পশ্চিমা মডেল গ্রহণ করা। তাই তিনি একের পর এক নাটকীয় সংস্কার চালু করেন। উদ্দেশ্য ছিল তুরস্ককে একটি আধুনিক রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করা। কিছু সংস্কার প্রথম দৃষ্টিতে সামান্য মনে হলেও বাস্তবে এগুলো ছিল নতুন এক রাষ্ট্রচিন্তার প্রকাশ। অতীতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই নতুন পথ চলায় একটি বড় সিদ্ধান্ত ছিল ধর্মকে রাষ্ট্র থেকে আলাদা করা। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, পুরুষদের জন্য ফেজ টুপি পরা নিষিদ্ধ করা হয়, আর নারীদের জন্য ঘোমটা পরা নিরুৎসাহিত করা হয়। চালু করা হয় পশ্চিমা ধাঁচের গ্রেগরীয় ক্যালেন্ডার। লেখাপড়ার ভাষা আরবি হরফ থেকে লাতিন অক্ষরভিত্তিক তুর্কি লিপিতে পরিবর্তন করা হয়।

আতাতুর্ক বুঝেছিলেন, ভাষাই সংস্কৃতির মূল ভিত্তি। তিনি চেয়েছিলেন এমন এক নতুন তুর্কি পরিচয় ও সংস্কৃতি গড়ে তুলতে, যা বহুজাতিক ও বহুভাষিক অটোমান সাম্রাজ্যের ছায়ায় ঢাকা পড়ে থাকবে না। সেই সময়ের শিক্ষিত ও অভিজাত শ্রেণি ব্যবহার করত 'উসমানি তুর্কি' ভাষা। এই ভাষাটি তৈরি হয়েছিল তুর্কি, আরবি ও ফারসি ভাষার মিশ্রণে। অন্যদিকে দরিদ্র ও নিরক্ষর সাধারণ জনগণ ব্যবহার করত সাধারণ তুর্কি ভাষা। এর ফলে ভাষাগত একটি স্পষ্ট সামাজিক বিভাজন তৈরি হয়েছিল দেশটিতে। ফলে শিক্ষিত শ্রেণি ও সাধারণ মানুষ বাস করত আলাদা আলাদা জগতে। এই বিভাজন দূর করার জন্য আতাতুর্ক নিজেই অগ্রণী হয়ে উঠলেন। দেশজুড়ে সফরে বেরিয়ে পড়তেন তিনি। বিভিন্ন গ্রামের বাজারে বা স্কুলে গিয়ে নিজের হাতে ছোট একটি স্লেটে নতুন বর্ণমালা লিখে দেখাতেন। এই পদক্ষেপটি ছিল অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত। এই উদ্যোগ কেবল ভাষা শিক্ষাকেই সহজ করে তোলেনি, তাকে ঘিরে একধরনের ব্যক্তিপূজার সংস্কৃতিও তৈরি করেছিল। আর তার চেয়েও বড় কথা হলো, এই সংস্কার সাধারণ মানুষকে ধর্মীয় পণ্ডিতদের উপর নির্ভরশীলতা থেকে মুক্তি দিয়েছিল। লেখাপড়া না জানার কারণে আগে যেসব মানুষ ধর্মগুরুদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত, তারা এখন নিজেরাই পড়তে ও বুঝতে পারছিল রাষ্ট্র কী বলছে। ফলে রক্ষণশীল ধর্মীয়

পণ্ডিতদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থান তুলনামূলকভাবে দুর্বল হয়ে আসে। এটি ছিল আতাতুর্কের অত্যন্ত কৌশলী এক পদক্ষেপ। ভাষার হাত ধরে সংস্কৃতি নির্মাণের এক সাহসী উদ্যোগ।

তবে আতাতুর্কের 'তুর্কিকরণ' প্রক্রিয়ার একটি অন্ধকার দিক ছিল খ্রিস্টান আর্মেনীয়দের পদ্ধতিগতভাবে নির্মূলের বিষয়টি অস্বীকার করা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ১৯১৪-১৫ সালে রাশিয়ার ককেশাস অঞ্চলে অভিযান চালায় উসমানিরা। আনাতোলিয়া উপত্যকার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে কৃষ্ণসাগর ও ভান লেকের মধ্যবর্তী অঞ্চলে দুইপক্ষ মুখোমুখি হয়। শেষ পর্যায়ে বর্তমানে তুরস্কের একটি শহর সারিকামিশের কাছকাছি চূড়ান্ত যুদ্ধে পরাজিত হয় উসমানি বাহিনী। যুদ্ধক্ষেত্রের কাছাকাছি কিছু গ্রামে আর্মেনীয় খ্রিস্টান জনগোষ্ঠী বসবাস করত। সেই আর্মেনীয়দের ওপর এই পরাজয়ের দায় চাপান উসমানি যুদ্ধমন্ত্রী এনভার পাশা। তাছাড়া আর্মেনীয়রা তাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি ধরে রাখায় অনেক তুর্কিই আর্মেনীয়দের ওপর ক্ষুব্ধ ছিল। তারা আর্মেনীয়দের 'অভ্যন্তরীণ শত্রু' হিসেবে দেখত। ১৯১৫ থেকে ১৯২৩ সালের মধ্যে মূলত পূর্ব আনাতোলিয়ায় সংঘটিত এই নির্মূলকরণ অভিযানে যুদ্ধ করতে সক্ষম এমন লাখ লাখ পুরুষকে হত্যা করা হয়। পাশাপাশি নারী, শিশু ও বৃদ্ধদেরকে জোরপূর্বক হাঁটিয়ে নির্বাসনে পাঠানো হয় সিরিয়ার মরুভূমিতে। এই যাত্রায় তাদের জন্য রাখা হয়নি কোনো খাবার বা পানির ব্যবস্থা। ফলে অনাহারে ও তৃষ্ণায় মারা যায় অসংখ্য মানুষ। ইতিহাসবিদদের মতে এই গণহত্যা ছিল পূর্বপরিকল্পিত। বর্তমানে এই গণহত্যাকে 'জেনোসাইড' বা জাতি নির্মূল করার প্রচেষ্টা হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অন্যতম ভয়াবহ এই গণহত্যাকে নবগঠিত তুর্কি রাষ্ট্রের সরকারি ইতিহাস থেকে কার্যত মুছে ফেলা হয়েছিল। যেন এমন কিছু ঘটেইনি কোনোদিন। এই ইতিহাস-অস্বীকৃতি নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা কাহিনির অংশে পরিণত হয়। আজও এই ঘটনাকে গণহত্যা হিসেবে স্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানায় আঙ্কারা। নৃশংসতা যে সংঘটিত হয়েছিল, তা তুরস্ক স্বীকার করে। কিন্তু তারা জোর দিয়ে দাবি করে যে আর্মেনীয় জনগোষ্ঠীকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে কোনো পূর্বপরিকল্পিত কর্মসূচি ছিল না এটা। এই তথ্য চাপা দেওয়া, ইতিহাস মুছে দেওয়া এবং সংস্কৃতির পশ্চিমমুখী রূপান্তর—সবই ছিল আধুনিক রাষ্ট্র নির্মাণের অংশ। আতাতুর্ক চেয়েছিলেন পাশ্চাত্য-ঘেঁষা একটি আধুনিক জাতি হিসেবে তুরস্ক নতুন দিগন্তে যাত্রা শুরু করুক।

তবে এই নতুন দিগন্তে পৌঁছেই দেখা দিল এক বাস্তব সমস্যা। তারা বুঝতে পারল যে পৃথিবী বদলে গিয়েছে, তুরস্কের ভৌগোলিক অবস্থান বা প্রভাবও আর আগের মতো নেই। প্রাক্তন উসমানি সাম্রাজ্যের ব্যাপ্তি সংকুচিত হয়ে শুধু মারমারিয়া ও আনাতোলিয়া পর্যন্ত সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। তুরস্ক তখনও ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করছিল বটে, কিন্তু এই ভূমিকার গুরুত্ব আগের তুলনায় কমে গিয়েছিল অনেকটাই। বিশেষ করে সুয়েজ খালের উদ্বোধন বাণিজ্যের এক নতুন সমুদ্রপথ খুলে দিয়েছিল। এই নতুন পথ চালু হওয়ার কারণে কারণে তুরস্ককে আর আগের মতো প্রয়োজন ছিল না সবার। অন্যদিকে, এই এই সময়ে এসে ভোগবাদী সমাজ হিসেবে অ্যামেরিকার উত্থান ঘটে এবং ইউরোপীয় ব্যবসায়ীদের কাছে অ্যামেরিকা হয়ে ওঠে আরো বেশি লাভজনক বাজার। ফলে, তুরস্কের ঐতিহ্যগত ভৌগোলিক গুরুত্ব অনেকটাই ফিকে হয়ে আসে ইউরোপিয়ানদের কাছে।

১৯২০-এর দশকের তুরস্ক তখনো মূলত ছিল কৃষিনির্ভর সমাজ। তবে আতাতুর্কের নেতৃত্বে দেশটি ধীরে ধীরে শিল্পায়নের পথে এগোতে শুরু করে। ১৯২৯ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে তুরস্কের শিল্প উৎপাদন বৃদ্ধি পায় ৮০ শতাংশ। এটি ছিল এক বিশাল অগ্রগতি। কিন্তু এই পথচলার মাঝেই বিশ্বব্যাপী একটা ধাক্কা আসে। ১৯২৯ সালে ধ্বস নামে মার্কিন শেয়ারবাজারে, আর এই ধ্বস থেকে বিশ্বব্যাপী শুরু হয় অর্থনৈতিক মন্দা। এই মহামন্দার ধাক্কায় তুরস্কও হয়ে পড়ে টালমাটাল। তাদের প্রধান রপ্তানি ছিল কৃষিপণ্য, কিন্তু সগুলোর দাম দ্রুত পড়ে যায়। ফলে দেশের আয় কমতে শুরু করে। উপরন্তু, মারমারিয়া অঞ্চলকে ঘিরে আন্তর্জাতিক ট্রানজিট বা বাণিজ্যপথ হিসেবেও তুরস্কের গুরুত্ব কমে যায়। সেই সাথে ছিল পূর্বাঞ্চলে কুর্দি বিদ্রোহ দমনে বিপুল অর্থব্যয়। সব মিলিয়ে বিশ্বমঞ্চে বড় শক্তি হয়ে ওঠা কঠিন হয়ে পড়ে তুরস্কের জন্য।

এরই মধ্যে ঘনিয়ে আসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। কিন্তু ওই মুহূর্তে তুরস্কের সামরিক বাহিনী ছিল দুর্বল, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আমলের পুরোনো অস্ত্রে সজ্জিত। যুদ্ধ শুরু হলে উভয় পক্ষই তুরস্ককে নিজেদের দলে টানার চেষ্টা করেছিল। লোভনীয় কিছু সুযোগও এসে দাঁড়ায় তাদের সামনে। বিশেষ করে নাৎসিরা গ্রিস দখল করে ফেলার পরে তুরস্কের সামনে আকর্ষণীয় সুযোগের হাতছানি আসে। যদি তারা সেই সময় জার্মানির পাশে দাঁড়াত, তবে হয়তো হারানো কিছু ভূখণ্ড ফিরে পাওয়াও সম্ভব হতো। কিন্তু আঙ্কারা চূড়ান্ত কৌশলী অবস্থান নেয় এবং নিরপেক্ষ ভূমিকা

বজায় রাখে। ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সোভিয়েত বাহিনী যখন বার্লিনের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে এবং জার্মানদের পরাজয় একরকম নিশ্চিত, তখন জার্মানি ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তুরস্ক। এটি কিছুটা স্বার্থান্বেষী সিদ্ধান্ত হলেও বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে বেশ কৌশলী বলতে হবে। এই সিদ্ধান্ত তুরস্ককে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বৈশ্বিক কাঠামো গঠনের সম্মেলনগুলোতে আসন পেতে সাহায্য করে। বড় কোনো শক্তি না হওয়া সত্ত্বেও আলোচনার কেন্দ্রে থাকার সুযোগ পায় তারা।

১৯৪৬ সালে তুরস্ক তার চারপাশের পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে সন্তুষ্ট হওয়ার মতো কিছুই খুঁজে পায়নি। তখনো আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথ হিসেবে নিজেদের পুরোনো অবস্থান ফিরে পায়নি তুরস্ক। তখন তাদের আশেপাশের দেশগুলোও ছিল গরিব ও অনুন্নত। অন্যদিকে, যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যুদ্ধ করে এসেছে, সেই রাশিয়ানরা তখন বলকান অঞ্চলে সেনা মোতায়েন করছিল। সোভিয়েত সম্প্রসারণের অংশ হিসেবে কুর্দি বিদ্রোহীদেরকেও সহায়তা দিচ্ছিল রাশিয়ানরা। উদ্দেশ্য ছিল তুরস্ককে দুর্বল করা। একই সঙ্গে সিরিয়া এবং ইরাকেও সোভিয়েত প্রভাব বাড়ছিল। এমন পরিস্থিতিতে একা থাকা তুরস্কের পক্ষে আর সম্ভব ছিল না। ফলে, যুদ্ধ শেষ হওয়ার ছয় বছরের মধ্যেই ১৯৫২ সালে ন্যাটোর সদস্যপদ গ্রহণ করে তারা। এই সদস্যপদ তুরস্কের দৃষ্টিতে ছিল নতুন এক কৌশলগত ছাতার নিচে আশ্রয় নেওয়ার মতো। একদিকে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত হলো, আবার পশ্চিমা বিশ্বের অংশ হিসেবেও তারা নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে পারল।

এটি ছিল এক সুবিধাবাদী জোটভুক্তি। হিসাব-নিকাশের বিবাহ বলা চলে। স্নায়ু যুদ্ধ তখন উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। ফলে ন্যাটোর কাছে তুরস্ককে পাশে পাওয়া মানে ছিল এটা নিশ্চিত হওয়া যে দেশটি অন্তত সামনে কয়েক দশক মস্কোর দিকে ঝুঁকবে না। একই সঙ্গে ন্যাটোর দক্ষিণ সীমান্ত রক্ষা করার জন্যও কাউকে প্রয়োজন ছিল। এদিকে গ্রিসও একই বছরে একই উদ্দেশ্যে ন্যাটোতে যোগ দিয়েছিল। এই দুই দেশ যুক্ত হওয়ায় ন্যাটোর সামরিক শক্তি ও কৌশলগত সক্ষমতা বহুগুণে বেড়ে যায়। তবে দেশ দুইটির পারস্পরিক সম্পর্ক তখনও উত্তেজনাপূর্ণ। কৃষ্ণসাগরে সোভিয়েত নৌবহরের গতিপথ রোধের দায়িত্ব দেওয়া হয় তুর্কি নৌবাহিনীকে, যাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ করতে না পারে। একই সময়ে তুর্কি স্থলবাহিনী মোতায়েন করা হয় বুলগেরিয়া সীমান্তে সোভিয়েত

ব্লকের প্রান্তে, যাতে সোভিয়েত সেনাদের স্থল আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখা যায়। তুরস্কের কৌশলগত গুরুত্ব এতই বেশি ছিল যে ১৯৬০, ১৯৭১ এবং ১৯৮০ সালে তুরস্কে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটলেও ন্যাটো কার্যত সেসব উপেক্ষা করে গেছে। পশ্চিমা দেশগুলো বিব্রত গলায় বলেছিল, 'এটি ওদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার।' কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তুরস্কের ভৌগোলিক অবস্থান ও কৌশলগত গুরুত্বের কারণেই সেখানকার স্বৈরতন্ত্র নিয়ে তারা মাথা ঘামায়নি। ১৯৯০-এর দশকে এসে তুরস্কে বেসামরিক শাসনকে স্বাভাবিক বিষয় হিসেবে দেখা শুরু হয়।

স্নায়ুযুদ্ধের অবসান এক নতুন যুগের সূচনা করেছিল, কিন্তু সেই নতুন যুগেও বেশ কিছু পুরোনো সমস্যা রয়ে যায়। ১৯৯০-এর দশকে এসে গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথ হিসেবে নিজেকে নতুন করে প্রতিষ্ঠিত করে তুরস্ক। ইরাক এবং কাস্পিয়ান সাগর থেকে ইউরোপের দিকে গ্যাস ও তেল সরবরাহের জন্য আনাতোলিয়া ভূখণ্ডের ওপর দিয়ে পাইপলাইন নির্মাণ করে তারা। তারা গড়ে তোলে ন্যাটোর অন্যতম বৃহৎ ও দক্ষ সেনাবাহিনী। এই বিষয়টি নতুন বিশ্ব পরিস্থিতির মধ্যে আত্মবিশ্বাস এনে দেয় দেশটিকে। স্নায়ুযুদ্ধের সময় গোটা দুনিয়াজুড়ে, বিশেষ করে তুরস্কের আশেপাশে অনেক সমস্যা চাপা পড়ে ছিল। বিশ্ব যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র এই দুই মেরুর প্রভাব থেকে বেরিয়ে বহুমেরু ব্যবস্থায় প্রবেশ করতে শুরু করল, তখন সেই চাপা পড়া সমস্যাগুলোও প্রকট হয়ে উঠতে শুরু করে। এই সময়ে এসে ছোট এবং মাঝারি আকারের রাষ্ট্রগুলো তাড়াহুড়ো করে নিজেদের নতুন অবস্থান ঠিক করতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। তুরস্কও এই পরিবর্তনের অংশ হয়ে ওঠে।

বলকান অঞ্চলে নতুন করে যুদ্ধ শুরু হয় ১৯৯১ সালে। কিন্তু তার আগেই এক নতুন সংকটের সম্মুখীন হয় তুরস্ক। ইরাকের ভেতরে 'অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম' শুরু হতেই লাখ লাখ ইরাকি কুর্দি সাদ্দাম হোসাইনের সেনাবাহিনী থেকে বাঁচার জন্য পালিয়ে এসে তুরস্কের সীমান্তে আশ্রয় নেয়। সাদ্দামের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক হস্তক্ষেপ নিয়ে তুরস্ক আপত্তি করেনি। কিন্তু যুদ্ধ-পরবর্তী বাস্তবতায় যে সমস্যার জন্ম নিল, তা তাদের দুশ্চিন্তায় ফেলে দেয়। তুরস্ক এতটা আশা করেনি। ইরাকের উত্তরাঞ্চলে গড়ে ওঠে এক আধা-স্বায়ত্তশাসিত কুর্দি অঞ্চল তুরস্কের জন্য অত্যন্ত সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ, নিজের ভূখণ্ডেও তুরস্ক তখন কুর্দি জাতীয়তাবাদ দমন করতে ব্যস্ত ছিল। এরপর আরেকটি পুরোনো উসমানি ভূখণ্ড রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মধ্যে পড়ে। ১৯৯০ সালে যুগোস্লাভিয়া ভেঙে

যাওয়ার পর অতি জাতীয়তাবাদী নেতাদের উস্কানিবশত বসনিয়া, ক্রোয়েশিয়া, সার্বিয়া, কসোভো ও মেসিডোনিয়ায় জাতিগত সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছিল। আঙ্কারা এসব অঞ্চলে পণ্য রপ্তানি করতে চেয়েছিল, কিন্তু পেয়েছিল অনিশ্চয়তা ও সহিংসতার প্রতিধ্বনি। এই সহিংসতায় চাপা পড়ে যায় অন্য এক প্রাক্তন উসমানি ভূখণ্ডে সংঘাতের খবর—নাগোর্নো-কারাবাখ নিয়ে আর্মেনিয়া ও আজারবাইজানের মধ্যে যুদ্ধ। এছাড়াও ককেশাস ও মধ্য এশিয়ায় রাশিয়া ও ইরানের প্রভাব নিয়ে তুরস্ক উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। তারা স্পষ্টভাবেই তুরস্কের পথ রোধ করতে চাচ্ছিল।

এই সময় পর্যন্ত তুরস্ক ছিল পুরোপুরি পশ্চিমমুখী। তাদের দৃষ্টি ছিল ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দিকে। স্বপ্ন ছিল একদিন এই অভিজাত ক্লাবে সদস্যপদ অর্জন করবে তারা। কিন্তু শতাব্দী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই স্বপ্ন ধীরে ধীরে ফিকে হয়ে আসতে শুরু করেছে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে প্রবেশের জন্য যে অর্থনৈতিক মানদণ্ড পূরণ করতে হয়, তুরস্ক তা করতে পারেনি। দেশটির মানবাধিকার পরিস্থিতিও ভয়াবহ। তবে এখানে ইউরোপের সাথে তুরস্কের সাংস্কৃতিক পার্থক্যও কিছুটা অসুবিধা তৈরি করেছিল। ইইউ-এর মধ্যে একটি অব্যক্ত কিন্তু সুস্পষ্ট ইউরোপীয় দৃষ্টিভঙ্গিও কাজ করেছে। তুরস্ককে তারা 'প্রকৃত ইউরোপীয়' মনে করে না। ইইউ-এর প্রত্যাখ্যানের পর তুরস্ক ধীরে ধীরে পরিবর্তনের দিকে এগোয়। অভ্যন্তরীণ রাজনীতির মঞ্চে উঠে আসেন এক নতুন নেতা, যার হাত ধরে এক নতুন পথের সন্ধান শুরু করে তারা। নতুন লক্ষ্য ছিল অতীতের দিকে ফিরে তাকিয়ে ভবিষ্যৎ গঠনের চেষ্টা। একবার এক নেতার পরিকল্পনাতে তারা অতীতকে মুছে আধুনিক হতে চেয়েছিল, এবার আরেক নেতার ইচ্ছায় তারা অতীত আকড়ে ধরতে চাইছে।

নতুন এই নেতাই হলেন রেজেপ তাইয়িপ এরদোয়ান। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে ওঠেন ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের প্রতীক এবং একই সঙ্গে 'নব্য উসমানিবাদ'-এর রূপকার। প্রথমে প্রধানমন্ত্রী এবং পরে রাষ্ট্রপতি হিসেবে এরদোয়ান এমন একটি তুরস্ক গড়ে তুলতে চেয়েছেন, যে দেশ নিজের অবস্থানে স্বাধীনভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। তিনি চেয়েছেন এমন একটি দেশ গড়তে, যে দেশ পশ্চিম ও পূর্ব উভয় শিবিরের সঙ্গে নিজের মতো করে খেলতে পারে। ২০০০-এর দশকে মনে হচ্ছিল তুরস্ক হয়তো আগের মতোই ন্যাটোর বিশ্বস্ত সদস্য থাকবে। তারা হয়তো ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য হওয়ারও চেষ্টা চালিয়ে যাবে। কিন্তু খুব শিগগিরই দেখা গেল ভূগোল, ইতিহাস এবং আদর্শগত বাস্তবতা এই কৌশলের সঙ্গে খাপ

খাচ্ছে না। সময়ের পরিক্রমায় এই পার্থক্যগুলো এক এক করে মাথা তুলে দাঁড়াতে থাকে এবং তুরস্কের চিন্তাধারা সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে মোড় নেয়।

এরদোয়ান কতটা 'ইসলামপন্থী'—এ নিয়ে বিতর্ক আছে। অনেকে মনে করেন, ইসলাম সম্পর্কে তার দৃষ্টিভঙ্গি বেশ কট্টর। তিনি এমন এক রাজনৈতিক দর্শনে বিশ্বাসী যেখানে ইসলাম কেবল সমাজজীবনে নয়, রাষ্ট্রনীতিতেও সক্রিয়ভাবে উপস্থিত থাকবে। অনেকে আবার এই ব্যাপারে সন্দেহও পোষণ করেন। তবে, ইস্তাম্বুল শহরের এক দরিদ্র এলাকা থেকে উঠে এসে তিনি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সুযোগ সুযোগ পান, সে সময় ইসলামপন্থীই ছিলেন তিনি। ১৯৯৪ সালে তিনি ইসলামপন্থী ওয়েলফেয়ার পার্টির প্রার্থী হিসেবে ইস্তাম্বুলের মেয়র নির্বাচিত হন। কিন্তু ১৯৯৯ সালে এক সভায় একটি ইসলামপন্থী কবিতা আবৃত্তির জন্য তাকে চার মাসের কারাদণ্ড ভোগ করতে হয়। এই ধরনের কবিতা সে সময়ের ধর্মনিরপেক্ষ সরকারের চোখে ছিল 'উস্কানিমূলক'। এই কবিতায় লেখা ছিল—

"মসজিদ আমাদের ব্যারাক,
গম্বুজ আমাদের শিরস্ত্রাণ,
মিনার আমাদের বেয়নেট,
আর বিশ্বাসীরা আমাদের সৈনিক।"

কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়ার পর জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি বা 'একেপি' নামে নতুন একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন এরদোয়ান। দলের নামের সংক্ষিপ্ত রূপ একপিকে আরো সংক্ষেপে 'আক' নামে ডাকা হয়। তুর্কি ভাষায় এর অর্থ সাদা বা পরিচ্ছন্ন। এটি ছিল কৌশলগতভাবে চমৎকার একটি নামকরণ। পুরোনো রাজনৈতিক দলগুলো থেকে নিজেদের আলাদা ও পরিচ্ছন্ন হিসেবে তুলে ধরার জন্য এটি ছিল কার্যকর একটি নাম। তবে দলটির মূল শিকড় ছিল ওয়েলফেয়ার পার্টির মধ্যেই। ২০০২ সালের নির্বাচনে একেপি ক্ষমতায় আসে, আর এর পরের বছর এরদোয়ান প্রধানমন্ত্রী হন। এতে অবশ্য প্রমাণ মেলে না যে তিনি ইসলামপন্থীই ছিলেন। কারণ, এরদোয়ান যথেষ্ট কৌশলী। প্রয়োজন অনুযায়ী যে ভোটারগোষ্ঠীর সমর্থন প্রয়োজন, তাকেই তিনি আকৃষ্ট করতে জানতেন। তবে তিনি একজন প্রকাশ্য জাতীয়তাবাদী এবং গণতন্ত্রের প্রতি তার আন্তরিকতা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব ফুটে ওঠে তার এই মন্তব্যে, "গণতন্ত্র হলো এক ধরনের বাসযাত্রা। আমার গন্তব্যে পৌঁছে গেলে আমি নেমে

যাব।” একেপির উত্থান আধুনিক তুরস্কের ইতিহাসে এক বড় পরিবর্তনের সূচনা করে। আধুনিক তুরস্ক রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল মুস্তাফা কামাল আতাতুর্কের ধর্মনিরপেক্ষতা নীতিকে ভিত্তি করে। আর এখন দেশটির শাসনভার এল এমন এক দলের হাতে যার শেকড় ছিল ইসলামপন্থায়। যার নীতিনির্ধারকেরা ন্যাটো নিয়ে উদাসীন এবং সাবেক উসমানি সাম্রাজ্যে তাদের প্রভাবহীনতা নিয়ে হতাশ। এরদোয়ান যথেষ্ট 'স্ট্রিট-স্মার্ট' ছিলেন। তিনি খুব ভালোভাবেই জানতেন ইস্তাম্বুলের উদারপন্থী বা পশ্চিম ঘেঁষা বুদ্ধিজীবীরা আসলে গোটা দেশের প্রতিনিধিত্ব করে না। তারা এমনকি ইস্তাম্বুল শহরের সংখ্যাগরিষ্ঠেরও প্রতিনিধিত্ব করে না। কারণ গত কয়েক দশকে গ্রামাঞ্চল থেকে বিপুল সংখ্যক রক্ষণশীল, ধর্মভীরু মানুষ কাজের খোঁজে ইস্তাম্বুলে এসে বসতি স্থাপন করেছে। আর তারা নিয়ে এসেছে ভিন্ন এক সামাজিক বাস্তবতা।

এরদোয়ানের পররাষ্ট্রনীতি বোঝার অন্যতম চাবিকাঠি হতে পারে একেপির আরেক গুরুত্বপূর্ণ নেতা প্রফেসর আহমেত দাভুতোগলুর চিন্তাধারা ও কূটনৈতিক দর্শন। একসময় তিনি তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন, পরে প্রধানমন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০০১ সালে প্রকাশিত তার বই 'স্ট্র্যাটেজিক ডেপথ' আধুনিক তুরস্কের পররাষ্ট্রনীতির মূল অবকাঠামো হিসেবে বিবেচিত হয়। এই বইকে ভিত্তি করেই এরদোয়ানের নব্য তুরস্কের পররাষ্ট্রনীতি তৈরি হয়েছে। দাভুতোগলুর মূল বক্তব্য ছিল, ভূগোলকে অবশ্যই গতিশীলভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে। শুধু স্থিতাবস্থা ধরে রাখা নয়, বরং প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলে নিজে আক্রমণে যাওয়া—এটিই হবে তুরস্কের কৌশলগত দিকনির্দেশনা। এই দৃষ্টিভঙ্গিকে কৌশলগত গভীরতার সম্প্রসারণ বলা যেতে পারে।

দাভুতোগলুর মতো এরদোয়ানও একজন নব্য-উসমানি। তাদের বিশ্বাস, পশ্চিমা শক্তির প্রভাব যত কমবে, তুরস্কের পরাশক্তি হয়ে ওঠার সম্ভাবনা ততই বাড়বে। ১৯৯০-এর দশক ছিল তুরস্কের শক্তি বৃদ্ধির একটা গুরুত্বপূর্ণ পর্ব। সোভিয়েত ইউনিয়নের পতনের পর এই অঞ্চলে এমন কোনো শক্তিই ছিল না যার পক্ষে তুরস্কের সুশৃঙ্খল এবং আধুনিকায়িত সেনাবাহিনীর মোকাবিলা করা সম্ভব। সত্তর বছর পর তুরস্ক প্রথমবারের মতো এমন একটা পর্যায়ে পৌঁছেছিল, যেখানে সামরিক শক্তি ব্যবহার করা শ্রেফ আত্মরক্ষার বিষয় নয় বরং একটি কৌশলগত পছন্দ। সামরিক শক্তিকে নিজেদের ইচ্ছেমতো প্রয়োগ করার অবস্থান আবারও ফিরে পেয়েছে তারা।

তবে ৯/১১-পরবর্তী বিশ্ব-পরিস্থিতিতে তুরস্ককে অনেকটাই সতর্ক হয়ে চলতে হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র তখন বিশ্বজুড়ে 'সন্ত্রাসবিরোধী যুদ্ধ' চালাচ্ছে। এই সময়ে তুরস্কের পররাষ্ট্রনীতির মূল স্লোগান হয়ে দাঁড়ায়—'প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোনো সমস্যা নয়'। ২০০০-এর দশকজুড়ে এই নীতিতে অটল থেকে পশ্চিমা শক্তিগুলোর সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রেখেছে আঙ্কারা। পাশাপাশি বাণিজ্য, কূটনীতি ও সফট পাওয়ারের মাধ্যমে বলকান ও মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব বিস্তারের প্রচেষ্টা শুরু করেছে তারা। এই দশকে তারা বসনিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নে চেষ্টা চালায়, ইসরায়েল ও সিরিয়ার মধ্যে মধ্যস্থতা করে, ফাতাহ ও হামাসের মতো পরস্পরবিরোধী ফিলিস্তিনি গোষ্ঠীগুলোকে এক টেবিলে বসানোর চেষ্টা করে, এমনকি ঐতিহ্যগতভাবে বৈরী রাষ্ট্র আর্মেনিয়ার দিকেও বন্ধুত্বের হাত বাড়ায়। এইসব প্রচেষ্টা আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে শিরোনাম হয়েছিল, কিন্তু বাস্তব অগ্রগতি খুব একটা হয়নি। এছাড়া, এই 'শূন্য সমস্যা' নীতিরও কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। যদি আপনি প্রতিবেশীদের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করেন, তাহলে অনেক ঝামেলাই এড়ানো যায়। কিন্তু আপনি যদি দেখতে পান আপনার আশেপাশে অন্য পরাশক্তি সক্রিয় হয়ে উঠেছে, তখন নিরপেক্ষ অবস্থান ধরে রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে আপনি নিশ্চুপ বসে থাকতে পারবেন না।

২০১০-এর দশকে এসে তুরস্কের কোমল কূটনীতি তার কার্যকারিতা হারাতে শুরু করে। আর ২০১১ সালে আরব বসন্ত শুরু হওয়ার পর এই নীতি কার্যত ভেঙেই পড়ে। 'প্রতিবেশীদের সঙ্গে কোনো সমস্যা নয়' নীতি পরিবর্তিত হয়ে প্রায় 'কোনো বন্ধু নয়' নীতিতে পরিণত হয়।

তুরস্ক ও ইসরায়েলের মধ্যে দুই দশকের সহযোগিতামূলক সম্পর্ক এই সময়ে এসে দ্রুত ভেঙে পড়তে শুরু করে। ইসলামপন্থী ও জাতীয়তাবাদী নেতারা দীর্ঘদিন ধরে দাবি করছিলেন যে, ইসরায়েলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তুরস্ককে তার জনগণের আবেগ ও ঐতিহাসিক পরিচয় থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। একেপি সরকারের সমর্থকদের মধ্যেও ইসরায়েলপন্থী মানুষের সংখ্যা খুব বেশি ছিল না। ফলে ২০০৮ সালের ইসরায়েল-গাজা সংঘর্ষ দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক শীতল করার একটি অজুহাত হয়ে দাঁড়ায়। পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যেই দুই দেশের যৌথ সামরিক মহড়া বাতিল করা হয়, হামাসের নেতাদেরকে তুরস্কে স্বাগত জানানো হয় এবং তুর্কি টেলিভিশনে একের পর এক ইসরায়েল-বিরোধী চলচ্চিত্র প্রচার হতে থাকে। এরদোয়ানও প্রকাশ্যে ইহুদি-বিরোধী বক্তব্য দিতে থাকেন।

তুরস্ক আরব বসন্তকে দেখেছিল প্রাক্তন উসমানি শাসিত অঞ্চলে নিজেদের প্রভাব ফিরিয়ে আনার একটি সুযোগ হিসেবে। কিন্তু একের পর এক ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে বারবার ভুল পক্ষকে সমর্থন করেছে তারা। আঙ্কারা মনে করেছিল মধ্যপ্রাচ্যে প্রভাব বিস্তারের যথেষ্ট সুযোগ থাকলেও বলকান অঞ্চলে সেই সুযোগ তুলনামূলক কম। কারণ, বলকান রাষ্ট্রগুলো তুরস্কের পরিবর্তে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়তে বেশি আগ্রহী। কিন্তু সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত এবং মিশরের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন। সৌদি আরব নিজেকে মক্কা ও মদিনার 'দুই পবিত্র মসজিদের রক্ষক' হিসেবে দেখে এবং ইসলামি বিশ্বের আধ্যাত্মিক নেতৃত্বের দাবিদার মনে করে। সংযুক্ত আরব আমিরাত তাদের বিপুল অর্থনৈতিক সম্পদ কাজে লাগিয়ে পুরো অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করতে চায়। মিশরও ঐতিহ্যগতভাবে নিজেকে প্রধান আরব শক্তি হিসেবে দেখে আসছে দীর্ঘদিন ধরে। তুরস্কের নব্য-উসমানিবাদী পুনরুত্থানের প্রচেষ্টাকে ভালোভাবে নেয়নি তারা। ফলে, আঙ্কারা যখনই মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষমতার খেলায় প্রবেশ করতে চাইল, তখন থেকেই এই তিন দেশের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে ওঠে।

প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান দীর্ঘদিন ধরেই মুসলিম ব্রাদারহুডের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখে চলেছেন। এটি একটি সুন্নি ইসলামপন্থী আন্তর্জাতিক সংগঠন, যাদের মূল উদ্দেশ্য হলো শরিয়াভিত্তিক বৈশ্বিক খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা। গোপন সাংগঠনিক কাঠামো এবং ধর্মভিত্তিক আদর্শের কারণে মধ্যপ্রাচ্যের অধিকাংশ সরকারই তাদের ঘৃণা করে। কারণ, আরবের এইসব শাসকরা হয় রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী, না হয় ধর্মীয় দিক থেকে তুলনামূলকভাবে উদার। তাই তারা জানে ব্রাদারহুডের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় তারাই হবে প্রথম টার্গেট। মিশরে ১৯২০-এর দশকে মুসলিম ব্রাদারহুড প্রতিষ্ঠিত হয়। দশকের পর দশক ধরে তারা সেখানে নির্মম দমন-পীড়নের শিকার হয়েছে। আরব বসন্তের সময় ২০১২ সালে মিশরের শাসক হোসনি মোবারকের পতনের পর অনুষ্ঠিত নির্বাচনে জয়ী হয় মুসলিম ব্রাদারহুডের রাজনৈতিক শাখা 'ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস পার্টি'। এরদোয়ান এতে দারুণ খুশি হয়েছিলেন। তিনি ভেবেছিলেন—মিশর, লিবিয়া এবং তিউনিশিয়ার নতুন ইসলামপন্থী সরকারগুলোর সঙ্গে একটি কৌশলগত সম্পর্ক গড়ে তুলবেন, সেখানে নেতৃত্বে থাকবে তুরস্ক। কিন্তু পরের বছরেই চিত্র বদলে যায়। ব্রাদারহুড সরকারের বিরুদ্ধে কয়েক মাসব্যাপী গণআন্দোলনের পর এক সামরিক অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত হয় তারা। এই অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে কড়া প্রতিবাদ জানান এরদোয়ান। ফলে নতুন রাষ্ট্রপতি ও সেনাপ্রধান জেনারেল আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসির সঙ্গে

তার সম্পর্ক একদম তলানিতে গিয়ে ঠেকে। বর্তমানে সিসিসহ আরো কয়েকজন আঞ্চলিক নেতা তুরস্ককে ইসলামপন্থী উগ্রপন্থার পৃষ্ঠপোষক হিসেবে দেখেন। শুধু মুসলিম ব্রাদারহুডই নয়, আরো কয়েকটি বিতর্কিত ইসলামপন্থী গোষ্ঠীর সঙ্গেও ঘনিষ্ঠতা থাকার অভিযোগ আছে তুরস্কের বিরুদ্ধে। এই উত্তেজনার মধ্যেই কায়রোয় নিযুক্ত তুরস্কের রাষ্ট্রদূতকে বহিষ্কার করা হয়। দুই দেশের সম্পর্ক আজও পুরোপুরি স্বাভাবিক হয়নি। তবে দুই পক্ষই যথেষ্ট বাস্তববাদী। ফলে রাজনৈতিক উত্তেজনা থাকা সত্ত্বেও অর্থনৈতিক সম্পর্ক মোটামুটি বজায় রেখেছে তারা।

এরদোয়ান ও সিসি দুজনেই কট্টর জাতীয়তাবাদী। নিজ নিজ দেশের ইতিহাস ও আঞ্চলিক ভূমিকাকে ঘিরে দুজনেরই এক ধরনের আবেগপ্রসূত দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। কিন্তু উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গির অবস্থান পরস্পরের বিপরীত মেরুতে। আদর্শগত এবং কৌশলগত এই বিভাজনই পরবর্তীতে লিবিয়ায় তাদের মুখোমুখি দাঁড় করায় এবং পূর্ব ভূমধ্যসাগরে প্রতিযোগিতার ময়দান তৈরি করে। সিসির কাছে লিবিয়া হলো তর বাড়ির পেছনের আঙ্গিনার মতো। সেখানে কোনোভাবেই মুসলিম ব্রাদারহুড-সমর্থিত কোনো সরকারকে ক্ষমতায় আসতে দিতে দিতে রাজি নন তিনি। এরদোয়ানের দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক উল্টো। তার কাছে লিবিয়া হলো এমন একটি স্থান, যেখানে ব্রাদারহুডপন্থী সরকারকে সমর্থন দিয়ে একদিকে আদর্শগত অবস্থান জাহির করা যায়, অন্যদিকে পুরোনো উসমানি ভূখণ্ডে তুরস্কের সক্রিয় উপস্থিতিও নিশ্চিত করা যায়।

সিরিয়ার গৃহযুদ্ধ ঘিরেও আরেক দফা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যায় এই দুই দেশ। শুরুতে এই বিদ্রোহ ছিল রাষ্ট্রপতি বাশার আল আসাদের বিরুদ্ধে। আসাদ আলাওইত শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। ২০১১ সালে সিরিয়ায় গৃহযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর সুন্নি জনগণের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিয়েছিল একাধিক ইসলামপন্থী গোষ্ঠী। আঙ্কারা খুব দ্রুতই সেই ইসলামপন্থী গোষ্ঠীগুলোর প্রতি সমর্থন জানায়। এই পরিস্থিতিকে 'সুন্নি মুসলিমদের ত্রাণকর্তা' হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার একটি সুযোগ হিসেবে দেখেন এরদোয়ান। দামেস্কে তুরস্ক-সমর্থিত সরকার বসানোর পরিকল্পনা ছিল তার। অন্যদিকে, মিশরে সিসি ক্ষমতায় আসার পরপরই আসাদ সরকারের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক করার উদ্যোগ নেয় কায়রো। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মিশর ও সিরিয়ার মধ্যে ভিন্নতা থাকলেও তারা উভয়েই ইসলামপন্থীদের রাজনৈতিক উত্থানকে সবথেকে বড় হুমকি হিসেবে বিবেচনা করে। সিসির দৃষ্টিতে, আসাদ সরকার যত খারাপই হোক না কেন, দামেস্কে তুরস্ক-

সমর্থিত সরকার আসার চেয়ে তা অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য। ২০১৬, ২০১৮ এবং ২০১৯ সালে সিরিয়ার উত্তরাঞ্চলে অভিযান চালায় তুর্কি বাহিনী। মিশর আগে থেকেই দাবি করে আসছিল যে আরব বিশ্ব এক নব্য-উসমানি সম্প্রসারণবাদী হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। এই ঘটনা মিশরের দাবিকে আরো জোরালো করে তোলে।

তুরস্কের দৃষ্টিকোণ থেকে সিরিয়ায় তাদের সামরিক অভিযান ছিল একদম অপরিহার্য। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল—সিরিয়ার ভেতরে যেন কোনো স্বায়ত্তশাসিত কুর্দি অঞ্চল গড়ে উঠতে না পারে। কারণ, এমন একটি স্বাধীন কুর্দি অঞ্চল ভবিষ্যতে তুরস্কের কুর্দি-প্রধান প্রদেশগুলোর সঙ্গে যুক্ত হওয়ার চেষ্টা করতে পারে। তবে কুর্দি ইস্যুর বাইরেও তুরস্কের আরেকটি বড় উদ্দেশ্য ছিল রাশিয়ার প্রভাব ঠেকানো। ২০১৬ সালে মস্কো যখন আসাদ সরকারকে সরাসরি সামরিক সহায়তা দেওয়া শুরু করে, তখন আঙ্কারা তৎপর হয়ে ওঠে। তৃতীয়ত, তুরস্ক চেয়েছিল আর যেন নতুন করে শরণার্থীর ঢল না নামে। কারণ, তখন পর্যন্ত তুরস্ক ৩.৫ মিলিয়নেরও বেশি সিরিয়ান শরণার্থী গ্রহণ করেছিল। তুর্কিরা মনে করে যে, এত বিপুল সংখ্যক শরণার্থীকে আশ্রয় দেওয়া সত্ত্বেও ইউরোপের তুলনায় তারা আন্তর্জাতিক মহলে যথাযথ স্বীকৃতি পায়নি। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তুরস্কের অভ্যন্তরে শরণার্থী-বিরোধী মনোভাব বাড়তে থাকে। এরদোয়ানও এক পর্যায়ে এসে যত বেশি সম্ভব শরণার্থীকে দেশ থেকে সরানোর পরিকল্পনা হাতে নেন। কিন্তু আঙ্কারার দাবি ছিল তারা সিরিয়ায় সেনা পাঠাতে বাধ্য হয়েছে আইএস এর সন্ত্রাসী হুমকি ঠেকানোর জন্য। তুরস্ক সিরিয়ায় প্রবেশ করার পর ন্যাটো তাদের সহায়তা করতে অস্বীকৃতি জানায়। অথচ সম্ভাব্য রুশ আগ্রাসন মোকাবিলায় ন্যাটো ২০১৭ সালে লিথুয়ানিয়ায় অতিরিক্ত সেনা পাঠিয়েছিল। ন্যাটোর এই দ্বৈত নীতির প্রতি সে সময় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন এরদোয়ান। তার ভাষায়, এটি ছিল তুরস্কের নিরাপত্তার জন্য এক সংকটময় মুহূর্ত।

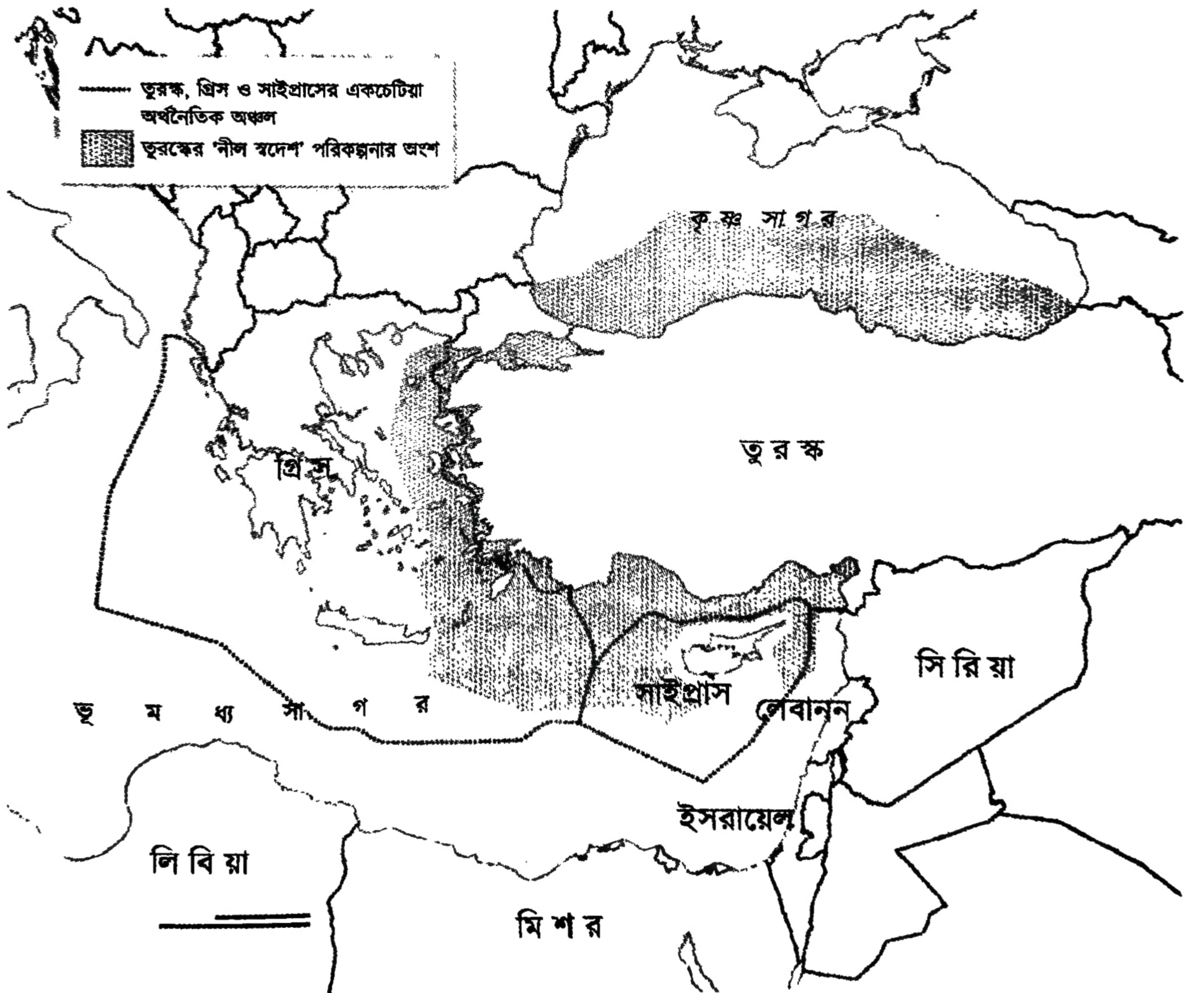
এই অভিজ্ঞতাগুলো থেকেই এরদোয়ান আরো বেশি কর্তৃত্ববাদী হয়ে উঠতে থাকেন। তিনি তুরস্ককে ধীরে ধীরে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ও ন্যাটো থেকে দূরে সরিয়ে নিতে শুরু করেন এবং একপ্রকার একা পথচলার কৌশল গ্রহণ করেন। অবশ্য আগে থেকেই ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে তুরস্কের সম্পর্কে টানাপোড়েন চলছিল। আর্মেনীয় জেনোসাইড অস্বীকার করার ঘটনা ২০০০-এর দশকে তুরস্কের বিরুদ্ধে বড় এক বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল। জার্মানি, কানাডা, ফ্রান্স, ইতালি,

পোল্যান্ড, রাশিয়া, ভ্যাটিকান এবং যুক্তরাষ্ট্র—সকলেই ঘটনাটিকে জেনোসাইড হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। কূটনৈতিক এবং বাণিজ্য আলোচনার পটভূমিতে বিষয়টি প্রায়শই অদৃশ্য ছায়ার মতো ঘুরপাক খায়। এই অভিযোগ তুরস্ককে সবসময় প্রচণ্ডভাবে ক্ষুব্ধ করে তোলে। বলা যায়, এটি সেই বিরল ইস্যুগুলোর একটি, যা একজন তুর্কিকে সহজেই উত্তেজিত করে তুলতে পারে। কয়েক বছর আগে প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান মন্তব্য করেছিলেন, আর্মেনীয় প্রবাসীরা তুরস্কের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়ানোর চেষ্টা করছে। তিনি বলেছিলেন, "আমরা যদি বিগত ১০০ থেকে ১৫০ বছরের ইতিহাসে চোখ বুলাই, তাহলে দেখতে পাব আর্মেনীয়দের তুলনায় আমাদের জাতির ভোগান্তি ছিল অনেক বেশি।" তবে এই দৃষ্টিভঙ্গি অনেক দেশের কাছেই গ্রহণযোগ্য নয়।

২০১৬ সালে এরদোয়ানের বিরুদ্ধে একটি রক্তক্ষয়ী সামরিক অভ্যুত্থান ঘটলেও তা ব্যর্থ হয়। এরপর থেকে ন্যাটোর সঙ্গে তুরস্কের দূরত্ব আরো বেড়ে যায়। সেই সময়ে সামরিক বাহিনীর কয়েকটি ছোট গ্রুপ ইস্তাম্বুল শহরের সবগুলো সেতু ও টিভি স্টেশন দখল করে নিয়েছিল। এর পরপরই সরকার সমর্থকদের সাথে তাদের ভয়াবহ সংঘর্ষ শুরু হয়। এই সংঘর্ষে নিহত হয় অন্তত ৩০০ জন। তবে নিয়ন্ত্রণ পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হয় সরকারের সমর্থকরা। এই ঘটনার পর এরদোয়ান ব্যাপক দমনপীড়ন চালান। দশ হাজারেরও বেশি মানুষকে পাঠানো হয় কারাগারে। অভ্যুত্থানপন্থী হিসেবে সন্দেহের বশে সামরিক বাহিনী, গণমাধ্যম, পুলিশ, প্রশাসন ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ছাঁটাই করা হয় বিপুল সংখ্যক মানুষকে। পর্যাপ্ত প্রমাণ না থাকলেও এরদোয়ান ইঙ্গিত দেন যে এই অভ্যুত্থান আসলে ছিল মার্কিনিদের সহায়তায় সংঘটিত একটি বিশাল ষড়যন্ত্র। এরদোয়ানের অনেক সমর্থকও খোলাখুলিভাবে দাবি করে যে, এই অভ্যুত্থানের পেছনে ওয়াশিংটনের হাত ছিল।

সাম্প্রতিক কালে তুরস্কের সামরিক মহলে 'মাভি ভাতান' বা 'নীল স্বদেশ' নামে একটি ধারণা জনপ্রিয় হয়েছে। এই ধারণার সমর্থকরা তাদের দেশের ন্যাটো সদস্যপদ নিয়ে অসন্তুষ্ট। তারা মনে করেন, এটি একটি মার্কিন ষড়যন্ত্র। যে জোটে সহযোগী হিসেবে গ্রীস রয়েছে সেটা তাদের জন্য ভালো হতে পারে না। ন্যাটো জোটে তাদের রাখার উদ্দেশ্যই হচ্ছে তুরস্ককে তার 'যথাযোগ্য' স্থান দখল করা থেকে বঞ্চিত রাখা। প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানও হয়তো এই বিশ্বাসের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন। নীল স্বদেশের ধারণা অনুযায়ী, তুরস্ককে তার চারপাশের তিনটি সমুদ্র—কৃষ্ণসাগর, এজিয়ান সাগর এবং পূর্ব ভূমধ্যসাগরে আধিপত্য বিস্তার করতে হবে। এই মতাদর্শ প্রকাশ্যেই

প্রচারিত হয়। তবে এর অন্তরালে রয়েছে একটি সুদূরপ্রসারী কৌশল, যার মাধ্যমে ১৯২৩ সালের 'লুজান চুক্তি'কে অগ্রাহ্য করার পরিকল্পনা করা হচ্ছে। লুজান চুক্তির মাধ্যমেই উসমানি সাম্রাজ্য আনুষ্ঠানিকভাবে ভেঙে গিয়ে তুরস্ক নামে নতুন রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল। সেই সময় কিছু ভূখণ্ডের ওপর দাবি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় তুরস্ক। নীল স্বদেশের এই ধারণাটিকে জনপ্রিয় করে তোলেন তুরস্কের সাবেক রিয়ার অ্যাডমিরাল জেম গুরদেনিজ। ২০০৬ সালে তিনিই প্রথম এই পরিভাষাটি তৈরি করেছিলেন। নৌবাহিনী থেকে অবসর নেওয়ার পর নিজের ভাবনাকে জনসমক্ষে তুলে ধরার জন্য সক্রিয় প্রচার শুরু করেন তিনি। এই মতবাদ বর্তমানে তুরস্কের জাতীয়তাবাদী কৌশলে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান তৈরি করেছে।



চিত্র: ওপরের মানচিত্রের গাঢ় অংশে তুরস্কের 'নীল স্বদেশ' ধারণার ভৌগোলিক সীমানা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এই পরিকল্পনার মাধ্যমে তুরস্ক তার চারপাশের সাগরগুলোর বড় অংশ নিয়ন্ত্রণ করতে চায়।

ওপরে যে দৃষ্টিভঙ্গির কথা বলা হয়েছে, তা একটি বৃহত্তর ধারণাকে বোঝায়। তবে জনপ্রিয় আলোচনায় 'নীল স্বদেশ' বলতে এখন মূলত এজিয়ান ও পূর্ব ভূমধ্যসাগরে গ্রিসকে ঘিরে আঙ্কারার নীতিকেই বোঝানো হয়। 'গ্রিস' অধ্যায়ে আমরা দেখেছি, সাগরতলের গ্যাসক্ষেত্র আবিষ্কার দীর্ঘদিনের উত্তেজনাকে আরো জটিল করে তুলেছে। ১৯৭৪ সালে সাইপ্রাসে তুরস্কের আগ্রাসনের পর থেকেই পূর্ব ভূমধ্যসাগর নিয়ে গ্রিস ও তুরস্কের মধ্যে বিরোধ আরো বেড়ে গেছে। অ্যাডমিরাল গুরদেনিজ এই পরিস্থিতিকে ব্যবহার করেছেন নিজের মতবাদকে জোরালো করার জন্য। তার প্রণীত মানচিত্রগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায়, অনেক গ্রিক দ্বীপপুঞ্জকেও তুরস্কের নিয়ন্ত্রণাধীন হিসেবে দেখানো হয়েছে। তার এই তত্ত্বের প্রভাব এতটাই ব্যাপক যে তুরস্কের নেভাল ওয়ার কলেজের সাময়িকীর নাম রাখা হয়েছে 'মাভি ভাতান'। এমনকি ২০১৯ সালে তুরস্ক যে বিশাল সামরিক মহড়া চালিয়েছিল, সেটির নামও ছিল 'মাভি ভাতান'। গুরদেনিজের অবস্থান স্পষ্ট এবং তা ব্যাপকভাবে সমর্থিত। তিনি নিজেও একাধিক উসকানিমূলক মন্তব্য করেছেন। তার মধ্যে একটি হলো, "সামরিক শক্তির অভাবে গ্রিস যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের ওপর নির্ভর করে তাদের হয়ে কথা বলার জন্য... তাদের নিজেদের অবস্থান বোঝা উচিত।" এরদোয়ানও তেমন ভিন্ন নন, শুধু ভাষায় খানিকটা সংযত। তিনি চুক্তিকে সমালোচনা করেছেন এই বলে যে এতে তুরস্ককে অতি ছোট করে ফেলা হয়েছে। এছাড়াও তিনি বলেছেন, "পশ্চিম থ্রেস (গ্রিস), সাইপ্রাস, ক্রিমিয়াসহ বিশ্বের যেকোনো জায়গায় বসবাসরত তুর্কি স্বজাতিদের তুরস্ক অবহেলা করতে পারে না।" আঙ্কারার দবি হলো, লুজান চুক্তিতে নিরপেক্ষ হিসেবে ঘোষিত দ্বীপগুলোতে সৈন্য মোতায়েন করে গ্রিস চুক্তি লঙ্ঘন করেছে।

ক্রিমিয়াও একসময় উসমানি সাম্রাজ্যের অংশ ছিল। ক্রিমিয়া নিয়ে তুরস্কের উচ্চকণ্ঠ অবস্থান থাকলেও বাস্তবে তারা খুব বেশি কিছু করতে পারে না। কারণ কৃষ্ণসাগরে তুরস্কের নৌবহর সীমিত। অন্যদিকে ২০14 সালে ক্রিমিয়া দখলের পর থেকে সাগরজুড়ে নিজেদের সামরিক উপস্থিতি ব্যাপকভাবে বাড়িয়েছে রাশিয়া। তাই তুরস্কের নৌবাহিনী কৃষ্ণসাগরের বদলে এখন বেশি মনোযোগ দিচ্ছে এজিয়ান এবং পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে। আর এই অঞ্চল বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম জটিল ভূরাজনৈতিক দাবা বোর্ডে পরিণত হয়েছে। তবে এখানে তুরস্ককে প্রতিবেশীদের কাছ থেকে সরাসরি প্রতিরোধের মুখে পড়তে হচ্ছে। তুরস্কের চ্যালেঞ্জ অবশ্য এখানেই থেমে নেই। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাক্তন উসমানি অঞ্চলে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সম্মুখীন হচ্ছে তারা। আর সেটি হলো আজারবাইজান। আজারবাইজান অঞ্চলে

ঐতিহাসিকভাবে তুরস্কের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। ২০২০ সালে আজারবাইজান ও আর্মেনিয়ার মধ্যে সংঘর্ষ রুশ কূটনৈতিক হস্তক্ষেপে এক অস্থির সমাপ্তির দিকে যায়। যুদ্ধ থামানোর পরে রুশ শান্তিরক্ষীরা টহলদারি শুরু করলেও তুরস্কের সেনাদের কেবল একটি পর্যবেক্ষণকেন্দ্রে সীমিতভাবে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয়। এই সংঘাতের কেন্দ্র ছিল নাগর্নো-কারাবাখ অঞ্চল, যেখানে জাতিগত আর্মেনিয়ানরা আজারবাইজানের অংশ হতে রাজি ছিল না। তুরস্ক প্রকাশ্যে আজারিদের পাশে দাঁড়ায়, কারণ তারা জাতিগতভাবে তুর্কি জনগোষ্ঠীর অংশ। শেষ পর্যন্ত আজারবাইজানই বিজয়ী হয়। তবে যুদ্ধ থামানোর সিদ্ধান্তমূলক ভূমিকা নেয় মস্কো। অনেকেই পুতিন ও এরদোয়ানের মধ্যে তথাকথিত 'ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের' কথা বলেন, কিন্তু আসলে এমন কোনো সম্পর্ক নেই। যা আছে তা হলো কঠোর বাস্তববাদী ভূরাজনীতি ও একে অপরের নির্মমতার প্রতি পারস্পরিক সম্মান। দুই পক্ষই একে অপরকে ভালোভাবে চেনে। তারা যতটা সম্ভব সংঘর্ষ এড়িয়ে চলে। তবে তারা এটাও জানে যে, কোনো কোনো সময় মুখোমুখি সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী।

২০২০ সালের মধ্যে সিরিয়া, মিশর, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, ইসরায়েল, ইরান, আর্মেনিয়া, গ্রিস, সাইপ্রাস ও ফ্রান্সের সঙ্গে শত্রুতায় জড়িয়েছে তুরস্ক। একই সময়ে রাশিয়া থেকে এস-৪০০ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কিনে ন্যাটো মিত্রদেরও ক্ষুব্ধ করেছে তারা। অ্যামেরিকা বিষয়টিকে আস্থাভঙ্গ হিসেবে দেখেছিল। ওয়াশিংটন স্পষ্ট করে জানায়, এস-৪০০ মূলত নকশা করা হয়েছিল মার্কিন এফ-৩৫ স্টেলথ ফাইটার ভূপাতিত করার জন্য। আর সেই ক্ষোভ থেকেই ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে তারা তুরস্কের প্রতিরক্ষা শিল্পের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে। এর প্রতিক্রিয়ায় এরদোয়ানের এক শীর্ষ উপদেষ্টা যুক্তরাষ্ট্রকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন—"১৯২২ সালে গ্রিসের যে পরিণতি হয়েছিল, তুরস্কে অবস্থানরত অ্যামেরিকান সেনারাও সেই একই পরিণতির মুখোমুখি হতে পারে। তুর্কিরা তাদের শিখিয়ে দেবে কীভাবে এজিয়ান সাগরে সাঁতার কাটতে হয়।" আর ২০২১ সালের শুরুতেই দ্বিতীয় একটি এস-৪০০ সিস্টেম কেনার বিষয়ে মস্কোর সঙ্গে আলোচনা শুরু করে আঙ্কারা।

প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর সঙ্গে আঙ্কারার সম্পর্ক গঠনে প্রভাব ফেলেছে দুইটি বড় অভ্যন্তরীণ চ্যালেঞ্জ। একটি হলো আনাতোলিয়ার উন্নয়ন, আর অন্যটি হলো কুর্দিদের সঙ্গে দীর্ঘস্থায়ী সংঘাত। কুর্দিদের সাথে তুরস্কের সমস্যাকে প্রায়শই "চিরস্থায়ী যুদ্ধ" বলা হয়।

তুরস্কের ৮ কোটি ৫০ লক্ষ জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি বসবাস করে ইস্তাম্বুলের বিস্তৃত নগরাঞ্চল এবং কৃষ্ণসাগর ও ভূমধ্যসাগরের সরু উপকূলীয় সমভূমিতে। বাকিরা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে দেশের দুর্গম ও উঁচু অভ্যন্তরভাগে। সেখানে অনেক পর্বতশৃঙ্গের উচ্চতা ৩,০০০ মিটারেরও বেশি। তুরস্কের সর্বোচ্চ চূড়া হলো আরারাত পর্বত। এর উচ্চতা ৫,১৩৭ মিটার। এই পর্বতশৃঙ্গকেই নূহ (আ.) এর জাহাজের অবতরণস্থল হিসেবে বাইবেলের কাহিনিতে উল্লেখ করা হয়েছে। পাহাড়ি অঞ্চলে গড়ে ওঠা অনুন্নত গ্রামীণ অঞ্চলগুলোর সঙ্গে মর্মর সাগরকেন্দ্রিক সমৃদ্ধ প্রাণকেন্দ্রের যোগাযোগ ঘটানো বরাবরই ছিল একটা চ্যালেঞ্জ। দুর্গম ভূপ্রকৃতির কারণে এটি এখনো চলমান এক প্রচেষ্টা হিসেবেই রয়ে গেছে। তবে আনাতোলিয়ায়, বিশেষত এর পূর্বাঞ্চলে একটা গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ রয়েছে। আর তা হলো প্রচুর পরিমাণে পানি।

ইউফ্রেটিস বা ফোরাত নদীর প্রায় ৯০ শতাংশ এবং টাইগ্রিস বা দজলা নদীর প্রায় ৪৫ শতাংশ জলপ্রবাহের উৎসস্থল আনাতোলিয়ার উচ্চভূমি। ইউফ্রেটিস নদী সিরিয়ার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ইরাকে প্রবেশ করেছে। আর টাইগ্রিস নদী সিরিয়া-ইরাক সীমান্ত দিয়ে ইরাকে প্রবেশ করে এরপর ইউফ্রেটিস নদীর প্রায় সমান্তরালে প্রবাহিত হয়েছে। এই দুইটি নদী দক্ষিণ ইরাকে গিয়ে একীভূত হয়ে শাত-ইল-আরব নাম নিয়ে গিয়ে পড়েছে পারস্য উপসাগরে। এই দুই নদীর মধ্যবর্তী উর্বর অঞ্চলটিই প্রাচীনকালে 'মেসোপটেমিয়া' নামে পরিচিত হয়। মেসোপটেমিয়া শব্দটির অর্থই হলো 'দুই নদীর মধ্যবর্তী ভূমি'। এই অঞ্চল আজও অত্যন্ত উর্বর। কৃষিকাজ, পানীয় জল ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য এই দুইটি নদীর গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে ইউফ্রেটিস নদীর ওপর নির্ভর করে আছে ৬ কোটিরও বেশি মানুষ। আর এই দুই নদীর উৎসস্থল যেহেতু তুরস্কের ভেতরে, তাই পানি প্রবাহের নিয়ন্ত্রণ মূলত আঙ্কারার হাতেই।

১৯৬০-এর দশকের শেষ দিকে টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর ওপর বাঁধ নির্মাণ শুরু করে তুরস্ক। এর ফলে নদীর পানিপ্রবাহ ধীরে ধীরে কমতে থাকে, বিশেষ করে ভাটির দিকে থাকা ইরাক ও সিরিয়ায় পানির প্রবাহ বেশ খানিকটা কমে যায়। এই পানি সংকট দুই প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে তুরস্কের কূটনৈতিক সম্পর্কে বারবার উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। সেই উত্তেজনা আজও চলমান। তুরস্কে নির্মিত হয়েছে শত শত বাঁধ। এর মধ্যে রয়েছে আতাতুর্ক বাঁধ। এটি বিশ্বের বৃহত্তম বাঁধগুলোর একটি। একদিকে দুইটি বাঁধ নির্মাণ, আর অন্যদিকে ভয়াবহ খরার

প্রেক্ষাপটে ১৯৭৫ সালে ইরাক, সিরিয়া ও তুরস্ক যুদ্ধের একদম দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে যায়। ১৯৮৯ সালে সিরিয়ার যুদ্ধবিমান একটি তুর্কি জরিপ বিমান ভূপাতিত করে। পরের বছর তুরস্ক ইউফ্রেটিস নদীর পানিপ্রবাহ সাময়িকভাবে বন্ধ করে দিলে ক্ষুব্ধ ইরাক বোমা হামলার হুমকি দেয়। এ নিয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে যখন তুরস্কের ওপর সমালোচনা শুরু হয়, তখন দেশটির তৎকালীন প্রেসিডেন্ট তুরগুত ওজাল বলেন, "আমরা তো আর আরবদের বলি না তারা কীভাবে তাদের তেল ব্যবহার করবে, তাহলে তারাও যেন আমাদের পানি ব্যবহারে নাক না গলায়।" বাস্তবে, তিন দেশই পরস্পরের সঙ্গে একাধিক চুক্তি করেছে। যার ফলে একদিকে তুরস্ক তার জলবিদ্যুৎ প্রকল্প চালিয়ে যেতে পারে, আবার সিরিয়া ও ইরাকও কিছু নির্দিষ্ট পরিমাণ পানিপ্রবাহ পেয়ে থাকে। তবে, পানিকে কেন্দ্র করে সংঘাতের আশঙ্কা এখনো রয়ে গেছে।

এই পানি-সম্পর্কিত চুক্তিগুলোর মধ্যেই তুরস্কের দুইটি বড় অভ্যন্তরীণ সংকট এসে মিশেছে। একদিকে, দক্ষিণ-পূর্ব আনাতোলিয়া প্রকল্পের অংশ হিসেবে বাঁধ নির্মাণ হচ্ছে, যার লক্ষ্য হলো কর্মসংস্থান সৃষ্টি, বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সেচব্যবস্থা উন্নত করে ওই অঞ্চলের অর্থনীতিকে চাঙা করা। কিন্তু ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীর উৎসস্থল আনাতোলিয়ার সেই অংশে, যেখানে কুর্দি জনগোষ্ঠীর বসবাস। এই জনগোষ্ঠী বহুবার তুর্কি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। একটা সময় পর্যন্ত তুরস্ক সরকার কুর্দিদের জাতিগত পরিচয়ই অস্বীকার করত। সরকারি ভাষায় তাদের বলা হতো 'পার্বত্য তুর্কি'। আঙ্কারা যখন প্রতিবেশীদের সঙ্গে পানি প্রবাহ নিয়ে সমঝোতায় বসে, তখন প্রায়শই শর্ত জুড়ে দেয় যে, সিরিয়া তাদের ভূখণ্ডে সক্রিয় সশস্ত্র কুর্দি গোষ্ঠীগুলোকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে।

তুরস্কের নির্মিত কিছু বাঁধ এই ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রেখেছে। কারণ এসব বাঁধের ফলে অনেক উপত্যকা প্লাবিত হয়েছে, যেগুলো আগে কুর্দি যোদ্ধাদের চলাচল এবং পরিবহনের রুট হিসেবে ব্যবহৃত হতো। নির্মাণকাজের ফলে কুর্দিদের অধ্যুষিত অঞ্চলগুলোর উত্তর ও দক্ষিণ ভাগ একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, যা বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর সংগঠিত হওয়ার ক্ষমতাকে ক্ষীণ করে দিয়েছে। এর প্রতিক্রিয়ায় কুর্দিদের প্রধান গেরিলা সংগঠন কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টি (পিকেকে) একের পর এক হামলা চালিয়েছে এসব প্রকল্পে। তারা কখনো যাওয়ার রাস্তায় বিস্ফোরক স্থাপন করেছে, কখনো নির্মাণ সামগ্রী বহনকারী ট্রাকে আগুন দিয়েছে

এবং আবার কখনো প্রকল্পের শ্রমিকদের অপহরণ করেছে। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে শ্রমিকদের নিরাপত্তা দিতে তুর্কি সেনাবাহিনীও মোতায়েন করতে হয়েছে।

তুরস্কে আনুমানিক ১.৫ কোটি কুর্দি বসবাস করে। দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ১৮ শতাংশই হলো কুর্দি। কুর্দিদের অধিকাংশের বসবাস ইরান, ইরাক ও সিরিয়া সীমান্তবর্তী পূর্ব আনাতোলিয়ার দুর্গম পর্বতাঞ্চলে। এই সীমান্ত পেরিয়েও আরো প্রায় দেড় কোটি কুর্দি ছড়িয়ে আছে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে। এরা মূলত সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতেই বসবাস করে। তবে তুরস্কের কুর্দিরা শুধু পাহাড়েই সীমাবদ্ধ নেই। ১৯৬০-এর দশকে যখন গ্রাম থেকে শহরে অভিবাসনের ঢেউ শুরু হয়, কুর্দিরাও তার অংশ হয়ে ওঠে। আজকের দিনে শুধু ইস্তাম্বুল শহরেই বাস করে প্রায় ২০ লাখ কুর্দি। তারা এই শহরের বৃহত্তম সংখ্যালঘু গোষ্ঠী।

কুর্দিদের বিষয়ে প্রায়ই বলা হয় যে, তারা বিশ্বের সবচেয়ে বড় "রাষ্ট্রবিহীন জাতি"। অবশ্য ভারত ও শ্রীলঙ্কার প্রায় ৭ কোটি ৫০ লক্ষ তামিল জাতিগোষ্ঠী এই ধারণাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে। তবু এটা সত্য যে অন্তত দুই শতাব্দী ধরে স্বাধীন কুর্দি রাষ্ট্রের স্বপ্ন ঘিরে একটি ধারাবাহিক আন্দোলন চলছে। এই দীর্ঘ সময়ে আনাতোলিয়ার কুর্দিরা একাধিকবার উসমানি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। আধুনিক তুর্কি প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধেও প্রায় অবিরত সংঘাতে লিপ্ত আছে তারা।

কুর্দিরা কথা বলে ফারসি ভাষার কাছাকাছি একটি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায়। তবে তুরস্ক, ইরান, ইরাক ও সিরিয়ার কুর্দি অধ্যুষিত অঞ্চলের উপভাষাগুলো এতটাই ভিন্ন যে, অনেক সময় কুর্দিরা নিজেরাই একে অপরকে তাদের ভাষা বোঝাতে হিমশিম খায়। এই ভাষাগত বৈচিত্র্য তাদের ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পথে দীর্ঘদিন ধরে একটি অন্তরায়। যদিও তাদের একত্রিত হয়ে একটি কুর্দিস্তান গড়ার স্বপ্ন বহু পুরোনো। আর ঠিক এই কারণেই প্রতিটি রাষ্ট্রে তারা নিপীড়নের শিকার হয়েছে। চারটি দেশের শাসকেরাই ভয় পায় যে, কুর্দি অধ্যুষিত ভূখণ্ড আলাদা হয়ে গেলে তাদের ভৌগোলিক অখণ্ডতা খর্ব হবে। তাছাড়া সেই ভূখণ্ড পার্শ্ববর্তী তিন দেশের কুর্দি অঞ্চল মিলিয়ে একটি রাষ্ট্রও গঠন করতে পারে, যা তাদের জন্য বহুমাত্রিক চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠবে।

তুরস্ক রাষ্ট্র গঠনের পর থেকেই 'অবিভাজ্য জাতি' গড়ার নামে কুর্দিদের ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। কুর্দিদের একীভূত করার চেষ্টা করা হয় জোরপূর্বক। নিষিদ্ধ করা হয় কুর্দি ভাষার ব্যবহার এবং আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের 'পার্বত্য তুর্কি' নামে উল্লেখ করা হতে থাকে। ১৯২০-এর

দশকে কুর্দি জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। এরপর কয়েক দশক ধরে উত্তেজনা চাপা পড়ে থাকলেও মাঝেমধ্যে সহিংসতা দেখা দিয়েছে। শেষপর্যন্ত ১৯৮০-এর দশকে শুরু হয় পূর্ণমাত্রার বিদ্রোহ। বিদ্রোহের নেতৃত্বে ছিল লেনিনপন্থী কুর্দিস্তান ওয়ার্কার্স পার্টি বা পিকেকে। প্রথমদিকে সংগঠনটি ব্যাপক জনসমর্থন পেয়েছিল। কিন্তু বিরোধী কুর্দিদের ওপর তাদের দমন-পীড়ন এবং একের পর এক সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের কারণে ধীরে ধীরে কুর্দিদের একটি বড় অংশ তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। পিকেকের বোমা হামলায় নিহত হয়েছে শত শত বেসামরিক নাগরিক। রাজনীতিবিদ ও পুলিশ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে একাধিক গুপ্তহত্যাও পরিচালনা করেছে তারা।

ক্ষমতায় আসার প্রথমদিকে এরদোয়ান কুর্দি প্রশ্নের শান্তিপূর্ণ সমাধানের চেষ্টা করেছিলেন। ফলে কুর্দি সংস্কৃতি ও ভাষার ওপর নিষেধাজ্ঞা শিথিল হয়, কুর্দি অধ্যুষিত এলাকায় করা হয় বাড়তি বিনিয়োগ। এমনকি তিনি পিকেকের সঙ্গে একটি যুদ্ধবিরতিও নিশ্চিত করেন। এতে লক্ষ লক্ষ কুর্দি বিশ্বাস করতে শুরু করে যে, সমঅধিকারের দাবি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় অর্জন করা সম্ভব এবং তারা এরদোয়ানের একে পার্টিকে ভোট দিতে শুরু করে। কিন্তু যুদ্ধবিরতি ভেঙে পড়ার পর ফের নতুন করে শুরু হয় সহিংসতা। আর সেই সময়ে সিরিয়ার কুর্দিরা তুর্কি সীমান্তঘেঁষা এলাকায় একটি স্বশাসিত অঞ্চল গড়ে তোলায় নতুন করে আত্মবিশ্বাসে বলীয়ান হয়ে ওঠে পিকেকে।

তুরস্কের সেনাবাহিনী আবারও আক্রমণাত্মক কৌশল গ্রহণ করে। গ্রামীণ এলাকাগুলোতে মাসের পর মাস কারফিউ জারি করে রাখা হয়। গ্রামগুলো ঘিরে অভিযান চালানো হয় যাতে সাধারণ মানুষ পিকেকে যোদ্ধাদের আশ্রয় না দেয়। ট্যাঙ্ক, আর্টিলারি, ড্রোন হামলা এবং স্পেশাল ফোর্সের অভিযানে পিকেকের চলাফেরা ও সাংগঠনিক ক্ষমতা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। এই সময় কয়েক হাজার পিকেকে যোদ্ধা নিহত হয়। তুর্কি সেনাবাহিনীও এক হাজারের বেশি সদস্য হারায়।

নতুন করে সহিংসতা শুরু হলে কুর্দিদের সমর্থন হারাতে থাকেন এরদোয়ান। ভোটের ঘাটতি পূরণ করতে তিনি তখন চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী তুর্কিদের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং কুর্দি রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি কঠোর বৈরী অবস্থান নেন। সীমান্ত পেরিয়ে ইরাকি কুর্দিস্তানের কান্দিল পর্বতমালায় পিকেকের ঘাঁটিগুলোতে একের পর এক অভিযান চালানো হয় তখন। এসব অভিযানের সময় তুর্কি সেনারা

কখনো কখনো ইরাকের ভেতরে ২০ কিলোমিটার পর্যন্তও ঢুকে পড়েছে। তবে এখানেই কুর্দিদের মধ্যে বিভক্তির চিত্র স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে। ইরাকি কুর্দিস্তানের আঞ্চলিক সরকার তুর্কি সেনাবাহিনীর এই অভিযানে সহযোগিতা করেছিল। কারণ তারা আঙ্কারার সঙ্গে জ্বালানি চুক্তিতে আবদ্ধ।

তুরস্ক উত্তর সিরিয়ায় সেনা অভিযান চালালে তা পিকেকের জন্য আরো বড় একটি ধাক্কা হয়ে আসে। তুরস্কের সরকারি দাবি অনুসারে এই অভিযান চালানো হয়েছিল আইএস জঙ্গিদের বিরুদ্ধে একটি বাফার জোন তৈরির উদ্দেশ্যে। তবে এর একটি গোপন উদ্দেশ্যও ছিল। আর তা হলো, সিরিয়ার কুর্দিরা যে স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলটি (তাদের ভাষায় 'রোজাভা') গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল, সেটাকে কোনোভাবে টিকতে না দেওয়া। তুর্কি বাহিনী সরাসরি 'রোজাভা' অঞ্চলের মাঝ দিয়ে ২৯ কিলোমিটার ভেতরে ঢুকে পরে। এতে পুরো অঞ্চলটিকে কার্যত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এর ফলে রোজাভার পশ্চিমপ্রান্তকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত প্রসারিত করার কুর্দি স্বপ্নটিও চুরমার হয়ে যায়। ভূমধ্যসাগরের পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলে রোজাভা অন্তত একটি সম্ভাব্য বন্দর পেত, তাদের জন্য নতুন আন্তর্জাতিক বাণিজ্যপথও খুলে যেত। এই অভিযানে কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ নূর পর্বতমালার সংযোগপথও বিচ্ছিন্ন করে দেয় তুর্কি সেনারা। নূর পর্বতমালা এমন একটি কৌশলগত এলাকা যেখানে ভূমধ্যসাগরের তীরে তুরস্ক ও সিরিয়ার সীমান্ত মিলিত হয়েছে। এই পথ ধরেই পিকেকে ও তাদের সিরিয়ান মিত্র ওয়াইপিজি সীমান্ত পেরিয়ে তুরস্কে ঢুকত। এই অভিযানে তুরস্ক প্রায় ৩০০টি গ্রাম, ছয়টি শহর এবং একাধিক কৌশলগত উচ্চভূমি দখলে নেয়। এই এলাকাগুলো একসময় উসমানি সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, যা এক শতাব্দী আগে তারা ছেড়ে গিয়েছিল। বর্তমানে এই দখলকৃত ভূখণ্ডে সিরিয়ান মুদ্রার জায়গায় চালু হয়েছে তুর্কি লিরা। বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থাও তুরস্কের গ্রিডের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। আঙ্কারা থেকেই স্থানীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের নিয়োগ দেওয়া হয়। আর স্কুলগুলোতে আরবির পাশাপাশি পড়ানো হয় তুর্কি ভাষা। আইনগতভাবে অঞ্চলটি এখনো সিরিয়ারই অংশ, কিন্তু বাস্তবে এই অঞ্চল তুরস্কের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। সিরিয়া সরকার যদি পুনরায় এই অঞ্চলের দখল নিতে চায়, তবে সেনাবাহিনীসহ সেখানে প্রবেশ করতে হবে এবং তুরস্কের সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে জড়াতে হবে।

এটাই বর্তমান তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। আবারও তারা ইউরোপ ও এশিয়ার সেতুবন্ধন হয়ে দাঁড়িয়েছে। আবারও তারা সীমানা সম্প্রসারণ করছে,

নতুন নতুন প্রান্তর দখল করছে এবং স্থাপন করছে সেনাচৌকি। বিগত শতকের সাথে একটি স্পষ্ট বিচ্ছেদরেখা টানা হয়েছে। আবার যোগসূত্র গড়ে উঠেছে অটোমান আমলের স্মৃতির সঙ্গে। একসঙ্গে চলছে দুইটি উদ্যোগ—অতীতের সঙ্গে পুনঃসংযোগ এবং ভবিষ্যতের মালিকানা গ্রহণের আহ্বান।

বর্তমান বহুকেন্দ্রিক বিশ্বব্যবস্থায় তুরস্ক এখন অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শক্তি। যেসব রাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বব্যবস্থাকে দুর্বল করে তুলেছে, তুরস্ক তাদের মধ্যে অন্যতম। এই পরিবর্তনের সবচেয়ে প্রতীকী মুহূর্তটি আসে ২০২০ সালের ১২ই জুলাই। সেদিন প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান এক নির্বাহী আদেশে ঘোষণা দেন— হায়া সোফিয়া জাদুঘর আবার মসজিদে রূপান্তরিত হবে। এর মধ্য দিয়ে কামাল পাশা আতাতুর্কের ১৯৩৪ সালের আইন বাতিল করেন তিনি। সেই আইনের মাধ্যমেই এই ঐতিহাসিক স্থাপনাটিকে জাদুঘর হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছিল। এটি এমন একটি ঐতিহাসিক অবকাঠামো, যা খ্রিস্টধর্ম ও ইসলাম উভয় ধর্মের ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে। ৫৩৭ সালে বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের অধীনে একটি গির্জা হিসেবে নির্মিত হয়েছিল হায়া সোফিয়া। ১৪৫৩ সালে উসমানিরা কনস্টান্টিনোপল দখল করার পর সেটাকে মসজিদে রূপান্তর করা হয়। কিন্তু আতাতুর্ক স্থাপনাটির এক ভিন্ন তাৎপর্য দেখেছিলেন। তিনি একে দেখেছিলেন তুরস্কের জন্য সফট পাওয়ার অর্জনের একটি কৌশল হিসেবে। তার ভাবনা ছিল হায়া সোফিয়া জাদুঘর হিসেবে সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে এবং সবাই এই স্থাপনার বহুধর্মীয় ইতিহাসকে উদযাপন করবে। যেন পশ্চিমের উদ্দেশে একটি বার্তা, 'দরজা সবার জন্য খোলা।'

এরদোয়ান এই ঐতিহাসিক ভবনের ভিন্ন এক তাৎপর্য দেখলেন। আর তার সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলো হয়ে উঠল সেই গল্পের বাহক। তার তুর্কি ও ইংরেজি টুইটার অ্যাকাউন্টে হায়া সোফিয়াকে উপস্থাপন করা হলো এক অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতীকের মতো—"এটি সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। তারা বিদেশি হোক বা স্থানীয়, মুসলিম হোক বা অমুসলিম... মানবতার যৌথ ঐতিহ্য হায়া সোফিয়া আরো আন্তরিক ও মৌলিক উপায়ে সবাইকে আপন করে নেবে।" কিন্তু প্রেসিডেন্ট দপ্তরের আরবি ওয়েবসাইটে বার্তাটির সুর ছিল সম্পূর্ণ আলাদা। সেখানে বলা হলো, এই সিদ্ধান্ত আসলে 'আল-আকসা মসজিদের মুক্তির অগ্রদূত', যা জেরুজালেমের পশ্চিম দেয়ালের ওপর অবস্থিত। এটি মুসলিম বিশ্বের জন্য নতুন সূচনা, আর "প্রতিটি ইসলামি অঞ্চলে আমাদের মূল্যবোধ ও প্রতীকগুলোর ওপর

যে ঘৃণ্য আক্রমণ চালানো হচ্ছে, এটা তার শ্রেষ্ঠ জবাব।" ওয়েবসাইটে আরো বলা হয়—"সর্বশক্তিমান আল্লাহর সাহায্যে আমরা এই বরকতময় পথে এগিয়ে যাব। থামব না, ক্লান্ত হব না, বিরতি নেব না। দৃঢ়তা, ত্যাগ ও অধ্যবসায়ের সাথে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছাব।" এই ঐতিহাসিক ঘোষণার দিন এক ভাষণে এরদোয়ান তুলে আনেন তুর্কি-উসমানি ইতিহাসের চারটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের কথা। তিনি বলেন, "হায়া সোফিয়ার পুনর্জাগরণ আমাদের সেই গৌরবময় অতীতের স্মৃতিকে ফিরিয়ে এনেছে—বদর থেকে মানজিকার্ত, নিকোপোলিস থেকে গ্যালিপলি।"

তাহলে নিয়তি কি নির্ধারিত হয়ে গেছে? তুরস্ক কি এখন আর ন্যাটোর প্রকৃত মিত্র নয়? কিংবা একটি আধুনিক প্রকৃত গণতন্ত্র হিসেবে বিবেচিত হওয়ার অবস্থানে নেই বর্তমান তুরস্ক? হয়তো পুরোপুরি নয়, তবে তার খুব কাছাকাছি পৌঁছে গেছে তুরস্ক।

কামাল পাশা আতাতুর্কের আদর্শে যে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের ভিত্তি গড়ে উঠেছিল, বিগত দুই দশকে তা ধীরে ধীরে ভেঙে ফেলা হয়েছে। আর তার জায়গায় গড়ে তোলা হয়েছে এক কর্তৃত্ববাদী শাসনব্যবস্থা, যার ভেতর আছে একটি সুস্পষ্ট ইসলামপন্থী সুর। এই ক্ষমতা-কেন্দ্রীকরণের পথে হাঁটতে গিয়ে এরদোয়ানের সরকার যেকোনো দেশের তুলনায় বেশিসংখ্যক সাংবাদিককে কারাগারে পাঠিয়েছে। মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিঃশেষ হয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয় ও নাগরিক সমাজ থেকে ভিন্নমতের কণ্ঠস্বর দমন করা হয়েছে। সেনাবাহিনী ও বিচারব্যবস্থার উচ্চপদগুলোতে বসানো হয়েছে নতুন শাসকগোষ্ঠীর অনুগত ব্যক্তিদের।

তবে এই কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে এরদোয়ান ও তার একেপি দল দীর্ঘ সময় ধরে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তবে মধ্যপন্থী কুর্দিদের সমর্থন হারিয়েছে তারা। নাগরিক স্বাধীনতার সংকোচন এবং প্রজাতন্ত্রের ক্রমবর্ধমান ইসলামিকরণ দেখে শহুরে এলাকায় অনেকেই উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। ফলে সেখানে উঠে আসছে নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী; নতুন বিরোধী কণ্ঠস্বর। একবিংশ শতকের সূচনালগ্ন পর্যন্ত মারমারিয়া অঞ্চলের শিক্ষিত ও ব্যবসায়ী উদারপন্থী শ্রেণিই তুরস্কের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিসর নিয়ন্ত্রণ করত। কিন্তু ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিকভাবে রক্ষণশীল আনাতোলিয়া অঞ্চল থেকে বিপুল জনগণ শহরে চলে আসে। আর সেসব অঞ্চলের উচ্চ জন্মহারকে কেন্দ্র করে ক্ষমতা চলে যায় একে পার্টির হাতে। তবে এক প্রজন্ম পেরোনোর পর ছবিটা আবার পাল্টাচ্ছে। নতুন

শহুরে জনগোষ্ঠীর অনেকের মধ্যেই উদার চিন্তাধারা বিস্তার লাভ করছে। কাজেই তুরস্কের হৃদয়, আত্মা এবং ভাবমূর্তি নিয়ন্ত্রণ নিয়ে লড়াই এখনো চলছে। আর তার পাশাপাশি টানাপোড়েন চলছে দেশের আন্তর্জাতিক ভূমিকা নিয়েও।

কূটনীতির মঞ্চে তুরস্ক ক্রমেই একা হয়ে পড়ছে, আর তার প্রতি সবার আস্থা কমে যাচ্ছে। তবে তুরস্ক মনে করে, তাদের হাতে এখনো একটি তুরুপের তাস রয়েছে। ন্যাটোর দক্ষিণ ফ্রন্ট রক্ষার প্রধান দায়িত্ব এখনো তাদের কাঁধে। ইনজারলিকে যুক্তরাষ্ট্রের বিমানঘাঁটি, ইজমিরে ন্যাটোর স্থলঘাঁটি আর দেশের মাঝামাঝি কুরেচিক অঞ্চলে স্থাপন করা আগাম সতর্কতা রাডার ব্যবস্থাকেই নিজেদের প্রভাবের উৎস মনে করে তুরস্ক। এগুলো প্রকৃতপক্ষেই শক্তিশালী কৌশলগত সুবিধা। তবে ন্যাটোর হাতেও অন্য বিকল্প আছে। তবে সেগুলো সহজে ব্যবহার করতে চায় না ন্যাটো। কিন্তু চাপের পরিস্থিতি তৈরি হলে ন্যাটো গ্রিস ও রোমানিয়ায় তাদের ঘাঁটিগুলো আরো শক্তিশালী করতে পারে, যাতে ভূমধ্যসাগর ও কৃষ্ণসাগর অঞ্চলে তুরস্কের অনুপস্থিতি সামাল দেওয়া যায়। এমনকি আমিরাতকে রাজি করিয়ে সেখানে একটি বিমানঘাঁটি গড়ে তোলার মাধ্যমে ইনজারলিক হারানোর অভিঘাতও কমানো সম্ভব। তুরস্ক নিজেও জানে যে, সে একা চলার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী হলেও বাস্তবতা বদলে যেতে পারে যেকোনো সময়। কারণ, তারা অবস্থান করছে একটা কঠিন ও টালমাটাল অঞ্চলের মাঝে। বিগত কয়েক বছরে তুরস্কের চারটি প্রতিবেশী দেশে সংঘাত হয়েছে। দেশগুলো হলো আর্মেনিয়া, আজারবাইজান, ইরাক এবং সিরিয়া। ইরান বরাবরই তুরস্কের প্রতিদ্বন্দ্বী। রাশিয়াও তাই। তবে এরদোয়ান ও পুতিনের সম্পর্ককে নিয়ে একধরনের 'বন্ধুত্বপূর্ণ ঘনিষ্ঠতার' গল্প চালু আছে। আসলে তাদের সম্পর্কের জন্য 'ফ্রেনেমি' কথাটিই বোধহয় যথাযথ। সিরিয়া ও লিবিয়ায় তুরস্ক কিছু সামরিক সাফল্য অর্জন করেছে বটে, তবে সেসব জায়গায় তাদের প্রতিপক্ষের সামর্থ্য তুলনামূলকভাবে সীমিত ছিল। ভূমধ্যসাগরে 'নীল স্বদেশ' কৌশল বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যদি তারা গ্রীসের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে জড়ায়, তাহলে যেসব প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে তাদের সামরিক ও কূটনৈতিক শক্তি অনেক বেশি। এই সংঘর্ষে সহজেই যুক্ত হয়ে যেতে পারে সাইপ্রাস, ফ্রান্স, মিশর, এমনকি সংযুক্ত আরব আমিরাতও।

স্নায়ুযুদ্ধ এবং ৯/১১-পরবর্তী বিশ্বকে আধুনিক তুরস্ক দেখে একটা বন হিসেবে। এই বনের প্রতিটি রাষ্ট্রই একে অপরের প্রতিযোগী জন্তু। আর সেই অরণ্যে তুরস্ক নিজেকে একটা শক্তিশালী সিংহ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

দেশটির একটি বড় লক্ষ্য অস্ত্র উৎপাদনে স্বনির্ভর হওয়া। এই লক্ষ্যে তারা একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা শিল্প গড়ে তুলেছে। তারা যথেষ্ট সাফল্যও অর্জন করেছে, যা দিয়ে তারা বিশ্বের অন্যতম প্রধান অস্ত্র রপ্তানিকারক হতে চায়। বর্তমানে তুরস্কের সামরিক সরঞ্জামের প্রায় ৭০ শতাংশই উৎপাদিত হয় দেশে। আর অস্ত্র রপ্তানিতে দেশটি এখন রয়েছে বিশ্বে চতুর্দশ স্থানে। তবে মনে রাখা দরকার যে, ন্যাটোর মিত্র রাষ্ট্রগুলো থেকে খুব বেশি অর্ডার তাদের কাছে আসে না। তুরস্কের সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষী সামরিক প্রকল্প হলো TF-X যুদ্ধবিমান। এই অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমানটি ২০৩০ সালের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের তৈরি এফ-১৬ যুদ্ধবিমানের জায়গা নিতে পারবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছে তারা। প্রকল্পটি আরো আগেই শেষ হতে পারত, কিন্তু রাশিয়ার এস-৪০০ সিস্টেম কেনার পর অ্যামেরিকার চাপের কারণে রোলস-রয়েস ও বিএই সিস্টেমস এই প্রকল্পে সহযোগিতা থেকে সরে দাঁড়ায়। তবে তুরস্ক ধীরে ধীরে নিজেদের সামরিক উৎপাদন সক্ষমতা বাড়িয়ে চলেছে। বর্তমানে দেশটি ট্যাংক, সাঁজোয়া যান, পদাতিক বাহিনীর অবতরণ নৌযান, ড্রোন, স্নাইপার রাইফেল, সাবমেরিন এবং ফ্রিগেট তৈরি করে থাকে। ২০২০ সালে তারা প্রথমবারের মতো একটি হালকা বিমানবাহী রণতরী চালু করে, যা হেলিকপ্টার গানশিপ ও সশস্ত্র ড্রোন পরিবহনে সক্ষম। আন্তর্জাতিক পরিসরেও তুরস্ক তার প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। বহির্বিশ্বের ওপর নির্ভরতা কমাতে তুরস্ক এখন কাতার ও সোমালিয়ায় সামরিক ঘাঁটি গড়ে তুলেছে এবং সিরিয়া ও লিবিয়ায় সেনা মোতায়েন করেছে। এই দিক থেকে এরদোয়ান নিঃসন্দেহে সফল। পুতিন যেমন বিশ্বের নজর কাড়তে পেরেছেন, তেমনি এরদোয়ান নিশ্চিত করেছেন যে অভিবাসন থেকে শুরু করে জ্বালানি ও বাণিজ্যসহ বিভিন্ন বিষয়ে তুরস্কেরও যেন বলার মতো একটি অবস্থান থাকে। প্রেসিডেন্ট বাইডেন দায়িত্ব নেওয়ার সময় বলেছিলেন, তার প্রশাসন হবে 'মূল্যবোধ-ভিত্তিক'। তিনি চেয়েছিলেন ন্যাটো মিত্ররা গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের মতো মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধাশীল আচরণ করুক। তবে, বাস্তব রাজনীতির চাপে পড়ে যুক্তরাষ্ট্র অতীতে তুরস্কের সামরিক একনায়কতান্ত্রিক শাসনগুলোকে উপেক্ষা করেছিল। কারণ ন্যাটোর জন্য তুরস্ক ছিল অপরিহার্য। বাইডেন প্রশাসনের পররাষ্ট্র দপ্তরে সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ ছিল রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ। ২০২২ সালে রাশিয়া ইউক্রেনে পূর্ণমাত্রার আগ্রাসন শুরুর পর তুরস্কের কৌশলগত অবস্থান নতুনভাবে দৃশ্যমান হয়। একদিকে তুরস্ক ইউক্রেনকে ড্রোন সরবরাহ করেছে, আবার অন্যদিকে রাশিয়ার সঙ্গে সীমিত সংলাপ ও সহযোগিতা বজায় রেখেছে। এই দ্বৈত অবস্থান তুরস্ককে পশ্চিমা জোটে এখনো অপরিহার্য করে

রেখেছে। যুক্তরাষ্ট্র এই ভূমিকা মূল্যায়ন করলেও তুরস্কের কিছু পদক্ষেপ নিয়ে সতর্ক অবস্থানে রয়েছে তারা।

কামাল আতাতুর্ক জানতেন, উসমানিরা অতিরিক্ত সাম্রাজ্য বিস্তারের চেষ্টা করে ভুল করেছিল। তাই তিনি পশ্চিমমুখী নীতির ওপর গুরুত্ব দেন এবং তুরস্ককে বিংশ শতকে টেনে আনেন। এরদোয়ানের তুরস্ক প্রথমে ৩৬০ ডিগ্রি দৃষ্টিতে চারপাশ পর্যালোচনা করেছে। কিন্তু এক দশক পর তারা ধীরে ধীরে নজর দিয়েছে দক্ষিণ ও পূর্ব দিকে। এই মুহূর্তে সেটাই তাদের চলার দিক। তবে সামনে এখনো নির্বাচন রয়েছে, তাই পরিবর্তনের সম্ভাবনা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। আবার বাস্তবতাও বদলে যেতে পারে। ফলে আঙ্কারাকে বিভিন্ন বাধার মুখোমুখি হতে হবে। আর সবচেয়ে বড় বিষয় হলো ভূগোল। এটি সবসময়ই নির্ধারণ করে দেবে যে, তুরস্ক আসলে কতদূর যেতে সক্ষম হবে।

অধ্যায় ৭

সাহেল অঞ্চল



"দুই নদীর মিলনস্থলে পানি কখনো শান্ত থাকে না"

- আফ্রিকার দেশ চাদে প্রচলিত প্রবচন

সাহারা মরুভূমিকে যদি বিশাল একটা বালির সাগর ভাবা হয়, তাহলে সাহেল হলো সেই সাগরের উপকূলরেখা। এই উপকূল থেকে সাহারার বালির সাগর পাড়ি দেওয়া মানুষের সংখ্যা ক্রমেই বাড়ছে। এই মানুষগুলোর গন্তব্য হলো আরেক উপকূল 'ইউরোপ'। তারা পেছনে ফেলে আসছে পৃথিবীর সবচেয়ে অস্থিতিশীল, দরিদ্র ও জলবায়ু বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত অঞ্চলগুলোর একটি। সাম্প্রতিক হিসাব অনুযায়ী সাহেল থেকে ইতোমধ্যেই প্রায় ৩.৮ মিলিয়ন মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে। আর এই বাস্তুচ্যুত শরণার্থীরা ছুটে যাচ্ছে বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধ অঞ্চল ইউরোপের দিকে।

আঞ্চলিক সহিংসতা ও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বাড়তে থাকায় আরো অবনতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে সাহেলের পরিস্থিতি। এই অঞ্চলের বিভিন্ন

জনগোষ্ঠীর দুর্দশাকে নিজেদের বৃহত্তর উদ্দেশ্যে কাজে লাগাতে চাইছে আল-কায়েদা ও আইএস এর মতো গোষ্ঠীগুলো। আবার স্থানীয় গোষ্ঠীগুলোও নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এসব সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর নাম ব্যবহার করছে। বহু দশক ধরে ধিকিধিকি জ্বলতে থাকা সংঘাত এখন হয়ে উঠেছে আগুনের গোলা। আর সেই পরিস্থিতি দাবানলের মতো ছড়িয়ে যাচ্ছে সাহেল ছাড়িয়ে আরো বহু দূর পর্যন্ত। ২০২০ সালে এসে বিশ্বের সবচেয়ে দ্রুতবর্ধনশীল বিদ্রোহের কেন্দ্র হয়ে ওঠে সাহেল অঞ্চল। জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস সতর্ক করে বলেছিলেন, "সহিংসতার মুখে আমাদের অবস্থান দুর্বল হয়ে পড়ছে।"

কিন্তু সমস্যা হলো, সাহেলে যা ঘটে তা সাহেলেই সীমাবদ্ধ থাকে না।

অধিকাংশ ইউরোপীয় নাগরিকই সাহেল অঞ্চলের বাস্তবতা সম্পর্কে প্রায় কিছুই জানেন না। এই অঞ্চলের সংকটের জটিলতাও বোঝেন না তারা। এমনকি এই সংকট যে ইউরোপের ভবিষ্যতের ওপর কতটা সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলতে পারে, তা নিয়েও তাদের স্পষ্ট কোনো ধারণা নেই। অথচ ইউরোপ ইতোমধ্যেই অভিবাসন ও শরণার্থী সংকটে প্রবলভাবে জর্জরিত। এই মুহূর্তে যদি সাহেল থেকে ইউরোপের দিকে আরো একটি বৃহৎ শরণার্থীর ঢল আসে, তা হবে এমন একটা সময়ে যখন ইউরোপের রাজনীতিতে অভিবাসন ভীতি, জাতীয়তাবাদ এবং বহিরাগতবিরোধী মনোভাব দ্রুত বেড়ে চলেছে। ইউরোপজুড়ে ভোটাররা এখন অনেক বেশি সতর্ক, অনেক বেশি অনাগ্রহী। কেউ কেউ তো সরাসরি 'দুর্গের মতো ইউরোপ' গড়ে তোলার পক্ষে মত দিচ্ছেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো, ভূমধ্যসাগরের উত্তর তীরে সীমান্তে প্রাচীর তুলে এই সমস্যার সমাধান হবে না। স্থিতিশীলতার নির্মাণকাজ করতে হবে দক্ষিণ তীরে।

'সাহেল' শব্দটি এসেছে আরবি ভাষা থেকে। শব্দটির অর্থ 'উপকূল' বা 'তীর'। প্রাচীন ভ্রমণকারীরা একটা তীর হিসেবেই দেখতেন এই অঞ্চলটিকে। আগুনের মতো উত্তপ্ত সাহারা মরুভূমি পার হয়ে তারা যখন সাহেলে পৌঁছাতেন, তাদের কাছে মনে হতো তারা যেন দুর্গম সমুদ্র পাড়ি দিয়ে তীরে এসে পৌঁছালেন। এই উপকূলরেখা গঠিত হয়েছে পাথুরে ঝোপঝাড়, বালুকাময় সমতল, ধুসর রঙের ছোট ঘাস ও ছোট ছোট গাছপালার সমন্বয়ে। কিন্তু এই ভূপ্রকৃতি কখনোই স্থির নয়। শুষ্ক হাওয়ার দাপটে উর্বর ভূমি ধীরে ধীরে হারিয়ে যাচ্ছে সাহারার বালিতে। অন্যদিকে, সাম্প্রতিক সহিংসতা ও অস্থিরতা অঞ্চলটিকে ঠেলে দিচ্ছে আরো গভীর সংকটের মধ্যে। সাহেল তাই শুধু একটি ভৌগোলিক সীমানা নয়; এটি বেঁচে থাকার

একটা পরীক্ষাক্ষেত্র। কঠিন এই ভূমি এই অঞ্চলের মানুষকেও গড়ে তুলেছে কঠিন করে। এখানে স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনের স্বপ্ন আজও দুর্লভ, প্রায় বিলাসিতার সমান।

তবে সাহেল অঞ্চল যে শুধু সমস্যারই জন্ম দেয়, ব্যাপারটা তেমন নয়। এর কিছু সুবিধাও রয়েছে। সাহারার ১,৬০০ কিলোমিটার বিরামহীন নিষ্ঠুর বালুভূমি ও কঠিন পরিবেশ পেরিয়ে যারাই এই অঞ্চলে পৌঁছায়, সে খুঁজে পায় কূপ, নদী ও খাদ্যের উৎস। বর্ষাকালে এখানে দেখা মেলে আকাশিয়া গাছের হলুদ, সাদা ও সবুজ রঙের ফুল। কোথাও আবার রয়েছে বোগেনভিলিয়ার গোলাপি, বেগুনি কিংবা ম্যাজেন্টা রঙের বাহার। সাহেল বহু জাতিগোষ্ঠীর আবাসভূমি। এইসব জনগোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে জটিল লেনদেন, আন্তঃসম্পর্ক ও বাণিজ্যের ইতিহাস। আফ্রিকার বুক চিরে ৬,০০০ কিলোমিটারের দীর্ঘ এক করিডোর গড়ে তুলেছে সাহেল। এই করিডোর লোহিত সাগরকে যুক্ত করেছে আটলান্টিক মহাসাগরের সঙ্গে। এই করিডোরের মাঝে ছড়িয়ে রয়েছে রোমান্টিক কল্পনায় ঘেরা শহর তিমবুকতু, আছে খার্তুমের মতো বিশাল ব্যস্ত মহানগরী। পাশাপাশি রয়েছে অচেনা প্রান্তিক অঞ্চলের ছোট ছোট ধুলোমাখা শহর। এইসব শহরের মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে খনিজ উত্তোলন করে আন্তর্জাতিক বাজারে বিক্রির মাধ্যমে। এখানে আছে যাযাবর পশুপালক গোষ্ঠী তুয়ারেগ ও ফুলানিরা। শত শত বছর ধরে একই পথ ধরে চলাচল করছে ওরা। এসব পথের জন্ম জাতিরাষ্ট্র নামক আধুনিক ধারণা আফ্রিকায় চাপিয়ে দেওয়ার বহু আগে। আজও মানুষের আঁকা কৃত্রিম সীমান্তরেখা অবাধে পেরিয়ে যায় তারা। বর্তমানে এইসব পথেই সক্রিয় আছে বিভিন্ন সশস্ত্র গোষ্ঠী, যাদের মতাদর্শ ও সহিংসতা আবারও বহিঃশক্তির সেনাবাহিনীকে টেনে এনেছে এই অঞ্চলে।

সাহেল অঞ্চলের উত্তরে মরুভূমি, আর দক্ষিণে রয়েছে ঘন রেইনফরেস্ট। উত্তরে বেশিক্ষণ থেমে থাকলে তৃষ্ণা ও হিটস্ট্রোকে মৃত্যুর ঝুঁকি থাকে। আর দক্ষিণের অরণ্যে রাজত্ব করে রক্তচোষা সেতসি মাছি। এই মাছির কামড়ে ঘোড়া, উট বা গাধার মতো বাহন টিকতে পারে না। এমনকি আজও প্রতি বছর হাজার হাজার মানুষের জীবন কেড়ে নেয় এই ক্ষুদ্র পতঙ্গ।

সাহেলের বিস্তীর্ণ পরিসরে আরব, খ্রিস্টান, ইসলামি, যাযাবর পশুপালক ও স্থায়ী কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতির মধ্যে ঐতিহাসিক ও সমকালীন মেলবন্ধনের বহু নিদর্শন রয়েছে। অন্যদিকে এটি আফ্রিকার সবচেয়ে অনিয়ন্ত্রিত ও শিথিলভাবে শাসিত ভূখণ্ডগুলোর একটি। এত বড় ভৌগোলিক অঞ্চলের বহু জায়গা যে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকে গেছে, তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। তার ওপর এই অঞ্চলের বহু

রাষ্ট্রই রাজধানী শহরের বাইরে মৌলিক সেবা পৌঁছে দেওয়ার প্রতি উদাসীন। এইসব অঞ্চলে না আছে অবকাঠামো, না আছে নিরাপত্তা, না আছে ন্যূনতম রাষ্ট্রীয় সেবা। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে জাতিগত টানাপোড়েন, দারিদ্র্য ও অরক্ষিত সীমান্ত। সাম্প্রতিক সময়ে এখানে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় সহিংস মতাদর্শের প্রভাব। ফলে পুরো অঞ্চলটিতে টিকে আছে অনেকগুলো দীর্ঘমেয়াদি জটিল সংকট। জলবায়ু পরিবর্তন এই সমস্যাকে বাড়িয়ে তুলছে আরো বহুগুণ। বৃষ্টি না হলে ফসল নষ্ট হয়, হ্রদ শুকিয়ে গেলে খাদ্য সরবরাহও কমে যায়। আর যখন খাদ্য সংকট দেখা দেয়, তখন মানুষ স্থান পরিবর্তন করে। কিন্তু এই মানুষগুলো নিজের এলাকা ছেড়ে যেখানে গিয়ে পৌঁছায়, বেশিরভাগ সময়ই সেই জায়গাগুলো নতুনদের আগমনের জন্য প্রস্তুত থাকে না।

সাহেল অঞ্চলের বর্তমান অস্থিরতার অন্যতম চালিকাশক্তি হলো ভূগোল, ইতিহাস এবং জাতিরাষ্ট্র গঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে সংঘর্ষ। এই বাস্তবতা বুঝতে হলে আমাদের অনেক দূরের অতীতে ফিরে তাকাতে হবে। হাজার হাজার বছর ধরে চরম শুষ্ক কিংবা ভেজা মৌসুম সাহারার বিস্তার ও সংকোচন নির্ধারণ করেছে। আর এর সঙ্গে পাল্টেছে সাহেলের রূপ এবং এখানকার মানুষের বসতি, জীবনধারা ও আচরণ।

হাজার হাজার বছর ধরে সাহারা মরুভূমির সীমানা কখনো বৃদ্ধি পেয়েছে, আবার কখনো কমে এসেছে। দীর্ঘ খরার সময়গুলোতে মরুভূমি বিস্তৃত হয়ে গ্রাস করেছে আশেপাশের তৃণভূমি। আবার বর্ষা দীর্ঘস্থায়ী হলে মরুভূমি সরে গিয়ে তৈরি হয়েছে নতুন সবুজ অঞ্চল। এই প্রাকৃতিক ছন্দের মধ্যেই গড়ে উঠেছে সাহেলের মানবসমাজ। এখানে আবহাওয়ার ভাঙাগড়ার সঙ্গে তাল মিলিয়ে পরিবর্তিত হয়েছে জীবনধারা, জনবসতি ও উৎপাদনের ধরন।

প্রায় ১০,৫০০ বছর আগে সাহারা মরুভূমিতে শুরু হয় দীর্ঘস্থায়ী মৌসুমি বৃষ্টিপাত। আর এই ঘটনা হঠাৎ করেই সাহারা মরুভূমিকে রূপান্তরিত করেছিল সবুজ তৃণভূমিতে। এই নতুন তৃণভূমি দক্ষিণে গিয়ে মিলেছিল বর্তমান সাহেল অঞ্চলের সঙ্গে। মরুভূমি যখন সঙ্কুচিত হয়, তখন শিকার ও খাদ্য সংগ্রহের জন্য তৈরি হয় নতুন জায়গা। প্রায় বিশ প্রজন্ম ধরে চলা এই পরিবর্তনের ফলে ধীরে ধীরে উত্তর ও দক্ষিণ দিক থেকে মানুষ এসে এই নতুন অঞ্চলে বসতি স্থাপন করে। তারা সঙ্গে আনে গৃহপালিত পশু, শেখে প্রাথমিক কৃষিকাজের কৌশল।

এরপর ঘটে আকস্মিক এক উল্টো পরিবর্তন। প্রায় ৫,০০০ বছর আগে বন্ধ হয়ে যায় সেই মৌসুমি বৃষ্টিপাত। সাহারা থেকে হারিয়ে যায় তৃণভূমি। সেই জায়গা নেয় শুষ্ক ও নিষ্ঠুর মরুভূমি। একসময় যে জনগোষ্ঠীগুলো সবুজ সাহারায় কৃষিকাজ ও পশুপালনের জীবন গড়ে তুলেছিল, তারা তখন সরে যেতে বাধ্য হয়। অনেকেই চলে যায় উত্তরের ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলের দিকে, কেউ সরে যায় দক্ষিণে সাহেল ও তারও নিচের শুষ্ক ভূভাগে। মরুভূমি ফিরে আসার ফলে উত্তর-দক্ষিণ সংযোগ কার্যত বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। মরু সাহারা পেরোনো আবারও দুঃসাধ্য এক অভিযান হয়ে দাঁড়ায়। মরুভূমিতে পথ নির্ভর করত মরুদ্যানের অবস্থানের ওপর। তবে উটের আবির্ভাব এক্ষেত্রে রীতিমতো বিপ্লব ঘটায়।

আজ থেকে প্রায় ২,০০০ বছর আগে ছোট আকারের উটের কাফেলা মরুভূমি পেরিয়ে দীর্ঘ বাণিজ্যপথ স্থাপনে সক্ষম হয়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আকারে বড় হতে থাকে এসব কাফেলা। এমনকি কিছু কাফেলায় একসঙ্গে ১২,০০০ উটও থাকত। এই সারি সারি উটের বহর মরুভূমির বালির ওপর দিয়ে যেভাবে চলত, তা আজকের জাহাজ বা সুপারট্যাংকারের কথাই মনে করিয়ে দেয়। উট নিয়ে একটা মজার কথাও চালু আছে—"উট হলো একটি কমিটির ডিজাইন করা ঘোড়া।" উট নিয়ে এই ধরনের মন্তব্য অন্যায্য। উট দেখতে খুবই কুশ্রী হলেও এটি এমনসব কাজ করতে পারে যা অন্য কোনো বাহক প্রাণীর পক্ষে সম্ভব নয়। আর সেই কারণেই এটি ইতিহাসের গতিপথ পাল্টে দেয়। এইসব 'মরুর জাহাজ' ছিল একমাত্র গণপরিবহন যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আফ্রিকা ও ইউরেশিয়ার মধ্যে থাকা স্থলবাধা অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছিল।

এক কুঁজওয়ালা উটের সহনশীলতা বিস্ময়কর। একটি ঘোড়ার তুলনায় এটি চারগুণ বেশি বোঝা টানতে পারে। এই প্রাণীটি প্রতিদিন গড়ে অতিক্রম করে প্রায় ৫০ কিলোমিটার পথ। আরো আশ্চর্যের বিষয় হলো, উট টানা দুই সপ্তাহেরও বেশি সময় বেঁচে থাকতে পারে এক ফোঁটা জল ছাড়াই। শরীরের ওজনের প্রায় এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত পানিশূন্যতা সহ্য করার ক্ষমতা রাখে এই প্রাণীটি। বালুকাময় মরুভূমির জন্য এর দেহে রয়েছে বিশেষ ধরনের অভিযোজন। উটের খুরের মাঝখানে মোটা চামড়ার স্তর থাকায় এদের পা সহজে বালিতে ডুবে যায় না। মরুভূমিতে ধুলোর ঝড় উঠলে উট নাকের ছিদ্র আংশিক বন্ধ করে বালিকণার অনুপ্রবেশ ঠেকায়। আর লম্বা চোখের পাতা ও ভেতরের পর্দার মতো স্বচ্ছ পাতার সাহায্যে চোখকে ঢেকে ফেলে। এ যেন এক প্রাকৃতিক উইন্ডশিল্ড ওয়াইপার।

খাদ্যের ক্ষেত্রেও উট অত্যন্ত অভিযোজিত, যাই দেওয়া হোক না কেন সে অনায়াসে খেয়ে নেবে।

আমি নিজেও সাহারা ও নেগেভ মরুভূমিতে একাধিকবার উটের পিঠে চড়েছি। সৌদি আরবের রেড স্যান্ড মরুভূমিতে বহুবার উটের থুতুও লেগেছে আমার গায়ে। উটের পিঠে ওঠার পরই টের পাওয়া যায় মাটির থেকে কতটা ভয়ংকর উচ্চতায় আছেন আপনি। উট চলার সময় শরীর দুলতে থাকে, আর নিয়মিত নিচ থেকে গম্ভীর গর্জনের মতো শব্দ ভেসে আসে। আমার মতো অনভিজ্ঞ আরোহীর জন্য অভিজ্ঞতাটি মোটেই স্বস্তিদায়ক ছিল না। সুযোগ থাকলে আমি নির্দ্বিধায় তিন লিটার ইঞ্জিনওয়ালা একটি ফোর হুইল ড্রাইভ জিএমসি গাড়ি বেছে নিতাম। তবে এই একবিংশ শতকেও সাহারার ১,৬০০ কিলোমিটার মরুভূমি পাড়ি দেওয়ার ক্ষেত্রে গাড়ির চেয়ে উটেরই হয়তো টিকে থাকার সম্ভাবনা বেশি। প্রাচীন যুগের যাযাবর আর ব্যবসায়ীদের কাছে কয়েক সপ্তাহব্যাপী এই ভয়ঙ্কর যাত্রায় ঘোড়ার বদলে উট বেছে নেওয়া মোটেই কোনো কঠিন সিদ্ধান্ত ছিল না।

একটা পর্যায়ে ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী বাণিজ্যকেন্দ্রগুলো সেনেগাল নদীর তীরবর্তী অঞ্চল, লেক চাদ অববাহিকা এবং নাইজার নদীর বাঁকের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। এর ফলে গড়ে ওঠে নতুন আন্তঃআঞ্চলিক বাণিজ্যপথ। এতে শুধু যে অর্থনীতিই সচল হয়েছে তা নয়। পরবর্তীকালে রাজনৈতিক মানচিত্রের গঠনকেও প্রভাবিত করেছে এই বাণিজ্যপথগুলো। এসব পথের রাজনৈতিক তাৎপর্য আজও বিদ্যমান। কারণ এই প্রাচীন পথগুলো চলে গেছে বিংশ শতকে তৈরি হওয়া আধুনিক সার্বভৌম রাষ্ট্রগুলোর সীমানা ভেদ করে।

এই পথগুলো ধরে বয়ে আসে সমৃদ্ধি। আর সেই সমৃদ্ধিই অষ্টম থেকে উনিশ শতক পর্যন্ত সাহেল অঞ্চলে একাধিক সাম্রাজ্য ও রাজ্যের উত্থানের ভিত্তি তৈরি করে দেয়। তিমবুকতুর মতো বাণিজ্যকেন্দ্র থেকে উটের পিঠে চাপিয়ে উত্তরের বাজারগুলোতে পৌঁছে দেওয়া হতো হাতির দাঁত, স্বর্ণ এবং বিপুলসংখ্যক কৃতদাস। অনুমান করা হয়, প্রায় এক হাজার বছর ধরে এক কোটিরও বেশি কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান দাসকে এই পথে ধরে নিয়ে বিক্রি করে দেওয়া হয়েছিল আরব দেশগুলোতে। অন্যদিকে, উত্তর আফ্রিকার মারাকেশ, তিউনিস ও কায়রোর মতো নগরী থেকে আসত নানারকম ভোগবিলাসের পণ্য। এগুলোর ক্রেতা ছিল দক্ষিণের সাম্রাজ্যগুলোর অভিজাত শ্রেণির মানুষরা। এইসব পণ্যের পাশাপাশি আসত বিপুল পরিমাণ লবণ। সাহেল অঞ্চলে একসময় লবণ এতটাই দুর্লভ ছিল যে, তা কখনো

কখনো স্বর্ণের সমান দামেও বিনিময় হতো। আজও তুয়ারেগ যাযাবররা সেই পুরোনো পথ ধরেই বিশালাকৃতির লবণের চাঁই উটে চাপিয়ে মালির দিকে নিয়ে যায়। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বালিয়াড়ির অবস্থান আর সাম্রাজ্যের ভাগ্য বদলেছে, তবে এভাবেই গড়ে উঠেছিল আজকের সাহেল অঞ্চলের ভিত্তি।

তবে এতগুলো বাণিজ্যপথ থাকা সত্ত্বেও এসব অঞ্চলের মধ্যে যাতায়াত ছিল দুরূহ। আর এই দুর্গম পথ এই অঞ্চলের প্রশাসনকে সবসময় চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে। তাই সাম্রাজ্যের শাসকেরা রাজধানী থেকে দূরের অঞ্চলগুলোকে তুলনামূলকভাবে বেশি স্বায়ত্তশাসন দিয়ে রাখতেন। এই রাজনৈতিক প্রবণতা আজও টিকে আছে। কারণ, আধুনিক রাষ্ট্রগুলোর আয়তন বিশাল, আর এই অঞ্চলের জনগোষ্ঠীগুলো সেই বিশাল জায়গা জুড়েই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে। মালিকে এই জটিল বাস্তবতার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ হিসেবে ধরা যায়। মালির উত্তরের সাহেল অঞ্চল ধীরে ধীরে সাহারার বালুরাশি ও যাযাবর সমাজের সঙ্গে মিশে গেছে। আর দেশটির রাজধানী শহর বামাকোর অবস্থান দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে। সেখানে জলবায়ু তুলনামূলকভাবে উষ্ণ ও আর্দ্র, আর জনজীবনের ছন্দও অনেকটা পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলবর্তী সংস্কৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফলে ভৌগোলিক, জলবায়ুগত এবং সাংস্কৃতিক দিক থেকে বামাকো উত্তরের শহর ও গ্রামগুলোর চাইতে অনেকটাই ভিন্ন।

এই ভৌগোলিক বিভাজনের একটি ঐতিহাসিক কারণও রয়েছে। সাহেলভিত্তিক সাম্রাজ্যগুলোর প্রসার সাধারণত দক্ষিণে এসে থেমে যেত। কারণ আরো দক্ষিণের দিকে প্রবেশের চেষ্টা করলে বাধা হয়ে দাঁড়াত ঘন বনভূমি। এইদিকে রয়েছে ইয়োরুবা ও আশান্তি জাতিগোষ্ঠীর আবাস। ব্যবসায়ীরাও তাদের ঘোড়া ও উটকে নিয়ে এই অঞ্চলে যেতে মোটেই আগ্রহী ছিল না। কারণ এই অঞ্চলের ভয়ংকর সেতসি মাছির কামড়ে বাহক পশুগুলোর মৃত্যু ছিল মোটামুটি নিশ্চিত।

উত্তর আফ্রিকা ও আরব অঞ্চলের বণিকেরা উটের কাফেলায় চাপিয়ে শুধু পণ্যই আনত না। পণ্যের সাথে তাদের কাছে আসত নতুন অনেক ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাস। এর মধ্যে অন্যতম ছিল ইসলাম। ইসলাম ধর্মের মূল বিশ্বাস হলো, "আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, আর মুহাম্মদ (সাঃ) তাঁর বার্তাবাহক।" অষ্টম শতাব্দীর গোড়াতেই সাহেল অঞ্চলে ইসলামের প্রবেশ ঘটে। পরবর্তী

শতাব্দীগুলোতে একে একে বহু প্রভাবশালী শাসক ইসলাম গ্রহণ করেন। ধীরে ধীরে স্থানীয় নানা বিশ্বাসের সঙ্গে মিশ্রণ ঘটতে থাকে ইসলামের।

পঞ্চদশ শতকে এসে আটলান্টিক উপকূলে ভিড়তে শুরু করে ইউরোপীয় বাণিজ্য জাহাজ। এর সঙ্গে বদলে যায় বাণিজ্যের ধারা। আফ্রিকান দাস ব্যবসায়ীদের হাতে এসে যায় দ্বিতীয় এক বাজার, যেখানে পুরুষ দাসের চাহিদা নারীর চেয়ে অনেক বেশি। অন্যদিকে, আফ্রিকার স্বর্ণ ব্যবসার সঙ্গে জড়িত ব্যবসায়ীরাও ইউরোপীয়দের মাধ্যমে নতুন ও লাভজনক অনেক সুযোগ খুঁজে পায়। স্বর্ণের এই বিপুল রমরমা দেখে ইউরোপীয়রা দ্রুত এই অঞ্চলটির নাম দেয় গোল্ড কোস্ট। এই বাণিজ্যিক পরিবর্তন কেবল উপকূলীয় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বরং অভ্যন্তরীণ অনেক অঞ্চলও এই আটলান্টিক ঘেঁষা বাণিজ্যপথের সাথে সরাসরি যুক্ত হয়ে যায়।

এরপর আসে ১৮৮৪–৮৫ সালের বার্লিন সম্মেলন। ইউরোপীয় পরাশক্তিগুলো বার্লিনের টেবিলে বসে আফ্রিকার মানচিত্রের ওপর কলম চালিয়ে গোটা মহাদেশটাকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়। বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, অনেক অঞ্চলে তখনো ইউরোপীয়রা পা ফেলেনি। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। বড় শক্তিগুলো জানত যে তাদের আসলে কী চাই। তাদের দরকার ছিল ভূমি ও সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ। সেই সম্মেলনের ধরন এতটাই নির্মম ও স্বার্থপর ছিল যে কয়েক বছর পর ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী লর্ড সালিসবারি মন্তব্য করেছিলেন "আমরা একে অপরের মধ্যে পাহাড়, নদী আর হ্রদ বিলিয়ে দিয়েছি। শুধু ছোট একটা সমস্যা ছিল—আমরা ঠিক জানতাম না, পাহাড়, নদী আর হ্রদগুলো কোথায়!"

আফ্রিকা মহাদেশের ওপর এই ভূরাজনৈতিক হস্তক্ষেপের সবচেয়ে গভীর দাগ পড়ে সাহেল অঞ্চলে। সাহেলের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ফরাসিদের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। আজকের মালি, নাইজার, বুরকিনা ফাসো, চাদ, মৌরিতানিয়া, সেনেগাল, গিনি, বেনিন ও আইভরি কোস্ট তখন পরিণত হয় ফরাসি 'প্রজেক্ট' এর এক বিস্তৃত পরীক্ষাগারে। এসব অঞ্চলকে দেওয়া হয় নতুন নতুন নাম—'আপার ভোল্টা', 'ফ্রেঞ্চ সুদান' বা 'সিনেগাম্বিয়া'। সব মিলিয়ে অঞ্চলটি পরিচিত হয় 'ফ্রেঞ্চ ওয়েস্ট আফ্রিকা' নামে। এর বিস্তার গিয়ে ঠেকেছিল উত্তরের আলজেরিয়া পর্যন্ত। আলজেরিয়া ঊনবিংশ শতকের শুরুতেই ফরাসি শাসনের অধীনে চলে গিয়েছিল। পুরো প্রক্রিয়াটি ছিল অত্যন্ত কঠোর ও নির্মম। এর মধ্যে সবচেয়ে কলঙ্কজনক অধ্যায় হলো ১৮৯৮/৯৯ সালের ভুলে-শানোয়াঁ অভিযান।

ফরাসি সেনা কর্মকর্তা পল ভুলে ও জুলিয়েন শানোয়াঁ সেনেগাল থেকে লেক চাদের দিকে অভিযান শুরু করেন। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ফরাসিদের দখলকৃত অঞ্চলগুলোকে একত্র করা। কিন্তু অভিযান শুরুর কিছুদিন পরেই দলটি খাদ্যসংকটে পড়ে। প্রায় ৩,০০০ সৈন্য, মালবাহক এবং বন্দী নিয়ে গঠিত এই বহরটি তখন আশেপাশের গ্রামগুলো আক্রমণ শুরু করে। শুরু হয় জবরদস্তি, লুটপাট, নারী ধর্ষণ এবং নির্বিচার হত্যাকাণ্ড। ফরাসি সরকার এই ঘটনার সংসদীয় তদন্ত করতে অস্বীকার করে। উপনিবেশ বিষয়ক মন্ত্রণালয় একটি অভ্যন্তরীণ তদন্ত করলেও সেটি নীতিগত প্রশ্নগুলো এড়িয়ে যায়। তাছাড়া আগের বহু হত্যাযজ্ঞও এই তদন্তে বিবেচনায় নেওয়া হয়নি। শেষে বলা হয়, ভুলে ও শানোয়াঁ নাকি 'সুদানাইট আইগুতে' আক্রান্ত হয়েছিলেন। অর্থাৎ অতিরিক্ত গরমে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছিলেন তারা। এক বছরেরও কম সময়ে শেষ হয় অভিযানটি। ফ্রান্সের জাতীয় ইতিহাস থেকে এই অভিযান প্রায় মুছে ফেলা হয়েছে। পাঠ্যবই দূরে থাক, জনস্মৃতিতেও একে স্থান দেওয়া হয়নি। অথচ সাহেলের জনপদগুলো আজও এই ঘটনাকে মনে রাখে এক নির্মম স্মৃতি হিসেবে।

একই সময়ে ব্রিটিশরা মিশর, সুদানে এবং সোমালিল্যান্ডে নিজেদের দখল মজবুত করছিল কিংবা বিস্তার ঘটাচ্ছিল। অন্যদিকে, ইতালির দখলে ছিল লিবিয়ার বেশিরভাগ অংশ, আর স্পেন নিয়ন্ত্রণ করছিল 'স্প্যানিশ সাহারা'। স্প্যানিশ সাহারা এখন পশ্চিম সাহারা নামে পরিচিত। এই ঔপনিবেশিক তৎপরতার ফল হিসেবে অঞ্চলটির বহু পুরোনো ঐতিহ্যবাহী বাণিজ্যপথ হয় সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, না হয় ব্যাহত হয়। ইউরোপীয় শক্তিগুলো তাদের উপনিবেশের স্বার্থে অভ্যন্তরীণ বাজার গড়ে তোলার লক্ষ্যে নতুন রেলপথ ও টার্মিনাল তৈরি করে। এগুলো কিছু ক্ষেত্রে যাতায়াত সহজ করলেও এর ফলে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসা পুরোনো বাণিজ্যপথগুলো অকেজো হয়ে পড়ে। এই পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় শিকার হয় পুরোনো পথে জীবনধারণ করা মানুষ ও স্থানীয় ব্যবসায়ীরা। তাদের আয়ে বড় ধরনের ধাক্কা লাগে। এই ধরনের তীব্র আর্থিক ও সামাজিক টানাপোড়েনই পরবর্তীকালে সাহেল অঞ্চলের সংঘাত ও অস্থিরতার অন্যতম প্রধান ভিত্তি তৈরি করেছিল।

ঔপনিবেশিক যুগে আফ্রিকার মানচিত্রে যে সীমারেখাগুলো টানা হয়েছিল, সেগুলো মূলত প্রশাসনিক অঞ্চল নির্ধারণের জন্য ব্যবহৃত হতো। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পর ১৯৫০ ও ১৯৬০-এর দশকে সেই

প্রশাসনিক রেখাগুলো ধীরে ধীরে রাষ্ট্রসীমায় পরিণত হয়। ১৯৬৪ সালে আফ্রিকান ইউনিয়নের পূর্বসূরি 'অর্গানাইজেশন অব আফ্রিকান ইউনিটির' শীর্ষ সম্মেলনে অনিচ্ছা সত্ত্বেও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। আফ্রিকান রাষ্ট্রপ্রধানরা বহু আলোচনার পর ঠিক করেন, স্থিতিশীলতার স্বার্থে ঔপনিবেশিক যুগের আঁকা এই সীমারেখাকেই রাষ্ট্রসীমা হিসেবে মেনে নিতে হবে। তাদের আশঙ্কা ছিল, যদি ঐতিহাসিক জাতিগত সম্পর্ক বা প্রাক-ঔপনিবেশিক রাজনৈতিক সত্তার ভিত্তিতে সীমান্ত পুনর্নির্ধারণের প্রক্রিয়া শুরু হয়, তবে তা সমগ্র মহাদেশে অনিশ্চয়তা ও সংঘাত ডেকে আনবে। এই নীতিকে সাধারণভাবে 'uti possidetis juris' বা 'বর্তমান দখল বজায় রাখার নীতি' হিসেবে দেখা হয়। এটি শুধু আফ্রিকায় নয়, লাতিন অ্যামেরিকা ও এশিয়ার বহু নতুন রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য ছিল। এই সমঝোতাই আফ্রিকার রাজনৈতিক মানচিত্রকে মোটামুটি অটুট রেখেছে। ব্যতিক্রম ঘটেছে মাত্র দুইটি ক্ষেত্রে। প্রথমত, দীর্ঘ সশস্ত্র সংগ্রামের পর ইরিত্রিয়ার ইথিওপিয়া থেকে স্বাধীন হওয়া, এবং দ্বিতীয়ত, ২০১১ সালে গণভোটের মাধ্যমে দক্ষিণ সুদানের আলাদা রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ। তবে দক্ষিণ সুদানের জন্মের পরপরই শুরু হয় ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ। সেই যুদ্ধ আজও স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠায় বড় বাধা হয়ে আছে।

তবে স্থিতাবস্থা বজায় রাখা এবং সীমান্ত পুননির্ধারণ—দুই মডেলেই ঝুঁকি রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে নাইজেরিয়ার কথা বলা যায়। ১৯৬০-এর দশকে দেশটির কেন্দ্রীয় সরকার দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখার লক্ষ্যে তেলসমৃদ্ধ ও ইগবো অধ্যুষিত বায়াফ্রা অঞ্চলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যুদ্ধ শেষে নাইজেরিয়া রাষ্ট্র টিকে যায়, কিন্তু প্রাণহানি ঘটে প্রায় ১০ লক্ষ মানুষের। আজও ইগবোদের অনেকেই আলাদা রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখে। তবে শুধু নাইজেরিয়াই নয়, গোটা আফ্রিকা মহাদেশ জুড়েই এমন অসংখ্য উদাহরণ আছে।

সাহেলের বর্তমান অবস্থায়ও এই প্রবণতা দেখা যায়। এই অঞ্চলের সীমান্তরেখাগুলো এখনও টিকে আছে ঠিকই, কিন্তু তা এখন এক গভীর সংকটের মুখে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব, জিহাদি গোষ্ঠীগুলোর ক্রমবিস্তৃত প্রভাব এবং প্রাক-ঔপনিবেশিক জাতিগোষ্ঠীগত বিভাজন মিলে এই অঞ্চলে এক নতুন সংঘাতের যুগ তৈরি হয়েছে।

মালির ঘটনাপ্রবাহ এই জটিল অবস্থার একটি স্পষ্ট উদাহরণ। ৯৬০ সালে ফরাসিদের নিয়ন্ত্রণাধীন পশ্চিম আফ্রিকার ভেতরে এই রাষ্ট্রের সীমানা টানা হয়।

প্রায় একই সময়ে গঠিত হয় আপার ভোল্টা, যা পরে বুরকিনা ফাসো নামে পরিচিত হয়। কিন্তু সীমান্তরেখা নিয়ে তারা কখনোই একমত হতে পারেনি। পূর্বাঞ্চলের যেসব জায়গায় মূল্যবান খনিজ সম্পদের সম্ভাবনা ছিল সেই অংশগুলো নিয়ে অসন্তোষ ছিল সবচেয়ে বেশি। এই সীমান্তবিরোধ ১৯৭৪ সালে প্রথম সশস্ত্র সংঘর্ষে রূপ নেয় এবং পরে ১৯৮২ সালে আবার সংঘর্ষ বাধে। শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক আদালত বিতর্কিত অঞ্চলটিকে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে ভাগ করে দেয়। কিন্তু এতেও সমস্যার সমাধান হয়নি। দুই পক্ষই ঔপনিবেশিক শাসকের রেখে যাওয়া কাঠামোগত সমস্যায় ভুগতে থাকে। উভয় রাষ্ট্রই দেশের নাম, পতাকা ও এক ধরনের সরকারসহ স্বাধীনতা পেয়েছিল। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসন যে অবকাঠামো রেখে গিয়েছিল, আধুনিক রাষ্ট্রচালনার জন্য তা ছিল একদমই অপর্যাপ্ত। প্রকৌশলী, চিকিৎসক বা অর্থনীতিবিদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। আর রাজনৈতিক নেতারা নির্ভর করতেন প্রথাগত গোত্রভিত্তিক ব্যবস্থার ওপর। এটি তাদের নিজস্ব গোষ্ঠীকে সুবিধা দিত। ফলে রাষ্ট্রযন্ত্র হয়ে ওঠে চরম পক্ষপাতদুষ্ট।

মালির ভেতরে দুইটি সুস্পষ্ট ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক অঞ্চল রয়েছে। একটি হলো উত্তর মালি, আর অন্যটি হলো দক্ষিণ মালি। নাইজার নদী এই দুই অঞ্চলকে প্রাকৃতিক সীমারেখার মতো বিভক্ত করেছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে, উত্তরাঞ্চল অনেক বেশি শুষ্ক। সাহারার সীমানার কাছাকাছি এলাকায় এই শুষ্কতা আরো বেশি। এই অঞ্চলে তুয়ারেগ জনগোষ্ঠী প্রভাবশালী। তুয়ারেগরা উত্তর আফ্রিকার বারবার বা আমাজিঘ জনগোষ্ঠীর একটি শাখা। এরা ঐতিহ্যগতভাবে যাযাবর জীবনযাপন করে। আলজেরিয়া, নাইজার ও মৌরিতানিয়ার সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এই অঞ্চলের প্রধান শহর গাও ও তিমবুকতুর অবস্থান নাইজার নদীর তীরে। গত ২০০ বছরে সমুদ্রপথে ইউরোপের সঙ্গে বাণিজ্য বেড়ে যাওয়ায় এই শহরগুলোর মর্যাদা ও সম্পদ কমে গেছে। অন্যদিকে, মালির দক্ষিণাঞ্চল তুলনামূলকভাবে সবুজ ও উর্বর। এখানে রয়েছে বিস্তৃত তৃণভূমি, পর্যাপ্ত বৃষ্টি, কৃষি উৎপাদন, ঘন জনবসতি এবং নানা রকম প্রাকৃতিক সম্পদ। রাজনৈতিক ক্ষমতাও মূলত এই অঞ্চলেই কেন্দ্রীভূত। কারণ মালির রাজধানী বামাকোর অবস্থানও এই অঞ্চলে। এখানে বাস করে বামবারা জনগোষ্ঠী, যাদের শিকড় বুরকিনা ফাসো, আইভরি কোস্ট ও গিনির দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত। ফলে, উত্তর ও দক্ষিণ মালির মধ্যে প্রাকৃতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিভাজন প্রবল ও সুস্পষ্ট। এই বিষয়টি দেশের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতার অন্যতম প্রধান কারণ।

স্বাধীনতার কয়েক দশক পেরিয়ে গেলেও মালির অভিজাত শ্রেণি এখনো 'অন্যদেরকে' 'নিজেদের' অংশ হিসেবে মানতে অনিচ্ছুক। ফরাসি ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হওয়ার পর বামাকোর নতুন নেতারা প্রথম যে কাজগুলো করেছিলেন, তার একটি হলো ফরাসিদের 'বিভাজন ও শাসন' নীতি বজায় রেখে উত্তরাঞ্চলের অপেক্ষাকৃত ফর্সা তুয়ারেগ উপজাতিদের দমন করা। তাদেরকে দেখা হতো পশ্চাৎপদ, আগ্রাসী ও বর্ণবাদী হিসেবে। এই ঘটনার পাল্টা প্রতিক্রিয়ায় বহু যাযাবর তুয়ারেগ ক্ষুব্ধ হয় এই ভেবে যে, তারা এমন এক রাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে যাকে তারা চিনত না। তাদের মতে এমন এক রাষ্ট্রে তাদের জোরপূর্বক যুক্ত করা হয়েছে, যেখানে কর্তৃত্ব চলে গেছে দক্ষিণের স্থায়ী কৃষিজীবী জনগণের হাতে। অথচ অতীতে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে দক্ষিণের লোকেরা উত্তরাঞ্চলের যোদ্ধাদের ভয় পেত। স্বাধীনতার মাত্র দুই বছর পর ১৯৬২ সালে প্রথম তুয়ারেগ বিদ্রোহ ঘটে। এরপর থেকে পর্যায়ক্রমে বারবার উত্তেজনা ও সহিংসতা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। বর্তমান অস্থিরতাকে সেই ধারাবাহিকতারই অংশ বলা যায়। বর্তমানে তুয়ারেগদের একটি আন্দোলন গড়ে উঠেছে, যারা আজাওয়াদ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবি করছে।

তবে সব পক্ষেই এমন কিছু মানুষ আছেন যারা ঐতিহাসিক বিভাজন পেরিয়ে জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলতে চান। এমনকি একসময় তুয়ারেগ বংশোদ্ভূত একজন প্রধানমন্ত্রীও হয়েছিলেন। কিন্তু এতেও অবস্থার তেমন পরিবর্তন হয়নি। উত্তরাঞ্চল এখনো দক্ষিণের তুলনায় কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল থেকে অনেক কম অর্থ পায়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে—সরকার যদি নাগরিকদের জন্য কিছু না করে, তবে এমন সরকারের প্রয়োজন কী?

২০১২ সালে তুয়ারেগদের 'ন্যাশনাল মুভমেন্ট ফর দ্য লিবারেশন অব আজাওয়াদ' মালির রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করে। আর এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে গোটা সাহেল অঞ্চলে। এর আগে বহুবার তুয়ারেগ বিদ্রোহ হয়েছিল, কিন্তু এবার পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ এবার তারা সমর্থন পেয়েছিল আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলোর। মালিভিত্তিক 'আনসার দিন' ও আলজেরিয়া-প্রভাবিত 'মুভমেন্ট ফর ওউনেস অ্যান্ড জিহাদ ইন ওয়েস্ট আফ্রিকার' সঙ্গে জোট বাঁধার মাধ্যমে তুয়ারেগ যোদ্ধারা আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে অনেক বেশি সুসজ্জিত ও ভয়ংকর হয়ে ওঠে। এই দুই সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর পেছনে ছিল আরেক পরিচিত নাম—'আল-কায়েদা ইন দ্য ইসলামিক মাগরিব' (AQIM)। এই ঘটনার

পেছনে বড় ভূমিকা রাখে ১৯৯০-এর দশকের আলজেরিয়ার গৃহযুদ্ধ এবং ২০১১ সালে লিবিয়ায় শুরু হওয়া গৃহযুদ্ধ। এই দুই গৃহযুদ্ধ থেকে বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ছড়িয়ে পড়ে সাহেল অঞ্চলে।

২০০২ সালে আলজেরিয়ার গৃহযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর উত্তর মালিতে এসে আশ্রয় নেয় কিছু ইসলামি চরমপন্থী। তারা আলজেরিয়ার সামরিক জান্তার জায়গায় ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। এই চরমপন্থীদের একটি বড় অংশ ছিল 'সালাফিস্ট গ্রুপ ফর প্রিচিং অ্যান্ড কমব্যাট' (GSPC)। আলজেরিয়ার 'আর্মড ইসলামিক গ্রুপের' (GIA) ভাঙনের ফলে এই গোষ্ঠীটি তৈরি হয়েছিল। তারা মাদক চোরাচালান ও অপহরণের অর্থে টিকে থাকা এক গোষ্ঠীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে স্থানীয় বিদ্রোহগুলোর ভেতরে ঢোকার সুযোগ করে নেয়। আর এখান থেকেই শুরু হয় 'আল-কায়েদা ইন দ্য ইসলামিক মাগরেবের উত্থান'। তারা ধীরে ধীরে স্থানীয় তুয়ারেগ বিদ্রোহীদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং তাদের আন্দোলনের আড়ালে নিজেদের উপস্থিতি পাকাপোক্ত করে তোলে। অন্যদিকে ২০০০-এর দশকে মালির হাজার হাজার তুয়ারেগ তরুণ লিবিয়ায় গাদ্দাফির বাহিনীতে যোগ দেয়। গাদ্দাফি এই তুয়ারেগদের সামরিক প্রশিক্ষণ দেন এবং 'ইসলামিক লিজিয়ন' নামে একটি বাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করেন। তেল সম্পদের জোরে গোটা অঞ্চলে প্রভাব বিস্তার করার পরিকল্পনা ছিল কর্নেল গাদ্দাফির। আর এজন্য তিনি মালিতে ইচ্ছাকৃতভাবে বিভাজন সৃষ্টি করে দেশটিকে দুর্বল করে নিজের নিয়ন্ত্রণ জোরদার করতে চেয়েছিলেন। তুয়ারেগদের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি দেখা যায়, তারা এমন একটি রাষ্ট্রের নাগরিক, যেটি তাদের কখনোই আপন করে নেয়নি। ফলে, বাইরের কারও সহায়তা নিতে তাদের কোনো বাধা ছিল না। অন্যদিকে মালির সরকার যেন গাদ্দাফির কর্মকাণ্ডের সমালোচনা না করে, সেই উদ্দেশ্যেই তিনি প্রচুর অর্থ ব্যয় করে দেশটিতে টেলিভিশন চ্যানেল প্রতিষ্ঠা করেন। বিভিন্ন অঞ্চলে নির্মাণ করে দেন মসজিদ। কিন্তু ২০১১ সালে গাদ্দাফির পতনের পর পরিস্থিতি বদলে যায়। ভাড়াটে সেনারা প্রচুর ভারী অস্ত্র লুট করে নিজ দেশ মালিতে ফিরে আসে। মালি ও সাহেল অঞ্চলে সহিংসতা বিস্তারের এক ভয়াবহ অনুঘটক হয়ে ওঠে এই অস্ত্র। অল্প সময়ের মধ্যেই মালিতে শুরু হয় চরম বিশৃঙ্খলা। আর দুই বছরের মধ্যেই সহিংসতা সীমান্ত পেরিয়ে অস্থিতিশীল করে তোলে গোটা সাহেলকে।

মালি ছিল বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর একটি। মালির বহু অঞ্চলে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ ছিল দুর্বল। ফলে একদল সুসজ্জিত, সুসংগঠিত এবং মতাদর্শে

বলীয়ান বিদ্রোহী যখন উত্তরের শহরগুলোতে আক্রমণ শুরু করে, তখন তাদের প্রতিরোধ করার মতো প্রস্তুতি সরকারের ছিল না। তিমবুকতুসহ উত্তর মালির প্রধান শহরগুলো একে একে দখল করে নেয় বিদ্রোহীরা। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তারা বিশাল এলাকা নিজেদের দখলে নেয়, যার আয়তন ফ্রান্সের থেকেও বড়!

প্রায় নয়শত বছর আগে তুয়ারেগরাই তিমবুকতু শহরের পত্তন করেছিল। একসময় শহরটি ছিল পৃথিবীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইসলামি শিক্ষাকেন্দ্র। চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত আফ্রিকা, মধ্যপ্রাচ্য এবং ইউরোপের পণ্ডিতদের জন্য একটি মিলনস্থলে পরিণত হয়েছিল এই তিমবুকতু শহর। এখানে সংগৃহীত ও রচিত হয়েছিল হাজার হাজার দুর্লভ পাণ্ডুলিপি। সাহিত্য, আইন, জ্যোতির্বিদ্যা, গণিত ও ইসলামি ধর্মতত্ত্বকে সমৃদ্ধ করেছিল এইসব পুস্তক। বহু সুফি দরবেশ, আলেম ও ইসলামি চিন্তাবিদ বসবাস করতেন এই শহরে। তাদের অনেকেই মানুষের কাছে 'ওলি' বা সাধক হিসেবে সম্মান পেয়েছেন। পুরো শহর ও তার আশেপাশের এলাকা জুড়ে অসংখ্য সুফি সাধক বা আধ্যাত্মিক ব্যক্তিত্ব সমাহিত আছেন। মুসলিমরা এই কারণেই তিমবুকতুকে '৩৩৩ আউলিয়ার নগরী' বলেন। সেই সুফি ঐতিহ্যবাহী শহরেই কঠোর শরিয়াভিত্তিক শাসন চাপিয়ে দেয় ইসলামি চরমপন্থীরা। শহুরে জনগণের জীবনধারা পাল্টে যায় মুহূর্তের মধ্যেই। তারা এসব নিয়মের সঙ্গে অভ্যস্ত ছিল না, ফলে হঠাৎই দমন-পীড়নের শিকার হতে শুরু করে জনগণ। নারীদের বাধ্য করা হয় পুরো শরীর ঢাকা পোশাক পরতে। কেউ নির্দেশ না মানলে প্রকাশ্যে বেত্রাঘাত করা হয়। সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয় ধূমপান। গানবাজনা হারাম ঘোষণা করে শিল্পীদের বাদ্যযন্ত্র ভেঙে ফেলা হয়। ধ্বংস করা হয় শহরের বহু প্রাচীন নিদর্শন। তারা এমনকি পঞ্চদশ শতকের সিদি ইয়াহিয়া মসজিদের একটি নির্দিষ্ট ফটকও ভেঙে ফেলে। স্থানীয় বিশ্বাস অনুযায়ী, সেই দরজা কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ থাকার কথা। একধরনের অলৌকিক নিষেধাজ্ঞা বা বরকতের প্রতীক হিসেবে ধরা হতো সেটিকে। এই বিশ্বাসকে 'ইসলামবিরোধী', 'শিরক' বলে আখ্যা দিয়ে প্রাচীন দরজাটি উপড়ে ফেলা হয়। স্থানীয় ইমাম আলফা আব্দুল্লাহিকে তারা প্রায় ৯০ ডলার দেয় মেরামতের জন্য। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। তার কথায়, "ওরা যে ক্ষতি করেছে তা আর কখনোই পূরণ করা সম্ভব নয়।"

রাজধানী বামাকোর অবস্থান যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রায় ১,০০০ কিলোমিটার দক্ষিণে। সরকার সেখানে বসে দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধ্বংসের কঠোর নিন্দা জানিয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেছিল। তবে বাস্তবে তাদের কিছুই করার ক্ষমতা ছিল না। সরকারি

সেনারা আগেই পালিয়ে গিয়েছিল, প্রশাসনিক কাঠামোও প্রায় পুরোপুরি ভেঙে পড়েছিল সেখানে।

২০১৩ সালের জানুয়ারির শুরুতে সামরিক ও আদর্শিক উভয় দিক থেকেই সীমা অতিক্রম করে ফেলে তুয়ারেগ ও জিহাদি শক্তি। অতিরিক্ত আগ্রাসী হয়ে ওঠে তুয়ারেগ ও জিহাদি গোষ্ঠীগুলো। AQIM-সংযুক্ত গোষ্ঠীগুলোর ফিল্ড কমান্ডার এবং তুয়ারেগ নেতারা ঊর্ধ্বতনদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করে দক্ষিণে অগ্রসর হয় তারা। অথচ এই ধরনের অভিযান নিয়ে তাদের বিদেশি জ্যেষ্ঠ কমান্ডাররা আগেই সতর্ক করেছিলেন। স্থানীয় যোদ্ধারা যেখানে তাৎক্ষণিক যুদ্ধজয়ের চিন্তায় থাকেন, সেখানে দূরদর্শী বিদেশি কমান্ডাররা অনেক সময় বড় কূটনৈতিক ও কৌশলগত প্রেক্ষাপট বিবেচনায় নেন। তারা জানতেন যে এভাবে আগ্রাসন চালালে তা হবে এই অঞ্চলের প্রধান বহিঃশক্তি ফ্রান্সকে প্ররোচিত করা।

তবে এখানেও বাস্তবতা বেশ জটিল। তুয়ারেগরা প্রায়শই জিহাদি পরিচয়ে লড়লেও আল-কায়েদার বৈশ্বিক লক্ষ্য থেকে তাদের লক্ষ্য আলাদা। তুয়ারেগদের কাছে স্থানীয় রাজনীতি অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। পশ্চিমা গোয়েন্দা সূত্রের ভাষায়, স্থানীয় যোদ্ধাদের অনেকেই বাইরে থেকে আসা গোষ্ঠীতে যোগ দিলেও খিলাফত বা আল-কায়েদা-আইসিসের নামে তাদের পরিচিতি আসলে এক ধরনের 'রেড হেরিং' বা 'ভুল দিশা' হিসেবে কাজ করে। 'রেড হেরিং' হলো এমন একটি 'ফ্যালাসি' বা বিপথগামী তথ্য, যা মূল বিতর্ক বা আলোচনার বিষয় থেকে মনোযোগ সরিয়ে অন্য একটি অপ্রাসঙ্গিক বা কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে নিয়ে যায়। গোয়েন্দাদের ভাষায়, তুয়ারেগরা মুসলিম হলেও তাদের লড়াই খিলাফতের জন্য নয়। তাদের ক্ষোভের শেকড় আইসিসের উত্থানের আগেই ছিল। আর তা অনেক বেশি স্থানীয় ও আঞ্চলিক রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত। তুয়ারেগদের স্বাধীনতার আন্দোলনকে আল-কায়েদার লেবেল দিলে দীর্ঘদিনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দ্বন্দ্ব আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসবাদের হুমকির আড়ালে চাপা পড়ে যায়। ফলে সমস্যা সমাধানের বদলে দমনই মুখ্য হয়ে ওঠার সম্ভাবনা থাকে।

আল-কায়েদা সাধারণত দীর্ঘমেয়াদি কৌশল নিয়ে এগোয়। কিন্তু, তুয়ারেগ যোদ্ধাদের একটি অংশকে রাজধানীর দিকে অগ্রসর হওয়ার আগ্রহ থেকে থামাতে ব্যর্থ হয় তারা। যোদ্ধারা নাইজার নদী পেরিয়ে বামাকোর দিকে অগ্রসর হলো। আর একবার যখন তারা নাইজার পেরিয়ে গেল, তখন আর পিছু হটার পথ রইল না। এ যেন প্রাচীন রোমের সেই 'রুবিকন নদী পার' হওয়ার মুহূর্ত। রুবিকন ছিল রোম সাম্রাজ্যের উত্তরের সীমান্তে অবস্থিত একটি ছোট্ট নদী। আইনে নির্ধারিত ছিল, কোনো রোমান জেনারেল তার সেনাবাহিনী নিয়ে রুবিকন অতিক্রম করতে পারবে না। যদি তারা এই সীমানা

পার হয় তাহলে সেটাকে বিদ্রোহ হিসেবে গণ্য করা হবে। খ্রিস্টপূর্ব ৪৯ সালে এক লিজিয়ন সেনা নিয়ে জুলিয়াস সিজার রুবিকন অতিক্রম করেন। সেই মুহূর্তেই রোমের ইতিহাস ঘুরে যায়, শুরু হয় গৃহযুদ্ধ। এই ঘটনার স্মরণেই ইংরেজিতে "Crossing the Rubicon" কথাটি তৈরি হয়েছে, যার অর্থ—এমন এক সিদ্ধান্ত নেওয়া, যার পর আর ফেরার উপায় থাকে না।

তুয়ারেগদের ক্ষেত্রেও তাই হলো। একবার এগোনো শুরু করার পর আর থামতে পারল না তারা। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যেই তারা শক্তিশালী এক বাহিনীর মুখোমুখি হলো। আর তখন দেখা গেল—যে জনগণকে তারা শাসন করতে চেয়েছিল, তাদের কাছ থেকে কোনো সমর্থনই পেল না তারা। কারণ, তাদের চাপিয়ে দেওয়া কঠোর শরিয়াতন্ত্র সাধারণ মানুষকে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়েছিল।

সম্ভবত স্থানীয় জিহাদিরা বুঝতেই পারেনি যে ইউরোপের দোরগোড়ায় কোনো আইসিসধর্মী রাষ্ট্র গড়ে ওঠার সম্ভাবনাকে ফ্রান্স কোনোভাবেই মেনে নেবে না। এই অঞ্চলের প্রধান বিদেশি শক্তি হিসেবে ফ্রান্সের পক্ষে বসে থাকা সম্ভব ছিল না। তাছাড়া, সাহেলে তাদের স্বার্থ বহুস্তরবিশিষ্ট। অভিবাসন নিয়ন্ত্রণ, অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং বিশেষ করে পরমাণু জ্বালানির কারণে সাহেলে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ফ্রান্সের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একবিংশ শতকের শুরু থেকেই ফ্রান্স বহু জঙ্গি হামলার শিকার হয়েছে। হামলাগুলোর একটি বড় অংশের যোগসূত্র রয়েছে সেইসব দেশের সঙ্গে, যেগুলো একসময় ফরাসি উপনিবেশ ছিল। এইসব দেশের বহু নাগরিক দ্বৈত নাগরিকত্বের সুবিধায় সহজেই ফ্রান্সে প্রবেশ করতে পারে। ২০০০ সালের পর থেকে ফ্রান্সে সন্ত্রাসী হামলায় প্রাণ হারিয়েছেন ৩০০ জনেরও বেশি মানুষ। আহত হয়েছেন আরো শত শত। তাই জিহাদিরা বামাকোর দিকে এগিয়ে আসতেই ফরাসি যুদ্ধবিমান আকাশে ওঠে এবং স্পেশাল ফোর্স ইউনিট মোতায়েন করা হয়। এতে ঔপনিবেশিক ইতিহাসের ভূমিকা থাকলেও পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল মূলত বর্তমান স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনে।

ফরাসিরা জানে, সাহেল অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলো নিজেদের শক্তিতে এতসব জটিল হুমকির মোকাবিলা করতে পারবে না। যদি একা ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে মালি ও বুরকিনা ফাসোর মতো দেশ ভেঙে পড়তে পারে। আর তার ফলে তৈরি হবে এক বিশাল শাসনশুন্য অঞ্চল। সেই শাসনশূন্যতা ভরাট করতে চাইবে আল-কায়েদা। আর সেখান থেকে তারা নিজেদের সীমানা প্রসারিত করার চেষ্টা করবে। এর বাইরে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, সাহেলজুড়ে রয়েছে ফ্রান্সের কয়েক হাজার প্রবাসী নাগরিক। বিশেষ করে নাইজারে। এই দেশেই রয়েছে ইউরেনিয়ামের খনি,

যা ফরাসি পারমাণবিক শিল্পকে জ্বালানি সরবরাহ করে। ফ্রান্সের মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের ৭০ শতাংশই আসে পারমাণবিক শক্তি থেকে। তাদের মোটি চাহিদার প্রায় ১৫ শতাংশ ইউরেনিয়াম নাইজার থেকে আসে।

ফরাসি বিমান হামলা শুরু হলে জিহাদি গোষ্ঠীগুলো পিছু হটে উত্তরে সরে যেতে থাকে। আর তাদের পিছু নেয় ফরাসি স্পেশাল ফোর্স। এরপর মালির সরকারের আমন্ত্রণে শুরু হয় 'অপারেশন সার্ভাল'। অভিযানের নাম রাখা হয় আফ্রিকার সাভানা তৃণভূমিতে বিচরণকারী চতুর, ক্ষিপ্র ও ভয়ঙ্কর বুনো বিড়াল 'সার্ভাল' এর নামে।

আড়াই হাজার ফরাসি সেনা দ্রুত মালিতে এসে নামে এবং জাতিসংঘের অনুমোদন ও মালির সেনাবাহিনীর সহায়তা নিয়ে তারা অল্প সময়ের মধ্যেই জিহাদিদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়। তবে 'ছত্রভঙ্গ' মানে নির্মূল নয়। অনেক বিদ্রোহীকে হত্যা করা হয়, কিন্তু বাকিরা ছড়িয়ে পড়ে বিস্তীর্ণ সাহেল অঞ্চলে।

কিছুদিনের মধ্যেই পুনর্গঠিত হয়ে আবারও প্রকাশ্যে আবির্ভূত হয় বিভিন্ন জঙ্গিগোষ্ঠী। এর প্রথম ইঙ্গিত মেলে পাশের দেশ নাইজারে। ২০১৩ সালের মে মাসে নাইজারে 'দোজ হু সাইন ইন ব্লাড' নামে একটী নতুন গোষ্ঠী এক ভয়ংকর জঙ্গি হামলা চালায়। এর নেতা ছিলেন AQIM এর সাবেক কমান্ডার মোকতার বেলমোখতার। পরে তিনি নিজের দলের সাথে আরেকটি জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে একীভূত করে গড়ে তোলেন 'আল-মুরাবিতুন' নামের এক ভয়ঙ্কর জিহাদি দল। এই নতুন সংগঠনের ঘোষিত লক্ষ্য ছিল 'নীলনদ থেকে আটলান্টিক মহাসাগর পর্যন্ত অবিশ্বাসীদের তাড়ানো' এবং একই সঙ্গে 'ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিচালিত জায়নিস্ট অভিযানের মোকাবিলা করা'।

২০১৪ সালে ফরাসি সেনার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৪,৫০০ জনে। তবে ততদিনে অপারেশন সার্ভালের নতুন নাম হয়েছে 'অপারেশন বারখান'। নামটি রাখা হয় সাহারার মরুভূমির অর্ধচন্দ্রাকৃতির বালিয়াড়ির নামে। এই বালিয়াড়ির নাম 'বারখান ডিউনস'। অপারেশন বারখান ছিল একটি দীর্ঘমেয়াদি সামরিক পরিকল্পনা। এই অপারেশনের সীমানা মালি ছাড়িয়ে বিস্তৃত হয় প্রতিবেশি বুরকিনা ফাসো, চাদ, মৌরিতানিয়া এবং নাইজার পর্যন্ত। এই পাঁচ দেশ মিলে 'জি-৫ সাহেল' নামের একটি সহযোগিতা জোট গঠন করে। এই দেশগুলো সম্মিলিতভাবে ৫,০০০ সেনা, পুলিশ, জেন্ডারমেরি ও সীমান্ত রক্ষী মোতায়েন করে। কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল যে হুমকিটি কেবল একটি দেশের নয়, বরং পুরো অঞ্চলের জন্য। কিন্তু মাত্র কয়েক হাজার সৈন্য দিয়ে প্রায় ৫০ লাখ বর্গকিলোমিটারের এই বিশাল মরুময় দুর্গম অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদের

বিস্তার রুখে দেওয়া সম্ভব ছিল না। বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে জঙ্গিগোষ্ঠীগুলো একে অপরের সঙ্গে জুড়ে গিয়ে এক ধরনের বৃহত্তর নেটওয়ার্ক গড়ে তোলে।

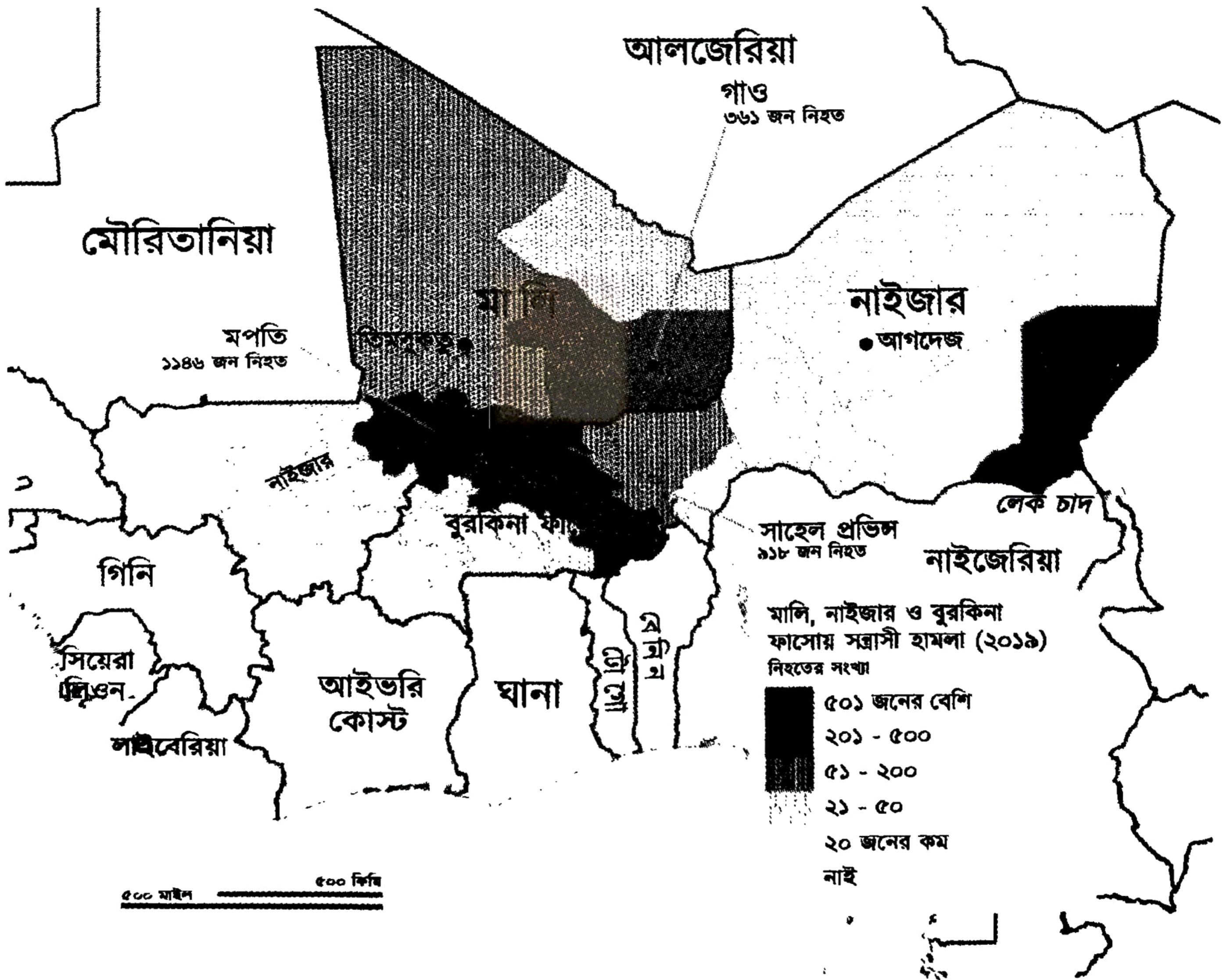
২০১৪ সালের মধ্যেই উত্তর মালিতে জঙ্গিরা আবারও সক্রিয় হয়ে ওঠে। ২০১৫ সালে দেশটির মধ্যাঞ্চলেও তাদের দেখা যায়। ২০১৬ সালে তারা ছড়িয়ে পড়ে নাইজারের পশ্চিমাঞ্চল এবং ও বুরকিনা ফাসোর উত্তরাঞ্চলে। ২০১৮ সালের মধ্যে বুরকিনা ফাসোর পূর্বাঞ্চলেও জঙ্গি উপস্থিতি ছড়িয়ে পড়ে। পাশাপাশি উত্তর আফ্রিকা, হর্ন অফ আফ্রিকা এবং নাইজেরিয়ার বোকো হারামের মতো গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে যোগসূত্র বাড়ার ইঙ্গিত মেলে। সংশ্লিষ্ট মহলের আশঙ্কা ছিল যে, এই বিস্তার ধীরে ধীরে বেনিন, আইভরি কোস্ট, টোগো ও ঘানার মতো পশ্চিম আফ্রিকার দেশগুলোতেও ছড়িয়ে পড়বে। এই ভয় আর আশঙ্কা সত্যি হয়ে দেখা দেয় ২০১৯ সালে। বেনিন ও বুরকিনা ফাসোর সীমান্ত থেকে দুই ফরাসি পর্যটককে অপহরণ করা হয়। এটি ছিল সাহেল অঞ্চলে জিহাদিদের ক্রমবর্ধমান ভৌগোলিক বিস্তারের এক স্পষ্ট প্রমাণ।

সাহেল অঞ্চলে সক্রিয় জিহাদি গোষ্ঠীগুলো সচরাচর স্থানীয় কিংবা আন্তর্জাতিক বাহিনীর সঙ্গে সরাসরি সংঘাতে যেতে চায় না। তারা খুশি মনে 'সিড দ্য ব্যাটলগ্রাউন্ড' অর্থাৎ যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে দেওয়ার কৌশল অনুসরণ করে। তাদের কৌশল মূলত গেরিলা যুদ্ধ ও হিট-অ্যান্ড-রান হামলার ওপর নির্ভরশীল। অর্থাৎ, হঠাৎ আক্রমণ করে আবার দ্রুত সরে পড়ে তারা। এই আক্রমণের অন্যতম অস্ত্র হলো আইইডি বা ইম্প্রোভাইজড এক্সপ্লোসিভ ডিভাইস, বা সহজভাবে বললে হাতে তৈরি বিস্ফোরক। এসব বিস্ফোরক গাড়ির নিচে পুঁতে রাখা হয়, অথবা রাস্তার পাশে লুকিয়ে রেখে সৈন্যদের গতিরোধ করা হয়। হামলার পর তারা মিশে যায় জনসাধারণের মধ্যে। অথবা তারা সেইসব এলাকায় সরে পড়ে যেগুলো রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের বাইরে। মালিতে কর্মরত এক নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞের ভাষায়: "এই মিলিশিয়ারা সীমিত সময়ের জন্য আঞ্চলিক আধিপত্য সৃষ্টি করতে পারে। তারা হঠাৎ কোনো এলাকায় হয়তো বারো ঘণ্টা সময়ের জন্য বিপুল শক্তি ঢেলে দেয়। তারপর সরকারি সেনাঘাঁটি দখল করে আবার অদৃশ্য হয়ে যায়।"

সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনা ঘটে ২০১৯ সালের ডিসেম্বর মাসে। সশস্ত্র জঙ্গিরা একটি সামরিক ঘাঁটিতে আক্রমণ চালিয়ে ৭১ জন সেনাকে হত্যা করে। মাত্র এক মাস পর ২০২০ সালের জানুয়ারিতে আরেকটি হামলায় নিহত হয় আরো ৮৯ জন। তারপর মার্চের শেষদিকে বিশ্ব যখন করোনা ভাইরাস মহামারি নিয়ে ব্যস্ত, তখন বোকো হারাম চাদের লেক চাদের কাছে একটি সেনাঘাঁটিতে অতর্কিত হামলা চালায়। সাত ঘণ্টার লড়াইয়ে তারা অন্তত ৯২ জন ভারী অস্ত্রসজ্জিত সৈন্যকে হত্যা করে, যা চাদের সেনাবাহিনীর ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ ক্ষতি। এই ঘটনার পর থেকেই আন্তর্জাতিক মহলে প্রশ্ন ওঠে, চাদ রাষ্ট্রটি আদৌ টিকে থাকতে পারবে কি না। ১ কোটি ৬০ লাখ

মানুষের এই রাষ্ট্রে রয়েছে দুই শতাধিক জাতিগোষ্ঠী, যারা ছড়িয়ে আছে যুক্তরাজ্যের চেয়েও বড় একটি ভূখণ্ডজুড়ে। অথচ সরকার জনগণকে রক্ষার কথা তো দূরের কথা, নিজ সেনাবাহিনীকেই রক্ষা করতে ব্যর্থ।

পুরো অঞ্চলে ২০১৯ জুড়ে সেনা ও বেসামরিক লক্ষ্যবস্তুতে হামলা অব্যাহত ছিল। অথচ বিস্ময়করভাবে, আন্তর্জাতিক মহলের দৃষ্টিতে এই সংকট ছিল প্রায় অদৃশ্য। এই প্রেক্ষাপটে ২০২০ সালের জানুয়ারিতে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাক্রোঁ এক শীর্ষ সম্মেলন আহ্বান করেন এবং আন্তর্জাতিক সমর্থন চান। মাক্রোঁ মনে করতেন, সাহেল অঞ্চলের নিরাপত্তা ইউরোপের নিজস্ব নিরাপত্তার সঙ্গেই জড়িত। তার প্রস্তাব ছিল—নতুন এক ইউরোপীয় প্রতিরক্ষা নীতির অংশ হতে হবে, যার উদ্দেশ্য হবে দক্ষিণের দেশগুলোর পতন ঠেকানো এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের ইউরোপমুখী শরণার্থী প্রবাহ রোধ করা। তিনি মনে করিয়ে দেন, ফরাসি বাহিনী ইতোমধ্যে চল্লিশের বেশি সৈন্য হারিয়েছে, এবার অন্য ইউরোপীয় দেশগুলোর এগিয়ে আসার সময়।



চিত্র: সাম্প্রতিক বছরগুলোতে সাহেল অঞ্চলে সন্ত্রাসী হামলার সংখ্যা আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে।

মাক্রোঁর এই আহ্বানে সাড়া খুব বেশি মেলেনি। ইরাকের অভিজ্ঞতায় দগ্ধ যুক্তরাজ্য তখন ব্যস্ত ছিল সিরিয়ায়। আর ইউরোপের অন্যান্য দেশ, বিশেষ করে জার্মানি বহুদিন ধরেই সামরিক বাহিনী পাঠাতে অনীহা প্রকাশ করে আসছে। ব্রিটিশরা অবশ্য কয়েক ডজন সেনা ও তিনটি হেলিকপ্টার পাঠিয়েছিল যাতে ফরাসি সেনাদের পরিবহনে সহায়তা করা যায়। ডেনমার্ক পাঠায় কয়েকটি বিমান ও প্রায় সত্তর জন সেনা। চেক রিপাবলিকের সরকার যোগ করে আরো ষাটজন। এস্তোনিয়া আগেই তাদের স্কাউট ব্যাটালিয়ন থেকে পঞ্চাশ সদস্যের একটি সাঁজোয়া পদাতিক ইউনিট পাঠিয়েছিল।

এই সীমিত সহায়তার চিত্র দেখে প্রেসিডেন্ট মাক্রোঁ শেষ পর্যন্ত নিজেই আরো ৬০০ ফরাসি সেনা এবং ১০০টি সাঁজোয়া যান পাঠানোর নির্দেশ দেন। ফলে সাহেল অঞ্চলে ফরাসি বাহিনীর মোট সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ৫,১০০ জনে। ২০২০ সালে সুইডেনও এগিয়ে আসে। একটি হেলিকপ্টার-নির্ভর কুইক রেসপন্স টিম এবং স্পেশাল ফোর্সের ১৫০ জন সেনা পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দেয় তারা। তাদের কয়েকজন সেনা আগে থেকেই জাতিসংঘের কমান্ডে সেখানে অবস্থান করছিল। এরপর যুক্তরাজ্য ঘোষণা করে ২৫০ সদস্যবিশিষ্ট একটি লং রেঞ্জ মেকানাইজড রিকনেসান্স টাস্ক গ্রুপ পাঠানো হবে। তাদের দায়িত্ব হবে এমন এলাকায় পৌঁছানো যেখানে অধিকাংশ সেনা যেতে চায় না এবং সেখান থেকে সরাসরি গোয়েন্দা তথ্য এনে জাতিসংঘের মিশন সদর দপ্তরে সরবরাহ করা। অন্য কথায়, ঝুঁকিপূর্ণ জায়গায় মোতায়েন করা হবে। তবে এটি ছিল তৎকালীন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরিস জনসনের জন্য একটি উচ্চঝুঁকির সিদ্ধান্ত। কারণ, ২০১৩ সালে গঠিত জাতিসংঘ মিশন 'মাল্টিডাইমেনশনাল ইন্টিগ্রেটেড স্ট্যাবিলাইজেশন মিশন ইন মালি (MINUSMA) জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনগুলোর মধ্যে সবচেয়ে প্রাণঘাতী মিশন হিসেবে পরিচিত। এই মিশনে এখন পর্যন্ত ২০০ জনের বেশি শান্তিরক্ষী প্রাণ হারিয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট মাক্রোঁ বারবার চেষ্টা করেছেন আলজেরিয়ার সুসজ্জিত 'আর্মে ন্যাশনাল পপুলেয়ার' বাহিনীকে এই সংঘাতে সম্পৃক্ত করতে। কিন্তু আলজেরিয়ায় দীর্ঘদিনের ফরাসি উপনিবেশের ইতিহাস আছে। এই ঐতিহাসিক কারণে আলজিয়ার্স এমন কোনো অভিযানে অংশ নিতে রাজি নয় যেখানে তাদের সেনারা কার্যত প্যারিসের অধীনে কাজ করবে। আলজেরিয়ার শর্ত স্পষ্ট—যদি তারা অংশ নেয়, তবে সেই বাহিনী কেবল আফ্রিকান ইউনিয়নের অধীনেই কাজ করবে। তাছাড়া, আলজেরিয়ার আরেকটি গভীর দুশ্চিন্তা রয়েছে। তুয়ারেগ মিলিশিয়ারা

দীর্ঘদিন ধরেই 'আজাওয়াদ' নামে যে স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন দেখে, সেই মানচিত্রে আলজেরিয়ার দক্ষিণের কিছু এলাকাও অন্তর্ভুক্ত। আলজিয়ার্সের আশঙ্কা, সামরিকভাবে যুক্ত হওয়া মানে সেই ভীমরুলের চাকে আরো নাড়া দেওয়া। ফলে আলজিয়ার্স বরং দূরত্ব বজায় রাখাকেই নিরাপদ মনে করে।

এদিকে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক নানা বাহিনী ও সংস্থা এখন মরিয়া হয়ে অঞ্চলটিকে স্থিতিশীল করার চেষ্টা করছে। ২০১৭ সালে ফ্রান্স, জার্মানি, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি (UNDP), বিশ্বব্যাংক ও আফ্রিকান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক মিলে গঠন করে 'সাহেল অ্যালায়েন্স'। পরে যুক্তরাজ্য, ইতালি এবং স্পেনও এতে যুক্ত হয়। ২০১৮ সালে এই জোট প্রতিশ্রুতি দেয়, তারা এই অঞ্চলে কর্মসংস্থান ও অবকাঠামো উন্নয়নে ৬ বিলিয়ন ইউরোর প্রকল্প হাতে নেবে। সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতও নানা আঞ্চলিক প্রকল্পে অর্থ ঢেলেছে এখানে। তবে তাদের উদ্দেশ্য এই অঞ্চলে ইরানের প্রভাব কমানো। ইরান ক্রমশই সাহেল এলাকায় বাণিজ্য ও কূটনৈতিক উপস্থিতি বাড়ানোর চেষ্টা করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও সাহেলের জন্য সামরিক সহায়তা বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, যদিও তার সবটুকু এখনও বাস্তবায়িত হয়নি।

আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় সাহেলজুড়ে কার্যত এক ধরনের স্থায়ী উপস্থিতি তৈরি করেছে। একদিকে রয়েছে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশন MINUSMA, অন্যদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সামরিক প্রশিক্ষণ মিশন EUTM Mali. এছাড়া জি-৫ সাহেলের যৌথবাহিনী তো আছেই। সব মিলিয়ে এখানে গড়ে উঠেছে এক বিস্তৃত নিরাপত্তা ও উন্নয়ন কর্মসূচির জাল। কিন্তু এতসব সংস্থার ভিড়কে অনেক বিশ্লেষক কার্যকর বলে মনে করেন না। তাদের মতে, বাস্তবে এখানে যেন এক ধরনের 'অ্যালফাবেট সুপ' বা সংক্ষিপ্ত নামের হাট বসেছে। প্রতিটি সংস্থা তাদের নিজস্ব ম্যান্ডেট ও কর্মসূচি নিয়ে কাজ করে, ফলে অনেক ক্ষেত্রেই কেবল তথ্য বিনিময় ছাড়া আর কোনো ধরনের সমন্বয় দেখা যায় না। জার্মানির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 'সিভিলিয়ান ক্রাইসিস প্রিভেনশন' বিভাগের পরিচালক হাইকে থিয়েল ঠিক এই জায়গাটির দিকে আঙুল তুলে বলেন, "সমন্বয় নিশ্চয়ই জরুরি, কিন্তু তা যেন কেবল কার্যক্রমভিত্তিক এক্সেল শিট বিনিময়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে।"

সমস্যা হলো, এই জটিল কাঠামোর ভিড়ে স্থানীয় মানুষ কিংবা গোষ্ঠীগুলোই বুঝতে পারে না আসলে কে কী করছে, কিংবা কার কাছে জবাবদিহি করতে হবে। ফলস্বরূপ, একদিকে কাজের পুনরাবৃত্তি হয়, অন্যদিকে অনেক সময় এক সংস্থার

প্রচেষ্টা অন্য সংস্থার কাজে বাধা সৃষ্টি করে। এতগুলো সংক্ষিপ্ত নাম আর অসংখ্য কর্মসূচির কারণে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের বাইরের মানুষ তো বটেই, এমনকি নীতিনির্ধারকদের কাছেও পুরো চিত্র অস্পষ্ট থেকে যায়। শেষ পর্যন্ত প্রকৃত ফলাফল বা ব্যর্থতার দায়ভার কার ওপর বর্তাবে, সে প্রশ্নও অমীমাংসিত থেকে যায়। সব মিলে সম্পদ ও অর্থ সঠিকভাবে ব্যবহার হয় না।

তবে কেবল বাহিনীর মধ্যে সমন্বয় নয়, স্থানীয় জনগণকে পাশে রাখাও এই লড়াইয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। জি-৫ সাহেলের নেতারা জানেন, তাদের জনগণের একটি অংশ এই অভিযানকে নব্য-ঔপনিবেশিক প্রকল্প হিসেবে দেখে। তারা এইসব অভিযানে খুশি হওয়ার বদলে উল্টো ক্ষুব্ধ হয়। ২০২০ সালে মাক্রোঁর সম্মেলনের অল্প কিছুদিন আগে বামাকোতে শত শত মালিয়ান ফরাসি-বিরোধী বিক্ষোভে অংশ নেয়। ফরাসি পতাকা পুড়িয়ে দেয় তারা। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানান ফরাসি প্রেসিডেন্ট মাক্রোঁ। তিনি বলেন যে, আঞ্চলিক নেতাদের পক্ষ থেকে এই ঘটনাগুলোর নিন্দা যথেষ্ট শক্তভাবে করা হয়নি বলেই তিনি মনে করেন।

সাহেল অঞ্চলের সরকারগুলোকে প্রতিনিয়ত এক কঠিন ভারসাম্য বজায় রেখে চলতে হয়। তাদের একদিকে দেখাতে হয় যে তারা নিজেরাই নিয়ন্ত্রণে আছে, অন্যদিকে প্রায়ই বড় শক্তিগুলোর কাছে নতি স্বীকার করতে হয়। একইসঙ্গে তাদের সামলাতে হয় উপনিবেশ-পরবর্তী জাতিগত বিভাজন। উদাহরণ হিসেবে মালির বাম্বারা ও ডগন সম্প্রদায়ের কথা বলা যায়। তারা বিশ্বাস করে, সরকার তাদের জঙ্গি গোষ্ঠীগুলোর হাত থেকে যথেষ্ট সুরক্ষা দিতে পারছে না, বা দিতে চাইছে না। তাই তারা নিজেদের রক্ষা করতে সশস্ত্র মিলিশিয়া গঠন করেছে। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, এই প্রক্রিয়ায় তারা অন্য গোষ্ঠীগুলোকেও নিশানা বানিয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, কিছু দেশে সরকারি নিরাপত্তা বাহিনীও নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর সাধারণ নাগরিকদের ওপর গণহত্যা চালিয়েছে। মালি ও নাইজারে এই অভিযোগ অত্যন্ত জোরালো। এসব দেশের সেনাবাহিনীর বেশিরভাগ সদস্যই আসে দক্ষিণের সাভানা অঞ্চল থেকে। উত্তরাঞ্চলের মরুভূমি অঞ্চলের মানুষদের অংশগ্রহণ তাতে কম। ফলে উত্তরের বিস্তৃত ও তুলনামূলক অবহেলিত অঞ্চলগুলো অনেক সময় মনে করে যে এই সেনাবাহিনী আসলে ‘তাদের বাহিনী নয়’।

সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের বড় অংশ এখনো পরিচালনা করছে ফরাসি ও মার্কিন সেনারা। ফ্রান্স মূলত মালি ও পশ্চিম সাহেলে মনোযোগী। আর যুক্তরাষ্ট্র

বেশি সক্রিয় লেক চাদ অববাহিকায়—বিশেষ করে যেখানে বোকো হারামের মতো গোষ্ঠীগুলো সক্রিয়। তবে গোয়েন্দা তথ্যের আদান প্রদান থেকে শুরু করে যৌথ কৌশল নির্ধারণ পর্যন্ত সবকিছুতেই উভয় দেশের মধ্যে রয়েছে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা। মার্কিন রাজনৈতিক ও সামরিক মহল অঞ্চলটিকে দেখে জাতীয় নিরাপত্তা ও বৃহত্তর কৌশলের দৃষ্টিকোণ থেকে। তাদের মতে, যুক্তরাষ্ট্র যদি এই অঞ্চল থেকে সরে দাঁড়ায়, তাহলে অনেক রাষ্ট্রই ব্যর্থ হয়ে পড়বে। আর সেই শূন্যতা জিহাদি গোষ্ঠীগুলোর জন্য নিরাপদ আশ্রয়ে পরিণত হবে। সেই অবস্থায় এই অঞ্চল মার্কিন স্বার্থের বিরুদ্ধে হামলার উর্বর ক্ষেত্রে পরিণত হতে পারে। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ যুক্তি হলো, যদি অ্যামেরিকা পেছনে সরে আসে, তাহলে এই শূন্যতা পূরণে চীন সক্রিয় হয়ে উঠবে। সাহেলে চীনের আগ্রহ কেবল অর্থনৈতিক নয়, কৌশলগতও। তাছাড়া ইউরোপীয় মিত্রদের পাশে দাঁড়ানোর বিষয়টিও আছে। সাহেল ও আশেপাশের অঞ্চলে যদি নিরাপত্তাহীনতা বাড়ে, তাহলে ইউরোপমুখী শরণার্থীদের ঢল নেমে আসতে পারে। আর এর ফলে ইউরোপের স্থিতিশীলতা বিপর্যস্ত হবে। তবে এই যুক্তিগুলোর বিপরীতে পাল্টা যুক্তিও রয়েছে। অনেকে মনে করেন, যেহেতু প্রতিরক্ষা বাজেট সীমিত, তাই পেন্টাগনের মূল মনোযোগ হওয়া উচিত প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চল, যেখানে চীনের সঙ্গে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। তাদের মতে, সাহেল অঞ্চল ইউরোপের 'প্রতিবেশী এলাকা', কাজেই এর দেখভালের দায়িত্ব ইউরোপেরই নেওয়া উচিত।

সাহেল অঞ্চলের বিশালতা এবং জনসংখ্যার ঘনত্ব অতি কম হওয়ায় সাহেল অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক সেনা মোতায়েন বাস্তবসম্মত নয়। বৃহৎ পরিসরের টহলও কার্যকর নয়। তাই ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই ড্রোন, বিশেষ বাহিনীর অভিযান এবং স্থানীয় সেনাদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার কৌশল নিয়েছে। তাদের লক্ষ্য হলো, জঙ্গিগোষ্ঠীগুলোর চলাফেরা যাতে সীমিত করা যায় এবং সীমান্ত পেরিয়ে অস্ত্র পরিবহনের সক্ষমতা যেন দুর্বল হয়।

এই কৌশলের অংশ হিসেবেই নাইজারের আগাদেজ শহরে অ্যামেরিকানরা একটি কৌশলগত ড্রোন ঘাঁটি স্থাপন করেছে। এর আগে তারা ফ্রান্সের সঙ্গে যৌথভাবে বুরকিনা ফাসোর সীমান্তের কাছাকাছি অবস্থিত নিয়াম বিমানবন্দর ব্যবহার করত। তবে সময়ের সঙ্গে পরিস্থিতি পাল্টেছে। জিহাদি গোষ্ঠীগুলোর সহিংসতা বিস্তৃত হওয়ায় জঙ্গিদের ব্যবহৃত রুটগুলো নজরদারি করার ক্ষমতা সাধারণ ড্রোনের সীমার বাইরে চলে যায়। আগাদেজ ঘাঁটিতে এখন MQ-9

Reaper ড্রোন মোতায়েন রয়েছে, যাদের কার্যক্ষমতা প্রায় ১,৮৫০ কিলোমিটার। এর সঙ্গে উত্তর-পূর্ব নাইজারের ডিরকু ঘাঁটি মিলিয়ে এখন পশ্চিম মালি থেকে শুরু করে চাদ পর্যন্ত এবং উত্তর দিকে লিবিয়া থেকে দক্ষিণে নাইজেরিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত আকাশসীমা এদের নজরদারির আওতায় এসেছে।

যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স উভয়ের কাছেই কৌশলগতভাবে নাইজার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেশটির ভৌগোলিক অবস্থান সাহেল অঞ্চলের ঠিক মাঝখানে। ফলে এখান থেকে উত্তরের অস্থিতিশীল লিবিয়া ও আলজেরিয়ার গতিবিধির ওপর যেমন নজর রাখা যায়, তেমনি দক্ষিণে নাইজেরিয়া, চাদ বা বুরকিনা ফাসোতে সক্রিয় ইসলামি সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর তৎপরতাও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হয়। এখন পর্যন্ত নাইজার তার প্রতিবেশীদের মতো ভয়াবহ সহিংসতার শিকার হয়নি, তবে দেশটির নেতৃত্ব আশেপাশের বিপদের ব্যাপারে সবচেয়ে সচেতন। দেশটির চারপাশে রয়েছে সন্ত্রাসকবলিত নাইজেরিয়া, বুরকিনা ফাসো, মালি, আলজেরিয়া, লিবিয়া ও চাদ। এগুলোই সেই শতাব্দী-প্রাচীন বাণিজ্যপথগুলোর ঠিকানা, যেগুলোর একটি চলে গেছে আগাদেজ হয়ে উত্তর-দক্ষিণে, আরেকটি চলে গেছে নাইজার-আলজেরিয়া সীমান্ত বরাবর। একসময় এসব পথ দিয়ে আফ্রিকার অভ্যন্তরের সাথে ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্যিক যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল। আর আজ সেসব পথের দখল নিয়েছে মানব পাচারকারী নেটওয়ার্ক। গত এক দশকে এসব রুট ব্যবহার করে হাজার হাজার অভিবাসন প্রত্যাশী ইউরোপে পাড়ি জমিয়েছে।

এই ঘূর্ণিপাকের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে নাইজার পশ্চিমা সামরিক বাহিনীকে স্বাগত জানিয়েছে। অন্যদিকে তারাই সম্ভবত 'জি-৫ সাহেল' জোটের সবচেয়ে সক্রিয় সদস্য। নিজেদের সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীতে তারা ব্যাপক অর্থায়ন করছে। শুধু তাই নয়, সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠীগুলোর সমস্যাকে গুরুত্ব দেওয়ারও প্রচেষ্টাও চালিয়েছে দেশটি। এই সংখ্যালঘুদের মধ্যে আছে ফুলানি জনগোষ্ঠী।

ফুলানি জাতিগোষ্ঠীর ইতিহাস ও জনতাত্ত্বিক বিস্তার বর্তমান সংকটকে বোঝার জন্য একটি অপরিহার্য চাবিকাঠি। কারণ বিপুল সংখ্যক ফুলানি এই অঞ্চলের বিদ্রোহে জড়িয়ে আছে। তাদের ঐতিহাসিক স্মৃতি, ভৌগোলিক বিস্তার এবং সাংস্কৃতিক অনুশীলন সাহেলের সঙ্কটকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। ফুলানিরা এক জাতি হলেও তাদের কোনো রাষ্ট্র নেই। সাহেল, পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল এবং আরো দক্ষিণে সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে অন্তত ২ কোটি ৩০ লক্ষ ফুলানি। শুধু নাইজেরিয়াতেই আছে আনুমানিক ১ কোটি ৭০ লাখ

ফুলানি, যা দেশটির মোট জনসংখ্যার ৯ শতাংশ। মালিতে তাদের সংখ্যা প্রায় ৩০ লাখ (১৬ শতাংশ), নাইজারে ১৬ লাখ (৭.৬ শতাংশ), বুরকিনা ফাসোতে ১২ লাখ (৬.৩ শতাংশ), আর চাদে প্রায় ৬ লাখ (৪ শতাংশ)।

ঐতিহাসিকভাবে ফুলানিরা যাযাবর পশুপালক হিসেবে পরিচিত। কিন্তু শুধু গৃহহীন বিচরণেই তাদের অতীত সীমাবদ্ধ ছিল না। অতীতে তাদের ছিল একাধিক সাম্রাজ্য। সাহেল অঞ্চলকে তারা কখনো কাগুজে সীমানার ভেতরে আবদ্ধ বিভিন্ন রাষ্ট্রে বিভক্ত অঞ্চল হিসেবে দেখেনি। তারা এই ভূখণ্ডকে সবসময় এমন এক অবিচ্ছিন্ন অঞ্চল হিসেবে দেখেছে, যেখানে তারা অবাধে চলাচল করবে। এই অঞ্চল শাসনের অভিজ্ঞতা তাদের সমষ্টিগত স্মৃতিতে গভীরভাবে প্রোথিত। ১৮১৮ থেকে ১৮৬২ সাল পর্যন্ত টিকে থাকা মাচিনা সাম্রাজ্য এই জাতিগোষ্ঠীর কাছে সোনালি যুগ হিসেবে বিবেচিত হয়।

মাচিনা সাম্রাজ্যের কেন্দ্র ছিল বর্তমান মালির একাংশে। আর তা বিস্তৃত ছিল পূর্ব–পশ্চিমে শত শত কিলোমিটার পর্যন্ত। মালির মধ্যভাগে অবস্থিত হামদুল্লাহি ছিল এর রাজধানী। শহরের নামটি এসেছে আরবি থেকে। এর অর্থ 'আল্লাহর প্রশংসা'। নামটি থেকেই বোঝা যায় যে ফুলানি নেতারা কট্টর সুন্নি ইসলামি বিশ্বাস অনুসরণ করত। ফুলানিরা আফ্রিকার প্রথম দিককার ইসলাম গ্রহণকারী জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে একটি। তাদের শাসনের ভিত্তি ছিল ধর্মীয় অনুশাসন ও সামরিক শৃঙ্খলা। তাদের শাসনামলে নাচ, গান, ধূমপান ও মদ্যপান নিষিদ্ধ ছিল। কেবল রাজধানী হামদুল্লাহিতেই তাদের ছিল ১০ হাজারের বেশি সৈন্য। আর আঞ্চলিক ঘাঁটি তিমবুকতুসহ নানা শহরে ছিল আরো হাজার হাজার সেনা।

তবে, মাচিনা সাম্রাজ্যের গৌরবের আড়ালে লুকিয়ে আছে এক দীর্ঘ পরাধীনতার স্মৃতি। এই সাম্রাজ্য গড়ে ওঠার আগে ফুলানিরা সাহেলের বিভিন্ন বৃহৎ সাম্রাজ্যের অধীনে যুগের পর যুগ 'ভাসাল' বা অনুগত জাতি হিসেবেই টিকে ছিল। সেই অভিজ্ঞতা এখনো তাদের সমষ্টিগত চেতনায় দাগ কেটে আছে। অপরদিকে বহু অ-ফুলানি স্থায়ী কৃষিজীবী জনগোষ্ঠীর মনে রয়েছে এক ভিন্ন ধরনের স্মৃতি। তাদের কাছে ফুলানিরা ছিল যুদ্ধবাজ জাতি, যারা ক্ষমতা হাতে পেলে বিপুল সংখ্যক মানুষকে দাসে পরিণত করত। বিশেষত অমুসলিম জনগোষ্ঠীর জন্য এটি ছিল এক নির্মম বাস্তবতা। তাদের চোখে ফুলানিরা কেবল দখলদারই নয়, বরং ধর্মীয় অনুশাসনের আড়ালে নিপীড়ন চালানো এক শক্তি। সাহেল জুড়ে বর্তমান উত্তেজনার শেকড় আংশিকভাবে এই ইতিহাসের মধ্যে নিহিত। অনেকেই জিহাদী মতবাদের

উত্থানকে ফুলানিদের সাম্রাজ্য পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও খ্রিস্টানদের জোরপূর্বক ধর্মান্তর প্রচেষ্টার সঙ্গে মিলিয়ে দেখে।

এই আশঙ্কা নানা কারণে আরো জোরালো হয়েছে। ২০১২ সালে ফ্রান্সের নেতৃত্বে মালিতে সামরিক অভিযানের পর যেসব নতুন জঙ্গিগোষ্ঠীর উত্থান ঘটে, তাদের অন্যতম ছিল মাচিনা লিবারেশন ফ্রন্ট (MLF)। মালির মাচিনা শহরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এই গোষ্ঠীর নেতৃত্বে ছিলেন পঞ্চাশোর্ধ্ব ধর্মশিক্ষক আমাদু কুফা। তরুণ বয়সে কুফা পাকিস্তানি ধর্মপ্রচারকদের সংস্পর্শে এসে রক্ষণশীল ইসলামি মতাদর্শে আকৃষ্ট হন। পরে কাতার ও আফগানিস্তান সফর তার চিন্তাজগতে আমূল পরিবর্তন আনে। তিনি জড়িয়ে পড়েন জিহাদপন্থি 'তাকফিরি' দর্শনে। 'তাকফিরি' মতাদর্শ এমন এক ধর্মতাত্ত্বিক অবস্থান, যেখানে একজন মুসলিম অন্য মুসলমানকে ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস থেকে বিচ্যুত মনে করে তাকে কাফির বা অবিশ্বাসী ঘোষণা করে। জিহাদিদের দৃষ্টিতে কাফির ঘোষিত ব্যক্তিকে হত্যা করা ধর্মীয়ভাবে বৈধ। এই চিন্তা মধ্যপ্রাচ্যে সুন্নি মুসলমানদের মধ্যে বিশেষত সালাফিদের মধ্যে রয়েছে। তবে আফ্রিকার মুসলিম সমাজে এই প্রবণতা প্রায় অনুপস্থিত ছিল। এখানকার মুসলিমরা ঐতিহ্যগতভাবে সুফি ঘরানার। এই ঘরানার মানুষদের আধ্যাত্মিকতা, সহনশীলতা ও আচার-অনুশীলনে বহুত্ববাদের ভূমিকা রয়েছে। তাদের কাছে এটি ছিল একদমই বিদেশি এক ধারণা। এই অঞ্চলে এই ধরনের মতাদর্শ ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছে একদম সাম্প্রতিক সময়ে।

আমাদু কুফা কার্যত AQIM এর কোলে এসে পড়েছিলেন। ফরাসি হস্তক্ষেপের পর উদ্ধার হওয়া নথি থেকে জানা যায়, AQIM নেতারা তাদের সহযোগী কিছু গোষ্ঠীকে নির্দেশ দিয়েছিল সরাসরি 'আল-কায়েদা' নাম ব্যবহার না করতে। নিজেদেরকে স্থানীয় রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে উপস্থাপন করতে বলেছিল তারা। এর পেছনে ছিল স্পষ্ট কৌশল: বিদেশি হস্তক্ষেপকে 'নব্য ঔপনিবেশিক আগ্রাসন' হিসেবে চিত্রিত করা এবং এর মাধ্যমে স্থানীয় জনগণের সহানুভূতি ও সমর্থন অর্জন করা। এই কৌশল বাস্তবায়নে ফুলানিদের বেছে নেওয়া হয় এক ধরনের 'আদর্শ বাহক' হিসেবে। একদিকে তারা আগে থেকেই একটি স্বতন্ত্র জাতি রাষ্ট্রের দাবিতে সোচ্চার ছিল, অন্যদিকে তাদের বিস্তৃত ভৌগোলিক উপস্থিতি গোটা সাহেল অঞ্চলে একটি কার্যকর ফ্রন্ট গড়ে তোলার সুযোগ করে দিত।

মাচিনা লিবারেশন ফ্রন্ট মূলত মালি ও সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকলেও তাদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ইতোমধ্যেই ভয়াবহ মাত্রা ছাড়িয়েছে। তারা বিভিন্ন গ্রামে আক্রমণ করেছে, শত শত বেসামরিক মানুষ ও মালিয়ান সেনাকে হত্যা করেছে। বামাকোর র‍্যাডিসন ব্লু হোটেলে হামলা চালিয়ে হত্যা করেছে ২২ জনকে। পাশাপাশি তারা বেশকিছু ধর্মীয় মাজারও বোমা মেরে উড়িয়ে দিয়েছে। এসব নৃশংসতার পেছনে তথাকথিত মুক্তির সংগ্রামকে ন্যায্যতা হিসেবে দাঁড় করিয়েছে তারা। তাদের দাবি, তারা মালির রাষ্ট্রীয় দমন-পীড়ন থেকে তাদের জাতিগোষ্ঠীকে মুক্ত করতে চায়। তাদের লক্ষ্য ছিল মালির মধ্যাঞ্চলের একটি বৃহৎ এলাকা দখল করে তথাকথিত 'ইসলামিক মাচিনা রিপাবলিক' প্রতিষ্ঠা করা। এরপর ধীরে ধীরে পশ্চিম আফ্রিকায় ইসলামি খেলাফতের আদলে একটি স্বাধীন অঞ্চল গড়ে তোলা। ২০১৮ সালের শেষ দিকে মালির সরকার ঘোষণা করেছিল যে, এক ফরাসি বিমান হামলায় মাচিনা ফ্রন্টের নেতা আমাদু কুফা নিহত হয়েছেন। কিন্তু কয়েক মাস পর ২০১৯ সালের মার্চে কুফা নিজেই এক ভিডিওবার্তায় জানান, তার মৃত্যুর খবর অত্যন্ত অতিরঞ্জিত!

ফুলানি জনগোষ্ঠীর মধ্যে রাষ্ট্রের দুর্বলতা ও অবিচারের ধারণা জঙ্গি সংগঠনগুলোর পক্ষে একপ্রকার 'নিয়োগ কর্মকর্তা'র ভূমিকা পালন করছে। ২০১২ সালে তিমবুকতুসহ বিভিন্ন এলাকায় কিছু সময়ের জন্য নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছিল জঙ্গিরা। সেসময় তারা নানা অন্যায়ের জন্ম দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সরকারের প্রত্যাবর্তনও সেসব জায়গায় আইনের শাসন ফিরিয়ে আনেনি। বরং পুরোনো দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারি কর্মকর্তারাই ফিরে এসে নতুন করে চাঁদাবাজি শুরু করেছে। সরকারি সেনাবাহিনী ফিরে এসেও কিছু অঞ্চলে সমষ্টিগত শাস্তি দেয়। বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশের সবচেয়ে দরিদ্র অঞ্চলের এই বাস্তবতায় কুফা ও তার নেতৃত্বাধীনরা কার্যত উন্মুক্ত দরজা পেয়েছিলেন। MLF এর প্রতিশ্রুতি ছিল বিনামূল্যে ধর্মীয় শিক্ষা, নিজেদের সংজ্ঞায়িত বিচারব্যবস্থা, ঘুষের অবসান, আর নতুন যোগ দেওয়া সদস্যদের জন্য আকর্ষণীয় আর্থিক প্রণোদনা। যারা আত্মঘাতী হামলায় রাজি হতো তাদের ১,০০০ ডলারের বেশি অর্থ প্রদানের প্রস্তাব ছিল। প্রতিশ্রুতিগুলো এমন আকর্ষণীয় ছিল যে, এই জঙ্গি সংগঠনে যোগ দেওয়া একসময় হয়ে উঠল সহজ ও স্বাভাবিক ব্যাপার।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এই সংঘাত সীমান্ত পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়েছে সাহেলের অন্যান্য অঞ্চলের ফুলানি জনগোষ্ঠীর মধ্যে। বিশেষত বুরকিনা ফাসো,

নাইজার ও নাইজেরিয়ার কিছু অংশে এই প্রবণতা বেশি দেখা যায়। প্রতিটি সংঘাতের পেছনে দেখা যায় একই ধরনের বিষয়। খরার কারণে জমি ক্রমশ অনুর্বর হয়ে গরু-ছাগল চরানোর অযোগ্য হয়ে উঠলে যাযাবর ফুলানিরা নতুন গ্রামীণ ও নগর এলাকায় চলে যায়। কিন্তু সেখানে তাদেরকে দেখা হয় 'বহিরাগত' হিসেবে। এতে স্থানীয় কৃষকদের সঙ্গে স্বার্থের সংঘাত বাঁধে তাদের। ধীরে ধীরে এই বিরোধই রূপ নেয় সহিংসতায়। এই সংকটের অন্যতম প্রধান চালিকাশক্তি হলো জলবায়ু পরিবর্তন। আর সন্ত্রাসবাদের মতোই জলবায়ু সংকটও কোনো সীমান্ত মানে না।

জলবায়ুর পরিবর্তন কীভাবে হাজার বছর ধরে সাহেলের ভূপ্রকৃতি গড়ে তুলেছে, তা আমরা আগেই দেখেছি। কখনো কখনো তা নাটকীয়ভাবে পুরো অঞ্চলকে পাল্টে দিয়েছে। তবে ১৯৫০-এর দশক থেকে এই পরিবর্তনের পেছনে মানুষের ভূমিকাও ক্রমাগত বাড়তে শুরু করে। জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্বালানির জন্য বন নিধনের হার বেড়ে যায়। একই সঙ্গে গবাদিপশুর সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকায় তৃণভূমি অতিরিক্ত চাপের মুখে পড়ে। একটা পর্যায়ে দ্রুত বিলীন হতে শুরু করে এই অঞ্চলের তৃণভূমি। এর ফলে দেখা দেয় মাটির ক্ষয় ও মরুকরণ। মাটির ওপরের উর্বর স্তর ঝোড়ো বাতাসে উড়ে গিয়ে তৈরি হয় বিশাল ধুলিঝড়। আর যেখানে গ্রীষ্মকালে গড় তাপমাত্রা প্রায়ই থাকে ৩৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসের ওপরে, সেখানে ওপরের মাটি হারিয়ে যাওয়ায় কৃষিকাজ কার্যত অসম্ভব হয়ে ওঠে।

এই পরিস্থিতিতে পরবর্তী খরা হয়ে দাঁড়ায় এক মহাবিপর্যয়। বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে পৃথিবীর আর কোথাও এমন ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হয়নি। ১৯৬৮ সালে শুরু হওয়া খরায় বিশাল অঞ্চলের ফসল প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়। ১৯৭২ সালে বৃষ্টিপাত প্রায় তো পুরোপুরি বন্ধই হয়ে গিয়েছিল। ১৯৭৩ সালের শেষ নাগাদ ধারণা করা হয়, এই খরায় প্রায় এক লাখ মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। পাশাপাশি মারা গেছে বিপুল সংখ্যক গবাদিপশু। সাহারা মরুভূমি তখন দক্ষিণ দিকে বাড়তে বাড়তে সাহেলের ভেতরে আরো ১০০ কিলোমিটার জনবসতিপূর্ণ অঞ্চল গ্রাস করে নেয়। ১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি সাহেলজুড়ে আবারও দেখা দেয় এক ভয়াবহ খরা ও দুর্ভিক্ষ। মরুভূমি প্রসারিত হয় আরো দক্ষিণ দিকে। আর এই জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম প্রতীক হয়ে ওঠে লেক চাদ। একসময় এই হ্রদ ছিল পশ্চিম-মধ্য আফ্রিকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পানিসম্পদ। বিশ শতকের শেষ চার দশকে এর

আয়তন কমে যায় ৯০ শতাংশ। আর এর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় মাছ ধরা, কৃষি এবং স্থানীয় অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল লাখ লাখ মানুষ। বিশেষ করে চাদ, নাইজার, নাইজেরিয়া ও ক্যামেরুন—এই চারটি দেশের বহু মানুষের জীবন-জীবিকা এই হ্রদের ওপর নির্ভরশীল ছিল। বর্তমানে এই পুরো অঞ্চলজুড়ে প্রায় ৩ কোটি মানুষ খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে রয়েছে। জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার (FAO) হিসাব অনুযায়ী তাদের মধ্যে অন্তত ১ কোটি মানুষ রয়েছে চরম ক্ষুধার ঝুঁকিতে।

বেশিরভাগ জলবায়ু বিজ্ঞানীর মতে, শিল্পবিপ্লবের সূচনালগ্ন থেকে বৈশ্বিক গড় তাপমাত্রা বেড়েছে প্রায় ১.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কিন্তু সাহেল অঞ্চলে উষ্ণতা বৃদ্ধির হার গড় তাপমাত্রা থেকে প্রায় ৫০ শতাংশ বেশি। দ্রুত জলবায়ু পরিবর্তনের এই প্রভাব এই অঞ্চলের পরিবেশ, অর্থনীতি ও সামাজিক স্থিতিশীলতাকে একযোগে আঘাত করেছে। সামগ্রিকভাবে বৃষ্টিপাত বেড়েছে নাকি কমেছে—তা নিয়ে গবেষকদের মধ্যে মতভেদ আছে। তবে তারা সবাই এই বিষয়ে একমত যে, বৃষ্টির ধরন নাটকীয়ভাবে বদলে গেছে। এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয় আকস্মিক অতি প্রবল বর্ষণ। সামান্য যে উর্বর মাটি অবশিষ্ট আছে তাও ক্ষয় করে ফেলে এই অতিবর্ষণ। আর গরম আবহাওয়ার কারণে জমিতে থাকা পানি দ্রুত বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। ফলে বৃষ্টির পানি মাটিতে দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কৃষিকাজের জন্য এটি খুবই ক্ষতিকর। অথচ এই অঞ্চলে কৃষিই অর্থনীতির মূল ভিত্তি। সাহেল অঞ্চলের সম্মিলিত জিডিপির ৪০ শতাংশেরও বেশি কৃষির ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু FAO এর হিসেব অনুযায়ী, এই অঞ্চলের প্রায় ৮০ শতাংশ চাষযোগ্য জমি ইতোমধ্যেই ক্ষয়প্রাপ্ত বা মরুকরণের শিকার। এর মধ্যে বিজ্ঞানীরা বলছেন যে ভবিষ্যতে তাপমাত্রা আরো বাড়বে। তাই এখানে দ্রুত ও ব্যাপক উদ্যোগ নেওয়া একান্ত জরুরি।

এই সংকট মোকাবিলায় সাহেল অঞ্চলের ১৭টি রাষ্ট্র একটি বৃহৎ যৌথ বিনিয়োগ পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। আগামী এক দশকে জলবায়ুর সাথে মানিয়ে নেওয়া ও টেকসই উন্নয়নে তারা প্রায় ৪০০ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করতে চায়। তবে এই বিপুল অর্থের সিংহভাগই নির্ভর করছে বিদেশি সহায়তার ওপর। আর উন্নত বিশ্ব যখন নিজেই অর্থনৈতিক সংকট ও অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক চাপে জর্জরিত, তখন কতটা অর্থ শেষ পর্যন্ত হাতে পাওয়া যাবে তা অনিশ্চিত। এই প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে আলোচিত উদ্যোগ হলো 'গ্রেট গ্রিন ওয়াল'। ২০০৭ সালে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের লক্ষ্য ছিল সাহারার দক্ষিণ প্রান্তে সাহেল জুড়ে ৮,০০০

কিলোমিটার দীর্ঘ ও ১৬ কিলোমিটার প্রশস্ত একটা বৃক্ষবেষ্টনী তৈরি করা। গাছ দিয়ে তৈরি এই দেয়াল মরুভূমির আগ্রাসন ঠেকাবে। প্রকল্পটির নেতৃত্ব দিচ্ছে আফ্রিকান ইউনিয়ন। প্রকল্পের অর্থায়নে যুক্ত রয়েছে জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন। পশ্চিমের সেনেগাল থেকে শুরু করে পূর্ব দিকের জিবুতি পর্যন্ত এই উদ্যোগে অংশ নিচ্ছে একাধিক দেশ। আফ্রিকার ভৌগোলিক বাস্তবতায় এক অভূতপূর্ব আন্তঃরাষ্ট্রীয় প্রয়াস বলেই বিবেচিত হচ্ছে প্রকল্পটি।

কিন্তু শুরু থেকেই এই প্রকল্পে নানা জটিলতা দেখা দেয়। প্রতিশ্রুত অর্থ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পৌঁছায়নি। তাছাড়া এই প্রকল্পের বেশিরভাগ অংশ পড়েছে জনবসতিহীন এলাকায়। সেখানে গাছ লাগানোর পর সেগুলোর পরিচর্যার দায়িত্ব নেওয়ার মতো কেউ ছিল না। ফলে অধিকাংশ গাছ মরে যায়। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রকল্পটি একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের মধ্যেই বোঝা যায় যে, সাহারা মরুভূমি যে দক্ষিণ দিকে এগিয়ে আসছে সেটাই একমাত্র সমস্যা নয়। সাহেল অঞ্চলের ভেতরে দশকের পর দশক ধরে জমির অযাচিত ব্যবহারও একটা বড় সমস্যা। তাই কেবল মরুভূমির প্রান্তে সবুজ দেয়াল গড়ে তোলার ধারণা থেকে সরে এসে, পুরো সাহেল অঞ্চলের পুনরুজ্জীবনের উদ্দেশ্যে প্রকল্পটিকে নতুন করে সাজানো হয়। এই নতুন 'গ্রেট গ্রিন ওয়াল' প্রকল্প মূলত ভূমি পুনরুদ্ধার ও টেকসই চাষাবাদের দিকে মনোযোগ দেয়। এই প্রদ্ধতিতে সহজ ও কম খরচের জলসংরক্ষণ কৌশল ব্যবহার করে স্বাভাবিক ঘাস জন্মাতে সাহায্য করা হয় এবং নতুন চারা লাগানোর পর তাদের যত্ন নেওয়ার একটি সংগঠিত কাঠামো গড়ে তোলা হয়। এতে স্থানীয় কৃষক, গবাদিপশু পালক এবং সমাজের অন্যান্য অংশীদারদের অংশগ্রহণ বাড়ে। ফলে প্রকল্পের সাফল্য কিছুটা দৃশ্যমান হয়।

তবে এখানেও দেখা দেয় নতুন চ্যালেঞ্জ। সাহেল অঞ্চলের খাদ্য নিরাপত্তার সংকট যখন তীব্র হয় তার সবথেকে ভয়াবহ প্রভাব পড়ে যাযাবর সম্প্রদায়ের ওপর। দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে তাদের পশুর পাল মারা যায়। জীবিত পশুদের খাদ্যের জন্য তারা এমনসব বন ও তৃণভূমির দিকে চলে যায়, যেখানে নতুন গাছপালা মাত্রই বেড়ে উঠতে শুরু করেছে। ফলে অনেক জায়গায় আবার শুরু হয় মরুকরণ।

সময় কারও পক্ষে নেই। আফ্রিকাই আজ বিশ্বের দ্রুততম জনসংখ্যা বৃদ্ধির অঞ্চলে পরিণত হয়েছে। জাতিসংঘের হিসাব বলছে, ২০৫০ সালের মধ্যে মহাদেশটির জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে ১২০ কোটির জায়গায় দাঁড়াবে প্রায় ২৪০

কোটিতে। সাহেলও এই প্রবণতার বাইরে নয়। কিছু কিছু দেশের পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ। যেমন নাইজারের জনসংখ্যা ২০১৯ সালে ছিল প্রায় ২ কোটি ৩৩ লাখ। ২০৫০ সাল নাগাদ বেড়ে এই জনসংখ্যা ৬ কোটি ৫৫ লাখে পৌঁছাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির লাগাম টানতে শিক্ষার প্রসার একটি কার্যকর উপায় হতে পারে। বিশেষ করে নারীদের শিক্ষা নিশ্চিত হলে জন্মহার উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। বিষয়টি বহু গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা হলো, সাহেল অঞ্চলের বেশিরভাগ দেশেই শিক্ষা একপ্রকার বিলাসিতা। শিক্ষা খরচ সাশ্রয়ী নয় বলে পরিবারগুলো কেবল ছেলেদেরই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। মেয়েরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পায় না, বা পেলেও তা ছেলেদের তুলনায় অনেক কম। সাহেল জুড়ে বহু নারীরই জন্মনিয়ন্ত্রণের সুযোগ নেই। আর অধিকাংশ নারীই যৌনাঙ্গ বিকৃত করার নিষ্ঠুর বিভীষিকাময় এক প্রথার শিকার। স্বাস্থ্য ও যৌনশিক্ষা এই প্রবণতা পাল্টাতে পারে। কিন্তু সীমিত সরকারি স্বাস্থ্য বাজেট সেই পথে বড় এক বাধা। অথচ অর্থ যে একদমই নেই তা নয়। উন্নত দেশের তুলনায় কম হলেও সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ বণ্টনের মাধ্যমে এই অর্থকে অনেক বেশি কাজে লাগানো যেত।

সাহেল অঞ্চলকে সাধারণত বিশ্বের দরিদ্রতম অঞ্চল হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। কিন্তু বাস্তবতা হলো, অঞ্চলটি প্রাকৃতিক সম্পদে বেশ সমৃদ্ধ। নাইজারে রয়েছে ইউরেনিয়াম, তেল ও ফসফেট। মৌরিতানিয়ায় রয়েছে লোহা ও তামা। চাদে আছে তেল ও ইউরেনিয়াম। আর বুরকিনা ফাসো ও মালিতে রয়েছে স্বর্ণ। এই সম্পদের পরিমাণ কম নয়। কিন্তু সমস্যাটা এই সম্পদের ব্যবস্থাপনায়। এসব দেশের শাসনব্যবস্থা দুর্বল, প্রশাসন দুর্নীতিগ্রস্ত এবং অর্থনৈতিক স্বচ্ছতা প্রায় অনুপস্থিত। সাহেলের দেশগুলো নিজেরা নিজেদের খনিজ সম্পদ প্রক্রিয়াজাত করে না। তাদের আয় আসে প্রধানত আন্তর্জাতিক খনন কোম্পানিগুলোর ওপর আরোপিত কর থেকে। কিন্তু এখানেই আরেকটি গভীর সমস্যা তৈরি হয়। বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে আকৃষ্ট করতে গিয়ে সরকার প্রায়ই কর ছাড় দিতে বাধ্য হয়। ফলে নিজেদের কোষাগারে রাজস্ব জমা হয় খুবই কম।

উদাহরণ হিসেবে নাইজারের কথা বলা যায়। নাইজার বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম ইউরেনিয়াম উৎপাদক দেশ। দেশটির সরকার ফরাসি রাষ্ট্রায়ত্ত Orano কোম্পানির সঙ্গে এক অসম চুক্তিতে আবদ্ধ। কোম্পানিটি আলজেরিয়া সীমান্তঘেঁষা আরলিত শহরের কাছে SOMAIR ও COMINAK নামের দুইটি সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে

খনিগুলো চালায়। কয়েকটি এনজিওর হাতে পাওয়া নথি অনুযায়ী, নাইজার সরকার ও Orano কোম্পানির প্রাথমিক চুক্তিতে কোম্পানিটিকে শুল্ক ও রাজস্ব কর থেকে বড় ধরনের ছাড় দেওয়া হয়েছিল। ২০১৪ সালে নাইজার এই চুক্তি পুনর্বিবেচনা করতে চেয়েছিল, যাতে রাষ্ট্রের ভাগ একটু বাড়ানো যায়। Orano কোম্পানি দাবি করে নতুন শর্তে তাদের খনিগুলো অলাভজনক হয়ে যাবে। 'রক্ষণাবেক্ষণের' অজুহাতে তারা খনি বন্ধ করে দেয়। শেষ পর্যন্ত নতুন সমঝোতা চুক্তি হলেও এনজিওগুলো মনে করে শর্তগুলো এখনও কোম্পানির পক্ষেই বেশি সুবিধাজনক। এই শোষণের চিত্রটি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে দ্য টাইমস পত্রিকার সাংবাদিক ড্যানি ফোর্টসনের একটি মন্তব্যে। আরলিত সফরের পর তিনি লিখেছিলেন—"পশ্চিমা দেশে খনন করতে চাইলে আপনাকে এক বুকশেলফ ভর্তি লাইসেন্স ও অনুমতি সংগ্রহ করতে হয়। কিন্তু নাইজারে কাউকে একটা কোদাল আর দিনে দুই ডলার ধরিয়ে দিলেই আপনি ইউরেনিয়াম তুলতে পারেন।"

আরলিতের খনিগুলো একদিকে যেমন কর্মসংস্থান এনেছে, তেমনি এনেছে জটিল সমস্যাও। শহরটির অবস্থান নাইজারের আগাদেজ অঞ্চলে। এই এলাকায় রয়েছে প্রায় ৫০ লাখ গবাদিপশু। পশুপালকদের অভিযোগ, খনি-সংলগ্ন ভারী যান চলাচল ও বিষাক্ত বর্জ্য ফেলার কারণে তারা আর ঐতিহ্যগত চারণপথ ব্যবহার করতে পারেন না। শহরটি সাহারার প্রান্তে অবস্থিত হলেও মরুভূমির সেই নীরব, মনোমুগ্ধকর সৌন্দর্যের ছোঁয়া এখানে নেই। দিগন্ত ছোঁয়া ধবধবে বালুরাশি, সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সময় বালুর বুকে ছায়ার খেলা এক অনিন্দ্যসুন্দর শৈল্পিক বিস্ময়। কিন্তু আরলিতের সেই পরিবেশ এখন আর নেই।

প্রায় ১ লাখ ২০ হাজার মানুষের এই শহরটি জরাজীর্ণ ঘরবাড়ি আর টিনের চালার ছাউনি দিয়ে গঠিত অগোছালো ও দারিদ্র্যপীড়িত এক জনপদ। পানযোগ্য জলের অভাব এখানে প্রকট। অথচ পাশের খনিগুলো প্রতিদিন কয়েক মিলিয়ন লিটার পানি ব্যবহার করে। বালুঝড় শুরু হলে খনির আবর্জনা থেকে আসা সূক্ষ্ম কণাগুলো ছড়িয়ে পড়ে শহর জুড়ে। তবুও, এই খনি শিল্পই আরলিতের সবচেয়ে বড় নিয়োগদাতা। চাকরি মানে এখানে শুধু জীবিকা নয়, বরং সামাজিক মর্যাদা ও বেঁচে থাকার গ্যারান্টি। তাই স্বাস্থ্যঝুঁকি থাকলেও চাকরির চাহিদা কমে না। গ্রিনপিসসহ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো একাধিক গবেষণায় দেখিয়েছে যে, খনির আশেপাশে উচ্চমাত্রার বিকিরণ ছড়িয়ে পড়ছে, যার ফলে স্থানীয়দের মধ্যে দেখা যাচ্ছে নানা রোগ। তবে কোম্পানি এসব দাবি সরাসরি অস্বীকার করেছে। তাদের

ভাষায় কোম্পানির সবকিছু বৈজ্ঞানিকভাবে নিরাপদ এবং এইসব গবেষণা হলো 'ভিত্তিহীন প্রচারণা'। শহরের হাসপাতালগুলোও কোম্পানির মালিকানাধীন। হাসপাতালগুলোতে কর্মচারি এবং সাধারণ বাসিন্দা সবাইকেই বিনামূল্যে চিকিৎসা দেওয়া হয়। তবে ডাক্তার-নার্সরাও কোম্পানির বেতনভুক্ত, আর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা দাবি করেন খনি থেকে বিকিরণজনিত কোনো রোগ ধরা পড়েনি। ফলে স্বাভাবিকভাবেই এই চিকিৎসাব্যবস্থার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। ফরাসি সরকার অবশ্য বলছে তারা আফ্রিকার দেশগুলোকে খনিজসম্পদ সংক্রান্ত চুক্তিতে সঠিক দরকষাকষি করতে সাহায্য করার জন্য ১ কোটি ডলার বরাদ্দ দিয়েছে।

খনি অঞ্চলে নিরাপত্তার বিষয়টি বরাবরই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। নাইজারের দুইটি ইউরেনিয়াম খনির একটি ছিল ২০১৩ সালের সন্ত্রাসী হামলার লক্ষ্যবস্তু। এরপর সুরক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়। ঝুঁকি এখনো রয়ে গেলেও খনিগুলো অন্তত সরকারের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চলে অবস্থিত এবং সেখানে স্থায়ী প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়েছে। কিন্তু বুরকিনা ফাসোর স্বর্ণখনি শিল্পে পরিস্থিতি এতটা স্থিতিশীল নয়।

২০০৯ সালে তুলাকে পেছনে ফেলে স্বর্ণ হয়ে ওঠে বুরকিনা ফাসোর প্রধান রপ্তানি পণ্য। এই পরিবর্তনের ফলে দেশটি পরিণত হয় আফ্রিকার চতুর্থ বৃহত্তম স্বর্ণ উৎপাদনকারী দেশে। আর এর ফলে ইসলামপন্থী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর নজর পড়ে এই শিল্পের ওপর। এই খনিগুলো তাদের কাছে যেন এক ধরনের ধনভাণ্ডার। সেখানে রয়েছে প্রচুর বিস্ফোরক ও ডেটোনেটর। পাশাপাশি দেশটিতে এমনসব কর্মী রয়েছে, যাদের ভয় দেখিয়ে কিংবা প্রলুব্ধ করে সহজেই দলে টানা যায়। তার চেয়েও বড় কথা, এখানে উৎপাদিত পণ্যটি সহজেই গলানো যায়, পাচার করা যায়, এমনকি মুদ্রার মতোও ব্যবহার করা যায়।

এছাড়াও রয়েছে অসংখ্য অবৈধ স্বর্ণখনি। সরকার সেগুলো নিষিদ্ধ করলেও বুরকিনা ফাসোর মতো দারিদ্র্যপীড়িত দেশে স্বর্ণের মোহ অতিক্রম করা কঠিন। কিছু অনুমতিবিহীন খনি এমনকি সংরক্ষিত এলাকাতেও গড়ে উঠেছে, যেগুলো হাতির জন্য অভয়ারণ্য হিসেবে নির্ধারিত। কিন্তু দেশের কেন্দ্রীয় সরকার এত দুর্বল, আর ভূখণ্ড এত বিশাল যে, ধারণা করা হয় ২,০০০ এরও বেশি অবৈধ খনি এখানে সক্রিয় রয়েছে।

এই খনিগুলোতে কাজ করা শ্রমিকরা অপরাধী ও জিহাদিদের জন্য সহজ শিকার। ডাকাতি আর অপহরণ এখানে নিত্যকার ব্যাপার। কিছু ক্ষেত্রে জিহাদিরা

সরাসরি খনির নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয়। ২০১৮ সালে পামা অঞ্চলে এমনই এক ঘটনা ঘটেছিল। হঠাৎ চার-পাঁচটি ফোর-হুইল ড্রাইভ পিকআপে করে জিহাদিরা এসে ঘোষণা দেয়, এখন থেকে তারাই দায়িত্বে থাকবে। খনন কাজ চলতে পারবে, তবে তাদেরকে 'কর' দিতে হবে। অন্য কোনো পথ খোলা ছিল না। পুরোনো একটি প্রবাদে বলা হয়েছে—জীবনে দুইটি জিনিস নিশ্চিত: মৃত্যু আর কর।

এমন শত শত ঘটনার নজির রয়েছে যেগুলো মিলিয়ে এই তথাকথিত 'কর-রাজস্ব' বিশাল অঙ্কের সম্পদ তৈরি করে। ২০১৮ সালে সরকারি কর্মকর্তারা জিহাদিদের প্রভাবাধীন এলাকায় চব্বিশটি সাইটে প্রবেশ করতে সক্ষম হন। তাদের হিসাব অনুযায়ী, প্রতি বছর এসব খনি থেকে উত্তোলিত স্বর্ণের বাজারমূল্য দাঁড়ায় প্রায় ৩৪ মিলিয়ন ডলার। এই ছোট্ট অংশের খনিগুলো থেকে আদায় করা 'কর' দিয়েই জিহাদিরা বিপুল পরিমাণ অস্ত্র কিনতে পারে। নতুন যোদ্ধাদের বেতন মেটানোও সম্ভব হয় এই টাকা থেকে। তবে এভাবে মুনাফা ভোগ করাকে ইসলামি শরিয়তে হারাম বলে ধরা হয়। তাই কিছু গোষ্ঠী দাবি করে, এই টাকা আসলে জাকাত বা দান হিসেবে নেওয়া হচ্ছে। অনেক সময় দাবি করা হয়, তারা খনিগুলোর নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে, আর এই 'পরিষেবার' বিনিময়ে পারিশ্রমিক নিচ্ছে।

২০১২ সালে বুরকিনা ফাসো, মালি ও নাইজারজুড়ে একটি সমৃদ্ধ ভাণ্ডারের সন্ধান পাওয়ার পর স্বর্ণখনন খাত দ্রুত সম্প্রসারিত হতে শুরু করে। এরপর থেকে এই অঞ্চলজুড়ে গজিয়ে উঠতে থাকে অসংখ্য বৈধ ও অবৈধ খনি। 'ক্রাইসিস গ্রুপের' ২০১৯ সালের প্রতিবেদনে বলা হয়, এই তিন দেশে ২০ লাখেরও বেশি মানুষ সরাসরি ক্ষুদ্র আকারের স্বর্ণ উত্তোলন কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত। এর মধ্যে বুরকিনা ফাসোতে প্রায় ১০ লাখ, মালিতে ৭ লাখ এবং নাইজারে রয়েছে ৩ লাখ। এর বাইরেও খাতটিতে পরোক্ষভাবে কর্মরত মানুষের সংখ্যা এর তিনগুণ বেশি হতে পারে।

স্থিতিশীল ও শিল্পোন্নত রাষ্ট্রে খনি খাত থাকে সরকারের কঠোর নিয়ন্ত্রণে। আর সেখান থেকে আসা রাজস্ব সরাসরি জমা হয় রাষ্ট্রীয় কোষাগারে। কিন্তু সাহেলে বাস্তবতা একেবারেই ভিন্ন। নানা ধরনের সঙ্কট আর একাধিক ফ্রন্টে চলমান সংঘাতের কারণে সরকারগুলোর পক্ষে সেই ধরনের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা সম্ভব হয় না। উল্টো দুর্নীতিগ্রস্ত কর্মকর্তারা নিজেরাই বিমানবন্দর কিংবা অরক্ষিত সীমান্ত দিয়ে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ চোরাচালানে জড়িয়ে পড়েন। অনেক ক্ষেত্রে পরিস্থিতি

আরো জটিল হয়, কারণ সরকার অনেক সময় স্থানীয় গোষ্ঠীগুলোর খনি এলাকায় নিয়ন্ত্রণ নেওয়া এবং অনানুষ্ঠানিক পুলিশবাহিনীর মতো ভূমিকা পালন করাকে মেনে নেয়—যতক্ষণ না তারা সরাসরি রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করছে। তবু এর মাঝেই সর্বত্র শোনা যায় ঘুষ, জোরপূর্বক স্বীকারোক্তি আদায় এবং নির্বিচার আটকাদেশের অভিযোগ।

এই অঞ্চলের জটিল বাস্তবতাকে জটিলতর করে তুলতে পারে আরেকটি সম্পদ। আর তা হলো 'রেয়ার আর্থ মেটালস' নামে পরিচিত ১৭ প্রকার ধাতু। ভূপৃষ্ঠের নিচে লুকিয়ে থাকা এই রেয়ার আর্থ মেটাল খুঁজে পাওয়া এবং উত্তোলন করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু অনন্য তাপ-সহনশীলতা, চৌম্বকত্ব এবং আলোক বিকিরণ সংক্রান্ত বিশেষ ক্ষমতার কারণে এই ধাতুগুলো অত্যন্ত মূল্যবান। নিওডিমিয়াম বা ইটারবিয়ামের মতো নাম আমাদের কাছে অপরিচিত হতে পারে, তবে আমরা প্রতিনিয়ত এইসব ধাতু দিয়ে তৈরি ডিভাইস ব্যবহার করি। ল্যাপটপের হার্ড ড্রাইভ, লেজার প্রযুক্তি, মোবাইল ফোন, ফ্ল্যাট-স্ক্রিন টেলিভিশন, নাইট-ভিশন গগলস এবং ক্ষেপণাস্ত্রের জন্য এসব ধাতু অপরিহার্য। আধুনিক প্রযুক্তি ও প্রতিরক্ষা শিল্পের জন্য জরুরি এই উপাদানগুলো প্রতিটি শিল্পোন্নত দেশের কাছেই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

সাহেল অঞ্চলে এখনো এসব ধাতুর প্রাচুর্য প্রমাণিত হয়নি, তবে সম্ভাবনা প্রবল। নাইজার ও চাদে ইউরেনিয়াম আছে। এই দেশ দুইটি থেকে থেকে অল্পমাত্রায় রেয়ার আর্থ মেটালস পাওয়া সম্ভব। মালিতে রয়েছে লিথিয়াম। যদিও লিথিয়াম ‘রেয়ার আর্থ’ শ্রেণিভুক্ত নয়, তবু এর মূল্য দিন দিন বাড়ছে। কারণ এটি হাইব্রিড গাড়ি, বৈদ্যুতিক গাড়ি এবং তারবিহীন শক্তিশালী যন্ত্রপাতির ব্যাটারি তৈরি করতে কাজে লাগে। এর পাশাপাশি মালিতে পাওয়া যায় ম্যাঙ্গানিজ ও বক্সাইট, যা ইলেকট্রনিক্স শিল্পে ব্যবহার করা হয়। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, বিশ্বের অর্ধেকেরও বেশি কার্বনাটাইট শিলা রয়েছে আফ্রিকাতেই। কার্বনাটাইট শিলাকে রেয়ার আর্থ খনিজ উপস্থিতির অন্যতম চিহ্ন হিসেবে ধরা হয়। তাই সাহেল অঞ্চল হয়ে উঠতে পারে নতুন সম্পদের ভাণ্ডার।

যে অঞ্চলেই এই দুর্লভ খনিজ আবিষ্কৃত হবে, সেটিই দ্রুত পরিণত হবে নতুন এক ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতার কেন্দ্রবিন্দুতে। চীন সেখানে প্রভাব বজায় রাখতে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে, আর অন্যান্য শক্তি চেষ্টা করবে সেই প্রভাব ভাঙতে। কারণ আজকের দিনে বিশ্বের মোট রেয়ার আর্থ মেটালের ৩০ শতাংশেরও

বেশি মজুত রয়েছে চীনের ভূখণ্ডে। তার ওপর চীন দেশের বাইরে থেকেও বিপুল পরিমাণ খনিজ আমদানি করে। তবে চীনের প্রকৃত শক্তি লুকিয়ে আছে তাদের প্রক্রিয়াজাতকরণ ক্ষমতায়। পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি রেয়ার আর্থ পরিশোধন কারখানা চীনেরই দখলে। ফলে এসব ধাতু ব্যবহার করে তৈরি নানা হাই-টেক পণ্য তারা সহজেই অন্য দেশে রপ্তানি করতে পারে। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব প্রক্রিয়াজাতকরণ অবকাঠামো তুলনামূলকভাবে দুর্বল। তাই সরবরাহের জন্য তাদের চীনের ওপর নির্ভর করতেই হয়। বিষয়টি এখন ওয়াশিংটনের চোখে এক ধরনের কৌশলগত দুর্বলতা। ২০১৯ সালে দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যযুদ্ধ চলাকালে চীন যখন এইসব মেটালের সরবরাহ কমিয়ে দেওয়ার হুমকি দেয়, তখন থেকেই বিকল্প সাপ্লাই চেইন গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয় যুক্তরাষ্ট্র। বিশেষজ্ঞদের মতে, খুব শিগগিরই চীনের অভ্যন্তরীণ চাহিদা তাদের নিজস্ব উৎপাদনকে ছাড়িয়ে যাবে। তখন তারা বাইরের দেশ থেকে আরো বেশি খনিজ আহরণে মনোযোগ দেবে। পাশাপাশি যুক্তরাষ্ট্রের মতো প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে এইসব মেটাল বিক্রি করতেও অনাগ্রহী হয়ে উঠবে তখন চীন। অথচ যুক্তরাষ্ট্রের হাইটেক অস্ত্রশস্ত্র ও প্রতিরক্ষা শিল্প এসব উপাদানের ওপরই নির্ভরশীল।

এই সম্ভাব্য খনিজ সম্পদই চীনকে আফ্রিকায় বড় খেলোয়াড়ে পরিণত করার একমাত্র কারণ নয়। চীনের বহু দশকের 'ক্ষমতা লুকিয়ে রাখা' এবং 'উপযুক্ত মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করা' নীতি এখন উপযুক্ত সময়ের কাছাকাছি চলে এসেছে। দেশটির বর্তমান লক্ষ্য মহাশক্তি হিসেবে নিজেদের অবস্থান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা। সাহেল অঞ্চলে চীনের ক্রমবর্ধমান সামরিক উপস্থিতি সেই প্রক্রিয়ারই অংশ। ২০১৫ সালে বেইজিং এমন এক আইন পাস করে, যা পিপলস লিবারেশন আর্মি ও অন্যান্য নিরাপত্তা বাহিনীকে বিদেশে মোতায়েন করার অনুমতি দেয়। এর ধারাবাহিকতায় মালিতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে চীনের বিশেষ বাহিনী এখন সক্রিয়ভাবে অংশ নিচ্ছে। অন্যদিকে, তাইওয়ানকে স্বীকৃতি দেওয়া বন্ধ করতে বুরকিনা ফাসোকে রাজি করিয়ে নেওয়ার পর সেখানেও তারা সামরিক সম্পর্ক জোরদার করছে। ২০১৭ সালে জিবুতিতে চীন স্থাপন করেছে তাদের প্রথম বৈদেশিক নৌঘাঁটি।

এই সামরিক উদ্যোগ চীনের বহুল আলোচিত 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' বা বিআরআই এর অর্থনৈতিক কার্যক্রমের সঙ্গে সমান্তরালে এগোচ্ছে। বিআরআই পরিকল্পনার মাধ্যমে চীন বৈশ্বিক বাণিজ্যপথ নির্মাণ ও আধুনিকায়নের চেষ্টা করছে, যাতে বিশ্বজুড়ে তাদের পণ্যের আমদানি-রপ্তানির গতি

ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়। এসব কর্মকাণ্ডের বেশিরভাগই সাহেলের দক্ষিণে হলেও, জিবুতিতে নৌঘাঁটিটি স্থাপন করা হয়েছে বানিজ্যিক বন্দরের ঠিক পাশেই। জিবুতি বন্দর থেকে ইথিওপিয়া পর্যন্ত একটি বৈদ্যুতিক রেললাইন নির্মাণে চীন আর্থিক সহায়তা দিয়েছে। আবার গিনি ও সেনেগালের সমুদ্রবন্দর থেকে স্থলবেষ্টিত মালি পর্যন্ত রেললাইন তৈরির কাজেও চীনা কোম্পানিগুলো সক্রিয়ভাবে জড়িত। অনুমান করা হয়, আফ্রিকাজুড়ে বেল্ট অ্যান্ড রোড প্রকল্পে কয়েক লাখ চীনা শ্রমিক কাজ করছে এখন।

তবে সাহেলজুড়ে চীনের উপস্থিতিকে ঘিরে ক্ষোভও বাড়ছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, চীনা কোম্পানিগুলো স্থানীয়দের বদলে নিজেদের শ্রমিককে প্রাধান্য দিচ্ছে। আর বেসরকারি চীনা নিরাপত্তা বাহিনী স্থানীয়দের সঙ্গে শুরু করেছে দুর্ব্যবহার। ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের সাংবাদিক ডেভিড ফেইথ লিখেছেন, চীনের রাষ্ট্রায়ত্ত কোম্পানিগুলো আর্থিক স্বচ্ছতা, পরিবেশগত ক্ষতি বা মানবাধিকার লঙ্ঘনের মতো 'তুচ্ছ' বিষয়গুলোকে খুব একটা গুরুত্ব দেয় না। তার মতে, "বেইজিংয়ের এই পদ্ধতি আফ্রিকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে বাড়িয়েছে বটে, কিন্তু একই সঙ্গে বিশ্বের সবচেয়ে দমনমূলক সরকারগুলোকেও শক্তিশালী করেছে।" তার এই বক্তব্য যথার্থ। তবে একইসঙ্গে এটিও সত্য যে, পশ্চিমা দেশগুলোর অতীত রেকর্ডও খুব একটা ভালো না। অবশ্য সাম্প্রতিক বছরগুলোতে তারা স্বচ্ছতা ও দূষণ সমস্যাকে তুলনামূলকভাবে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে।

সাহেল যদি ভবিষ্যতে রেয়ার আর্থ মেটালের উৎসে পরিণত হয়, তবে সেটি আশীর্বাদ হবে নাকি অভিশাপ হবে সেই প্রশ্ন এখনই উত্থাপিত হচ্ছে। এখন পর্যন্ত প্রমাণ খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গোর সমৃদ্ধ তামা, হীরা, দস্তা ও কোলটান দেশটিতে উন্নতির বদলে যুদ্ধ ও দুর্দশা ডেকে এনেছে। একইভাবে আমরা ইতোমধ্যেই দেখেছি, মালি ও বুরকিনা ফাসোর স্বর্ণশিল্পে দুর্নীতি, সহিংসতা ও চরমপন্থা কীভাবে শেকড় গেড়ে বসেছে।

কার্যকর ও ন্যায্য শাসনব্যবস্থা, পর্যাপ্ত নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক সহায়তা ছাড়া সাহেল তার নানা সংকট অতিক্রম করতে পারবে না। দীর্ঘ ঔপনিবেশিক শাসন, পরবর্তীকালে গৃহীত বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক কাঠামো এবং দুর্বল ও দুর্নীতিগ্রস্ত শাসনকাঠামো মিলে এই অঞ্চলটিকে ক্রমশ ঠেলে দিয়েছে চরমপন্থার দিকে। দেশীয় ও বিদেশি জঙ্গিগোষ্ঠীগুলো এখানে বিদ্যমান দুর্বলতা, দারিদ্র্য ও সামাজিক বিভাজনকে নিজেদের পক্ষে কাজে লাগিয়েছে। আফগানিস্তানে

তালেবানদের মধ্যে বিদেশি বাহিনী নিয়ে একটি কথার প্রচলন ছিল, "তোমাদের কাছে আছে ঘড়ি, কিন্তু আমাদের আছে সময়।" শেষ পর্যন্ত এই কথাই সত্যি হয়েছে। বিদেশি সেনারা ফিরে গেছে, আর তালেবান রয়ে গেছে আরো সংগঠিত, আরো শক্তিশালী হয়ে। এখন প্রশ্ন হলো—সাহেলে বিদেশি শক্তিগুলো কতটা সময়, কতটা রক্ত এবং কতটা অর্থ ব্যয় করতে রাজি?

অ্যামেরিকা এই অঞ্চল থেকে সরে আসতে চায়, যা ফ্রান্সের সামরিক ও কূটনৈতিক মহলে গভীর উদ্বেগের জন্ম দিয়েছে। কারণ, মার্কিন বাহিনী যে লজিস্টিক ও গোয়েন্দা সহায়তা দিয়ে থাকে তা ছাড়া ফরাসিদের পক্ষে একা পরিস্থিতি সামাল দেওয়া প্রায় অসম্ভব। প্যারিস এখন নিরবে ওয়াশিংটনকে মনে করিয়ে দিচ্ছে যে, মধ্যপ্রাচ্য এবং হর্ন অব আফ্রিকার মতো গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় ফরাসি বাহিনীও মার্কিন স্বার্থে কাজ করছে। তবু বাস্তবতা হলো, সাহেল এখন আর যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত অগ্রাধিকারে নেই। তাদের মনোযোগ সরে গেছে বৃহৎ শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতার দিকে, বিশেষত চীন ও রাশিয়ার দিকে। এর ওপর সাহেলে তারা ইতোমধ্যেই বিশেষ বাহিনীর কয়েকজন সদস্য হারিয়েছে। তাই এখন নতুন করে বেশি ঝুঁকি নিতে একদমই অনাগ্রহী তারা।

অ্যামেরিকানরা যদি তাদের উপস্থিতি কমিয়ে আনে, তবে ফ্রান্স ও অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তির সামনে তিনটি পথ খোলা থাকবে—অতিরিক্ত সেনা পাঠানো, বর্তমান সক্ষমতা বজায় রাখা, অথবা সম্পূর্ণ সরে যাওয়া। এই তিনটি পথই ঝুঁকিপূর্ণ। পাশাপাশি প্রতিটি পথেরই রয়েছে নিজস্ব রাজনৈতিক, কৌশলগত ও মানবিক জটিলতা। তবে পুরোপুরি সরে যাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে কম। কারণ, এতে যে বিশৃঙ্খলা তৈরি হবে তা সহজেই অনুমানযোগ্য। বিশেষজ্ঞদের মতে, সাহেলের রাষ্ট্রগুলো এককভাবে টিকে থাকার মতো পর্যাপ্ত সক্ষমতা রাখে না। রাষ্ট্রগুলোর অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েন ও বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা এত প্রবল যে, কেন্দ্রীয় শাসন ভেঙে পড়লে পুরো অঞ্চল টুকরো টুকরো হয়ে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণে চলে যাবে। এর ফল হবে সহিংসতার বিস্ফোরণ। এর প্রভাব দক্ষিণে মধ্য আফ্রিকা এবং উত্তরে উত্তর আফ্রিকা হয়ে ইউরোপ পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। এর সঙ্গে যোগ হবে বিপুল জনস্রোত। ন্যূনতম হিসাবেও কয়েক লাখ শরণার্থী চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে। দ্বিতীয় পথ হলো বর্তমান সামরিক সহযোগিতা বজায় রাখা। তবে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা ছাড়া এই পদক্ষেপ ধরে রাখতে গেলে জঙ্গিগোষ্ঠীর সামনে অবস্থান হারানোর আশঙ্কা থেকে যাবে। আর তৃতীয় পথ, অর্থাৎ

অতিরিক্ত সেনা পাঠানোর অর্থ হলো আরো বেশি ব্যয় এবং সেইসঙ্গে আরো বেশি প্রাণহানি।

সাহেল অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলোর আঞ্চলিক জোট 'জি-৫ সাহেল' চায় ফরাসি বাহিনী এবং অন্যান্য বিদেশি বাহিনীর উপস্থিতি এই অঞ্চলটিতে থাকুক। একই রকম অবস্থান নিয়েছে পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলবর্তী দেশগুলোও। কারণ তারা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে, সাহেলের সহিংসতার ঢেউ কীভাবে ধীরে ধীরে তাদের দিকেও এগিয়ে আসছে। এর একটি স্পষ্ট উদাহরণ আইভরি কোস্ট। দেশটিতে তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল একটি অর্থনীতি গড়ে উঠেছে, যার একটি বড় অংশ নির্ভর করে পর্যটনের ওপর। এই অর্থনৈতিক কাঠামোই দেশটিকে জঙ্গিদের চোখে একটি লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করেছে। ২০১৬ সালে দেশটির গ্র্যান্ড বাসাম সৈকতে এক ভয়াবহ হামলা চালিয়ে ১৬ জনকে গুলি করে হত্যার দায় স্বীকার করেছিল AQIM. এই ধরনের হামলা আরো বাড়লে পর্যটকরা দেশটি এড়িয়ে চলবে। পাশাপাশি হাজার হাজার ফরাসি প্রবাসী শ্রমিকও নিজেদের নিরাপত্তার স্বার্থে দেশে ফিরে যেতে বাধ্য হবে।

সহিংসতা দীর্ঘায়িত হলে কিংবা তা পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলীয় দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়লে ফ্রান্স ও অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তির সামনে সরাসরি পদক্ষেপ নেওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প থাকবে না। যদি তারা পিছিয়ে যায়, তাহলে সাহেলের দেশগুলো সহায়তার কোনো বিকল্প উৎস খুঁজবে। চীন ও রাশিয়া ইতোমধ্যেই এমন সুযোগের অপেক্ষায় রয়েছে। মালি কিংবা চাদের মতো দেশগুলো পশ্চিমাদের সঙ্গে কোনো আদর্শগত বন্ধনে আবদ্ধ নয়। স্নায়ু যুদ্ধের সময় আফ্রিকার বহু রাষ্ট্র যেভাবে তাদের স্বাধীনতার লড়াইয়ে যে কারও কাছ থেকে সাহায্য নিয়েছিল, এখনো বাস্তবতা একই রকম আছে। সুতরাং, যদি ইউরোপ ও অ্যামেরিকার সামরিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা অনিশ্চিত হয়ে পড়ে, তাহলে সাহেলের রাষ্ট্রগুলো আগেভাগেই নতুন অংশীদার খুঁজতে শুরু করবে। চীন এবং রাশিয়াও দেরি করবে না। অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক বা সামরিক ক্ষেত্র—যেখানে সম্ভব পশ্চিমা শক্তিকে চ্যালেঞ্জ জানাতে আগ্রহী এই দুই পরাশক্তি। ইতোমধ্যেই সিরিয়ার অস্থিরতাকে ব্যবহার করে রাশিয়া মধ্যপ্রাচ্যে আবার শক্তিশালী অবস্থান গড়ে তুলেছে। ইউরোপের দ্বিধা এবং অ্যামেরিকার উদাসীনতার সুযোগ নিয়ে প্রেসিডেন্ট পুতিন সেখানে তার ভূমিকাকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। তেমনি সাহেলের অস্থিতিশীল পরিবেশও তাদের সামনে নতুন সুযোগ এনে দিতে পারে। অন্যদিকে, সৌদি আরব ও সংযুক্ত

আরব আমিরাতের মতো উপসাগরীয় দেশগুলোও অর্থনৈতিকভাবে সহায়তা দিতে সক্ষম। তবে বাস্তবতা হলো, তাদের সেনাবাহিনী সাহেল জুড়ে ফরাসি ও অ্যামেরিকান শক্তির বিকল্প হয়ে উঠতে পারবে না।

আঞ্চলিক পর্যায়ের ইউরোপীয় শক্তিগুলো—বিশেষত স্পেন, ইতালি ও ফ্রান্স ভালোভাবেই জানে যে, সাহেলে যা ঘটবে তার সরাসরি প্রভাব পড়বে তাদের নিজেদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে। ২০১৫ সালের পর ইউরোপে যখন প্রায় ১০ লাখ শরণার্থী ও অভিবাসী প্রবেশ করেছিল, তখন গোটা মহাদেশজুড়ে রাজনীতি তীব্রভাবে মেরুকৃত হয়ে পড়ে। ওই সময় চরম ডানপন্থী দলগুলো দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে শুরু করে এবং রাজনৈতিক বিভাজন আরো তীব্র হয়ে ওঠে।

যে পদক্ষেপই নেওয়া হোক না কেন, যদি মূল সমস্যাগুলো মোকাবিলা না করা হয়, তবে তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। অনেক সময় শোনা যায়, "এই সংঘাতের কোনো সামরিক সমাধান নেই।" এই ধরনের কথা সাধারণত কূটনৈতিক ছাঁচের বুলি। বাস্তবে অনেক সংঘাতের সামরিক সমাধান হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ দিকে যখন রাশিয়ান সেনারা বার্লিনের দরজায় পৌঁছে গিয়েছিল, তখন স্তালিন হিটলারকে ফোন করে বলেননি: "অ্যাডলফ, এই যুদ্ধের তো কোনো সামরিক সমাধান নেই।" সাহেলের ক্ষেত্রে কথাটি সত্য। এখানে সামরিক অভিযান মানেই যেন পুরোনো 'হ্যাক-আ-মোল' খেলার মতো। এক দেশে কোনো বিদ্রোহী গোষ্ঠী দমন করা হলে তা আবার পাশের দেশে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এমনকি একটি দেশকে স্থিতিশীল করলেও তার ছিদ্রযুক্ত সীমান্তের কারণে দ্রুত অস্থিতিশীলতা ফিরে আসে।

আজ পর্যন্ত সাহেলের রাষ্ট্রগুলো তাদের জনগণের প্রকৃত অভিযোগ ভালো করে শুনেনি, ফলে সঠিকভাবে সমাধানও করতে পারেনি। স্পষ্টভাবে বললে, তারা আসলে তেমন কোনো চেষ্টাই করেনি। বিভিন্ন জাতিগত গোষ্ঠীর মধ্যে ন্যায্য আচরণ তো দূরে থাক, সরকার ও শাসকশ্রেণির ভেতরেই দুর্নীতি এমনভাবে গেঁথে বসে আছে যে বাহ্যিক সামরিক সহায়তা যতই আসুক, তা দিয়ে স্থায়ী রাষ্ট্র কাঠামো তৈরি করা সম্ভব নয়। ক্ষমতার শীর্ষে থাকা রাজনৈতিক ও ব্যবসায়িক অভিজাত শ্রেণি নিজেদের ধন-সম্পদ, ক্ষমতা ও নিজস্ব জাতিগোষ্ঠীর সুবিধা নিশ্চিত করাতেই বেশি মনোযোগী। ফলে রাষ্ট্রসীমার ভূগোলের চেয়ে জাতিগত ভূগোল এখানে অনেক বেশি কার্যকর হয়ে উঠেছে।

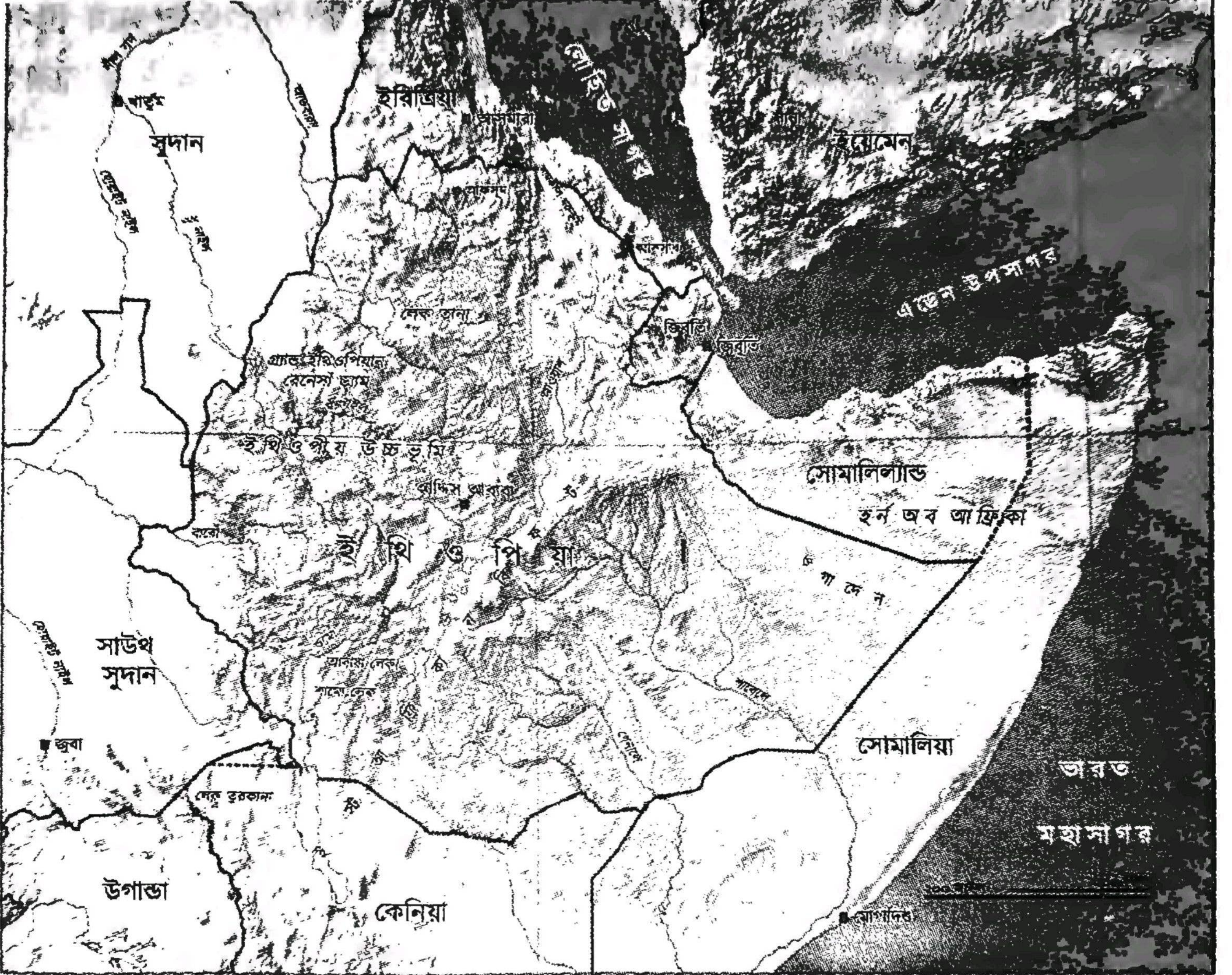
এই পরিস্থিতিকে কাজে লাগাচ্ছে জিহাদি ও বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলো। মালিতে আল-কায়েদা-ঘনিষ্ঠ জঙ্গি সংগঠন এবং তুয়ারেগ বিদ্রোহীরা স্থানীয় জনগণকে বোঝায় যে, কেন্দ্রীয় সরকার তাদের সমস্যার সমাধান দিতে পুরোপুরি ব্যর্থ। তাদের দাবি, এই সংকট থেকে মুক্তির একমাত্র পথ হলো স্বাধীনতা কিংবা একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। তারা জনগণকে সতর্ক করে দিচ্ছে যে, বিদেশি শক্তির ওপর নির্ভর করা বিপদজনক। AQIM সরাসরি দাবি করে—তারা ফ্রান্সকে কোনো লক্ষ্যই অর্জন করতে দেয়নি। বাস্তবতার বিচারে এই বক্তব্য পুরোপুরি অযৌক্তিকও নয়।

ফরাসিরা এখন আশঙ্কা করছে, তারা হয়তো এমন এক সংঘাতে আটকা পড়েছে যেখান থেকে বের হওয়া কঠিন। আবার জেতাও অসম্ভব। এটি তাদের জন্য হয়ে উঠছে এক 'চিরস্থায়ী যুদ্ধ'। যার শেষ নেই, কোনো পরিণতিও নেই। ব্রিটেন ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলোও আশঙ্কা করছে, এই সংঘাতে একসময় হয়তো তাদের আরো বেশি সম্পৃক্ত হতে হবে। এদিকে আটলান্টিক থেকে লোহিত সাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ডে কোটি কোটি মানুষ একের পর এক সহিংস ঢেউয়ের আঘাত সহ্য করছে।

সংঘাত যখন সীমান্ত পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে, তখন প্রতিটি সমাজই হচ্ছে রক্তাক্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত। এখন পরিস্থিতি এমন একটা অবস্থায় পৌঁছেছে, যেখানে কোনো পক্ষই এগোতে পারছে না। আঞ্চলিক ও বৈদেশিক শক্তিগুলো এই সংঘাত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারছে না, আবার তাদের উপস্থিতি বজায় থাকায় জিহাদিরাও রাষ্ট্রগুলোকে পুরোপুরি ভেঙে ফেলতে পারছে না। আলোচনার জায়গা ক্রমেই হয়ে আসছে সংকুচিত। সাহেল বহু পরিবর্তনের সাক্ষী হয়েছে, কিন্তু অঞ্চলটি আজও এক আপসহীন ভূখণ্ড হয়েই রয়ে গেছে।

অধ্যায় ৮

ইথিওপিয়া



"আপনার নিজের বাড়িতে লুসি আপনাকে স্বাগতম জানাচ্ছে"

- 'ন্যাশনাল মিউজিয়াম অফ ইথিওপিয়ার পোস্টার থেকে

ইথিওপিয়া থেকে এই পৃথিবী অনেক কিছুই পেয়েছে। মানুষ তার মধ্যে অন্যতম। অনেক অনেক বছর আগে ইথিওপিয়ার আওয়াশ উপত্যকায় বাস করত মানবসদৃশ এপ জাতীয় এক প্রাণী। বিজ্ঞানীরা এদের বলেন 'হোমিনিন'। আমরা যে হোমিনিনের কথা বলছি সে ছিল এক নারী। এই হোমিনিনটি দুই পায়ে যেমন হাঁটতে পারত, তেমনি পারত গাছে উঠতেও। বিজ্ঞানীদের ধারণা, গাছ থেকে পড়ে যাওয়ার কারণেই সম্ভবত তার মৃত্যু হয়েছিল। তার মৃত্যুর পর কেটে গেছে প্রায় ৩২ লাখ বছর। ১৯৭৪ সালে প্রাগৈতিহাসিক নৃতত্ত্ববিদ ডোনাল্ড জোহানসন এই

হোমিনিন নারীটির প্রায় সম্পূর্ণ কঙ্কাল আবিষ্কার করেন। পরবর্তী বিভিন্ন গবেষণায় বিজ্ঞানীরা জানতে পারেন, মানবজাতির আদি আবাসস্থল সম্ভবত এই এলাকাতেই। আবিষ্কারের রাতে জোহানসনের ক্যাম্পে বাজছিল বিটলস ব্যান্ডের গান 'লুসি ইন দ্য স্কাই উইথ ডাইমন্ডস'। এই গানের নাম থেকেই এই আদি পূর্বসূরির নাম রাখা হয় 'লুসি'। তার বৈজ্ঞানিক নাম 'AL 288-1' এতটা কাব্যময় নয়, তাই মানুষের কল্পনায় জায়গা করে নিয়েছে 'লুসি' নামটাই।

ইথিওপিয়ার জাতীয় জাদুঘরে একটি পোস্টারে লেখা রয়েছে—'আপনার বাড়িতে লুসি আপনাকে স্বাগতম জানাচ্ছে'। নিঃসন্দেহে এটি চমৎকার একটি মার্কেটিং কৌশল। দেশটির পর্যটন দপ্তরের স্লোগানও কম চিত্তাকর্ষক নয়—'ল্যান্ডস অব অরিজিন'। এই ব্র্যান্ডিং ইথিওপিয়াকে পৃথিবীর সামনে তুলে ধরেছে মানবজাতির আদি আবাস হিসেবে। আর সেই পরিচিতিই তাকে জায়গা করে দিয়েছে আন্তর্জাতিক পর্যটনের মানচিত্রে। বর্তমানে ইথিওপিয়ার অর্থনীতিতে পর্যটনের অবদান প্রায় ১০ শতাংশ! প্রতি বছর প্রায় ১০ লাখ পর্যটক ভ্রমণে আসেন এই নাটকীয় ভূ-প্রকৃতির দেশে। দেশটিতে রয়েছে সুউচ্চ পর্বত, গ্রীষ্মমণ্ডলীয় বনাঞ্চল, তপ্ত মরুভূমি, আর শ্বাসরুদ্ধকর জলপ্রপাত। পাশাপাশি রয়েছে নয়টি ইউনেস্কো ঘোষিত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট, যার অন্যতম হলো পাথর কেটে বানানো এক হাজার বছরের পুরোনো গির্জা।

ইথিওপিয়ার ভূরাজনৈতিক ভূমিকা ও গুরুত্ব মূলত নির্ধারিত হয় এর পানিসম্পদের মাধ্যমে। মিঠা পানিই দেশটির সবচেয়ে বড় শক্তি। আর লোনা পানি হলো তাদের দুর্বলতা। দেশটিতে রয়েছে ১২টি বড় হ্রদ ও ৯টি প্রধান নদী। বেশিরভাগ নদীই প্রবাহিত হয়েছে প্রতিবেশী দেশগুলোর ওপর দিয়ে। এই জল সম্পদ ইথিওপিয়াকে প্রতিবেশী দেশগুলোর ওপর ব্যাপক রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের সুযোগ এনে দিয়েছে। তবে ইথিওপিয়ার একটা বড় সীমাবদ্ধতাও আছে। দেশটির কোনো উপকূল নেই। ফলে সরাসরি সমুদ্রের সঙ্গে যোগাযোগের কোনো পথ নেই ইথিওপিয়ার। কিন্তু তারপরও মিঠা পানির ব্যাপক সম্ভাবনা, মধ্যপ্রাচ্য ও লোহিত সাগরের নিকটবর্তী অবস্থান এবং এই অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ইথিওপিয়াকে 'হর্ন অব আফ্রিকা' অঞ্চলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শক্তিতে পরিণত করেছে। হর্ন অব আফ্রিকা অঞ্চল দীর্ঘদিন ধরে গৃহযুদ্ধ, সীমান্ত বিরোধ, উগ্রবাদ ও জলদস্যুতার মতো সমস্যায় জর্জরিত। কিন্তু তারপরও কৌশলগত ও অর্থনৈতিক স্বার্থের কারণে তুরস্ক, চীন, উপসাগরীয় দেশগুলো এবং অ্যামেরিকা এখানে

বিনিয়োগ করছে। 'আফ্রিকার জলস্তম্ভ' হিসেবে পরিচিত ইথিওপিয়া যদি দক্ষতার সঙ্গে তার সম্পদ ও প্রযুক্তি ব্যবহার করতে পারে, তাহলে শুধু নিজের দেশ নয়, পুরো অঞ্চলের ভাগ্যই বদলে দিতে পারে দেশটি।

জলসম্পদের পর ইথিওপিয়ার ভূগোলকে যে জিনিসটি সবচেয়ে গভীরভাবে সংজ্ঞায়িত করে, তা হলো দেশটির বুক চিরে চলে যাওয়া এক বিশাল ফাটল। এই ফাটল 'ইস্ট আফ্রিকান রিফট সিস্টেম' নামে পরিচিত। এই রিফট গঠনের ফলে যে পর্বতমালা ও উপত্যকাগুলোর সৃষ্টি হয়েছে, সেগুলো দীর্ঘকাল ধরে দেশটিকে ভৌগোলিকভাবে বিভক্ত করে রেখেছে। আর এই বিভাজন ঘোচাতে ইথিওপিয়ার শাসকরা বরাবরই হিমশিম খেয়েছেন—হোক তা বাস্তব কোনো সেতু নির্মাণ, কিংবা প্রতীকী অর্থে একটি অভিন্ন জাতিরাষ্ট্র গড়ার চেষ্টা। এই ফাটল একসময় গ্রেট রিফট ভ্যালি নামে পরিচিত ছিল। এই বিশাল ফাটল নভোচারীদের চোখে মহাকাশ থেকে দৃশ্যমান পৃথিবীর সবচেয়ে স্পষ্ট ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্যগুলোর একটি। প্রায় ৬,৪০০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই ফাটল সিরিয়া থেকে শুরু হয়ে মোজাম্বিক পর্যন্ত বিস্তৃত। এর গড় প্রস্থ প্রায় ৫০ কিলোমিটার। ইথিওপিয়ার মধ্যভাগে পৌঁছে এটি দেশটির উচ্চভূমিকে দুইটি অংশে ভাগ করে দেয়। এই দুই উচ্চভূমির মাঝখানে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য উপত্যকা ও হ্রদ। এগুলো ইথিওপিয়ার অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ও যাতায়াতে দীর্ঘকাল ধরে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে।

উপগ্রহ চিত্রে ওপর থেকে তাকালে রিফট ভ্যালির দুই পাশে দাঁড়িয়ে থাকা উচ্চভূমিগুলোকে অনেকটা মানুষের ফুসফুসের মতো দেখায়। এর মধ্যে বাম, অর্থাৎ পশ্চিম দিকের 'ফুসফুস' অপেক্ষাকৃত বড়। প্রাণীদের ফুসফুসের মতো এই দুই উচ্চভূমিও দেশটির জনজীবনের মূল চালিকাশক্তি। এখানেই ইথিওপিয়ার সর্বাধিক জনবসতি, এখানেই রয়েছে দেশটির কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির প্রাণকেন্দ্র। দেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের প্রধান উৎস কফি বাগানগুলোর অবস্থানও এই অঞ্চলে। এই বনভূমি ও পাহাড়ি অঞ্চলের গর্ভ থেকেই জন্ম হয়েছে ইথিওপিয়ার বড় বড় নদীগুলোর। খরস্রোতা ধারায় নদীগুলো ছুটে চলে নিচু উর্বর সমতলের দিকে। তবে এসব নদীর বেশিরভাগই নৌচলাচলের উপযুক্ত নয়। কারণ এদের গতিপথে রয়েছে বিশাল বিশাল খাড়া গিরিখাত, পাথুরে ঢাল এবং জলপ্রপাত। এই ভূ-প্রকৃতিগত বাধাগুলো ইথিওপিয়ার অবকাঠামোগত উন্নয়নেও বাধা হয়ে আছে দীর্ঘকাল ধরে। এই দুই উচ্চভূমির মাঝে অবস্থিত দেশের কেন্দ্রস্থল। রাজধানী আদ্দিস আবাবাও গড়ে উঠেছে এই অঞ্চলেই। আর চারপাশের বিস্তৃত নিম্নভূমি অঞ্চল যেন এক

প্রাকৃতিক প্রতিরক্ষা বলয় গড়ে তুলেছে। এর ফলে ইথিওপিয়া দেশটি বহিঃশত্রুর আক্রমণের ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে সুরক্ষিত। এই কারণে কারণে দেশটিকে আক্রমণ করা বা দীর্ঘ সময় ধরে দখলে রাখা কখনোই খুব একটা সহজ ছিল না।

পশ্চিম ইথিওপিয়ার উচ্চভূমিতে রয়েছে বিশাল সব পর্বত। এইসব পর্বতের চূড়া কখনো কখনো ৪,৫০০ মিটার ছাড়িয়ে যায়। ইথিওপিয়ার সবচেয়ে উঁচু চূড়াটির উচ্চতা ৪,৫৩৩ মিটার। এই পর্বতশ্রেণী থেকেই উৎপন্ন হয়েছে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ নদী, যার মধ্যে অন্যতম হলো 'ব্লু নাইল'। এই নদীগুলো পাহাড়ি অঞ্চল থেকে গড়িয়ে নেমে আসে নিম্নভূমির দিকে এবং উত্তর-পশ্চিমে সুদান ও পশ্চিমে দক্ষিণ সুদানে প্রবেশ করে। দক্ষিণ দিকে ইথিওপিয়ার প্রতিবেশী দেশ কেনিয়া। আর পূর্বদিকে রিফটের অপর পাড়ে রয়েছে পূর্বাঞ্চলের উচ্চভূমি, যা হঠাৎ খাড়া ঢালে নিচে নেমে এসে আবার শত শত কিলোমিটারজুড়ে মসৃণভাবে বিস্তৃত হয়েছে সোমালিয়ার সীমান্ত পর্যন্ত। সোমালিয়ার অবস্থান ইথিওপিয়ার উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব সীমান্তজুড়ে। এই দুই দেশের মধ্যে রয়েছে প্রায় ১,৬০০ কিলোমিটার দীর্ঘ সীমান্ত। সোমালিয়া পার হলেই এডেন উপসাগর। তবে ইথিওপিয়ার সবচেয়ে অস্থিতিশীল প্রতিবেশীও এই সোমালিয়া। ১৯৯১ সালে সোমালিয়ার উত্তরাঞ্চল সোমালিল্যান্ড নিজেদেরকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করে। পরের তিন দশক ধরে গৃহযুদ্ধে জর্জরিত হয়ে আছে দেশটি। ইথিওপিয়ার উত্তর দিকে রয়েছে ইরিত্রিয়া ও জিবুতি। এই দুইটি দেশ লোহিত সাগরে ইথিওপিয়ার সরাসরি প্রবেশাধিকার রুদ্ধ করে রেখেছে। এই কারণে ইথিওপিয়া দেশটি সমুদ্র বন্দরের সুবিধা থেকে বঞ্চিত। ইরিত্রিয়ার সীমান্তঘেঁষা অঞ্চলেই অবস্থিত ইথিওপিয়ার সবচেয়ে নিচু ভূভাগ 'দানাকিল ডিপ্রেশন'। এলাকাটি সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ১০০ মিটারেরও বেশি নিচু। এটি শুধু ইথিওপিয়ারই নয়, গোটা পৃথিবীর অন্যতম উত্তপ্ত স্থান। এখানে তাপমাত্রা ৫১.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত রেকর্ড করা হয়েছে। এই এলাকায় পৃথিবীর ভূত্বক এতটাই পাতলা যে, ভূত্বকের একটু নিচ দিয়েই লাভা প্রবাহিত হচ্ছে। এখানেই রয়েছে সক্রিয় আগ্নেয়গিরি 'এরতা আলে', যার মুখে বিরাট এক লাভা-হ্রদ ক্রমাগত জ্বলতে থাকে। এই ভয়ংকর ও রহস্যময় ভূদৃশ্যের জন্য কেউ কেউ এটাকে বলেন, 'নরকের প্রবেশদ্বার'।

বর্তমান ইথিওপিয়া হর্ন অব আফ্রিকা অঞ্চলের প্রধান সামরিক শক্তি। দেশটির বর্তমান জনসংখ্যা প্রায় ১১ কোটি, যা ২০৩০ সালের মধ্যে ১৩ কোটি ছাড়িয়ে যাওয়ার কথা। এটি আফ্রিকার দ্বিতীয় সর্বাধিক জনবহুল দেশ। হর্ন অব আফ্রিকা অঞ্চলে সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণ দেশ এটি। প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে কেনিয়ায় আছে প্রায় ৫.২ কোটি মানুষ, উগান্ডায় ৪.৫ কোটি, সুদানে ৪.৩ কোটি, সোমালিয়ায় ১.৫ কোটি, দক্ষিণ সুদানে ১.১ কোটি, ইরিত্রিয়ায় ৩০ লাখ এবং জিবুতিতে মাত্র ১০ লাখ। এই অঞ্চল সম্মিলিতভাবে আফ্রিকার মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ ধারণ করে। এই বৃহৎ জনসংখ্যা এবং ভৌগোলিক গুরুত্বের কারণে হর্ন অব আফ্রিকার নেতৃত্ব মানে শুধু সামরিক বা কৌশলগত আধিপত্য নয়, এটি আফ্রিকান রাজনীতির মূল মঞ্চে একটি গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান নিশ্চিত করার মতো একটি বিষয়।

তবে, দেশটি এমন এক অঞ্চলের কেন্দ্রে অবস্থিত, যা বিশ্বের সবচেয়ে অস্থির ও সংঘাতপ্রবণ অঞ্চলগুলোরও অন্যতম। একবিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে সুদান, দক্ষিণ সুদান, সোমালিয়া, ইথিওপিয়া ও ইরিত্রিয়া গৃহযুদ্ধ লেগেই আছে। অন্যদিকে কেনিয়াও বারবার কেঁপে উঠেছে ব্যাপক জাতিগত সংঘর্ষে। আবার সোমালিয়া-ভিত্তিক জঙ্গি গোষ্ঠী আল-শাবাবের হাতে একাধিকবার বড় ধরনের সন্ত্রাসী হামলার শিকার হয়েছে দেশটি। এই দেশগুলোর তুলনায় জিবুতি আপাতদৃষ্টিতে স্থিতিশীল। কিন্তু তার মানে এই নয় যে দেশটি ঝুঁকিমুক্ত। প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে সংঘাতপীড়িত শরণার্থীদের অবিরাম ঢল এসে পড়ে ছোট্ট এই বন্দর নগর ভিত্তিক রাষ্ট্রে। ফলে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র জিবুতিকে প্রতিনিয়ত সামলাতে হয় জনসংখ্যার চাপ ও জাতিগত উত্তেজনা। এর ফলে ছোট এই দেশটির অভ্যন্তরীণ ভারসাম্যকে মাঝে মাঝেই টালমাটাল হয়ে পরে। হর্ন অঞ্চলের দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কও খুব একটা বন্ধুত্বপূর্ণ নয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সোমালিয়া ও কেনিয়ার মধ্যে বর্তমানে একটা বৃহৎ সামুদ্রিক অঞ্চলের মালিকানা নিয়ে তীব্র বিরোধ চলছে। এই অঞ্চলের আয়তন প্রায় এক লাখ বর্গকিলোমিটার। ধারণা করা হয়, এই জলসীমায় রয়েছে বিপুল পরিমাণ টুনা মাছের মজুত এবং গ্যাস-তেলের খনি। তবে ইতিহাসও এই অঞ্চল সম্পর্কে বলার মতো অনেক কিছু রেখে গেছে। হর্ন অব আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই রয়েছে সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক আদান-প্রদান। কেউ কেউ বলেন, লোহিত সাগরের এই দুই পাড়কে একটা একক ভৌগোলিক অঞ্চল হিসেবেও দেখা যেতে পারে।



চিত্র: আফ্রিকা মহাদেশের একদম উত্তর-পূর্ব কোণে গণ্ডারের শিং এর মতো অংশটিকে বলা হয় 'হর্ন অব আফ্রিকা' বা 'সোমালি উপদ্বীপ'। উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার এই দেশগুলোর মধ্যে যেমন পারস্পরিক সম্পর্ক আছে, তেমনি লোহিত সাগরের অপর পারে মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গেও রয়েছে ঐতিহাসিক সম্পর্ক।

প্রতিবেশী দেশগুলোকে অর্থনৈতিক প্রকল্পে সহায়তা করে, কিংবা দীর্ঘদিনের বিরোধগুলোর নিষ্পত্তিতে মধ্যস্থতা করে আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারত ইথিওপিয়া দেশটি। কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী সীমান্ত এবং অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা। বাস্তবতা হলো, এই দুইটি মৌলিক শর্তের কোনোটিই দেশটির নেই। ২০২০-২১ সালে দেশটির উত্তরাঞ্চলীয় তিগ্রাই অঞ্চলের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের এক ভয়াবহ সংঘাত শুরু হয়। এমনকি এই সংঘাত পূর্ণমাত্রার গৃহযুদ্ধে রূপ নেওয়ার হুমকি তৈরি করেছিল। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছায় যে, আল-শাবাবকে প্রতিহত করতে সোমালিয়া সীমান্তে মোতায়েন করা অভিজ্ঞ

সেনাদের সেখান থেকে সরিয়ে এনে পাঠানো হয় তিগ্রাইয়ে। ফলে সীমান্ত এলাকা হয়ে পড়ে অনিরাপদ। সংঘাতের তীব্রতায় দশ হাজারেরও বেশি মানুষ তিগ্রাই থেকে সুদানে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় তখন।

ইথিওপিয়া এই অঞ্চলের সবচেয়ে প্রভাবশালী আঞ্চলিক শক্তি হয়েও অনেকগুলো অভ্যন্তরীণ সংকটে জর্জরিত। দেশটি জলসম্পদে সমৃদ্ধ, তাদের ভূমি বেশ উর্বর, গবাদিপশুও রয়েছে বিপুল সংখ্যক এবং কৃষি খাত জিডিপির প্রায় অর্ধেক জোগান দেয়। সবকিছু ঠিকঠাক চললে বহু আগেই খাদ্য ও জ্বালানির দিক থেকে আত্মনির্ভরশীল হতে পারত দেশটি। কিন্তু বাস্তবে এমনটি একদমই ঘটেনি। নিয়মিত খরা, বন উজাড়, অতিরিক্ত পশুচারণ, দীর্ঘমেয়াদি সামরিক শাসন, আর দুর্বল অবকাঠামো—সবকিছু মিলিয়ে দেশটির উন্নয়ন বারবার ব্যাহত হয়েছে। দেশটির অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যেও রয়ে গেছে জটিলতা। এর অন্যতম কারণ হলো, দেশটির অধিকাংশ নদী এতটাই অগভীর ও দুরূহ গতিপথে প্রবাহিত যে সেগুলোতে নৌ চলাচল প্রায় অসম্ভব। শুধু বারোটি নদীতেই কার্যকরভাবে নৌপরিবহন সম্ভব। ১৯৮৪-৮৫ সালের ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখিয়ে দিয়েছিল যে পরিস্থিতি কতটা ভয়াবহ হতে পারে। এই দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারিয়েছিল লাখ লাখ মানুষ। আজও অনেক বিদেশির চোখে সেই দুর্ভিক্ষের স্মৃতি দিয়েই ইথিওপিয়া চিহ্নিত হয়। বিস্ময়ের বিষয় হলো, প্রাকৃতিক সম্পদে ভরপুর এই দেশটিতে এখনো কোটি কোটি মানুষ আন্তর্জাতিক মানবিক সহায়তার ওপর নির্ভরশীল হয়ে জীবনধারণ করছে।

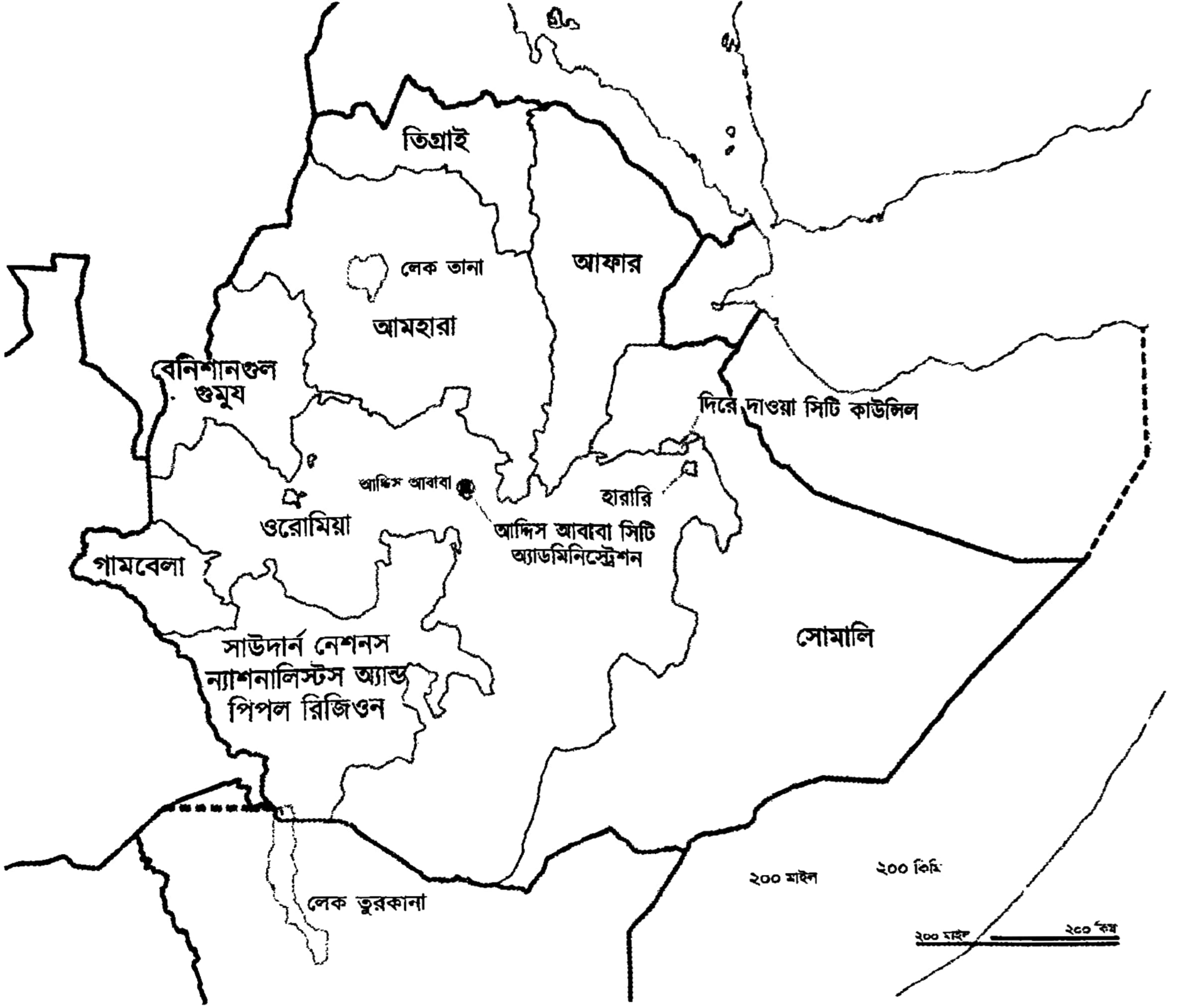
তবে সময় বদলাচ্ছে। ধীরে হলেও পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে দেশটিতে। ইথিওপিয়ার জলসম্পদ এখন আর কেবল নদীর স্রোতে বয়ে যাওয়া জলে সীমাবদ্ধ নেই। এই জল এখন রূপ নিচ্ছে শক্তিতে। ব্লু নাইল, আওয়াশ, ওমো, শেবেলি—এই সব নদীর ওপর গড়ে উঠছে বাঁধ ও বিদ্যুৎকেন্দ্র। এসব প্রকল্প থেকে উৎপন্ন বিদ্যুৎ একদিকে দেশের নিজস্ব চাহিদা মেটাবে, অপরদিকে উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ রপ্তানি করা যাবে প্রতিবেশী দেশগুলোতে। এতে করে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের মানুষ ধীরে ধীরে কয়লা ও কাঠ জ্বালানোর বদলে বিদ্যুৎ ব্যবহারে অভ্যস্ত হবে। বহুদিন ধরে বন উজাড়, ভূমিক্ষয় আর পরিবেশ বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ ছিল কাঠকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা। এই পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় প্রতীক হলো ব্লু নাইলের ওপর নির্মিত 'গ্র্যান্ড ইথিওপিয়ান রেনেসাঁ ড্যাম' (GERD)। অনেকে মনে করছেন, এই বাঁধ ইথিওপিয়ার বিদ্যুৎ উৎপাদনে এক নতুন যুগের সূচনা

করবে। এমনকি কৃষিক্ষেত্রেও এর প্রভাব পড়বে ব্যাপকভাবে। এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে এই বাঁধ নিয়ে বিশদ আলোচনা থাকবে।

এই প্রযুক্তিগত অগ্রগতি শুধু শক্তি উৎপাদনেই সীমাবদ্ধ নয়। এটি সম্পদের ন্যায্য বণ্টনের নতুন দুয়ারও খুলে দিতে পারে। এমনকি দেশটির দীর্ঘদিনের অভ্যন্তরীণ টানাপোড়েন, বিশেষত জাতিগত প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও কিছুটা উপশম করতে পারে। ইথিওপিয়ার সামাজিক অবস্থা জটিল। আফ্রিকার অনেক দেশের মতো এখানেও রয়েছে বহু জাতিগোষ্ঠীর সহাবস্থানের চ্যালেঞ্জ। ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো নিজেদের মতো করে আফ্রিকার মানচিত্র আঁকার সময় নানা জাতিগোষ্ঠীকে এক ছাতার নিচে জুড়ে দিয়েছিল। এর ফলে বহু দেশে সৃষ্টি হয় জাতিগত বিভাজন ও সংঘাত, যা আজও অব্যহত আছে। তবে ইথিওপিয়া এই ইতিহাসে একটি ব্যতিক্রম। এই দেশটি কখনোই সরাসরি ঔপনিবেশিক শাসনের অধীন হয়নি, বরং তারা নিজেরাই একসময় একটি সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল। আর তারই ফলে এই দেশের ভেতরেও অনুরূপ জাতিগত সমস্যা তৈরি হয়েছে। ইথিওপিয়ায় বর্তমানে রয়েছে নয়টি বৃহৎ জাতিগোষ্ঠী। ইথিওপিয়ার বর্তমান রাষ্ট্রীয় কাঠামোটি জাতিগত ভিত্তিতে সাজানো এক ফেডারেশন। এখানে রয়েছে নয়টি জাতিগত অঞ্চল। এগুলো মূলত বড় বড় জাতিগোষ্ঠীর পরিচয় অনুযায়ী গঠিত। এছাড়া রয়েছে দুইটি স্বশাসিত শহর—রাজধানী আদ্দিস আবাবা এবং দিরে দাওয়া। দেশটিতে প্রচলিত রয়েছে ৮০টিরও বেশি ভাষা এবং সবগুলো ভাষাই সরকারি স্বীকৃতি পেয়েছে। এই ভাষাগুলোর উদ্ভব চারটি প্রধান ভাষা-পরিবার থেকে। সবচেয়ে বড় জাতিগোষ্ঠী হলো ওরোমো। এরা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৩৫ শতাংশ। দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে আমহারা জাতিগোষ্ঠী, যারা প্রায় ২৭ শতাংশ। এরপর রয়েছে সোমালি ও তিগ্রাই সম্প্রদায়, উভয়ই প্রায় ৬ শতাংশ করে।

জাতীয় সরকারের দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ব্যবহার করা হয় আমহারিক। এই ভাষাটিই কেন্দ্রীয় প্রশাসন ও আঞ্চলিক সরকারগুলোর মধ্যে যোগাযোগের সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। ফেডারেল কাঠামোর বিভিন্ন অংশকে রাজধানীর সঙ্গে যুক্ত রাখতেও এই ভাষাটি ব্যবহার করা হয়। দেশটির সীমান্তবর্তী অনেক অঞ্চলের জনগণের জাতিগত ও ভাষাগত সম্পর্ক রয়েছে পার্শ্ববর্তী দেশের মানুষের সঙ্গে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সোমালি জাতিগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত মানুষেরা বসবাস করে পূর্বাঞ্চলীয় সোমালি প্রশাসনিক অঞ্চলে। ভাষা ও সংস্কৃতির দিক থেকে দেশের উত্তরাঞ্চলের তিগ্রাই জনগোষ্ঠীর তুলনায় সোমালিয়ার বাসিন্দাদের সঙ্গেই নিজেদের

বেশি মিল খুঁজে পায় তারা। এমন বৈচিত্র্যপূর্ণ জাতিগত গঠন আর জটিল ভূগোল, এই দুইয়ের সম্মিলিত জটিলতা ইথিওপিয়ার সরকারের জন্য একটি স্থায়ী চ্যালেঞ্জ।



চিত্র: ইথিওপিয়ার প্রশাসনিক অঞ্চলের মানচিত্র

একটি বিশেষ কাহিনি দীর্ঘদিন ধরে ইথিওপিয়ার জাতীয় ঐক্য এবং এর বৈচিত্র্যময় ঐতিহ্যের ভিত্তি হিসেবে বিবেচিত হয়ে আসছে। এই কাহিনির কেন্দ্রে রয়েছে লোহিত সাগরের দুই তীরের মধ্যে গড়ে ওঠা সাংস্কৃতিক বিনিময়। এই বিনিময়ের সাহিত্যিক প্রকাশ ঘটেছে শেবার রানি ও ইসরায়েলের রাজা সলোমনের প্রেমকাহিনির মধ্য দিয়ে। শেবার রানিকে ইথিওপিয়ায় ডাকা হয় 'মাকেদা' নামে। আর তিনিই এই জাতির মাতৃপ্রতিমা, যার মাধ্যমে ইথিওপিয়ার আত্মপরিচয়ের আখ্যান সূচিত হয়।

এই কাহিনির একাধিক রূপ প্রচলিত রয়েছে। কোনো কোনো গল্পে আছে রানির লোমশ পা ও রাজপ্রাসাদের কাঁচের মেঝে নিয়ে রহস্যময় গল্প। এই বিষয়গুলো তার পরিচয় ও শক্তির প্রতীক হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়। তবে আমরা এখানে মূল আখ্যানেই থাকব। চতুর্দশ শতকে রচিত ইথিওপীয় মহাকাব্য কেব্রা নাগাস্তে বর্ণনা করা হয় যে, রাজা সলোমনের প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের টানে রানি মাকেদা জেরুজালেমে যান। রাজা সলোমনও রানির প্রতি গভীর অনুরাগ দেখান। সফরের শেষ রাতে এক চতুর কৌশলে মাকেদাকে নিজের শয্যাসঙ্গিনী করে তোলেন সলোমন। এই মিলনের ফলে জন্ম নেয় এক পুত্র, যার নাম রাখা হয় মেনিলেক। পরবর্তীতে এই মেনিলেকই ইথিওপিয়ার সোলায়মানি রাজবংশের সূচনা করেন। এই বংশের মধ্য দিয়েই ইথিওপিয়ার ইহুদি-খ্রিস্টান ঐতিহ্য গড়ে ওঠে। মেনিলেক কিশোর বয়সে তার পিতা সলোমনের সঙ্গে দেখা করতে জেরুজালেমে যান এবং ফেরার সময় সঙ্গে করে নিয়ে আসেন একটি মহামূল্যবান স্মারক 'আর্ক অব দ্য কভেন্যান্ট'। এই পবিত্র সিন্দুকের মধ্যে রাখা ছিল ঈশ্বরপ্রদত্ত সেই দশটি বিধানফলক, যা মোজেস অর্থাৎ মুসা নবী সিনাই পর্বতে পেয়েছিলেন।

'আর্ক অব দ্য কভেন্যান্ট' সম্পর্কে ইহুদি, খ্রিস্টান এবং ইসলাম এই তিনটি আব্রাহামিক ধর্মের ধর্মগ্রন্থেই উল্লেখ রয়েছে। বাইবেলে বলা হয়েছে, এটি ছিল সোনায় মোড়ানো একটা কাঠের পবিত্র বাক্স। এই বাক্সে রাখা ছিল ঈশ্বরের দেওয়া দশটি বিধানফলক। ঐতিহাসিকভাবে এর কোনো হদিস বা প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে বহু দেশ এবং বহু সংস্কৃতির মানুষ দাবী করে যে সেই আর্ক তাদের কাছে আছে। ইথিওপিয়ার দাবি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটি তাদের রাজবংশ, ধর্মীয় পরিচয় এবং জাতীয় ইতিহাসের সাথে গভীরভাবে জড়িয়ে আছে। যদি কেব্রা নাগাস্তের এই কাহিনি সত্য হয়, তবে সেই পবিত্র সিন্দুকটি এখনো সংরক্ষিত আছে আকসুম শহরের কাছাকাছি 'চার্চ অব আওয়ার লেডি মেরি অব জায়ন' নামক গির্জায়। তবে লোকবিশ্বাস হলো, সাধারণ কেউ সেটাকে দেখার চেষ্টা করলে গির্জার চিরকুমার অর্থোডক্স সন্ন্যাসীরা তাকে হত্যা করতে দ্বিধা করবেন না। ফলে, সিন্দুকটি সত্যিই সেখানে আছে কিনা, তা যাচাই করাটা যথেষ্ট জটিল ও বিপজ্জনক।

সত্যতা যাই হোক না কেন, মেনিলেকের সেই কিংবদন্তি উত্তরাধিকারের দাবি ইথিওপিয়ার ইতিহাসে গভীর প্রভাব ফেলেছে। মেনিলেক থেকে শুরু করে ১৯৭০-এর দশকের হাইলে সেলাসি পর্যন্ত প্রত্যেক সম্রাটই এই দাবিকে নিজেদের

পরিচয়ের অংশ করে নিয়েছিলেন। তাদের বিশ্বাস ছিল, তাদের শিরায় বইছে সেই রাতের স্মৃতি, যা বহু শতাব্দী আগে জেরুজালেমে রচিত হয়েছিল।

সংগঠিত রাষ্ট্র হিসেবে ইথিওপিয়ার ইতিহাসের সূচনা আনুমানিক ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। সে সময় লোহিত সাগরের উপকূল থেকে প্রায় ১৬০ কিলোমিটার ভেতরে দেশটির উত্তরাঞ্চলের উঁচু মালভূমিতে গড়ে ওঠে একটি ছোট্ট নগর-রাষ্ট্র। এই মালভূমি বর্তমানে তিগ্রাই অঞ্চল নামে পরিচিত। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল আকসুম। ধীরে ধীরে এই নগর চারদিকে বিস্তার লাভ করে। খ্রিস্টীয় প্রথম শতক নাগাদ আকসুম হয়ে ওঠে লোহিত সাগর অঞ্চলের প্রধান বাণিজ্য শক্তি। এই অবস্থান বেশ কয়েক শতাব্দী ধরে রাখতেও সক্ষম হয় তারা। আকসুম সাম্রাজ্যের স্বর্ণযুগ ছিল খ্রিস্টীয় ১০০ থেকে ৯৪০ অব্দ পর্যন্ত। এই সময়কালে তাদের কর্তৃত্ব ছড়িয়ে পড়ে দক্ষিণ মিশর পর্যন্ত। এমনকি লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে ইয়েমেন পর্যন্তও তাদের প্রভাব ছিল। তাদের শক্তিশালী নৌবাহিনী এবং সেনাবাহিনী কেবল সাম্রাজ্যের নিরাপত্তাই রক্ষা করত না, সাগরের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যপথগুলোও নিয়ন্ত্রণে রাখত, বিশেষ করে হর্ন অব আফ্রিকা অঞ্চলে।

খ্রিস্টধর্ম ইথিওপিয়ায় প্রবেশ করে চতুর্থ শতকে। অল্প সময়ের মধ্যেই স্থানীয় সংস্কৃতির সঙ্গে গভীরভাবে মিশে যায় নতুন এই ধর্ম। ইথিওপীয় চার্চ ৪৫১ সালে মিশরের কপটিক চার্চের রীতিনীতি গ্রহণ করে এবং রোম ও কনস্টান্টিনোপলের বিশপদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলে। এরপর দীর্ঘকাল পেরিয়ে যায় এই বিচ্ছিন্ন অবস্থায়। অবশেষে বিশ শতকের মাঝামাঝি এসে, যুগপৎ রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ইথিওপীয় চার্চের সঙ্গে আবারও বহির্বিশ্বের খ্রিস্টীয় গির্জাগুলোর সম্পর্ক স্থাপিত হয়।

ইসলামের সঙ্গেও ইথিওপিয়ার সম্পর্ক খুবই পুরোনো। শুরু থেকেই এই সম্পর্ক ছিল সৌহার্দ্যপূর্ণ। এটি হর্ন অব আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের মধ্যে পুরোনো ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনের আরেকটি নিদর্শন। ইসলামের ইতিহাস অনুযায়ী, মক্কার কুরাইশদের নিপীড়ন থেকে বাঁচাতে ৬১৫ খ্রিস্টাব্দে নবী মুহাম্মদ (সা.) তাঁর অনুসারীদের একদলকে ইথিওপিয়ার সম্রাটের দরবারে পাঠান। মুসলিম ইতিহাসে ইথিওপিয়াকে উল্লেখ করা হয় আবিসিনিয়া নামে। তৎকালীন আকসুম সাম্রাজ্যের সেই সম্রাট ছিলেন খ্রিস্টান, যাকে ইসলামের ইতিহাসে 'নাজ্জাশি' নামে স্মরণ করা হয়। সম্রাট নাজ্জাশি তাদের সহানুভূতির সঙ্গে গ্রহণ করেন, নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন, এমনকি কুরআনের আয়াত শুনে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন তিনি। এই ঘটনা

ইসলামী ঐতিহ্যে ব্যাপকভাবে পরিচিত ও শ্রদ্ধেয়। এই ঘটনার মাধ্যমে মুসলিমদের ইথিওপিয়ায় বসবাসের সূচনা হয়। মুসলিমরা প্রথমদিকে বাস করতেন প্রধানত এই সাম্রাজ্যের উত্তর সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে। লোহিত সাগরের তীরবর্তী বাণিজ্যপথের মাধ্যমে ইসলাম পরবর্তীতে ইথিওপিয়ার আরও গভীরে প্রবেশ করে। অভিবাসন, বাণিজ্য ও স্থানীয়দের ধর্মান্তরের মাধ্যমে মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রভাব বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশেষ করে ত্রয়োদশ শতকে দেশের অভ্যন্তরে রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে শুরু করেন মুসলিম নেতারা। ফলে খ্রিস্টান শাসকদের সঙ্গে একাধিক সংঘাতের সূত্রপাত হয়। পঞ্চদশ শতকে উসমানি তুর্কিরা পূর্ব আফ্রিকায় তাদের প্রভাব বিস্তারের অংশ হিসেবে ইথিওপিয়ার অভ্যন্তরে অগ্রসর হয়। তখন খ্রিস্টানদের বেশকিছু ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করে তারা। এই সময়ে ইথিওপীয় রাজারা পর্তুগিজদের কাছ থেকে সমরাস্ত্র ও প্রশিক্ষণ সহায়তা পেয়েছিল। ফলে উসমানিদের রুখে দিতে সক্ষম হয় তারা।

বর্তমান ইথিওপিয়ার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ নাগরিক মুসলিম। তাদের অধিকাংশের বসবাস দেশটির প্রান্তীয় অঞ্চলে, বিশেষ করে পূর্বাঞ্চলের নিম্নভূমিতে। তবে দেশের নানা জায়গায় স্থানীয়ভাবেও মুসলিম জনবসতি রয়েছে। খ্রিস্টান ও মুসলিম এই দুই প্রধান সম্প্রদায়ের সম্পর্ক বেশিরভাগ সময়েই শান্তিপূর্ণ থেকেছে ইথিওপিয়াতে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে মধ্যপ্রাচ্য থেকে আসা উগ্র মতবাদের প্রভাবে ঐতিহ্যবাহী সুফি ইসলাম থেকে সরে গিয়ে কঠোর ধর্মীয় ব্যাখার দিকে ঝুঁকছেন অনেক ইথিওপীয় মুসলিম। এর ফলে কিছু অঞ্চলে তৈরি হয়েছে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা। এর ফলে ইথিওপিয়ার উচ্চভূমির অনেক খ্রিস্টান নাগরিক দেশটিকে দেখে থাকেন 'ইসলামের সমুদ্রে খ্রিস্টধর্মের একটি দ্বীপ' হিসেবে।

আধুনিক ইথিওপিয়ার যাত্রা শুরু হয় ১৮৫৫ সালে। সে বছর সম্রাট দ্বিতীয় টেওড্রোস বিভিন্ন রাজ্যকে বলপ্রয়োগে পুনরায় একীভূত করেন এবং দেশকে আধুনিকতার পথে এগিয়ে নেওয়ার উদ্যোগ নেন। সেনাবাহিনীকে নতুনভাবে সংগঠিত করে আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত করা হয়। ইউরোপ থেকে আসা কারিগররা নতুন প্রযুক্তি নিয়ে এসে প্রাণসঞ্চার করেন বাণিজ্যে। এই সময় দেশটি পরপর দুইটি সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণ প্রতিহত করে। প্রথমে ১৮৭৪–৭৬ সালের মিশর-ইথিওপিয়া যুদ্ধে মিশরীয় সেনারা দুই বার পরাজিত হয়। এরপর আসে ইতালি। ১৮৯৬ সালের আদওয়া যুদ্ধে ইতালির বাহিনী চরমভাবে বিপর্যস্ত হয়, প্রায় ছয় হাজার সৈন্য হারাতে হয় তাদের। এই পরাজয়ের পর ইতালির উপনিবেশবাদী স্বপ্ন

মুখ থুবড়ে পড়ে। তারা ইরিত্রিয়া দখল করে রাখলেও ইথিওপিয়ার প্রতি তাদের আগ্রাসী পরিকল্পনা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

এরপর আসে তুলনামূলক শান্ত একটি সময়। এই সময়ে আদ্দিস আবাবায় রাজধানী স্থানান্তরিত হয় এবং দেশটি ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হয়ে তার বর্তমান সীমানা পায়। বিংশ শতকের গোড়ার দিকে অবকাঠামো নির্মাণের প্রচেষ্টা শুরু হয় ইথিওপিয়াতে। অসংখ্য নদীর ওপর নির্মাণ করা হয় সেতু। রেলপথ তৈরি হয় আদ্দিস আবাবা থেকে শুরু করে লোহিত সাগর উপকূলের ফরাসি উপনিবেশ জিবুতি পর্যন্ত। তবে এগুলো ছিল তুলনামূলক ছোট এবং বিক্ষিপ্ত পদক্ষেপ। দেশের বিশাল জনগোষ্ঠী তখনও ছিল দারিদ্র্যের জাঁতাকলে পিষ্ট। ১৯২০-এর দশকে আদ্দিস আবাবার জনসংখ্যা এক লাখ ছাড়িয়ে যায়। চারপাশের ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক বলয়ের মধ্যে স্বাধীন রাষ্ট্র ইথিওপিয়া হয়ে ওঠে একমাত্র ব্যতিক্রম। তবে ইউরোপীয় শক্তিগুলোর প্রতিযোগিতামূলক চাপ থেকে দেশটি মুক্ত হতে পারেনি। পরবর্তীতে স্নায়ু যুদ্ধের সময় সেই চাপ আরও বিস্তৃত আকার ধারণ করে।

১৯৩০ সালে ইথিওপিয়ার সিংহাসনে বসেন রাস তাফারি মাকোনেন। তার রাজকীয় উপাধি ছিল 'প্রথম হাইলে সেলাসি'। আমহারিক ভাষার হাইলে সেলাসি অর্থ 'ত্রিত্বের মহাশক্তি'। তার নামের সঙ্গে যুক্ত ছিল তিনটি দীর্ঘ উপাধি—'রাজকীয় ইথিওপীয় সেনাবাহিনীর ফিল্ড মার্শাল', 'রাজকীয় ইথিওপীয় বিমান বাহিনীর মার্শাল' এবং 'রাজকীয় ইথিওপীয় নৌবাহিনীর অ্যাডমিরাল'।

হাইলে সেলাসির 'রাস তাফারি' নাম থেকেই পরবর্তীকালে জ্যামাইকায় জন্ম নেয় রাসতাফারিয়ান ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক আন্দোলন। ষোড়শ শতকের শেষভাগ থেকে ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলো আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষকে দাস হিসেবে ধরে নিয়ে আসত। তাদেরকে আটলান্টিক মহাসাগর পাড়ি দিয়ে ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জে আনা হতো, যেখানে জ্যামাইকাও ছিল গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। জ্যামাইকায় দাসদের ব্যবহার করা হতো প্রধানত চিনি, কফি, তামাক ও অন্যান্য বাগানে শ্রম দেওয়ার জন্য। তাদেরকে বাধ্য করা হতো অমানবিক পরিস্থিতিতে কাজ করতে। ষোড়শ শতক থেকে ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত লক্ষাধিক আফ্রিকানকে দাস হিসেবে জ্যামাইকায় আনা হয়। তারা সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল আফ্রিকান বিশ্বাস, লোকসংস্কৃতি, সঙ্গীত আর ধর্মীয় আচার। যদিও ইউরোপীয় উপনিবেশবাদীরা তাদের খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করার চেষ্টা করেছিল, তবুও আফ্রিকান আধ্যাত্মিকতার গভীর ছাপ রয়ে যায় তাদের মধ্যে। ১৮৩৪ সালে ব্রিটিশরা দাসপ্রথা

বিলোপ করলে জ্যামাইকায় মুক্ত কৃষ্ণাঙ্গ জনগোষ্ঠী তৈরি হয়। কিন্তু দারিদ্র্য, বৈষম্য আর শ্বেতাঙ্গ শাসন তখনও চলছিল। এই সময়ে তদের মধ্যে জন্ম নেয় আফ্রিকায় ফিরে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা।

বিংশ শতকের শুরুতে জ্যামাইকান নেতা মার্কাস গার্ভি 'আফ্রিকায় ফিরে চল' আন্দোলনের ডাক দেন। তিনি কৃষ্ণাঙ্গদের বলেছিলেন, আফ্রিকাই তাদের প্রকৃত মাতৃভূমি। গার্ভি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, "আফ্রিকায় এক রাজা অভিষিক্ত হবেন এবং তিনিই হবে মুক্তির প্রতীক।" ইথিওপিয়ায় রাজা হাইলে সেলাসির সম্রাট হিসেবে অভিষেককে গার্ভির ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা হিসেবে দেখেছিল জ্যামাইকানরা। তাদের বিশ্বাস ছিল—হাইলে সেলাসিই বাইবেলে ঘোষিত 'সিংহাসনধারী যিহূদার সিংহ' এবং 'কালো মানুষের মুক্তিদাতা'। রাস্তাফারিয়ানরা সাধারণত হাইলে সেলাসিকে 'জাহ' নামে আহ্বান করে, যা ইহুদি-খ্রিস্টান ঐতিহ্যের ঈশ্বর 'Yah' বা 'Yahweh' এর এক বিকৃত রূপ। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী, ইথিওপিয়ার সম্রাট হাইলে সেলাসিই ইশ্বরের অবতার। তাদের বিশ্বাস আফ্রিকা হলো প্রতিশ্রুত ভূমি 'জায়ন', আর পশ্চিমা শাসন ও নিপীড়ন হলো 'ব্যাবিলন'। তারা প্রাকৃতিক জীবন, প্রাকৃতিক খাদ্যাভ্যাস, ড্রেডলকস চুল, আর গাঁজাকে আধ্যাত্মিক ধ্যানের অংশ হিসেবে গ্রহণ করে। কিংবদন্তি সঙ্গীতশিল্পী বব মার্লে ছিলেন এই আন্দোলনের সবচেয়ে বিখ্যাত কণ্ঠস্বর। তার রেগে সংগীত ও বক্তব্য রাস্তাফারি দর্শনকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেয়।

এতসব আড়ম্বরপূর্ণ উপাধিতে ভারাক্রান্ত হলেও হাইলে সেলাসির রাজনৈতিক চিন্তা ছিল অনেকাংশেই আধুনিক ও দূরদর্শী। শারীরিক উচ্চতায় তিনি ছিলেন মাত্র পাঁচ ফুটের কিছু বেশি, কিন্তু আফ্রিকার ইতিহাসে ও রাজনীতিতে তার অবস্থান ছিল অনেক উঁচুতে। রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে ইথিওপিয়ার ইতিহাস ও ভূগোলকে কাজে লাগিয়ে আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেন তিনি। তিনি দেশে অর্থনৈতিক আধুনিকীকরণ শুরু করেন এবং ঘোষণা দেন যে, বিদেশি কোম্পানিগুলোকে ইথিওপীয় অংশীদারদের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করতে হবে। তার অন্যতম বড় কূটনৈতিক অর্জন ছিল জাতিসংঘের পূর্বসূরি 'লীগ অব নেশনসে' ইথিওপিয়ার অন্তর্ভুক্তি। ওই সময় লীগ অব নেশনসে সদস্যপদ পাওয়ার অন্যতম শর্ত ছিল দাসপ্রথা বিলুপ্ত করতে হবে। কিন্তু ইথিওপিয়ায় তখনও দাসপ্রথা প্রচলিত ছিল। অনুমান করা হয়, ১৯২০ ও ৩০-এর দশকে দেশটিতে ২০ লক্ষেরও বেশি মানুষ দাস হিসেবে জীবন কাটাচ্ছিল।

কিন্তু স্বাধীনতা এবং অর্থৈনৈতিক সাফল্যই এক নতুন সংকট ডেকে আনে। মুসোলিনির নেতৃত্বে ফ্যাসিবাদী ইতালি তখন আফ্রিকায় উপনিবেশ সম্প্রসারণে উদগ্রীব। তাদের নজর পড়ে হর্ন অব আফ্রিকার একমাত্র স্বাধীন রাষ্ট্র ইথিওপিয়ার ওপর। দেশটিতে দাসপ্রথা চালু আছে—এই যুক্তিকে প্রচারণার হাতিয়ার বানিয়ে যুদ্ধকে বৈধতা দেওয়ার চেষ্টা করে ইতালি। ইতালির প্রোপাগান্ডা মেশিন বিশ্ববাসীর কাছে ইথিওপিয়াকে তুলে ধরতে থাকে 'বর্বর', 'প্রাচীন' ও 'অসভ্য' একটি দেশ হিসেবে। হর্ন অব আফ্রিকা অঞ্চলে ইথিওপিয়াই ছিল একমাত্র জায়গা যেখানে ব্রিটিশ কিংবা ফরাসিদের সঙ্গে সরাসরি সংঘর্ষে না গিয়ে আগ্রাসন চালানো সম্ভব। ১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাসে ইতালির সেনাবাহিনী ইথিওপিয়ায় আক্রমণ চালায়। ১৯৩৬ সালের মে মাসের মধ্যেই রাজধানী আদ্দিস আবাবা দখল করে ফেলে তারা। সম্রাট হাইলে সেলাসি পালিয়ে লন্ডনে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। যুদ্ধক্ষেত্রে ইতালীয় সেনারা বিষাক্ত গ্যাসের মতো নিষিদ্ধ রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করে। মুসোলিনির জেনারেলরা ইথিওপীয় প্রতিরোধযোদ্ধাদের 'অসভ্য' বলে অবজ্ঞা করত, অথচ বিষাক্ত গ্যাস ব্যবহার করছিল ইতালি নিজেই, ইথিওপিয়া নয়। ইতালির আগ্রাসনের পর ১৯৩৬ সালে লীগ অব নেশনসে এক ভাষণ দেন হাইলে সেলাসি, যা বিশ্ব রাজনীতিতে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত হিসেবে বিবেচিত হয়। তার সেই বিখ্যাত বাণী, "আজ ইথিওপিয়া, কাল আপনারা" ছিল আগত বিশ্বযুদ্ধের অশনিসংকেত।

তবে যুদ্ধের ময়দানে পরাজয়ের পরও ইথিওপীয়দের প্রতিরোধ থেমে যায়নি। দীর্ঘ সময় ধরে স্থানীয় যোদ্ধারা ছায়াযুদ্ধ চালিয়ে যেতে থাকেন। অবশেষে ১৯৪১ সালে এই স্থানীয়দের সহায়তায় ব্রিটিশ সেনারা ইতালির বাহিনীকে পরাজিত করে হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়। সম্রাট হাইলে সেলাসি ফিরে পান তার সিংহাসন। এরপর আন্তর্জাতিক কূটনীতির ময়দানে শুরু হয় সেলাসির নতুন লড়াই। ১৯৪৫ সালে সেলাসি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্র্যাঙ্কলিন ডি রুজভেল্টকে বোঝাতে সক্ষম হন যে, সদ্য মুক্ত হওয়া ইরিত্রিয়া স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকতে পারবে না। তাকে বরং আদ্দিস আবাবার অধীনে ফিরিয়ে দেওয়া উচিত। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল সমুদ্রপথে ইথিওপিয়ার প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সময় লাগলেও ১৯৫২ সালে জাতিসংঘের অনুমোদনের মাধ্যমে ইরিত্রিয়াকে ইথিওপিয়ার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। কিন্তু একবার তা কার্যকর হতেই যুক্তরাষ্ট্র সেখানে গিয়ে ঘাঁটি গাঁড়ে। বর্তমান ইরিত্রিয়ার রাজধানী আসমারায় একটি গুপ্তচর কেন্দ্র এবং উপকূলবর্তী অঞ্চলে একটি নৌঘাঁটি স্থাপনের সুযোগ পায় মার্কিনিরা। স্নায়ু যুদ্ধের সময় আসমারার গুপ্তচর কেন্দ্রটি ছিল NSA এর প্রধান সিগন্যাল ইন্টেলিজেন্স ঘাঁটি। এই

ঘাঁটি থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং মধ্যপ্রাচ্যভিত্তিক কার্যকলাপ নজরে রাখা হতো। এই সময় থেকেই আদ্দিস আবাবা হয়ে ওঠে ওয়াশিংটনের আঞ্চলিক মিত্র। আফ্রিকায় সোভিয়েত প্রভাব ঠেকাতে ইথিওপিয়া হয়ে ওঠে অ্যামেরিকার গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। ইথিওপিয়ার অবকাঠামো ও সামরিক খাতে ব্যাপক বিনিয়োগ করে অ্যামেরিকা।

পুরো আফ্রিকা মহাদেশে ইথিওপিয়াই ছিল একমাত্র দেশ, যে দেশটি কোনো সময়েই ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে যায়নি। এই ঐতিহাসিক কারণে আফ্রিকান রাজনীতিতে সম্রাট হাইলে সেলাসি হয়ে ওঠেন এক সম্মানিত নেতৃত্বের প্রতীক। ১৯৬৩ সালে Organization of African Unity বা 'আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা' গঠনের অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি। এই সংস্থার সদর দপ্তরও স্থাপন করা হয় আদ্দিস আবাবায়। এই সংস্থাটি ২০০২ সালে আফ্রিকান ইউনিয়নে রূপান্তরিত হলেও সদর দপ্তর থেকে যায় ইথিওপিয়ার রাজধানীতেই। তবে এই গৌরবগাঁথার বিপরীতে বাস্তবতা ছিল অনেকটাই ভিন্ন। ইথিওপিয়া তখনও দারিদ্র্যপীড়িত, অবকাঠামোগতভাবে অনুন্নত এবং বিভাজিত এক রাষ্ট্র।

১৯৬০ সালে ইথিওপিয়াতে একটা অভ্যুত্থানের চেষ্টা করেছিল একটি গোষ্ঠী। তবে প্রাণে বেঁচে যান হাইলে সেলাসি। কিন্তু তার স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ও দেশের জাতিগত বিভাজন আরও গভীর হয়ে ওঠে এরপর। একই বছরে যুক্তরাজ্যের কাছ থেকে সোমালিয়ার স্বাধীনতা লাভ ইথিওপিয়ার সোমালি অধ্যুষিত ওগাদেন অঞ্চলে বিদ্রোহ উসকে দেয়। তাদের সমর্থনে সোমালিয়া এগিয়ে আসলেও ইথিওপীয় সেনারা দ্রুত উভয় পক্ষকেই পরাজিত করে। কিন্তু এর ফলে সোমালিয়া গিয়ে আশ্রয় নেয় সোভিয়েত শিবিরে। আর এর ফল হিসেবে ইথিওপিয়া ও সোমালিয়া হয়ে ওঠে স্নায়ু যুদ্ধের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পরাশক্তির কৌশলগত মহড়ার অংশ। একই দশকে ইরিত্রিয়াতেও শুরু হয় বিদ্রোহ। স্কুলে আমহারিক ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন থেকে যে প্রতিবাদ শুরু হয়েছিল, তা অচিরেই পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয়।

অবশেষে ১৯৭৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এক সেনা অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে সমাপ্তি ঘটে হাইলে সেলাসির দীর্ঘ শাসনের। সেনা, পুলিশ ও আঞ্চলিক বাহিনীর একটি 'সমন্বিত কমিটি' এই অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল। পরে এই কমিটি 'দার্গ' নামে পরিচিত হয়। দার্গ শব্দটির অর্থ 'কমিটি'। মেজর মেঙ্গিস্তু হাইলে মারিয়ামের নেতৃত্বে বিদ্রোহীরা প্রথমেই পৌঁছায় সম্রাটের প্রাসাদে। সেখানে তারা ৮২ বছর বয়সী সম্রাট

সেলাসিকে দেখতে পায় হতবিহ্বল, বিমূঢ় অবস্থায়। মনে হচ্ছিল, পরিস্থিতির গুরুত্ব যেন বুঝতেই পারছিলেন না তিনি। সৈন্যদের উপর চিৎকার করে 'ঈশ্বর নির্বাচিত' সম্রাটকে অসম্মান করার অভিযোগ আনেন তিনি। কিন্তু সৈন্যরা তাকে টেনে হিঁচড়ে নামিয়ে একটি ভক্সওয়াগন গাড়ির পেছনের সিটে বসিয়ে প্রাসাদ থেকে বের করে নিয়ে যায়। একসময় যিনি ছিলেন 'মহামহিম সম্রাট', 'যিহুদা গোত্রের বিজয়ী সিংহ', সেই তাকে দেখে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা জনতা চিৎকার করে বলছিল, "চোর! চোর!"

এক বছর পর গৃহবন্দি অবস্থায় হাইলে সেলাসির মৃত্যু ঘটে। সরকারি ভাষ্য অনুযায়ী, তার মৃত্যুর কারণ প্রস্টেট অপারেশনের জটিলতায় সৃষ্ট শ্বাসযন্ত্রের ব্যর্থতা। কিন্তু জনমনে বিশ্বাসযোগ্য ধরা হয়েছিল শুধু ব্যাখ্যার প্রথম অংশটুকু, অর্থাৎ মৃত্যু। বহু বছর ধরে গুজব ছিল, সেনাবাহিনীর একজন অফিসার বালিশ চেপে শ্বাসরোধ করে তাকে হত্যা করেছে। অনেক পরে ২০০৬ সালে যখন দার্গ সরকারের গণহত্যার বিচারে সাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করা হয়, তখন প্রমাণ করা হয় যে সম্রাটকে আসলেই তার শয্যায় শ্বাসরোধে হত্যা করা হয়েছিল। ১৯৯১ সালে দার্গের পতনের পর হাইলে সেলাসির মৃতদেহ উদ্ধার করা হয় প্রাসাদের ভেতর এক শৌচাগারের নিচ থেকে, উল্লম্বভাবে চাপা দেওয়া অবস্থায়! পরে আদ্দিস আবাবার হলি ট্রিনিটি ক্যাথেড্রালে যথাযথভাবে সমাহিত করা হয় তাকে। সেখানে অন্য ইথিওপীয় সম্রাটরাও চিরনিদ্রায় শায়িত।

১৯৭৭ সালে মেঙ্গিস্তু নিজেই নিজেকে পদোন্নতি দিয়ে লেফটেন্যান্ট-কর্নেল পদে উন্নীত করেন। ইথিওপিয়ায় আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করেন মার্কস-লেনিনবাদী শাসনব্যবস্থা। এরপর শুরু হয় অর্থনৈতিক বিপর্যয় আর সন্ত্রাসের এক দীর্ঘ অধ্যায়। স্বৈরশাসনের পুরোনো রীতি মেনে সম্পদ পুনর্বণ্টনের নামে রাষ্ট্রীয় সম্পদ নিজেদের দখলে নেন মেঙ্গিস্তু। রাষ্ট্রীয় মালিকানার নামে সেনা কর্মকর্তা ও পার্টি লিডাররা সম্পত্তি লোপাট করতে থাকে। মেঙ্গিস্তুর ১৭ বছরের শাসনকাল পরিচিত হয় 'রেড টেরর' নামে। এই সময় হত্যা করা হয়েছিল প্রায় ১ লাখ মানুষকে। আরও হাজার হাজার মানুষ নিখোঁজ হন, কিংবা কারাবন্দি অবস্থায় শারীরিক-মানসিক নির্যাতনের শিকার হন ওই সময়। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও ইথিওপিয়া নতুন মেরুতে গিয়ে দাঁড়ায়। মেঙ্গিস্তু যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে মিত্র হন সোভিয়েত ইউনিয়নের। মস্কোও এসময় বিপুল পরিমাণে অস্ত্র, অর্থ ও সামরিক পরামর্শক পাঠায় ইথিওপিয়াতে। ১৯৭৭-৭৮ সালের সোমালিয়া-ইথিওপিয়া যুদ্ধেও ইথিওপিয়াকে

সহযোগিতা করে মস্কো। মস্কো তখন তার আগের মিত্র মোগাদিশুকে ছেড়ে দেয়। এমনকি মস্কোর নির্দেশে কিউবা থেকে হাজার হাজার সৈন্য এসে ইথিওপিয়ায় অবস্থান নিয়েছিল তখন। ফলে ইথিওপিয়া আবারও সোমালিয়াকে পরাস্ত করে।

মার্কসবাদী অর্থনীতি বাস্তবায়নের নামে দেশে যা কিছু উৎপাদিত হতো তার সবকিছুই রাষ্ট্রীয়করণ করে দার্গ সরকার। স্বনির্ভর কৃষকদের বাধ্য করা হয় অতিরিক্ত ফসল উৎপাদনে। সেই ফসল বাজারমূল্যের চেয়ে কম দামে সেনাবাহিনীর কাছে বিক্রি করতে হতো কৃষকদের। এতে কৃষকদের কোনোই লাভই থাকত না। ফলে নীতিটি সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। এরপর ১৯৮০-এর দশকের গোড়ার দিকে দেশটির নিম্নভূমিতে বৃষ্টিপাত একেবারেই বন্ধ হয়ে যায়। দেখা দেয় ভয়াবহ খরা। আর এরপর খাদ্যের অভাবে শুরু হয় দুর্ভিক্ষ। বিংশ শতকের অন্যতম ভয়াবহ এই দুর্ভিক্ষে প্রাণ হারায় প্রায় দশ লাখ মানুষ। একই সময়ে ইরিত্রিয়ার স্বাধীনতাকামী বাহিনী ইথিওপীয় সেনাদের বিরুদ্ধে ক্রমেই শক্ত অবস্থান তৈরি করে, আর সারাদেশে বাড়তে থাকে অসন্তোষ।

১৯৮০-এর দশকের শেষদিকে দার্গ সরকারের চারপাশের দেয়াল ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে আসতে থাকে। ইরিত্রিয়ার যোদ্ধারা বারবার ইথিওপীয় সেনাদের পরাজিত করে এবং টাইগ্রে অঞ্চলের মিলিশিয়াদের সঙ্গে জোট গড়ে। এই মিলিশিয়ারা আদ্দিস আবাবা থেকে স্বায়ত্তশাসন চাইছিল। এই সময় সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্ষমতায় আসেন মিখাইল গর্বাচেভ। সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক অবস্থা তখন ভালো না। তাই উল্লেখযোগ্যভাবে কমিয়ে দেওয়া হয় সামরিক সহায়তা। ওদিকে দেশে ফিরে যেতে শুরু করে কিউবান সেনারা। গর্বাচেভ নিজের গ্লাসনস্ত ও পেরেস্ত্রইকা ধারণা মেঙ্গিস্তুকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু খোলামেলা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ধারণা মেঙ্গিস্তুর কাছে রুশ ভাষার মতোই অপরিচিত রয়ে যায়। ফলে তিনি গর্বাচেভের পরামর্শ উপেক্ষা করেন। আসলে স্নায়ু যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর নির্ভরশীল স্বৈরশাসকদের খেলার ইতি ইতি ঘটতে শুরু করেছিল। শেষ পর্যন্ত যতটুকু রাষ্ট্রীয় সম্পদ লুটে নিতে পেরেছিলেন তা নিয়ে ১৯৯১ সালের মে মাসে জিম্বাবুয়েতে পালিয়ে যান মেঙ্গিস্তু।

ইথিওপিয়ার পরবর্তী সরকার গঠিত হয় তিগ্রাই জাতিগোষ্ঠীর নেতা মেলেস জেনাওয়ির নেতৃত্বে। ফলে দীর্ঘদিন ধরে রাষ্ট্রক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকা আমহারা জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে উদ্বেগ ছড়িয়ে পড়ে। জেনাওয়ির অধীনে সংবিধান নতুনভাবে

রচিত হয়, ইথিওপিয়াকে ঘোষণা করা হয় এক ধরনের ফেডারেশন হিসেবে। প্রশাসনিক ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকরণ করা হয় জাতিগত ভিত্তিতে গঠিত আঞ্চলিক রাজ্যগুলোতে। এই সংবিধান অনুযায়ী অঞ্চলগুলোকে স্বাধীনতা চাওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। তবে বাস্তবে কেন্দ্রীয় সরকার তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের ভার হাতছাড়া করতে একদমই রাজি ছিল না। এই নীতি বাস্তবায়নের ফলে ১৯৯৩ সালে ইরিত্রিয়াকে পৃথক রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। একটি কলমের আঁচড়ে ইথিওপিয়া হারায় লোহিত সাগরের পুরো উপকূলরেখা এবং হয়ে ওঠে বিশ্বের সবচেয়ে জনবহুল স্থলবেষ্টিত দেশ।

তবে এই রাজনৈতিক সংস্কার সত্ত্বেও অভ্যন্তরীণ উত্তেজনা প্রশমিত হয়নি। ইরিত্রিয়ার সঙ্গে আবারও শুরু হয় সংঘর্ষ। ১৯৯৩ সালে ইরিত্রিয়াকে স্বীকৃতি দেওয়ার সময় সীমান্ত সমস্যাগুলো অমীমাংসিত থেকে গিয়েছিল। এই টানাপোড়েন টানাপোড়েন চূড়ান্ত রূপ নেয় ১৯৯৮ সালে বাদমে নামের একটি বিতর্কিত সীমান্তবর্তী গ্রামে সংঘর্ষের মাধ্যমে। দ্রুতই এই সংঘর্ষ পূর্ণমাত্রার যুদ্ধে রূপ নেয়। দুই বছর ধরে চলা রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে নিহত হয় উভয় পক্ষের হাজার হাজার সৈন্য। যুদ্ধ শেষ হয় এমন এক শান্তিচুক্তিতে যেখানে কোনো পক্ষই নতুন ভূমি দখল করতে পারেনি। তবে সেই চুক্তি কখনোই পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় দুই দেশের মাঝে বাফার জোন গঠিত হলেও উত্তেজনা পুরোপুরি প্রশমিত হয়নি। এই সময়েই সোমালিয়ায় চলমান গৃহযুদ্ধের ফলাফল নিজেদের পক্ষে আনার লক্ষ্যে সেখানে সেনা পাঠায় ইথিওপিয়া। ২০০০-এর দশকে দেশটিতে ধারাবাহিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি দেখা গেলেও অভ্যন্তরীণ দমননীতি চলতেই থাকে। বিরোধী দলের কর্মী, সাংবাদিক ও সমালোচকদের বিরুদ্ধে শুরু হয় ব্যাপক ধরপাকড়। অনেকে বছরের পর বছর কাটায় কারাগারে। এসব গ্রেপ্তারের পেছনে নির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ বা সাক্ষ্য-প্রমাণ ছিল না। মূলত সরকারের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করাই ছিল তাদের অপরাধ।

২০১৮ সালে ইথিওপিয়ার রাজনৈতিক অঙ্গনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। দেশের নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় আসেন ৪২ বছর বয়সী প্রাক্তন লেফটেন্যান্ট কর্নেল আবি আহমেদ। তার উত্থান ছিল নানা দিক থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ। আবি আহমেদের পিতা ছিলেন ওরোমো মুসলিম, আর মা ছিলেন আমহারিক খ্রিস্টান। ইথিওপিয়ার সবচেয়ে বড় ও প্রভাবশালী দুইটি জাতিগোষ্ঠী আমহারা ও ওরোমো। দীর্ঘদিন ধরেই বৈরিতা ও বৈষম্যের বিভাজনে আটকে ছিল

এই দুই গোষ্ঠী। ওরোমোরা সংখ্যাগরিষ্ঠ জাতিগোষ্ঠী হলেও ইতিহাসে এই প্রথম তাদের কেউ দেশের সর্বোচ্চ নেতৃত্বে আসেন। এই বাইরেও একাধিক পরিবর্তন আসে দেশটিতে।

ক্ষমতা গ্রহণের প্রথম ছয় মাসের মধ্যেই একটা বড়সর সংস্কার অভিযান শুরু করেন আবি আহমেদ। সাংবাদিক ও বিরোধী নেতাসহ হাজার হাজার রাজনৈতিক বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হয় এই সময়। এরপর তিনি একটি লিঙ্গ-সমতাভিত্তিক মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এই পদক্ষেপ ছিল ইথিওপিয়ার ইতিহাসে নজিরবিহীন। আগের মন্ত্রিসভায় নারী ছিলেন মাত্র ৪ জন, বাকি ২৪ জনই ছিলেন পুরুষ। কিন্তু আবি আহমেদের নতুন মন্ত্রিসভায় ২০ জন সদস্যের মধ্যে ১০ জনই ছিলেন নারী। এছাড়া সোমালি অঞ্চলের সশস্ত্র বিদ্রোহী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে একটি ঐতিহাসিক শান্তিচুক্তিতে উপনীত হন তিনি। এরপর তিনি এক কঠিন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নেন। জাতিগত ভিত্তিতে গঠিত জাতীয় জোট সরকার ভেঙে অধিকাংশ দলকে একীভূত করে একটি জাতীয় পার্টিতে রূপ দেন। কিন্তু এই পদক্ষেপ এক নতুন সংকট ডেকে আনে। তিগ্রাই অঞ্চলের অভিজাতদের অধিকাংশই এতে যোগ দিতে অস্বীকৃতি জানায়। এই দ্বন্দ্বই ২০২০ সালে দেশকে ঠেলে দেয় এক ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের দিকে। দুই বছরব্যাপী চলমান এই গৃহযুদ্ধে প্রাণ হারায় দুই থেকে ছয় লাখ মানুষ।

তবে সবচেয়ে চমকপ্রদ পরিবর্তনটি এত দ্রুত এসেছিল যে গোটা জাতি হতবাক হয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে আবি আহমেদ ঘোষণা করেন, ২০০০ সালের যে চুক্তি দিয়ে ইরিত্রিয়ার সঙ্গে দুই বছরের যুদ্ধের অবসান হয়েছিল, ইথিওপিয়া এবার সেটি মেনে চলবে। আবি নিজেও এই যুদ্ধে সৈনিক হিসেবে অংশ নিয়েছিলেন। তার ঠিক এক মাস পর আবি হাজির হন ইরিত্রিয়ার রাজধানী আসমারায়। সেখানে বিমানবন্দরের রানওয়েতে তিনি আলিঙ্গন করেন প্রেসিডেন্ট ইসাইয়াস আফওয়ারকিকে। এরপর স্বাক্ষরিত হয় একটি শান্তিচুক্তি, যার মাধ্যমে দুই দশকের যুদ্ধাবস্থার আনুষ্ঠানিকভাবে ইতি টানা হয়। এই চুক্তিতে বাণিজ্য ও কূটনীতিতে নতুন এক শান্তি ও সহযোগিতার যুগের ঘোষণা দেওয়া হয়। এই প্রচেষ্টার স্বীকৃতিস্বরূপ প্রথম ইথিওপীয় হিসেবে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হন আবি। তবে বাস্তব পরিস্থিতি বেশ জটিল। দুই দেশের সম্পর্কের উষ্ণতা এখনও পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। কিন্তু চেষ্টা এখনও চলমান রয়েছে।

তবে আসল চ্যালেঞ্জ ছিল দেশের অভ্যন্তরে শান্তি প্রতিষ্ঠা। কারণ এখানে শত্রুর সংখ্যা ছিল অনেক। ক্ষমতাচ্যুত রাজনীতিবিদরা ছিল নতুন সরকারের ওপর ক্ষুব্ধ। আবার সরকারের মধ্যে থাকা অনেকেই রাজনীতির মাধ্যমে ব্যক্তিগত সম্পদ বাড়াতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। তবে সবচেয়ে বিপজ্জনক ছিল শক্তিশালী জাতিগত জাতীয়তাবাদীরা। আবি আহমেদের বহুত্ববাদী রাষ্ট্র গঠনের প্রয়াসকে নিজেদের কর্তৃত্ব দিয়ে গ্রাস করতে চাইছিল তারা। তার শাসনের প্রথম কয়েক সপ্তাহেই ফেডারেশনের নয়টি আঞ্চলিক রাজ্যের সীমান্তবর্তী এলাকায় জাতিগত সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। কয়েক মাসের মধ্যেই নিহত হয় কয়েক শত মানুষ। আর প্রায় ত্রিশ লাখ মানুষ ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে বাধ্য হয়।

আবিই সেনাবাহিনীর ভেতর থেকে পুরোনো রাজনৈতিক প্রভাবশালী গোষ্ঠীকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। বিশেষ করে তিগ্রাই জাতিগোষ্ঠীর কর্মকর্তাদের ছাঁটাই করা হয়, যারা দীর্ঘদিন ধরে দেশটিকে প্রভাবিত করে আসছিল। সমালোচকেরা বলতে শুরু করলেন, আগের সরকারগুলোর দমনমূলক কর্তৃত্ব ভেঙে ফেলা আসলে পুরোনো ক্ষতগুলোকে উসকে দিচ্ছে এবং ইথিওপিয়ার ভৌগোলিক অখণ্ডতাকে হুমকির মুখে ফেলছে। গণমাধ্যমের ওপর থেকে নিয়ন্ত্রণ শিথিল হতেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও রেডিওতে জাতিগত বিদ্বেষ প্রকাশের ঢল নামে। বহুদিন ধরেই বিশ্লেষকেরা সতর্ক করে আসছিলেন যে, ইথিওপিয়ার ফেডারেশন কাঠামো যেকোনো সময় যুগোস্লাভিয়ার মতো গৃহযুদ্ধ ও রক্তাক্ত বিচ্ছেদের দিকে যেতে পারে। পরে তিগ্রাই অঞ্চলে যুদ্ধ শুরু হলে সেই আশঙ্কা আরও প্রকট হয়ে ওঠে।

আবি এই পরিস্থিতি ঠেকাতে চেষ্টা করেছেন এমন একটি সমস্যার মোকাবিলা করে, যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ইথিওপিয়ার রাজনীতিকে পীড়া দিয়েছে। দেশটির ইতিহাসে ক্ষমতা সবসময় একটি বিশেষ জাতিগোষ্ঠীর হাতে কেন্দ্রীভূত থেকেছে। ফলে একদিকে কেন্দ্রের শক্ত নেতৃত্বকে প্রান্তিকরা বিশ্বাস করে না। আর অন্যদিকে শক্তিশালী অঞ্চলগুলোকে কেন্দ্র ভয় পায়। আবির লক্ষ্য ছিল এই পারস্পরিক অবিশ্বাস দূর করা। আবি তাদের আশ্বস্ত করার চেষ্টা করেছেন যে, তার সংস্কারমূলক নীতির সুফল সবাই পাবে। সবাইকেই রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। ক্ষমতায় আসার এক বছর আগে এক বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, “আমাদের সামনে মাত্র একটি পথ খোলা আছে। আর তা হলো ঐক্যবদ্ধ থাকা... আর অন্য পথটি হলো একে অপরকে হত্যা করা।”

ইথিওপিয়ার বৈচিত্র্যময় অঞ্চলগুলোকে সবসময়ই কিছুটা বলপ্রয়োগ করে নিয়ন্ত্রণে রাখা হয়েছে। আসল চ্যালেঞ্জ হলো জাতিগোষ্ঠীগুলোকে ইথিওপীয় জাতীয়তাবাদের ধারণায় আস্থাশীল করা, যাতে দেশের সেনাবাহিনীতে যোগ দেওয়া মানুষরা সত্যিই দেশকে রক্ষার প্রেরণা পায়। আর এর ফলে যেন সীমান্ত পেরিয়ে আসা শত্রু বাহিনীর প্রতি স্থানীয় জনগণের সমর্থন কমে যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, এই জাতীয়তাবোধ জাগ্রত থাকলে ইথিওপীয় সোমালিরা হয়তো আর সোমালিয়ার পক্ষ নিতে যাবে না।

মানুষ যেন নিজেকে আগে ইথিওপীয় এবং পরে নির্দিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর সদস্য হিসেবে ভাবতে শেখে, সেই পরিবেশ তৈরি করতে রাষ্ট্র 'ইথিওপিয়ানেত' বা ইথিওপীয়ত্ব নামে এক নীতি চালু করেছে। এর মূলকথা হলো—ইথিওপিয়ার সব নাগরিকের মধ্যে একটি সাধারণ জাতীয় পরিচয় রয়েছে। খ্রিস্টান ও মুসলিম ধর্মীয় নেতাদেরও উৎসাহ দেওয়া হয় মানবতার ঐক্য ও ধর্মীয় মূল্যবোধের মিলিত সুরকে জোর দিয়ে তুলে ধরতে। তবে 'ইথিওপিয়ানেত' ধারণা ও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের মধ্যে এক অন্তর্নিহিত টানাপোড়েন রয়েছে। দেশকে জাতিগত অঞ্চলে ভাগ করার ফলে প্রতিটি গোষ্ঠীর মধ্যে অন্যদের প্রতি অবিশ্বাস ও শঙ্কা আরও জোরালো হয়ে ওঠে। আবার, এই বিভাজন না রাখলেও স্বায়ত্তশাসনের জন্য বিদ্রোহ শুরু হয়। দুই পথই শেষ পর্যন্ত রাষ্ট্রকে দুর্বল করে ফেলে। এই জটিল সমীকরণ সামলাতে হলে দরকার অত্যন্ত সূক্ষ্ম ভারসাম্য এবং সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বণ্টন। এই সূক্ষ্ম ভারসাম্য রক্ষা করাটাই এখন আবি সরকারের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।

তবে নানা মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও কিছু ক্ষেত্রে ইথিওপিয়ানেতের অস্তিত্ব দেখা যায়। বিদেশি আগ্রাসনের মুখে একসঙ্গে প্রতিরোধ গড়ে তোলা, গ্র্যান্ড ইথিওপিয়ান রেনেসাঁ বাঁধের মতো প্রকল্প ঘিরে জাতীয় অহংবোধ, কিংবা ক্রীড়াক্ষেত্রে হাইলে জেব্রসেলাসি, তিরুনেশ দিবাবা ও টিকি গেলারার মতো অলিম্পিকে স্বর্ণজয়ী তারকাদের সাফল্য—এসব মুহূর্তেই যেন জাতিগত বিভাজন পেছনে পড়ে গিয়ে ইথিওপীয়ত্বের গর্ব মাথা তোলে। তবে এই গর্বের অনুভূতি চিরস্থায়ী নয়। এর স্থায়িত্ব নির্ভর করে সময় ও প্রেক্ষাপটের ওপর। কখনো কখনো তা খুব সহজেই ভেঙে পড়ে, যেমনটি দেখা যায় ২০২০ সালের ২৯ জুন সন্ধ্যায়।

সেদিন দেশটির অন্যতম জনপ্রিয় ওরোমো গায়ক, ৩৪ বছর বয়সী হাচালু হুন্দেসা আদ্দিস আবাবার এক উপশহরে নিজের গাড়ি থেকে নামছিলেন। হঠাৎ করেই একজন এগিয়ে এসে তার বুকে গুলি চালায়। দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া

হলেও তাকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। এই নির্মম হত্যাকাণ্ড মুহূর্তেই জাতিগত আবেগে আগুন জ্বেলে দেয়। কয়েক দিনের মধ্যেই দেশজুড়ে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়ে। প্রাণ হারায় শত শত মানুষ।

দেশের বৃহত্তম জাতিগোষ্ঠী ওরোমোদের চোখে হাচালু হুন্দেসা ছিলেন সুপারস্টার। ওরোমোদের অনেকেই নিজেদের 'বঞ্চিত সংখ্যাগরিষ্ঠ' বলে উল্লেখ করে থাকেন। ইথিওপিয়ার রাষ্ট্র কাঠামোর ভেতরে তারা সবসময়ই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হয়েছেন বলে তাদের বিশ্বাস। হুন্দেসা ছিলেন ওরেমোদের প্রতীক, যিনি গান গেয়ে, কথা বলে এই দীর্ঘদিনের ক্ষোভ তুলে ধরেছিলেন। আর এই অবস্থানই তাকে অন্য অনেক জাতিগোষ্ঠীর চোখে বিপজ্জনক করে তুলেছিল। এমনকি ওরোমো নেতাদের একটি অংশও তার প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছিল। কারণ নিজের জাতির অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ও নেতাদের ক্ষমতালিপ্সার বিরুদ্ধেও কড়া ভাষায় কথা বলতেন তিনি। গুলির ঘটনার ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই শুরু হয় পারস্পরিক দোষারোপ। কিছু ওরোমো নেতা প্রতিশোধের ডাক দেন। আবার প্রভাবশালী আমহারা গোষ্ঠীর কিছু মানুষ ওরোমোদের ওপর আক্রমণের আহ্বান জানিয়ে উসকানি দিতে শুরু করেন। এর প্রতিক্রিয়ায় সরকার ইন্টারনেট বন্ধ করে দেয় এবং সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিবাদ ও গণ অরাজকতা ঠেকানোর চেষ্টা শুরু করে।

বৃহস্পতিবার জাতীয় টেলিভিশনে সম্প্রচারিত এক রোড শোয়ের মাধ্যমে হুন্দেসার কফিনবাহী গাড়ি রাজধানী থেকে যাত্রা শুরু করে। গন্তব্য ছিল ওরোমিয়া রাজ্যের আমবো শহর। জায়গাটির অবস্থান আদ্দিস আবাবা থেকে প্রায় একশ কিলোমিটার পশ্চিমে। এই শহর তার জন্মস্থান। কিন্তু পথে ওরোমোরা অবরোধ তৈরি করে দাঁড়িয়ে যায়। তাদের দাবি ছিল, হুন্দেসাকে আদ্দিস আবাবাতেই সমাধিস্থ করতে হবে। তারা এই শহরকে নিজেদের রাজধানী বলে মনে করে। শত বছরেরও বেশি সময় ধরে এই প্রশ্নে টানাপোড়েন চলেছে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে সহিংসতার মধ্যে পড়ে গাড়িবহর ফিরে আসতে বাধ্য হয়। অবশেষে হেলিকপ্টারে করে আমবোতে নিয়ে যাওয়া হয় হুন্দেসার মরদেহ। এর মধ্যেই রাজধানী ও আশেপাশের অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে সহিংসতা। এই সময় পর্যন্ত নিরাপত্তা বাহিনীর গুলি ও সহিংস দাঙ্গায় বহু মানুষ নিহত হয়েছিল। কিন্তু এরপর পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ রূপ নেয়।

এই হত্যাকাণ্ডের জের ধরে আমহারা ও ওরোমোদের মধ্যকার জাতিগত উত্তেজনা নতুন করে ঘনীভূত হয়ে ওঠে। ধর্মীয় বিভাজনও তাতে ইন্ধন যোগায়। কারণ আমহারাদের অধিকাংশ খ্রিস্টান, আর ওরোমোদের বড় অংশই মুসলিম। তরুণ ওরোমো পুরুষদের দল হাতে মাশেটি ও ছুরি নিয়ে হামলা চালায় আমহারা এবং ওরোমোর খ্রিস্টান অধ্যুষিত এলাকায়। তারা স্লোগান দিচ্ছিল,"এটা ওরোমোদের ভূমি।" কারও হাতে ছিল স্থানীয় বাসিন্দাদের নাম ও জাতিগত পরিচয়ের তালিকা। এরপর শুরু হয় ছুরিকাঘাত, গণপিটুনি ও শিরশ্ছেদ। ধ্বংস করা হয় অসংখ্য স্থাপনা। সবচেয়ে ভয়াবহ হামলার শিকার হয় ওরোমিয়া অঞ্চলের জাতিগতভাবে মিশ্র শহর শাশামানে। এই শহরে আমহারারা সংখ্যালঘু। এই শহরের অন্যতম জনপ্রিয় রেস্তোরাঁর ব্যবস্থাপক মুনির আহমেদ দাঁড়িয়ে দেখেন, কীভাবে একদল বিক্ষুব্ধ জনতা তার ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানটি আগুনে পুড়িয়ে দেয় কেবল এই কারণে যে সেটি 'ওরোমোদের নয়'। মুনির পরে বলেন, "আমরা কেঁদেছি, ওদের থামানোর জন্য মিনতি করেছি। কিন্তু ওদের চোখে আমরা ছিলাম শত্রু।" এই ঘটনার পর তার কর্মচারীরা শহর ছেড়ে পালিয়ে যায়।

জুলাই মাসের সেই ভয়ঙ্কর দিনগুলো ইথিওপিয়ার ভেতরে লুকিয়ে থাকা অমানবিক নিষ্ঠুরতাই শুধু প্রকাশ করেনি, সেই সঙ্গে সামনে এনেছিল দেশটির সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সংকটগুলোও। দেশটির বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে এখনো অনেকে কেবল নিজেদের জাতিগত শক্তি বাড়ানোর দিকেই মনোযোগী। বৃহত্তম জাতিগোষ্ঠী হওয়া সত্ত্বেও কখনো পূর্ণ ক্ষমতা না পাওয়ার হতাশা বহন করছে ওরোমোরা। আমহারারা মনে রাখছে, ইতিহাসের দীর্ঘ সময় তারাই ক্ষমতায় ছিল। তিগ্রাই ভাবছে, জনসংখ্যার মাত্র ৬ শতাংশ হওয়া সত্ত্বেও সাম্প্রতিক অতীতে যে আধিপত্য তারা ভোগ করেছিল, সেটি কি ফিরে পাওয়া সম্ভব? অন্যদিকে গুরাগে, আফার ও সিদামাসহ অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠী শঙ্কিত হয়ে পড়েছে। তারা ভয় পাচ্ছে যে, বৃহৎ গোষ্ঠীগুলোর আধিপত্যে তাদের অস্তিত্ব কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও প্রবৃদ্ধির জন্য একটি নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করতে হলে প্রথম শর্ত হলো দেশের অভ্যন্তরীণ শান্তি বজায় রাখা এবং বাইরের সীমান্ত সুরক্ষিত রাখা। এটাই ইথিওপিয়ার প্রধান চ্যালেঞ্জ। তবে ইথিওপিয়ার সবচেয়ে জটিল ভৌগোলিক সংকট হলো সমুদ্রপথে প্রবেশাধিকার না থাকা। ১৯৯৩ সালের পর থেকে প্রতিটি ইথিওপীয় নেতার কাছেই এটি হয়ে উঠেছে সবচেয়ে গুরুতর মাথাব্যথা। প্রাচীন আকসুম সাম্রাজ্যের মতো সমুদ্র উপকূল দখলের কোনো

পরিকল্পনা আধুনিক ইথিওপিয়ার নেই। কিন্তু টিকে থাকতে ও সমৃদ্ধ হতে হলে নির্ভরযোগ্য বাণিজ্যপথ নিশ্চিত করা তাদের জন্য অপরিহার্য। কারণ ইথিওপিয়ার আমদানি ও রপ্তানির অধিকাংশই করতে হয় প্রতিবেশী দেশগুলো অতিক্রম করে।

আফ্রিকার বুকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বাণিজ্যপথ নিঃসন্দেহে লোহিত সাগর। এই সাগরের দুই তীরে আছে দশটি দেশের উপকূল। এই সাগরের মুখে অবস্থিত সংকীর্ণ বাবেল মান্দেব প্রণালি দীর্ঘদিন ধরেই একটি কৌশলগত সমুদ্রদ্বার। ইথিওপিয়ার আমদানি-রপ্তানির প্রায় ৯০ শতাংশই সম্পন্ন হয় সমুদ্রপথে। আর রপ্তানিপণ্যের প্রায় পুরো অংশই নির্ভর করে লোহিত সাগর উপকূলে অবস্থিত জিবুতির গভীর সমুদ্রবন্দরের ওপর। কিন্তু একটি মাত্র করিডোরের ওপরে অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতা যে কী ভয়াবহ জটিলতা তৈরি করতে পারে, তার দৃষ্টান্ত মেলে ২০১৯ সালে। সে বছর বিক্ষোভকারীরা জিবুতি-ইথিওপিয়া মহাসড়ক অবরোধ করলে ইথিওপিয়ায় তীব্র জ্বালানি সংকট দেখা দেয়। কৌশলগতভাবে দেশটি যে কতখানি নাজুক অবস্থানে আছে, তা হঠাৎ করেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সেই অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিয়েই আদ্দিস আবাবা পরবর্তী বছরগুলোতে একাধিক বিকল্প রুট ও বন্দর সংযুক্তির পরিকল্পনায় নামে। এই দুর্বলতা সামাল দিতে ইথিওপিয়া জিবুতি বন্দরের অংশীদার হওয়ার চেষ্টা করেছে, সোমালিয়ার বিচ্ছিন্ন অঞ্চল সোমালিল্যান্ডের বেরবেরা বন্দরে ১৯ শতাংশ শেয়ার অর্জন করেছে, পাশাপাশি তারা পোর্ট সুদান ও কেনিয়ার লামু বন্দরে বিনিয়োগ করেছে। একই সঙ্গে ইরিত্রিয়ার বন্দরগুলোর সঙ্গে সংযোগকারী সড়কও পুনরায় চালু করেছে।

পুরো হর্ন অব আফ্রিকা অঞ্চল এখন এক ভূরাজনৈতিক প্রতিযোগিতার ময়দানে পরিণত হয়েছে। ফলে, চাইলেও পুরোপুরি নিজেদের পছন্দমতো কৌশলগত সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হচ্ছে না ইথিওপিয়ার পক্ষে। তাদেরকে অনেকটাই নির্ভর করতে হচ্ছে বৃহৎ শক্তিগুলোর ইচ্ছা-অনিচ্ছার ওপর।

বর্তমানে এই অঞ্চলে সবচেয়ে বড় খেলোয়াড় চীন। ইথিওপিয়ার প্রায় ৩৩ শতাংশ আমদানি এবং ৮ শতাংশ রপ্তানি চীনের সঙ্গে যুক্ত। পাশাপাশি চীন এই দেশটিতে বড় বড় অবকাঠামোগত প্রকল্পেও অর্থায়ন করছে। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প হলো ৭২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ বিদ্যুৎচালিত রেললাইন, যা জিবুতি বন্দরকে সরাসরি আদ্দিস আবাবার সঙ্গে যুক্ত করেছে। এই রুটটি পুরোনো শতবর্ষী

রেলপথের স্থান দখল করেছে, যে রেলপথটি বহুদিন ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল।

চীন যখন ২০১৬ সালে জিবুতিতে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছিল, তখন তা বিশ্বজুড়ে নজর কাড়ে। কিন্তু লোহিত সাগরের উপকূল দখলের প্রতিযোগিতায় চীন একা নয়। যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, ফ্রান্স ও ইতালির মতো শক্তিশালী দেশগুলোও এখানে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করেছে। পাশাপাশি রাশিয়া, কাতার, সংযুক্ত আরব আমিরাত ও তুরস্ক বিভিন্ন বন্দর প্রকল্পে বিনিয়োগ করেছে বা আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

২০১৫ সালে ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধে সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত জড়িয়ে পড়ার পর ইরিত্রিয়ার আসাব বন্দরের একটি অংশ ভাড়া নেয় আরব আমিরাত। তারা সেটিকে একটি বিমানঘাঁটিতে পরিণত করে এবং সেখান থেকে লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে ইয়েমেনে হামলা পরিচালনা করতে থাকে। এই তৎপরতা শুধু সামরিক ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নেই। আসাব থেকে ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবা পর্যন্ত একটি পাইপলাইন তৈরি করেছে আরব আমিরাত। এই প্রকল্পে আমিরাতের উদ্দেশ্য ছিল দ্বিমুখী: একদিকে হর্ন অব আফ্রিকায় রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার, অন্যদিকে আফ্রিকার ক্রমবর্ধমান ভোক্তা বাজারে নিজেদের বাণিজ্যিক উপস্থিতি দৃঢ় করা। তারা সেখানে তাদের জ্বালানি, প্লাস্টিকজাত পণ্য ও প্রাণিজ পণ্য রপ্তানি করতে চায়। তবে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর কাছে লোহিত সাগর ও আফ্রিকার হর্ন কেবল অর্থনৈতিক ক্ষেত্র নয়, বরং আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার এক সম্প্রসারিত মঞ্চ। দূরের দ্বন্দ্ব ও প্রতিযোগিতাগুলো এখানে এসে আঞ্চলিক দ্বন্দ্বের সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

২০১৭ সালে সৌদি আরব ও আরব আমিরাত একসঙ্গে কাতারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। তাদের অভিযোগ ছিল, কাতার সন্ত্রাসবাদকে সমর্থন দিচ্ছে এবং আঞ্চলিক অস্থিতিশীলতা তৈরি করছে। এর জবাবে কাতারের পক্ষে দাঁড়ায় সৌদি আরব ও আরব আমিরাতের প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ তুরস্ক। ফলে এই বিরোধ লোহিত সাগরের ওপারেও ছড়িয়ে পড়ে। এতে জড়িয়ে যায় তুরস্ক ও মিশরের মধ্যকার তিক্ত দ্বন্দ্ব। প্রেসিডেন্ট এরদোয়ানের সরকারের মধ্যে থাকা কট্টরপন্থীদের অনেকেই বিশ্বাস করেন, ২০১৩ সালে মিশরে মুসলিম ব্রাদারহুডের প্রেসিডেন্ট মুরসিকে ক্ষমতাচ্যুত করার অভ্যুত্থানে আরব আমিরাত অর্থায়ন করেছিল। একইভাবে ২০১৬ সালে এরদোয়ানকে উৎখাতের চেষ্টা করা অভ্যুত্থানেও আরব আমিরাতের হাত ছিল বলে তাদের ধারণা।

সোমালিয়ার রাজধানী মোগাদিশুর সরকারের সঙ্গে প্রথমে আরব আমিরাতের সম্পর্ক ভালো ছিল। কিন্তু তারা যখন মনে করল যে মোগাদিশু সরকার কাতার ও তুরস্কের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে, তখন আরব আমিরাত তাদের অর্থায়ন সরিয়ে দেয় সোমালিল্যান্ড ও পুন্টল্যান্ডের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে। সেখানে তারা একটি সামরিক ঘাঁটি এবং দুইটি বন্দর নির্মাণ করছে। আফ্রিকার দীর্ঘতম উপকূলরেখা যেহেতু সোমালিয়ার, অন্য দেশগুলোও দ্রুত বুঝতে পারে যে এখানে উপস্থিতি রাখা কৌশলগত সুবিধা এনে দেবে। উপসাগরীয় দেশগুলো আগ্রহ দেখানোর বহু বছর আগে থেকেই তুরস্ক সোমালিয়ায় বিনিয়োগ শুরু করেছিল। এখন তারা সোমালি সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন সবগুলো প্রধান সমুদ্র ও বিমানবন্দরে প্রভাব বিস্তার করেছে। মোগাদিশুতে একটি বিশাল সামরিক ঘাঁটিও স্থাপন করেছে তারা। আর এই ঘাঁটিকে ঘিরেই আরব দেশগুলোর মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে, বিশেষত সৌদি আরব ও আমিরাতের মধ্যে। তাদের সন্দেহ, তুরস্ক হয়তো প্রাক্তন উসমানি সাম্রাজ্যের ভূখণ্ডে পুনরায় প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করছে। তবে আঙ্কারা এই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছে। তাদের ভাষ্য অনুযায়ী, তুরস্কের পররাষ্ট্রনীতি হলো 'উদ্যোগী ও মানবিক'। কিন্তু আরব দেশগুলো এই নীতিকে মানবিক নয়, বরং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ও প্রভাববিস্তারের কৌশল হিসেবেই দেখছে। তুরস্ক ও আরব দেশগুলোর মধ্যে উত্তেজনা বেড়ে গেলে তার প্রভাব হর্ন অব আফ্রিকা অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়তে পারে।

ভৌগোলিকভাবে ইথিওপিয়াও এই কাতার-তুরস্ক বনাম সৌদি-আমিরাত দ্বন্দ্বের অংশ। তবে দেশটি মূলত নিরপেক্ষ থাকার চেষ্টা করেছে। দেশটি যেমন কাতার-তুরস্ক জোটের সঙ্গেও সম্পর্ক রাখছে, তেমনি কাজ করছে সৌদি-আমিরাত ব্লকের সঙ্গেও। তারা সরাসরি কোনো বলয়ের অনুগত হয়ে পড়তে চায় না, বরং সকল পক্ষের সঙ্গে কৌশলগত ভারসাম্য বজায় রেখে নিজস্ব ভূরাজনৈতিক স্বার্থ রক্ষা করতে চায়।

ইথিওপিয়ার জ্বালানি, পর্যটন ও উৎপাদন খাতে ব্যাপকভাবে বিনিয়োগ করেছে সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত। এর পাশাপাশি নিজেদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে দেশটির কৃষিখাতেও বিপুল অর্থ ঢেলেছে উপসাগরীয় এই দুইটি দেশ। অন্যদিকে, তারা যখন ইরিত্রিয়ায় তুরস্কের সক্রিয়তা সীমিত করে তোলে, তখন তুরস্ক তার কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি পুনর্বিন্যস্ত করে ইথিওপিয়ায় সক্রিয় হয়। ইথিওপিয়ার নিরপেক্ষ কূটনীতি তুরস্ককে সেখানে উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক

উপস্থিতি বজায় রাখতে সহায়তা করেছে। 'সফট পাওয়ার' কৌশলের অংশ হিসেবে তুরস্ক সেখানে স্কুল ও মসজিদ নির্মাণ করছে এবং পাশাপাশি অর্থনৈতিক প্রভাবও বাড়াচ্ছে। ফলে চীনের পরই ইথিওপিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম বিনিয়োগকারী হয়ে উঠেছে তুরস্ক। এটি আঙ্কারার ২০০৫ সালে শুরু করা 'ওপেন টু আফ্রিকা' নীতির অংশ। এই নীতি মূলত অর্থনৈতিক হলেও ইথিওপিয়ার ক্ষেত্রে এতে বাড়তি কূটনৈতিক সম্ভাবনাও যুক্ত হয়েছে। কারণ ইথিওপিয়া ও তুরস্ক এই দুই দেশেরই মিশরের সঙ্গে সম্পর্ক বেশ খারাপ। এই পারস্পরিক অবিশ্বাস ইথিওপিয়াকে কৌশলগত সুবিধা এনে দেয়, বিশেষত যখন তারা মিশরের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সমর্থন জোগাড় করতে চায়। মিশরের সাথে ইথিওপিয়ার বিরোধের কেন্দ্রবিন্দু হলো গ্র্যান্ড ইথিওপিয়ান রেনেসাঁ ড্যাম (GERD)। এটি আফ্রিকার বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রকল্প, যা ইথিওপিয়ার সবচেয়ে উচ্চাভিলাষী অবকাঠামোগুলোর একটি। এই বাঁধটি গড়ে উঠেছে নীল নদের অন্যতম প্রধান উপনদী ব্লু নাইলের ওপর।

নীল নদকে মিশরের প্রাণ হিসেবে বিবেচনা করা হয়। নীল নদের দুইটি প্রধান উপনদী আছে—ব্লু নাইল ও হোয়াইট নাইল। হোয়াইট নাইলের প্রধান উৎস লেক ভিক্টোরিয়া, যা উগান্ডা, কেনিয়া ও তানজানিয়ার সীমান্তবর্তী এলাকায় অবস্থিত। হোয়াইট নাইল লেক ভিক্টোরিয়ার উত্তরে প্রবাহিত হয়ে উগান্ডার মধ্য দিয়ে উত্তর দিকে সুদানের দিকে যায়। অন্যদিকে ব্লু নাইলের উৎস ইথিওপিয়ার উচ্চভূমি এবং রিফট অঞ্চলে। ব্লু নাইল ইথিওপিয়া থেকে প্রবাহিত হয়ে সুদানের রাজধানী খার্তুমে হোয়াইট নাইলের সঙ্গে মিলিত হয়ে নীল নদ নামে প্রবাহিত হয়। GERD বাঁধ ও জলাধার শুরু হয়েছে সুদান সীমান্ত থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে। ২০২০-এর দশকের কোনো এক সময় জলাধারটি পূর্ণ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তখন এটি ইথিওপিয়ার পার্বত্য অঞ্চলের গভীরে প্রায় ২৫০ কিলোমিটারজুড়ে বিস্তৃত হবে। ২০১১ সালে নির্মাণ শুরু হওয়ার নয় বছর পর ২০২০ সালের গ্রীষ্মে স্যাটেলাইট চিত্রে দেখা যায় যে গ্রেট আফ্রিকান রিফটের ওপর থেকে বাঁধের পেছনের জলাধারে পানির স্তর ধীরে ধীরে বাড়ছে। অথচ এখন পর্যন্ত কায়রো ও আদ্দিস আবাবার মধ্যে পানি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কোনো চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়নি। ইথিওপীয়রা বর্ষাকালের সুযোগ কাজে লাগিয়ে পানি স্তর এতটাই তুলেছিল, যাতে তারা দেশের অধিকাংশ অংশে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য টারবাইনগুলো পরীক্ষামূলকভাবে চালু করতে পারে। এই পদক্ষেপ ঘিরে দুই দেশের দ্বন্দ্ব আরো তীব্র হয়ে ওঠে।

ইথিওপিয়ার কাছে এই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র জাতীয় উন্নয়ন ও বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মিশরের কাছে এই বাঁধ নির্মাণ একটা অস্তিত্বের প্রশ্ন। ভৌগোলিক বাস্তবতায় বন্দি রাষ্ট্রের সবচেয়ে প্রকট উদাহরণগুলোর একটি মিশর। দেশটির জনজীবন, কৃষি, শিল্প এবং ইতিহাস সবকিছুর মূল ভিত্তি হলো নীল নদ। এই নীল নদের প্রবাহ যদি বন্ধ হয়ে যায় বা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়, তবে মিশরের অস্তিত্বই প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়বে। এই নদীর পানির প্রায় ৮৫ শতাংশ আসে ব্লু নাইল থেকে। আর এখন সেই প্রবাহের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে ইথিওপিয়ার হাতে। ইথিওপিয়ার এই নদীর প্রবাহ সম্পূর্ণ বন্ধ করতে চায় না। তবে তাদের হাতে সেটা করার ক্ষমতা চলে এসেছে। এই সম্ভাবনাটাই কায়রোর দুশ্চিন্তার উৎস।

উভয় পক্ষের দুশ্চিন্তা ভিন্ন কারণে হলেও, তাদের আবেগ অমূলক নয়। মিশরের অধিকাংশই এলাকাই মরুভূমি। তাই ১০ কোটি ৪০ লাখ জনসংখ্যার প্রায় ৯৫ শতাংশই নীল নদের তীর ও নদীটির বদ্বীপে বসবাস করে। ফলে নদীর প্রবাহে সামান্য ঘাটতিও বিশাল প্রভাব ফেলতে পারে মিশরের অর্থনীতিতে। কায়রোর আশঙ্কা, যদি মাত্র ১০ শতাংশ পানিও আটকে রাখা হয়, তবে কয়েক বছরের মধ্যে ৫০ লাখ কৃষক কর্মহীন হয়ে পড়বে। মিশরের কৃষি উৎপাদন নেমে আসবে অর্ধেকে। পাশাপাশি ইসলামপন্থী বিদ্রোহ দমনে লড়াইরত দেশটি আরও অস্থিতিশীল হয়ে উঠবে। নীল নদের স্বাভাবিক প্রবাহ থাকা অবস্থাতেও মিশরের উত্তরাঞ্চলের বদ্বীপ ইতোমধ্যেই ভূমধ্যসাগরীয় নোনাজলের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত। পানির প্রবাহ কমে গেলে এই অঞ্চলে নোনাভাব আরও বাড়বে। কৃষি ও পানীয় জলের ওপর মারাত্মক প্রভাব ফেলবে এই বিষয়টি। কায়রো তাদের অবস্থান ব্যাখ্যা করে ঔপনিবেশিক যুগের চুক্তির ভিত্তিতে। বিশেষ করে ১৯২৯ সালের অ্যাংলো-মিশরীয় চুক্তি, যেখানে মিশরের জন্য বার্ষিক পানিবণ্টনের কোটা নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং উজানের কোনো দেশ বাঁধ নির্মাণ করতে চাইলে তাতে মিশরের ভেটো ক্ষমতা রাখা হয়েছিল।

কিন্তু ইথিওপিয়া বিষয়টি এভাবে দেখে না। তাদের যুক্তি হলো, যে চুক্তিতে তারা সই করেনি তা মানতে তারা বাধ্য নয়। বরং উজানের দেশ হওয়ায় ভূগোল এখানে তাদের পক্ষে। এই বাস্তবতা ইথিওপিয়ার কাছে শুধু একটি কৌশলগত সুবিধাই নয়, বরং জাতীয় মর্যাদা ও উন্নয়নের প্রশ্ন। এই জলবিদ্যুৎ প্রকল্প বহু বছর ধরেই ইথিওপিয়ার জাতীয় পরিচয়ের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে।

দীর্ঘদিনের দরিদ্রতা, খরার হুমকি এবং বিদ্যুৎ সংকট কাটিয়ে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এটি তাদের অন্যতম প্রধান উদ্যোগ। বাঁধটি চালু হলে এত বেশি বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে যে ইথিওপিয়া উদ্বৃত্ত বিদ্যুৎ সুদানেও রপ্তানি করতে পারবে। আদ্দিস আবাবার দাবি, দেশের উজানের বহু অঞ্চল এখনো বৃষ্টিনির্ভর কৃষির ওপর নির্ভর করে, আর ঘন ঘন খরার কারণে কোটি ইথিওপীয় খাদ্যসংকটে পড়ার ঝুঁকিতে থাকে। এমন অবস্থায় পানির যথাযথ ব্যবহার ও বিদ্যুৎ উৎপাদনকে তারা নিজেদের মৌলিক অধিকার হিসেবে দেখে। কায়রোর অবস্থানের প্রতি ইথিওপীয়দের আগ্রহ সামান্যই। তাদের দৃষ্টিতে মিশর হলো একটা ঔপনিবেশিক শক্তি। এরা অতীতে বৃহৎ দাস বাজারের মাধ্যমে দাস ব্যাবসাকে সহায়তা করেছিল এবং ঊনবিংশ শতকে ইথিওপিয়ায় আগ্রাসনেরও চেষ্টা চালিয়েছিল। তাদের বক্তব্য হলো, মিশর এখনও সেই ঔপনিবেশিক মানসিকতাই ধরে রেখেছে। তারা এখন আধুনিক ইথিওপিয়ার আত্মনির্ভরশীলতা বন্ধ করতে চাচ্ছে।

এই উত্তেজনার মধ্যে ২০২১ সালে মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন, মিশরের স্বার্থ রক্ষায় তিনি ‘সব ধরনের উপায়’ ব্যবহার করবেন। এই বক্তব্যকে অনেকেই যুদ্ধের হুমকি হিসেবে দেখেন। আন্তর্জাতিক বিশ্লেষকদের একটি বড় অংশ মনে করেন, ভবিষ্যতে ‘জলসম্পদ’ ঘিরে সংঘাতের যে আশঙ্কা বহু বছর ধরে আলোচিত হচ্ছে, সেটি নীল নদের কারণেই ঘটতে পারে। আসলে এই সম্ভাবনা গত পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে রয়েছে। ১৯৭০ সালে ইথিওপিয়ার সরকার নীলনদের ওপর বাঁধ নির্মাণের প্রভাব কেমন হয় তা পরীক্ষা করতে একটি মার্কিন কোম্পানিকে দায়িত্ব দিয়েছিল। ওই সময় মিশরের প্রেসিডেন্ট ছিলেন আনোয়ার সাদাত। তিনি এতটাই ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন যে তিনি প্রকাশ্যে যুদ্ধের হুমকি দিয়েছিলেন।

তবে বাস্তবতা হলো, ইথিওপিয়াকে আঘাত হানার ক্ষেত্রে মিশরের সামনে একাধিক কৌশলগত সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এখানে ভূগোল আবারও ইথিওপিয়ার পক্ষে কাজ করে। ইথিওপিয়া একটি স্থলবেষ্টিত দেশ। এখানে আক্রমণ করতে হলে মিশরের স্থলবাহিনীকে সুদানের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করতে হবে, অথবা লোহিত সাগর পাড়ি দিয়ে ইরিত্রিয়া হয়ে ঢুকতে হবে। এই দুইটি বিকল্পের কোনোটিই কোনো সেনাবাহিনীর জন্য আকর্ষণীয় নয়। বিশেষ করে কোনো বাহিনীর যদি সাম্প্রতিক কালে দূরের থিয়েটারে পূর্ণমাত্রার সরবরাহ ও অভিযান পরিচালনার বাস্তব অভিজ্ঞতা সীমিত হয়, তবে তা আরো কঠিন হয়ে পড়ে। মিশরের সামরিক

ইতিহাসও আশানুরূপ নয়। ১৮৭৪-৭৬ সালে ইথিওপিয়ায় আক্রমণের চেষ্টা করেছিল মিশর। কিন্তু সেই অভিযান ভয়াবহভাবে ব্যর্থ হয়। এই ঘটনাই প্রমাণ করে—যে দেশকে ইউরোপীয়রাও উপনিবেশে পরিণত করতে পারেনি এমন একটি দেশের বিরুদ্ধে লড়াই কতটা বিপজ্জনক। ১৯৬০-এর দশকে ইয়েমেনের গৃহযুদ্ধে অংশ নিতে ৭০,০০০ মিশরীয় সৈন্য লোহিত সাগর পাড়ি দিয়েছিল। কিন্তু ফেরত এসেছিল মাত্র ৬০,০০০। বাকি ১০,০০০ সেখানেই প্রাণ হারায়।

এক সময় মিশর GERD বাঁধের ওপর বিমান হামলার পরিকল্পনাও করেছিল বলে শোনা যায়। কিন্তু এটিও কৌশলগত কারণে এসে থেমে যায়। কারণ, জলাধার পূর্ণ অবস্থায় আঘাত হানলে সুদান ভয়াবহ বন্যার মুখে পড়তে পারে। আর এই ধরনের মানবিক বিপর্যয় আন্তর্জাতিক ক্ষোভ ডেকে আনবে। তাছাড়া, কায়রো থেকে বাঁধের অবস্থান প্রায় ২,০০০ কিলোমিটার দূরে। এই দূরত্ব পাড়ি দিয়ে বোমা বর্ষণ করে আবার নিরাপদে ফিরে আসা বেশিরভাগ যুদ্ধবিমানের পক্ষেই বাস্তবসম্মত নয়। তাছাড়া মিশরের বিমানবাহিনীর আধুনিক এফ-১৬ বা রাফাল যুদ্ধবিমানগুলোয় আকাশে জ্বালানি ভরার সক্ষমতা নেই। ফলে তারা ফিরে আসতে পারবে কি না সন্দেহ। তার ওপর বাঁধের মোটা প্রাচীর ঘিরে রয়েছে ইসরায়েলের সরবরাহ করা আধুনিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা।

অস্ত্রের দিক থেকে ইথিওপীয় সেনাবাহিনী মিশরের মতো শক্তিশালী নয়। তবে তারা ফরাসি, রুশ, ইসরায়েলি ও মার্কিন অস্ত্র কিনছে। এছাড়াও তাদের রয়েছে দীর্ঘদিনের যুদ্ধ-অভিজ্ঞতা। দেশটির সেনারা প্রায় নিয়মিতভাবে তিগ্রাই, ওরোমো এবং সোমালি অঞ্চলে গৃহযুদ্ধ ও সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানে অংশ নিয়ে সামরিক অভিযানে দক্ষ হয়ে উঠেছে। সবচেয়ে বড় কথা, তারা লড়বে তাদের নিজস্ব ভূখণ্ডে, এটি সব সময়ই একটি কৌশলগত সুবিধা। প্রকৃত সামরিক মিত্র বলতে যদিও ইথিওপিয়ার কিছু নেই, তবে ভূগোলই এখানে তাদের সবচেয়ে বড় সহযোগী। অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট সিসি স্বভাবতই ঝুঁকিবিমুখ। মধ্যপ্রাচ্য ও আফ্রিকা অঞ্চলে যুদ্ধে নামা মানে কেবল হারের ঝুঁকি নয়, বরং ক্ষমতা হারানোরও সম্ভাবনা থাকে। এমনকি জীবন হারানোরও ঝুঁকি রয়েছে।

এখানে কূটনীতিও একটা বড় ভূমিকা রাখছে। দুইটি দেশেই বড় অঙ্কের বিনিয়োগ করেছে সৌদি আরব ও আরব আমিরাত। তাই তারা কোনো সংঘাত চায় না। ফলে সরাসরি না বললেও পরোক্ষভাবে উভয় পক্ষের ওপর চাপ প্রয়োগ করে আসছে সৌদি আরব ও আরব আমিরাত। একই রকম অবস্থানে আছে চীনও।

তাদের 'বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভ' ও হর্ন অব আফ্রিকায় প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্য ইথিওপিয়ার মাধ্যমে এগোচ্ছে। আদ্দিস আবাবার ওপর বেইজিংয়ের যথেষ্ট প্রভাব আছে। GERD বাঁধের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায়ও চীনের প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা রয়েছে। তারা কোনো দেশের গণতান্ত্রিক শাসন বা শ্রমের পরিবেশ নিয়ে মাথা ঘামায় না বটে, কিন্তু স্থিতিশীলতা নিয়ে ঠিকই ভাবে। তাই দুই পক্ষকেই সংযত থাকার আহ্বান জানাচ্ছে বেইজিং।

এই কারণে ইথিওপিয়া কূটনৈতিকভাবে একধাপ এগিয়ে রয়েছে। তারা শুরু থেকেই দাবি করে আসছে যে, এই বাঁধ নির্মাণের উদ্দেশ্য কাউকে ক্ষতিগ্রস্ত করা নয়, বরং জাতীয় উন্নয়ন নিশ্চিত করা। আদ্দিস আবাবা কায়রোকে আশ্বস্ত করার চেষ্টা করছে যে বাঁধ এমনভাবে ব্যবহার করা হবে, যাতে ভাটির দিকে পানিপ্রবাহে বড় কোনো প্রভাব না পড়ে। এদিকে মিশরও ধীরে ধীরে তাদের কৃষি খাতকে এমন পণ্য উৎপাদনের দিকে সরিয়ে নিচ্ছে, যেগুলো তুলনামূলকভাবে কম পানিনির্ভর। ঐতিহাসিকভাবে দেশটির অর্থনীতি নীলনদের পানির ওপর নির্ভরশীল। প্রায় ৮০ শতাংশ পানি ব্যয় হয় কৃষিখাতে, যার বড় অংশই চলে যায় পানিসম্পদ-নিবিড় ফসল যেমন ধান ও তুলা চাষে। তবে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং উজানে নতুন বাঁধ নির্মাণের সম্ভাবনা মাথায় রেখে এখন তারা কম পানি-নির্ভর ফসলের দিকে ধীরে ধীরে ঝুঁকছে। এর মধ্যে রয়েছে গম, বার্লি বা ড্রিপ ইরিগেশন প্রযুক্তি ব্যবহার করে উৎপাদনযোগ্য সবজি ও ফলমূল। পাশাপাশি, মিশর সরকার নতুন করে সেচ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ ও পানির অপচয় রোধে প্রযুক্তিনির্ভর কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

এই গঠন প্রক্রিয়ায় সুদান ও দক্ষিণ সুদান কিছুটা সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। তারা এই বিরোধে সরাসরি কোনো পক্ষ না হলেও গভীর নজরদারির মধ্যে রেখেছে পুরো পরিস্থিতিকে। ইথিওপিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়েছে যে পানিপ্রবাহ অব্যাহত থাকবে এবং বাড়তি বিদ্যুৎ প্রতিবেশীদের সরবরাহ করা হবে। এদিকে এই দুইটি দেশই তেল উৎপাদন করে। এটি তাদের জন্য আরেকটি কৌশলগত হাতিয়ার। ইথিওপিয়া এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে এক ধরনের বিনিময় কাঠামো গড়ার চেষ্টা করছে, অর্থাৎ কালো সোনার (তেল) বিনিময়ে নীল সোনা (পানি ও বিদ্যুৎ)। এই সমঝোতার মাধ্যমে উভয়েই লাভবান হবে। সহজ শর্তে বিদ্যুৎ কিনে সুদান ও দক্ষিণ সুদান বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটাতে পারবে। অপরদিকে সহজ শর্তে তেল কিনে ইথিওপিয়া তার ছোট আকারের তেলশিল্পকে পরিপূরক শক্তি দিতে পারবে।

নীল নদের মতো একটি জীবনদায়ী নদী যেসব দেশের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়, তাদের কাছে এটি জাতীয় নিরাপত্তার অবিচ্ছেদ্য অংশ। উগান্ডা, বুরুন্ডি, কঙ্গো, মিশর, কেনিয়া, ইথিওপিয়া, ইরিত্রিয়া, রুয়ান্ডা, দক্ষিণ সুদান, সুদান ও তানজানিয়া—সকলেই তাদের সীমান্ত দিয়ে প্রবাহিত নীলনদের গতিপ্রবাহ সতর্কভাবে পর্যবেক্ষণ করে। তবে এসব দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকির মুখে রয়েছে মিশর। আর সবচেয়ে কম ঝুঁকিতে রয়েছে ইথিওপিয়া। কারণ, পানির প্রবাহ তো উজান থেকে শুরু হয়। এখানে ভূগোল স্বভাবতই ইথিওপিয়ার পক্ষেই কাজ করে। শত বছর ধরে নীল নদের প্রবাহ ও ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে অভ্যস্ত মিশরকে এখন মানিয়ে নিতে হচ্ছে এক নতুন বাস্তবতার সঙ্গে। গ্রিক ইতিহাসবিদ হেরোডোটাস একসময় বলেছিলেন, "নীল নদের উপহার হলো মিশর।" কিন্তু নীল যা দেয়, গ্র্যান্ড ইথিওপিয়ান রেনেসাঁ ড্যাম চাইলে তা কেড়েও নিতে পারে।

অন্যদিকে, ইথিওপিয়ার জন্য এই বাঁধ একটি অনন্য সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করেছে। GERD শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদনের একটি বড় প্রকল্পই নয়, এটি তাদের জন্য শতাব্দী-প্রাচীন দারিদ্র্য ও জাতিগত সংঘাতের চক্র চক্র ভাঙার সুযোগ। প্রযুক্তি ব্যবহার করে অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে ইথিওপিয়া এখন তার ভৌগোলিক সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করছে। আফ্রিকার অনেক দেশের মতো এই অঞ্চলের নদীগুলোও কেবল স্বল্প দূরত্ব পর্যন্ত নৌপরিবহনের উপযোগী। কারণ নদীগুলো উচ্চভূমি থেকে তীব্র বেগে নেমে আসে নিচের দিকে। ফলে বাণিজ্যে করার ক্ষেত্রে এই নদীগুলো খুব একটা কাজে লাগে না। এতদিন পানি ইথিওপিয়াকে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের কিছু সুযোগ দিয়েছে। আর এখন, সেই 'জলস্তম্ভ' থেকে জন্ম নিচ্ছে প্রকৃত 'জলশক্তি' অর্থাৎ বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা।

যদি এই বিদ্যুৎ ন্যায়সংগত ও সুলভ মূল্যে ব্যবহার করা যায়, তবে তা কোটি মানুষের জীবন পাল্টে দিতে পারে। আর সেই সঙ্গে দেশটির অভ্যন্তরীণ উত্তেজনাও কিছুটা হ্রাস পেতে পারে। আর এই উন্নয়নের সঙ্গে সুশাসন যুক্ত হলে ইথিওপিয়ার একটি স্থিতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত হওয়ার সুযোগ তৈরি হবে। ইথিওপিয়া ইতোমধ্যেই হর্ন অব আফ্রিকার প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়েছে। সময়ের সঙ্গে অন্যরাও হয়তো সেটি মেনে নিতে শিখবে।

তবু এখনো ইথিওপিয়ার সামনে রয়ে গেছে বহু সংকট। জলবায়ু পরিবর্তন নিম্নভূমিতে ঘন ঘন খরাকে আরও তীব্র করেছে, আর বন উজাড়ের ফলে বাড়ছে মাটির ক্ষয় ও মরুকরণ। শুধু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ই নয়, সামাজিক চাপও দিন দিন

বাড়ছে। দক্ষিণ সুদান, সোমালিয়া ও ইরিত্রিয়া থেকে আসা লাখ লাখ শরণার্থী ইথিওপিয়ায় আশ্রয় নিয়েছে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অভ্যন্তরীণভাবে বাস্তুচ্যুত আরও প্রায় দশ লাখ মানুষ। অন্যদিকে, হর্ন অব আফ্রিকা অঞ্চল এখনো জঙ্গি গোষ্ঠী ও জলদস্যুতার কেন্দ্র। নিকট ভবিষ্যতে এই পরিস্থিতি পরিবর্তনের সম্ভাবনাও খুব কম।

এসব মোকাবিলার জন্য স্থিতিশীলতা অপরিহার্য। আর এটাই সম্ভবত ইথিওপিয়ার সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ। একটি ইথিওপীয় প্রবাদ আছে: "মাকড়সার জাল এক হলে তারা সিংহকেও বেঁধে ফেলতে পারে।" এই কথা হয়তো রাজনীতির প্রেক্ষাপটে জন্ম নেয়নি, কিন্তু এর অন্তর্নিহিত অর্থ রাজনীতির ক্ষেত্রেও খুব ভালোভাবেই প্রযোজ্য। যদি রাজনৈতিক ও ব্যবসায়ী শ্রেণি সফলভাবে অর্থনীতি চালাতে পারে, আর রাজনীতিবিদরা মিলেমিশে দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে পারে, তবে 'আফ্রিকান সাফল্যের গল্প' ইথিওপিয়ার জন্য পুরোপুরি বাস্তব সম্ভাবনা। কিন্তু এতে যদি তারা ব্যর্থ হয়, তাহলে দেশটিকে ধরে রাখা বন্ধন হয়তো আর যথেষ্ট শক্তিশালী থাকবে না।

অধ্যায় ৯

স্পেন



"স্পেনের প্রকৃতি ও মানুষ সম্পূর্ণভাবে পরস্পরের বিপরীত"

- গারট্রুড স্টেইন

স্পেনের ধুলোমাখা আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ ধরে গাড়ি চালানোর একটা অন্যরকম আনন্দ আছে। হঠাৎ কোনো এক বাঁক ঘুরতেই আপনার চোখের সামনে ভেসে উঠবে বিশাল এক দুর্গ। এই দুর্গগুলো দাঁড়িয়ে আছে পাথরের প্রাচীরের ওপর। কোথাও এমন কোনো দুর্গ হয়তো ভেঙে পড়েছে ধ্বংসস্তূপে। আবার কোথাও হয়তো অক্ষতভাবে টিকে আছে শত শত বছর ধরে। কিন্তু প্রতিটি দুর্গই স্পেনের ভূগোল আর ইতিহাস বোঝার জন্য একেকটি চাবিকাঠি।

মধ্যযুগের শুরুর দিকে দুর্গই ছিল মেসেতা অঞ্চলের প্রধান বৈশিষ্ট্য। মেসেতা হলো স্পেনের মধ্যভাগে বিস্তৃত বিশাল এক সমভূমি। এই এলাকাটি এত বেশি দুর্গে ভরা ছিল যে, এর নামই হয়ে যায় 'কাস্তিয়া'। শব্দটি এসেছে স্প্যানিশ শব্দ

'কাস্তিয়ো' বা দুর্গ থেকে। তাই 'কাস্তিয়া' মানে দাঁড়ায় 'দুর্গের দেশ'। মেসেতার প্রতিটি পাহাড়, প্রতিটি টিলা যেন তৈরি হয়েছিল দুর্গ নির্মাণের জন্যই। এই দুর্গ-সংস্কৃতির উত্থান কেবল প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের কারণেই নয়, বরং এর পেছনে ছিল দীর্ঘ রাজনৈতিক ও সামরিক ইতিহাস। স্পেনে অষ্টম থেকে পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত খ্রিস্টান রাজ্যগুলো ও দক্ষিণের মুসলিম শাসিত আল-আন্দালুসের মধ্যে টানা সংঘর্ষ চলেছে। দীর্ঘ এই লড়াই ইতিহাসে 'রিকনকিস্তা' নামে পরিচিত। দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ চলার সময়েই এই অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল শত শত দুর্গ। এই দুর্গগুলো শুধু প্রতিরক্ষার জন্যই নয়; অনেক সময় শাসন, কর আদায় এবং স্থানীয় রাজনীতির কেন্দ্র হিসেবেও কাজ করেছে।

আসলে পুরো স্পেনকেই বলা যায় একটা বিশাল দুর্গ। ভূমধ্যসাগর কিংবা আটলান্টিক উপকূল থেকে সামান্য ভেতরের দিকে গেলেই সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে উঁচু পাহাড়শ্রেণি। এগুলো আসলে এক ধরনের প্রাকৃতিক প্রাচীর তৈরি করেছে। আর দেশটির ভেতরে ঢুকলেই দেখা মেলে উঁচু পাহাড়শ্রেণি আর গভীর উপত্যকা ঘেরা এক সমতল মালভূমি 'মেসেতা'। এই ভূতাত্ত্বিক গঠন স্পেনকে ইউরোপের অন্যতম পর্বতময় দেশে পরিণত করেছে।

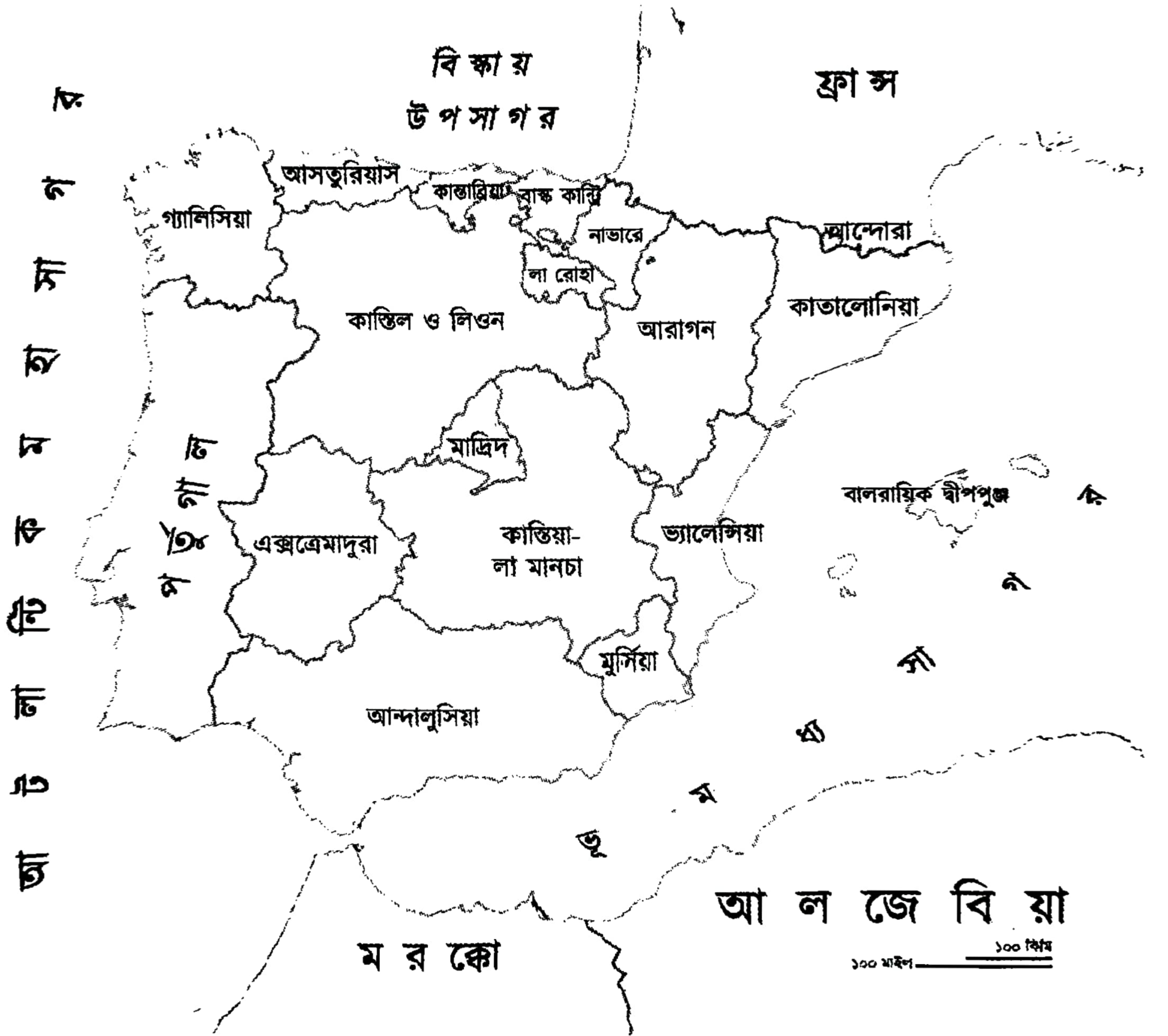
মেসেতা অঞ্চলের ঠিক মাঝে অবস্থিত মাদ্রিদ। ষোড়শ শতকে রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ যখন মাদ্রিদকে রাজধানী হিসেবে ঘোষণা করেন, তখন তার প্রধান কারণ ছিল শহরটির অবস্থান। স্পেনের প্রায় মাঝামাঝি অবস্থিত এই শহরটি। সে সময় ভাবা হয়েছিল, কেন্দ্রস্থলে রাজধানী স্থাপন করলে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সহজে পৌঁছে দেওয়া যাবে। সেই সঙ্গে আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলোর ওপরও কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণও বজায় রাখা যাবে। তবে বাস্তবতা হলো, স্পেনের পর্বতময় ভূপ্রকৃতি আর বিশাল আয়তন সবসময়ই বাণিজ্যিক যোগাযোগ ও রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে বাধা সৃষ্টি করেছে। ফলে মাদ্রিদ থেকে একচ্ছত্র কর্তৃত্ব চালানো যেমন কঠিন হয়ে পড়েছে, তেমনি রাজনৈতিক ঐক্যও থেকে গেছে আংশিক। এই ভৌগোলিক বৈচিত্র্যই দেশের প্রতিটি অঞ্চলের নিজস্ব সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত পরিচয়কে শক্তভাবে টিকিয়ে রেখেছে। এই সাংস্কৃতিক ভিন্নতার জটিলতা আর আবেগ এতটাই গভীর যে স্পেনের জাতীয় সঙ্গীতে সুর থাকলেও কোনো গীতি নেই। কারণ, জাতীয় সঙ্গীতে কী লেখা হবে তা নিয়েই কেউ একমত হতে পারেনি। এই বিভাজন আজও টিকে আছে। একসময় স্পেনের উত্তরাঞ্চলে বাস্ক অঞ্চলের চরমপন্থীরা মাদ্রিদের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি পেতে সহিংসতার পথ বেছে

নিয়েছিল। অন্যদিকে স্পেন থেকে আলাদা হওয়ার লক্ষ্যে কাতালোনিয়ায় আজও আন্দোলন চলছে। ২০১৭ সালের কাতালোনিয়া গণভোট ও তার পরবর্তী ঘটনাবলি এখনও স্পেনের রাজনীতিতে গভীর প্রভাব ফেলছে। সরাসরি দমনপীড়ন বা দখলদারির যুগ পেরিয়ে গেছে। কিন্তু আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের সহিংস ছায়া এখনো রয়ে গেছে দেশটিতে। আর এই বিভাজনের শিকড় খুঁজতে গেলে আমাদের বারবার ফিরে যেতে হয় স্পেনের ভূগোল আর ইতিহাস কাছে।

ইউরোপের মানুষ ধরেই নেয় যে একটি জাতি ও তাদের জাতীয় পরিচয় একদম চিরস্থায়ী একটি বিষয়। এর একটি বড় কারণ হলো, আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের ধারণা জন্ম নিয়েছিল এই ইউরোপেই। একইভাবে আমরা অনেকেই মনে করি যে উদার গণতন্ত্রই হলো পৃথিবীর স্বাভাবিক শাসনব্যবস্থা। অথচ ইতিহাসের দিকে তাকালে কিংবা বিশ্বজুড়ে দৃষ্টি দিলে বোঝা যায়, এই ধারণাগুলোই বরং ব্যতিক্রমী। বিশ্বজুড়ে এমন বহু রাষ্ট্র রয়েছে যেসব রাষ্ট্রের সীমানার ভেতর বসবাস করে একাধিক জাতিগোষ্ঠী। অনেক দেশেই রয়েছে বহু ভাষাভাষী কিংবা বহু সংস্কৃতির মানুষ। এইসব রাষ্ট্রগুলোতে 'জাতীয় পরিচয়' নামে যে ধারণাটি প্রচার করা হয়, তা অনেক সময়ই কৃত্রিম ও কেন্দ্রীয় প্রশাসন নির্ভর। জাতীয়তার অনুভূতি এখানে সহজে গড়ে ওঠে না। বরং ভেতরে ভেতরে বিরোধ, বৈচিত্র্য ও সংযুক্তির টানাপোড়েন কাজ করে সবসময়। স্পেন তার একটি ভালো উদাহরণ।

ইউরোপের প্রাচীনতম রাষ্ট্রগুলোর একটি স্পেন। দেশটির একত্রীকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয় ষোড়শ শতকে। শুরু থেকেই দেশটির কেন্দ্রের চারপাশের অঞ্চলগুলোকে একসূত্রে বাঁধা ছিল বেশ কঠিন একটা কাজ। স্পেন বর্তমানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের একটি আগ্রহী সদস্য। কিন্তু এই ইউনিয়নের অস্তিত্বই আসলে জাতিরাষ্ট্রের ক্ষমতা কিছুটা ক্ষয় করে। কারণ ইউরোপীয় ইউনিয়নের নীতিগত কাঠামো অনুসারে জাতীয় সার্বভৌমত্ব অনেকাংশেই কমে যায়। ফলে অনেকেই মনে করেন, একটি আঞ্চলিক পরিচয় নিয়ে সরাসরি ইউরোপীয় কাঠামোর অংশ হওয়াই অধিক কাম্য। এই ধারণাটি স্পেনে সবচেয়ে প্রবলভাবে দেখা যায় কাতালোনিয়ায়। এই অঞ্চলের জাতীয়তাবাদীরা স্পেন থেকে স্বাধীন হয়ে সরাসরি ইউরোপীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার স্বপ্ন দেখে। অন্যদিকে স্পেনের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও তুলনামূলকভাবে নতুন। ফ্রাঙ্কোর কর্তৃত্ববাদী শাসনের অবসানের পর ১৯৭০-এর দশকে দেশটিতে গণতন্ত্রে চালু হয়। আপাতদৃষ্টিতে স্পেনের এই গণতন্ত্র তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল। তাৎক্ষণিক কোনো সাংবিধানিক

হুমকিও চোখে পড়ে না।। তবে দেশটির রাজনৈতিক ইতিহাসে দীর্ঘ সময় ধরে একটি গণতন্ত্রবিরোধী প্রবণতা ছিল। উপযুক্ত পরিবেশ পেলে সেই প্রবণতা আবারও মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে। আর স্পেনের এই সবকিছুর মূলে আছে ভূগোল ও ইতিহাস।



চিত্র: স্পেনের বিভিন্ন অঞ্চল বরাবরই তাদের স্বতন্ত্র পরিচয় বজায় রেখেছে, বিশেষ করে কাতালোনিয়া, বাস্ক দেশ ও গালিসিয়া।

স্পেনের জনসংখ্যার ঘনত্ব পশ্চিম ইউরোপের অন্যান্য দেশের তুলনায় কম। রাজধানী মাদ্রিদ ছাড়া প্রায় সব বড় শহরই গড়ে উঠেছে সমুদ্রের উপকূলবর্তী এলাকায়। দেশটির ভেতরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল আজকাল 'লা এস্পানিয়া বাসিয়াদা' বা 'খালি হয়ে যাওয়া স্পেন' নামে পরিচিত। কারণ বিশ শতক জুড়ে প্রচুর মানুষ গ্রাম থেকে শহরে চলে আসে। আর এর ফলে দেশের ভেতরের দিকের অনেক অঞ্চলই

বেশ খানিকটা জনশূন্য হয়ে পড়ে। স্পেনের জনসংখ্যা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন কারণে ওঠানামা করেছে। এর পেছনে ছিল দেশটির অস্থির রাজনৈতিক ইতিহাস, দীর্ঘ সময় ধরে চলা যুদ্ধ এবং অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা। বর্তমানে দেশটির জনসংখ্যা প্রায় ৪৭ মিলিয়ন। তবে ধারণা করা হচ্ছে, আগামী চার দশকে তা আরও প্রায় ৫ মিলিয়ন কমে যাবে।

আয়তনের দিক থেকে স্পেন ইউরোপ মহাদেশের চতুর্থ বৃহত্তম দেশ। রাশিয়া, ইউক্রেন ও ফ্রান্সের পরেই এর অবস্থান। দেশটির উত্তরে স্থলসীমান্ত রয়েছে ফ্রান্স এবং ক্ষুদ্র দেশ আন্দোরার সঙ্গে। দক্ষিণে সীমান্ত আছে ব্রিটিশ অধিকৃত জিব্রালটারের সঙ্গে, আর পশ্চিমে রয়েছে পর্তুগালের সঙ্গে। এর মধ্যে পর্তুগালের সাথে রয়েছে স্পেনের ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ একটানা সীমান্ত। তবে স্পেনের সবচেয়ে ব্যতিক্রমী সীমান্তটি রয়েছে আফ্রিকার মাটিতে। উত্তর আফ্রিকার উপকূলে মরক্কোর ভেতরে স্পেনের দুইটি ছোট উপনিবেশ রয়েছে—সেউতা ও মেলিয়া। এই উপনিবেশগুলোর মাধ্যমে আফ্রিকার সঙ্গে ইউরোপীয় ইউনিয়নের একমাত্র স্থলসীমান্ত তৈরি হয়েছে। সেউতার অবস্থান স্পেনের মূল ভূখণ্ড থেকে মাত্র ১৩ কিলোমিটার দূরে, জিব্রাল্টার প্রণালির অপর পারে। স্পেনের মূল ভূখণ্ড থেকে খালি চোখেই দেখা যায় জায়গাটি।

স্পেনের ভৌগোলিক বৈচিত্র্য এখানেই শেষ নয়। ভূমধ্যসাগরে রয়েছে স্পেনের বালেয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ। এটি ইউরোপের সবচেয়ে বড় দ্বীপপুঞ্জ। ১৫১টি দ্বীপ নিয়ে এই দ্বীপপুঞ্জটি গঠিত হলেও মানুষের বসবাস কেবল পাঁচটিতে—মায়োর্কা, মিনোর্কা, ইবিজা, ফরমেন্তেরা এবং কাব্রেরা। আরও দক্ষিণে আটলান্টিক মহাসাগরে রয়েছে স্পেনের ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ। উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল থেকে এগুলোর দূরত্ব মাত্র ১১০ কিলোমিটার। কিন্তু মূল স্পেন থেকে সমুদ্রপথের দূরত্ব প্রায় ১,৬০০ কিলোমিটার। এখানে রয়েছে আটটি বড় দ্বীপ, যার মধ্যে টেনেরিফে ও গ্রান ক্যানারিয়া সবচেয়ে বেশি পরিচিত।

এই ভৌগোলিক বিস্তৃতি স্পেনকে দীর্ঘদিন ধরে সামরিক ও বাণিজ্যিক সুবিধা দিয়ে এসেছে। পাশাপাশি, ভূমধ্যসাগরে প্রবেশ আর প্রস্থান পথ নিয়ন্ত্রণের সুযোগ তৈরি করেছে দেশটির জন্য। এইসব সুবিধা একসময় শক্তিশালী সেনাবাহিনী গড়ে তুলতে স্পেনকে সহায়তা করেছিল। পরবর্তীতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ভিত্তি তৈরি করে দেয় এই সেনাবাহিনী। ষোড়শ থেকে ঊনবিংশ শতক পর্যন্ত স্পেন ছিল ইউরোপের সবচেয়ে প্রভাবশালী সামরিক এবং উপনিবেশবাদী শক্তিগুলোর একটি। স্পেনের

বিভিন্ন দ্বীপ ও বন্দরভিত্তিক সামরিক ঘাঁটিগুলো অ্যামেরিকা, এশিয়া এবং আফ্রিকায় স্পেনের উপস্থিতি বজায় রাখতে সহায়ক হয়েছিল। কিন্তু এমনকি স্পেন যখন তার সবচেয়ে শক্তিশালী অবস্থানে ছিল, দেশটির অভ্যন্তরীণ ভূগোল তখনও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সম্পদ অর্জন ও রাজনৈতিক ঐক্যে তৈরিতে।

পিরেনিজ পর্বতমালা একদিকে যেমন বহিরাগতদের সামনে প্রাকৃতিক প্রতিরোধ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তেমনি তা বাণিজ্যের পথেও এক বড় বাধা। দেশটির উপকূলীয় সমভূমিগুলো তুলনামূলকভাবে সংকীর্ণ এবং পার্বত্য অঞ্চলের খুব কাছাকাছি। ফলে কৃষিকাজের জন্য পর্যাপ্ত জমি নেই এখানে। তবুও যতটুকু আছে, স্পেন তার প্রাকৃতিক সম্পদের যথাসাধ্য ব্যবহার করেছে। জলপাই, কমলা ও মদের জন্য আজও দেশটি বিখ্যাত। দেশের মধ্যাঞ্চলে বিস্তৃত মেসেতা সমভূমি প্রচুর খাদ্য উৎপাদন করে। কিন্তু পাহাড় এখানেও একটা সমস্যা। পাহাড়ি পথ পেরোনো কঠিন বলে এই খাদ্য সারা দেশে ও বন্দর পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া ছিল সবসময়ই একটা বড় ধরনের অসুবিধা।

ফ্রান্স বা জার্মানির মতো স্পেনের বিস্তৃত সমতলভূমি জুড়ে দীর্ঘ ও নিরবচ্ছিন্ন নদী নেই। এই অঞ্চলের বেশিরভাগ নদী ছোট, জলের পরিমাণও সীমিত। আর অনেকগুলো নদী তো গ্রীষ্মকালে শুকিয়েও যায়। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে স্পেনে খরা এত ভয়াবহ রূপ নিয়েছে যে ফসল শুকিয়ে গেছে, আর অনেক অঞ্চলে চালু করতে হয়েছে পানির ওপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ। এই বিষয়টি নিয়ে স্পেনে একটি তিক্ত রসিকতা প্রচলিত রয়েছে—"এখন গাছগুলো কুকুরদের তাড়া করে পানির জন্য"। অর্থাৎ পানির এতটাই ঘাটতি যে গাছগুলোও যেন মাটি ছেড়ে উঠে পানির উৎসের খোঁজে বেরিয়ে পড়েছে।

স্পেনের পাঁচটি প্রধান নদীর মধ্যে চারটি গিয়ে মিশেছে আটলান্টিক মহাসাগরে। শুধু এব্রো নদী পতিত হয়েছে ভূমধ্যসাগরে। স্পেনের বেশিরভাগ নদী সাগর থেকে কিছুদূর ভেতরে প্রবেশ করেই নাব্যতা হারিয়ে ফেলে। ফলে সেগুলো পণ্য পরিবহন বা আক্রমণের সময় সৈন্য চলাচলের জন্য প্রায় অকার্যকর। স্পেনের একমাত্র প্রধান নৌচলাচলযোগ্য অভ্যন্তরীণ নদী হলো গুয়াদালকিভির। এই কারণেই সেভিয়া দেশটির একমাত্র অভ্যন্তরীণ নদীবন্দর হয়ে উঠেছে। এখানে মহাসাগরগামী জাহাজও ভিড়তে পারে। ষোড়শ শতকে এটি স্পেনের সবচেয়ে জনবহুল শহর হিসেবে বিবেচিত হতো। আর এটিই ব্যাখ্যা করে যে কেন অষ্টম শতকে আগত মুররা এখানে শক্ত ঘাঁটি গড়ে ৮০০ বছর শাসন করতে পেরেছিল।

সেভিয়ায় গভীর নদীবন্দর থাকার কারণেই তারা এখান থেকে আরো উত্তরে কর্ডোবা পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে তাদের রাজধানী গঠন করতে পেরেছিল।

বাণিজ্যিক ও সামরিক ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা থাকলেও এই নদীগুলো কৃষিজমির সেচের জন্য খুবই উপযোগী। বিংশ শতক থেকে নদীগুলোর জলপ্রবাহ জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজেও ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে স্পেন মূলত একটি শুষ্ক দেশ। এখানে মরুকরণের হুমকি ক্রমশ বাড়ছে। দেশটির দক্ষিণে অবস্থিত পর্বতমালা পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত হয়ে আটলান্টিক মহাসাগর থেকে আগত আর্দ্র বায়ুর প্রবাহে বাধা সৃষ্টি করে। ফলে গ্যালিসিয়া ও কান্তাব্রিয়ান পর্বতশ্রেণি আর্দ্রতার সুফল পায়, কিন্তু মেসেতা সমভূমি বঞ্চিত হয় পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত থেকে। মেসেতা অঞ্চলে যেহেতু কৃষিকাজ হয় কিন্তু পর্যাপ্ত বৃষ্টিপাত হয় না, তাই স্থানীয় সম্পদের ওপর বাড়তি চাপ সৃষ্টি করে এই শুস্ক আবহাওয়া। ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলে রয়েছে আরেক সমস্যা। অতিরিক্ত ভূগর্ভস্থ পানি উত্তোলনের কারণে ছিদ্রযুক্ত শিলাস্তরে সমুদ্রের পানি ঢুকে গিয়ে এই এলাকার জমিকে লবণাক্ত করে তুলেছে। এতে পানিসম্পদ নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে শুরু হয়েছে তিক্ত দরকষাকষি। অন্য অনেক দেশ প্রতিবেশীদের সঙ্গে পানিবণ্টন নিয়ে দ্বন্দ্বে জড়ায়। কিন্তু স্পেনের ক্ষেত্রে প্রতিবেশী দেশ নয় বরং এই দ্বন্দ্ব প্রায় সম্পূর্ণভাবে অভ্যন্তরীণ। যেমন তাগুস নদী থেকে সেগুরা নদীতে পানি স্থানান্তরকে কেন্দ্র করে কাস্তিয়া-লা মানচা ও আন্দালুসিয়া অঞ্চলের মধ্যে তৈরি হয়েছে রাজনৈতিক বিরোধ।

পর্বত ও নদীর বাধার কারণে স্পেন দীর্ঘদিন একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠতে পারেনি। অপরদিকে ভূপ্রকৃতির এই জটিলতাই আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যবোধ, ভাষাগত বৈচিত্র্য এবং সংস্কৃতিক পরিচয়ের ধরে রাখতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। মাদ্রিদ এই ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করেছে রেল ও সড়ক ব্যবস্থার মাধ্যমে। ১৮৪৮ সালে মাদ্রিদে তৈরি হয় প্রথম রেললাইন। এটি বার্সেলোনা ও মাতারোর মধ্যবর্তী ২৯ কিলোমিটার পথকে যুক্ত করে। এরপর রেললাইনগুলো মাদ্রিদকে কেন্দ্র করে চাকার স্পোকের মতো চারদিকে বিস্তার লাভ করেছে। কিন্তু তারপরও পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে সংযোগ দুর্বল থেকে যায়। বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে শুরু হয় নতুন মোটরওয়ে নির্মাণ। ১৯৬৯ সালে সেই বার্সেলোনা ও মাতারোর মধ্যে সংযোগ হিসেবেই প্রথম মোটরওয়ে চালু হয়েছিল।

এইসব উদ্যোগ আধুনিক স্পেনকে সংযুক্ত করতে সহায়ক হলেও ভৌগোলিক ব্যবধানের ঐতিহাসিক প্রভাব পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে পারেনি। স্পেনের কেন্দ্রীয় সরকার বারবার 'স্প্যানিশ' পরিচয় গড়ার চেষ্টা করেছে। কিন্তু কাতালান, বাস্ক, গালিশিয়ান ও অন্যান্য আঞ্চলিক গোষ্ঠীগুলো নিজেদের স্বতন্ত্র পরিচয় রক্ষায় অটল থেকেছে। ভূগোলও তাদের পাশে থেকেছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ৪৮৫ কিলোমিটার দীর্ঘ সিয়েরা মোরেনা পর্বতমালা আন্দালুসিয়াকে মেসেতা সমভূমি থেকে প্রাকৃতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এই দুই অঞ্চলকে সংযুক্ত করার একমাত্র বড় প্রাকৃতিক পথ হলো খাড়া প্রাচীরঘেরা দেসপেনিয়াপেরোস গিরিখাত। এই ভূ-প্রাকৃতিক বিভাজন দীর্ঘকাল ধরে স্পেনের দক্ষিণ ও মধ্য অংশের মধ্যে সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক দূরত্ব তৈরি করে রেখেছে।

স্পেনের ভৌগোলিক অবস্থান ইউরোপের একদম দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত আইবেরীয় উপদ্বীপে। ফলে প্রাচীনকাল থেকেই এটি ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকা থেকে আগত নানা জনগোষ্ঠীর আবাসস্থল হয়ে ওঠে। এর মধ্যে ছিল কার্থাজিনীয়রা ও রোমানরা। প্রাচীনকালে এই অঞ্চলটি পরিচিত ছিল 'হিস্পানিয়া' নামে। অঞ্চলটি রোমান সাম্রাজ্যের অংশ ছিল প্রায় ছয় শতাব্দী ধরে। রোমানদের বসতি স্থাপনের মাত্রা তুলনামূলকভাবে সীমিত হলেও, তারা এই অঞ্চলের স্থাপত্য, ধর্ম ও ভাষায় দীর্ঘস্থায়ী ছাপ রেখে গেছে। রোমানরাই পুরো আইবেরীয় উপদ্বীপজুড়ে একধারার সংস্কৃতির ভিত্তি গড়ে তুলেছে। লাতিন ভাষা ধীরে ধীরে ক্ষয়ে গেলেও তার থেকেই জন্ম নেয় কাস্তিলীয়, কাতালান, গ্যালিশীয় ও পর্তুগিজ ভাষা।

পঞ্চম শতকে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর রাজনৈতিক শূন্যতায় প্রবেশ করে উপদ্বীপটি। এই সময়েই উত্তর দিক থেকে আগত জার্মানিক গোষ্ঠী ভিসিগোথরা হিস্পানিয়ায় আধিপত্য শুরু করে। তবে, কয়েক শতাব্দী শাসন করলেও রোমানদের মতো সাংস্কৃতিক প্রভাব ফেলতে পারেনি তারা। তাদের শাসন ছিল তুলনামূলকভাবে দুর্বল ও বিক্ষিপ্ত। ৭১০ সালে ভিসিগোথ রাজা উইতিজার মৃত্যু এই দুর্বল কাঠামোকে আরও ভঙ্গুর করে তোলে। পরবর্তী সময়ে রাজপরিবারে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুরু হলে গোটা রাজত্ব বিভক্ত হয়ে পড়ে প্রতিদ্বন্দ্বী গোষ্ঠীর মধ্যে। ইতিহাস বলে, যখন অভ্যন্তরীণ বিভাজন হয় আর এক পক্ষ বিদেশি সেনাকে আমন্ত্রণ জানায়, তখন বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। ভিসিগোথদের ঘর এতটাই দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে, তার ছাদ প্রায় রাতারাতি ধ্বসে পড়ে। কিছু সূত্র মতে, উইতিজার পরিবার তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী রাজা রডেরিককে অপসারণের উদ্দেশ্যে উত্তর আফ্রিকার

মুসলিম বাহিনীর কাছে সাহায্য চেয়েছিল। মুসলিমদের জবাব ছিল অনেকটা এমন—“দারুণ দেশ, আমরাই তাহলে দখল করে নিচ্ছি।”

৭১১ সালের মে মাসে তারিক ইবনে জিয়াদ ৭ হাজার সৈন্য নিয়ে জিব্রাল্টারে এসে পৌঁছান। জুলাইয়ের মাঝামাঝি তিনি ভিসিগোথ রাজা রডেরিকের বাহিনীকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন এবং হত্যা করেন রাজাকে। এরপর তিনি উত্তরের দিকে অগ্রসর হয়ে দখল করেন ভিসিগোথের রাজধানী টলেডো। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ১৮ হাজার মুসলিম সেনা এই অভিযানে যোগ দেয়। কয়েক বছরের মধ্যেই তারা উপদ্বীপের অধিকাংশ অঞ্চল দখল করে নেয় এবং দখলকৃত ভূখণ্ডের নামকরণ করে ‘আল-আন্দালুস’।

মুসলিম বাহিনী বারবার পিরেনিজ পর্বতমালা অতিক্রম করে উত্তরমুখী অভিযান চালায়। তবে ৭৩২ সালে ঘটে ট্যুরের যুদ্ধ, যা অনেক ইতিহাসবিদের মতে ইউরোপে খ্রিস্টধর্ম টিকে থাকার অন্যতম কারণ। সে বছর মুসলিমদের একটি বিশাল বাহিনী লোয়ার নদীর উপত্যকা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। সেখানে তাদের প্রতিরোধ করেন ফ্রাঙ্কিশ নেতা শার্ল মার্তেল। প্রতিকূল পরিস্থিতি সত্ত্বেও ফ্রাঙ্করা বিজয়ী হয়। মার্তেল মনে করতেন, মুসলিমদের আইবেরীয় উপদ্বীপের মধ্যেই আটকে রাখা জরুরি। তা না হলে সমগ্র খ্রিস্টান ইউরোপ ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। প্রায় এক হাজার বছর পর খ্যাতনামা ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ এডওয়ার্ড গিবনও এই যুদ্ধের গুরুত্ব স্বীকার করে বলেন, “নীল বা ইউফ্রেটিসের মতো রাইন নদী অতিক্রম করাও খুব একটা কঠিন নয়। ফলে কোনো প্রতিরোধ না থাকলে আরব নৌবহর অনায়াসে টেমস নদীর মোহনায় পৌঁছে যেত।”

শার্ল মার্তেল যদি ট্যুরের যুদ্ধে পরাজিত হতেন, তাহলে তার নাতি শার্লেমেনও ইতিহাসে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে পারতেন না। শার্লেমেন ফ্রাঙ্কদের রাজ্যকে একটি বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত করেছিলেন। ফ্রাঙ্কদের সেই রাজ্য ছিল বর্তমান ফ্রান্স, জার্মানি ও ইতালির কিছু অংশ নিয়ে গঠিত। সাম্রাজ্য বিস্তারের পর এটি বিস্তৃত হয় পূর্ব ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানি, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস, সুইজারল্যান্ড, অস্ট্রিয়া এবং ইতালির কিছু অঞ্চল পর্যন্ত। ৮০০ সালের বড়দিনে পোপ তৃতীয় লিও তাকে ‘হোলি রোমান এম্পেরর’ হিসেবে অভিষিক্ত করেন। ফলে, ৪৭৬ খ্রিস্টাব্দে পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর ইউরোপে প্রথমবারের মতো একজন ক্যাথলিক সম্রাটের আবির্ভাব ঘটে। মুসলিমদের উত্তর দিকে অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করতে স্পেনের উত্তর-পূর্বাঞ্চল, বিশেষ করে কাতালোনিয়ার একাংশে শার্লেমেন

গড়ে তোলেন একটি প্রতিরক্ষা অঞ্চল বা 'বাফার জোন'। এই অঞ্চলটি পরবর্তীকালে হয়ে ওঠে রিকনকুইস্তা বা পুনর্দখল অভিযানের ঘাঁটি। শার্লেমনের লক্ষ্য ছিল মুসলিমদের সরিয়ে দিয়ে খ্রিস্টান শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা।

ট্যুরের যুদ্ধের পর মুসলিমরা ধীরে ধীরে পিছিয়ে যায়। ৭৫৬ থেকে ১০৩১ সাল পর্যন্ত তারা আইবেরিয়ার দুই-তৃতীয়াংশ জুড়ে আন্দালুসীয় উমাইয়া রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করে। তাদের রাজধানী কর্ডোবা সেই সময় সভ্যতার দিক থেকে বিশ্বের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নগরী ছিল। সাহিত্য, বিজ্ঞান ও স্থাপত্যকলার এক উৎকৃষ্ট কেন্দ্রে পরিণত হয় শহরটি। কর্ডোবায় ছিল ৭০ টিরও বেশি গ্রন্থাগার। এর মধ্যে অন্যতম ছিল আল-হাকামের প্রতিষ্ঠিত 'বায়তুল হিকমাহ'। এই গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত ছিল প্রায় চার লাখ পাণ্ডুলিপি। এই সময়ে ইবনে রুশদ ও ইবনে জুহরের মতো মুসলিম পণ্ডিতরা ইউরোপে জ্ঞানের পুনর্জাগরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তাদের রচিত আরবি পাণ্ডুলিপিগুলো টলেডো, কর্ডোবা ও গ্রানাডায় সংরক্ষিত হতো এবং পরে তা লাতিন ভাষায় অনূদিত হয়ে ইউরোপের রেনেসাঁ বা নবজাগরণের ভিত্তি তৈরি করে। আরবি ভাষার প্রভাব স্পেনের ওপর এতটাই গভীর যে লাতিন বাদ দিলে স্প্যানিশ ভাষায় আরবি থেকেই এসেছে সবচেয়ে বেশি শব্দ। এমনকি 'জিব্রাল্টার' নামটিও এসেছে তারিক ইবনে জিয়াদের নাম থেকেই। বর্তমানে 'রক অব জিব্রালটার' নামে পরিচিত পর্বতটি আরব শাসনামলে পরিচিত ছিল 'জাব-আল তারিক' অর্থাৎ 'তারিকের পাহাড়' নামে। জাব-আল তারিক নামটিই পরে বিকৃত হয়ে জিব্রালটারে পরিণত হয়।

১০৩১ সালে খিলাফত ভেঙে গেলে আল-আন্দালুস অঞ্চলে একক কেন্দ্রীয় শাসন বিলুপ্ত হয়ে যায়। এতে গোটা অঞ্চলটি অসংখ্য ক্ষুদ্র মুসলিম রাজ্যে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এইসব ক্ষুদ্র রাজ্যকে বলা হতো তাইফা। একটা পর্যায়ে এই রাজ্যগুলোর মধ্যে পারস্পরিক সংঘাত এবং বিভক্তি ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। আর এই দুর্বলতার সুযোগ নেয় উত্তরাঞ্চলের খ্রিস্টান রাজ্যগুলো। তারা একে একে তাদের হারানো ভূখণ্ড পুনরুদ্ধারের জন্য সামরিক অভিযান বা তাদের ভাষায় 'রিকনকুইস্তা' শুরু করে। ১০৬০-এর দশকে পোপ দ্বিতীয় আলেকজান্ডার ঘোষণা দেন: যারা এই যুদ্ধে অংশ নেবে, তাদের সকল পাপ ক্ষমা করা হবে। এই ঘোষণাটি ছিল একধরনের ধর্মীয় বৈধতা ও প্রেরণা। ঘোষণা শুনে খ্রিস্টান যোদ্ধারা ব্যাপকভাবে উৎসাহিত হয়। বলতে গেলে রিকনকুইস্তাকে একধরনের ক্রুসেডের বৈশিষ্ট্য দেয় পোপের এই ঘোষণা। ১০৮৫ সালে টলেডো শহর পুনর্দখল করা হয়,

ফলে উন্মুক্ত হয়ে যায় মেসেতায় প্রবেশের দ্বার। সামরিক সাফল্যের পাশাপাশি এটি স্পেন ও ইউরোপের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ বাঁকবদল হয়ে দাঁড়ায়।

১২১২ সালে উত্তরাঞ্চলের কাস্তিয়া, আরাগন ও নাভারা রাজ্যের সম্মিলিত বাহিনী দেসপেনিয়াপেরোস গিরিপথের মুসলিম প্রতিরক্ষা ভেঙে ফেলে। ১২৫০ সালের মধ্যেই প্রায় পুরো আইবেরীয় উপদ্বীপ খ্রিস্টানদের দখলে চলে আসে। ব্যতিক্রম ছিল শুধু দক্ষিণ উপকূলের গ্রানাডা। এখানে একটি স্বাধীন মুসলিম রাজ্য টিকে ছিল। তবে তারা পরিস্থিতির বাস্তবতা অনুধাবন করে কাস্তিয়া রাজ্যের অধীন কর প্রদান শুরু করে। এর ফলে পরবর্তী প্রায় আড়াই শত বছর ধরে অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয় গ্রানাডা। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যেই তৈরি হয় আন্দালুসীয় ঐতিহ্যের এক অপূর্ব নিদর্শন—আলহাম্রার প্রাসাদসমূহ।

রিকনকুইস্তাকে একক ও সঙ্ঘবদ্ধ অভিযান বলে মনে হলেও বাস্তবে তা ছিল ভিন্ন। স্পেনের ভূগোলের কারণে উত্তরাঞ্চলের খ্রিস্টান রাজ্যগুলো প্রায়ই আলাদাভাবে কাজ করত। উত্তর-পূর্বে আরাগন হয়তো নির্দিষ্ট একটি ভূখণ্ড দখলের উদ্দেশ্যে অভিযান চালাচ্ছে, আর একই সময়ে উত্তর-পশ্চিমের গ্যালিসিয়া হয়তো পুনর্গঠনে সময় পার করছে বা পরবর্তী আক্রমণের পরিকল্পনা করছে। ফলে মুসলিমদের দখল থেকে ভূখণ্ড পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াটি কোনো একমুখী তরঙ্গের মতো এগোয়নি। বরং এগুলো ছিল টুকরো টুকরো ফালির মতো করে দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হওয়া কিছু অভিযান। এর ফলে আধুনিক স্পেন যখন গড়ে উঠতে শুরু করে, তখনও তা খণ্ড খণ্ড অবস্থায় ছিল।

১৪৬৯ সালে এসে মুসলিম শাসনের অবসানের সূচনা হয়। কাস্তিয়ার রাজকুমারী ইসাবেলা পরবর্তীকালে রানি প্রথম ইসাবেলা নামে পরিচিত হয়েছিলেন। তার সঙ্গে আরাগনের রাজা ফার্দিনান্দ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। ভৌগোলিক দিক থেকে এর অর্থ হলো, স্পেনের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম একত্র হয়ে গেল। রাজনৈতিকভাবে এটি ছিল সীমিত একত্রীকরণ। ফলে এর অর্থনৈতিক প্রভাব ছিল কম এবং অঞ্চলগুলো তখনও স্বায়ত্তশাসিত ছিল। তবু আধুনিক স্পেনের জন্মপ্রক্রিয়ার এটা ছিল একটা গুরুত্বপূর্ণ ধাপ।

এই একত্রীকরণের মাত্র দুই দশক পর শুরু হয় স্পেনের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অভিযান। ১৪৮২ সালে ক্যাথলিক রাজদম্পতি ইসাবেলা ও ফার্দিনান্দ এক যুগ্ম সামরিক অভিযান শুরু করেন আইবেরিয়ার শেষ স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গ্রানাডা আমিরাতের বিরুদ্ধে। দীর্ঘ এক দশকব্যাপী যুদ্ধের পর শেষ পর্যন্ত ১৪৯২

সালে গ্রানাডার আমির আত্মসমর্পণ করেন। গ্রানাডা যুক্ত হয় কাস্তিয়ার সঙ্গে। এই ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রায় আট শতাব্দী ধরে আইবেরিয়ায় চলমান মুসলিম শাসনের অবসান ঘটে। মুসলিমরা এই ভূখণ্ডে এক দীর্ঘ ছাপ রেখে গিয়েছিল। ওই সময়ের প্রেক্ষিতে তাদের নির্মমতা অন্য শাসকদের তুলনায় বেশি ছিল তা বলা যায় না। বরং স্পেনজুড়ে জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিল্প, সাহিত্য ও স্থাপত্যের ক্ষেত্রে এক স্বর্ণযুগের সূচনা করেছিল তারা। বেশিরভাগ সময়েই তারা তুলনামূলক ধর্মীয় সহনশীলতা বজায় রেখেছিল। তবে খ্রিস্টান ও ইহুদিদের নানা বিধিনিষেধ মানতে হতো, যেমন—জিজিয়া কর দেওয়া, ধর্মপরিচায়ক ব্যাজ পরা, আর অনেক ধরনের অপমান সহ্য করা। অন্য ধর্মের মানুষ প্রশাসনে উচ্চপদে নিযুক্ত হতে পারতেন না এবং কিছু সামাজিক সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হতেন। তবে সামাজিক ও আইনি বিধিনিষেধ থাকলেও তাদের ধর্মচর্চায় সাধারণত বাধা দেওয়া হতো না। জোরপূর্বক ধর্মান্তর কিংবা গণহারে নির্যাতনের প্রবণতাও ছিল খুবই কম। এমনকি শহরের বাইরের কোনো বস্তিতে বাস করতেও তাদের বাধ্য করা হতো না।

তবে কেবল ভূখণ্ডগত ঐক্যই নয়, স্পেনকে একটি একক ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তিতে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন ইসাবেলা ও ফার্দিনান্দ। এই লক্ষ্য তারা ক্যাথলিক চার্চের কাছ থেকে ধর্মীয় বিচারব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ নিজেদের হাতে তুলে নেন। শুরু করেন কুখ্যাত স্প্যানিশ ইনকুইজিশন। এটি ছিল এক ধরনের রাষ্ট্রীয়ভাবে অনুমোদিত ধর্মীয় গোয়েন্দাগিরি ও বিচারপ্রক্রিয়া। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মূলত খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত মুসলিম ও ইহুদিদের আনুগত্য যাচাই করে দেখা। এই সময়টাতে ধর্মান্তরিত খ্রিস্টানদের মধ্য থেকে বিধর্মী সনাক্ত করে শাস্তি দেওয়া হতো। স্পেনে খ্রিস্টীয় মূল্যবোধের তথাকথিত বিশুদ্ধতা রক্ষা করা করতে গিয়ে এমন অনেক কাজ করা হয়েছে তখন। এখানে ধর্মীয় পরিচয় আর কেবল বিশ্বাসের বিষয় ছিল না, বরং তা হয়ে উঠেছিল জাতীয়তা, আনুগত্য এবং সাংস্কৃতিক বৈধতার একমাত্র মানদণ্ড। রিকনকুইস্তার সফল সমাপ্তির পর মুসলমান ও ইহুদিদের সামনে মূলত তিনটি পথ খোলা ছিল—ধর্মান্তরিত হও, নির্বাসনে যাও, অথবা মৃত্যু বরণ করো।

ইহুদিদের ক্ষেত্রে এই নীতি দ্রুত বাস্তবায়ন করা হয়। প্রায় এক হাজার বছর ধরে আইবেরিয়ায় বসবাস করছিল ইহুদিরা। সমাজে তাদের বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। তারা ছিলেন চিকিৎসক, অর্থনীতিবিদ, অনুবাদক, এমনকি রাজপরিবারের উপদেষ্টাও। কিন্তু ১৪৯২ সালের মার্চ মাসে তাদের চার মাসের মধ্যে দেশ ছাড়ার

নির্দেশ দেওয়া হয়। সেই সঙ্গে ঘোষণা করা হয়, তারা কোনো অর্থ, স্বর্ণ, অস্ত্র, কিংবা ঘোড়া সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারবে না। ফলে পুরোপুরি নিঃস্ব অবস্থায় দেশত্যাগে বাধ্য হয় তারা। ঠিক কতজন ইহুদি দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছিল, সে বিষয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। তবে আধুনিক গবেষণায় সংখ্যাটি প্রায় ৪০,০০০ বলে ধরা হয়। স্পেনে এরপর আর কখনোই উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ইহুদি দেখা যায়নি। এই বহিষ্কারের আদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে বাতিল করা হয় কয়েক শত বছর পরে, ১৯৬৮ সালে।

এরপর ১৫০২ সালে টার্গেট করা হয় মুসলিমদের। এই সময় অনেকেই ধর্মান্তরিত হয়েছিল, তবে তাদের মধ্যে কেউ কেউ গোপনে ইসলাম পালন করে যেত। এসব ধর্মান্তরিত মুসলিমদের ডাকা হতো 'মোরিসকো' বা 'লিটল মুর' নামে। 'অভ্যন্তরীণ শত্রু' হিসেবে তাদেরকে দেখা হতো সন্দেহের চোখে। অবশেষে ১৬০৯ সালে তাদেরও বহিষ্কার করা হয়। কয়েক লক্ষ মানুষকে দেশ ছাড়তে বাধ্য করা হয়েছিল তখন। ভ্যালেন্সিয়া রাজ্য একাই তার এক-তৃতীয়াংশ জনসংখ্যা হারায় এই সময়। এর ফলে ওই অঞ্চলের কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থা প্রায় এক প্রজন্মের জন্য বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে, স্পেনের গভীরে প্রোথিত ইহুদিবিদ্বেষী মানসিকতা আজও পুরোপুরি উপড়ে ফেলা যায়নি। আজও এর প্রতিফলন দেখা যায় স্প্যানিশ ভাষার কিছু শব্দে। ব্যবহারকারীরা হয়তো অনেক সময় না জেনেই সেগুলো ব্যবহার করে থাকেন। যেমন, 'জুদিয়াদা' শব্দটি আজকের দিনে 'নোংরা কৌশল' বা 'নির্মম আচরণ' বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এর আক্ষরিক অর্থ হলো 'ইহুদিদের মতো কাজ করা'। একইভাবে, উত্তর স্পেনের লিওন শহরে খ্রিস্টীয় 'হোলি উইক' উৎসবের সময় যে ঐতিহ্যবাহী মদ পরিবেশিত হয় তার নাম 'মাতার জুদিওস'। কথাটির অর্থ 'ইহুদিদের হত্যা করো'। এই ধরনের নাম শুধু বর্ণবাদী অতীতের উত্তরাধিকার নয়, বরং তা আজকের স্প্যানিশ সমাজে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক স্মৃতি হিসেবে টিকে আছে। এমনকি ২০১৪ সাল পর্যন্ত স্পেনের একটা গ্রামের নাম ছিল 'কাস্ত্রিও মাতাহুদিওস', যার অর্থ 'ইহুদি হত্যা শিবির'। আন্তর্জাতিক চাপ ও আধুনিক মূল্যবোধের কাছে নতিস্বীকার করে বহু পরে নামটি বদলানো হয়। এমনকি ব্যক্তিগত পর্যায়েও এই দৃষ্টিভঙ্গি কখনও কখনও দেখা যায়। কয়েক বছর আগে আমি ইসরায়েলে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম। তা জানতে পেরে বাসার ওপরতলার

হাসিখুশি, সদয়, ষাটোর্ধ্ব এক স্প্যানিশ নারী আমাকে একান্তে ডেকে সতর্ক করে বলেছিলেন, "টিম, ইহুদিদের থেকে সাবধান থাকবে কিন্তু!"

আজকের দিনে ইউরোপের অনেক দেশ আধুনিক মানবিকতা ও সহনশীলতার দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের ভাষাভাণ্ডার ও সাংস্কৃতিক রীতিনীতি পুনর্মূল্যায়ন করছে। কিন্তু স্পেনে এখনও এমন বহু শব্দ, নাম ও প্রথা টিকে আছে যা আজও একধরনের বৈষম্যমূলক মনোভাবকে স্বাভাবিক করে তুলেছে। স্পেনের পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশ এক্সত্রেমাদুরার একটি গ্রামের নাম 'ভায়ে দে মাতামোরোস', যার অর্থ 'মুর হত্যার উপত্যকা'। শুধু তাই নয়, 'মাতামোরোস' অর্থাৎ 'মুর হত্যাকারী' শব্দটি এখনও একটি পারিবারিক পদবি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যদিও তা খুব বেশি প্রচলিত নয়। বহু শতাব্দী ধরে, বিশেষ করে ইনকুইজিশনের যুগ থেকে শুরু করে ফ্রাঙ্কোর একনায়কতান্ত্রিক শাসন পর্যন্ত স্পেন তার জাতীয় পরিচয় নির্মাণ করেছে এক প্রকার ক্যাথলিক একত্ববাদের ভিত্তিতে। এই প্রক্রিয়ায় ইহুদি ও মুসলমানদের মতো ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা স্পেনের জাতীয় মূল্যবোধে স্থান পায় 'বিজাতীয়' হিসেবে। তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে স্পেনীয় বলে গ্রহণ করা হয়নি।

স্পেনের শাসকরা বিশ্বাস করতেন যে তাদের ঈশ্বর প্রদত্ত কর্তব্য হলো শুধু স্পেনের ভেতরে নয়, দেশের বাইরেও যত বেশি সম্ভব মানুষকে খ্রিস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করা। ইতিহাসের এমন একটা সময়ে স্পেনের দরবারে হাজির হলেন ক্রিস্টোফো কলোম্বো নামে এক ইতালীয় অভিযাত্রী। তিনি পরবর্তীতে ইংরেজিতে ক্রিস্টোফার কলম্বাস নামে পরিচিত হবেন। তার বয়স তখন চল্লিশ পেরিয়েছে। বহু বছর ধরে তিনি একটি সমুদ্র অভিযানের জন্য অর্থায়নের অনুরোধ করে রাজদম্পতিকে বিরক্ত করছিলেন। তার উদ্দেশ্য ছিল 'ইন্ডিজ' বা ভারতের যাওয়ার এক নতুন ও দ্রুততর সমুদ্রপথ আবিষ্কার করা। অবশেষে রাজদম্পতি তাকে কিছু অর্থ দিলেন। এই টাকা খরচ করে তিনি পৌঁছে গেলেন হিসপানিওলা দ্বীপে। এই দ্বীপ মূলত আজকের হাইতি ও ডোমিনিকান প্রজাতন্ত্র। সেখানে তিনি সামান্য স্বর্ণের সন্ধান পান। কিন্তু রানি ইসাবেলাকে লেখা এক চিঠিতে তিনি তা উপস্থাপন করেন 'অগাধ স্বর্ণের খনি' হিসেবে। সেই চিঠিতে কলম্বাস উল্লেখ করেন যে, তিনি যেসব স্বর্ণ পাচ্ছেন তা দিয়ে জেরুজালেমের পুনরুদ্ধার সম্ভব হবে। অর্থাৎ খ্রিস্টানদের পুণ্যভূমি মুসলিমদের হাত থেকে ফিরিয়ে আনা যাবে। এই সংবাদে রাজদরবারের প্রতিক্রিয়া ছিল অনেকটা এমন: "স্বর্ণ! তুমি স্বর্ণের কথা বলছ? তাহলে আমাদের

আরও বড় জাহাজ দরকার হবে!" পরে অবশ্য লাতিন অ্যামেরিকায় আবিষ্কৃত বিপুল সম্পদই স্পেনকে পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করবে।

স্বাভাবিকভাবেই এত সম্পদের খবরে অন্যরাও অংশীদার হতে চাইল। ১৪৯৩ সালে পর্তুগাল দাবি তোলে, কলম্বাস যেসব ভূখণ্ডে পা রেখেছেন সেগুলো তাদের প্রাপ্য। ফলে যুদ্ধের আশঙ্কা তৈরি হয়। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে পোপ ষষ্ঠ আলেকজান্ডার মনে করলেন, "আমি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রতিনিধি, সুতরাং এই বিরোধ মেটানো আমার কাজ।" তিনি আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে একটি কাল্পনিক রেখা টানলেন। এই রেখার পশ্চিম দিকে যেসব নতুন ভূখণ্ড আবিষ্কৃত হবে, তা স্পেনের, আর পূর্বদিকের সব পর্তুগালের। এই সিদ্ধান্ত যে মানবে না তাকে চার্চ থেকে বের করে দেওয়া হবে। ইতিহাসে 'ট্রিটি অব টর্ডেসিয়াস' নামে পরিচিত এই চুক্তির ফলে সাময়িকভাবে যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হয়। কিন্তু এই চুক্তির মধ্যে দিয়ে পোপ শুধু রাজনৈতিক দখলের ভাগাভাগিই করলেন না, লাতিন অ্যামেরিকায় এক দীর্ঘ, রক্তাক্ত অধ্যায়ের সূচনাও ঘটালেন। এই চুক্তির পরবর্তী ফলাফল ছিল—শত শত বছরের উপনিবেশ, নিপীড়ন, যুদ্ধ, দাসত্ব, হত্যাযজ্ঞ এবং ইউরোপীয় রোগে বিপুল পরিমাণ আদিবাসীর মৃত্যু।

ইহুদিরা চলে গিয়েছিল, মুসলিমদের বহিষ্কার করা হচ্ছিল, আর শিগগিরই ইসাবেলা ও ফার্দিনান্দও ইতিহাসের মঞ্চ থেকে বিদায় নিলেন। ১৫১৬ সালের মধ্যে দুইজনেই মারা যান। তবে সেই সময়ই স্পেন প্রবেশ করে তার সোনালি যুগে (১৫০০–১৬৮১) যা রাজকীয় সম্পদ, সামরিক শক্তি ও সাংস্কৃতিক উৎকর্ষের জন্য বিখ্যাত। এই সময়ের মূল চালিকাশক্তি ছিল দক্ষিণ অ্যামেরিকার স্বর্ণ ও রূপার খনি থেকে আহরিত বিপুল সম্পদ। ১৫৩০-এর দশকে ইনকা সাম্রাজ্য ধ্বংস করার পর পেরুর পোতসি অঞ্চলে রূপার বিশাল খনি আবিষ্কৃত হয়। এই খনি ইউরোপীয় অর্থনীতিকে আমূল বদলে দেয়। এই বিপুল ধনসম্পদ একদিকে স্পেনের রাজকোষ ভরে দেয়, অন্যদিকে তা সেনাবাহিনীকে আরও সুসজ্জিত ও আক্রমণাত্মক করে তোলে। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এই সময় গড়ে ওঠে অসাধারণ সব স্থাপত্যকীর্তি। বিকশিত হয় সাহিত্য ও চিত্রকলা। ফলে ইউরোপের সাংস্কৃতিক মানচিত্রে এক অনন্য উচ্চতায় উঠে যায় স্পেন।

এর পরেও স্পেনের অঞ্চলগুলো নিজেদের আলাদা পরিচয়, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক কাঠামো নিয়ে এগোতে থাকে। ভৌগোলিক কারণে এসব অঞ্চল একে অপরের সঙ্গে কার্যকর যোগাযোগ গড়ে তুলতে পারছিল না। ফলে রাজ্য গঠনের

প্রক্রিয়ায় একধরনের সংকট দেখা দেয়। ১০ হাজার কিলোমিটার দূরের খনি থেকে রাজকোষে যে বিপুল স্বর্ণ ও রূপা প্রবাহিত হচ্ছিল তা দিয়ে এই সংকটগুলো সাময়িকভাবে ঢেকে রাখা যাচ্ছিল বটে, কিন্তু মূল সমস্যা থেকেই যাচ্ছিল।

অন্যদিকে, এই বিপুল সম্পদের বড় অংশই ব্যয় হয়েছিল ইউরোপের বিভিন্ন যুদ্ধে। ফলে আটলান্টিক রুটগুলো সুরক্ষার জন্য নৌবাহিনীতে যথেষ্ট পরিমাণ বিনিয়োগ করা হয়নি। সপ্তদশ শতকের মাঝামাঝি এসে স্পেন সমুদ্রপথের ওপর নিয়ন্ত্রণ হারাতে শুরু করে। ফিলিপাইন ও চীন থেকে আসা মূল্যবান পণ্যগুলো প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে প্রথমে মধ্য অ্যামেরিকার বন্দরে এসে পৌঁছাত। এরপর সেখান থেকে মেক্সিকো হয়ে স্থলপথে পণ্যগুলো টেনে আনা হতো ক্যারিবিয়ান উপকূলে। ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের স্পেনীয় বণিক জাহাজগুলো সেসব পণ্য জাহাজে বোঝাই করত। তারপর স্বর্ণ ও রূপা বোঝাই জাহাজগুলোর সঙ্গে একত্র হয়ে সশস্ত্র গ্যালিয়নের পাহারায় কিউবা হয়ে রওনা হতো স্পেনের দিকে। কিন্তু এই রুটে যাতায়াতকারী জাহাজের সময় ও গতিপথ জলদস্যুরা সহজেই বুঝে ফেলে। তারা দ্রুত শিখে নিয়েছিল কিভাবে এই বহরকে ধ্বংস করে সম্পদ লুট করা যায়। ১৬শ শতকের শেষভাগে ক্যারিবীয় জলদস্যুদের হামলা ব্যাপক আকারে শুরু হয়। দ্রুত খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, ইউরোপের সবচেয়ে শক্তিশালী দেশটি এখন দুর্বল হয়ে পড়ছে। এই সুযোগ নেন স্যার ফ্রান্সিস ড্রেক ও স্যার ওয়াল্টার র‍্যালির মতো এলিজাবেথীয় যুগের ইংরেজ অভিযাত্রীরা। রাজকীয় অনুমোদনে ব্যাপক উৎসাহ নিয়ে স্পেনীয় জাহাজ আক্রমণ, লুট ও দখলের কাজে লিপ্ত হন তারা। এর ফলে স্পেনের রাজস্ব প্রবাহ আরও টালমাটাল হয়ে পড়ে।

১৫৮৮ সালে স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ এক চতুর পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু তিনি তখন আন্দাজ করতে পারেননি যে বাতাস কোন দিকে বইবে। নেদারল্যান্ড সেই সময় স্প্যানিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, আর রানি প্রথম এলিজাবেথ নেদারল্যান্ডকে সহায়তা দিচ্ছেন। রাজা ফিলিপের লক্ষ্য ছিল ইংল্যান্ড আক্রমণ করে রানি এলিজাবেথকে সিংহাসনচ্যুত করা। সাথে ইংল্যান্ড থেকে প্রোটেস্ট্যান্ট চার্চের প্রভাব নিশ্চিহ্ন করা। ফিলিপ মনে করতেন, যদি ইংল্যান্ডকে সামরিকভাবে বিপর্যস্ত করা যায়, তাহলে তারা আর নেদারল্যান্ডসের বিদ্রোহীদের সহায়তা করতে পারবে না। পাশাপাশি ইংলিশ জলদস্যুরাও আর স্পেনের ধন-সম্পদ লুট করতে পারবে না। 'লা গ্রান্দে আর্মাদা' অর্থাৎ 'মহা নৌবহর' নামে একটি বড়সড় সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা করেন তিনি। এই

অভিযানের জন্য প্রস্তুত করা হয় প্রায় ১৩০টি যুদ্ধজাহাজ। স্পেনীয় যুদ্ধজাহাজগুলো ছিল আকারে বড়, আর তাদের গোলাবারুদের পরিমাণও ছিল বিপুল। পরিকল্পনা ছিল, এই বিশাল নৌবহর প্রথমে ইংলিশ চ্যানেল পার হয়ে ক্যালেতে পৌঁছাবে। এরপর সেখান থেকে নেদারল্যান্ডস অঞ্চলে অবস্থানরত স্পেনীয় বাহিনীর সঙ্গে একত্রিত হয়ে আক্রমণ চালাবে ইংল্যান্ডে। সবকিছুই ঠিকঠাকই ছিল, শুধু বাতাসটাই ঠিক মতো বইল না! আর তাই শেষ পর্যন্ত পুরো তাদের অভিযান ভেস্তে গেল।

কিন্তু এই পরিকল্পনায় একটি বড় ঘাটতি ছিল। অভিজ্ঞ একজন অ্যাডমিরাল নিয়োগ দিলে হয়তো আর সমস্যা হতো না। অভিযানের মাত্র চার মাস আগে নৌবহরের নেতৃত্ব দেওয়া হয় মেদিনা সিদোনিয়ার ডিউককে, যিনি সামুদ্রিক অভিযানে একদমই অনভিজ্ঞ। তিনি নিজেই রাজাকে চিঠিতে জানিয়েছিলেন, "আমার সামান্য অভিজ্ঞতা বলে যে সমুদ্রে নামলেই আমি সি-সিক হয়ে পড়ি।" তার ওপরে স্থলযুদ্ধে ক্রমাগত খরচের কারণে স্প্যানিশ নৌবাহিনীও তখন ছিল দুর্বল অবস্থায়। ফ্ল্যাণ্ডার্স অঞ্চলে স্পেনীয় সেনাদেরকে আনা-নেওয়ার জন্য স্থলভাগের নিকটবর্তী কোনো গভীর পানির বন্দর ছিল না। ক্যালেতে পৌঁছানোর পর ডিউককে অপেক্ষা করতে হয় জরুরি সরঞ্জামের জন্য। কিন্তু আশ্রয় নেওয়ার মতো কোনো গভীর বন্দর না থাকায় তারা অপেক্ষা করছিল খোলা সাগরে। এই সুযোগে লর্ড হাওয়ার্ড ও ফ্রান্সিস ড্রেকের নেতৃত্বে ইংরেজ বাহিনী হঠাৎ আক্রমণে স্পেনীয় জাহাজগুলো ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

এই যুদ্ধে স্প্যানিশ আর্মাডা ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হয়। বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ে তাদের রণকৌশল। পুনরায় সংগঠিত হওয়ার জন্য উত্তর সাগরের দিকে পাড়ি দেয় তারা। তখন সিদ্ধান্ত হয় অভিযানের পরিকল্পনা বাতিল করে ফিরে যাওয়া হবে। কিন্তু স্প্যানিশদের একটি প্রবাদ আছে 'লা জিওগ্রাফিয়া মান্দা' অর্থাৎ ভূগোলই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করে। আর সে সময় ভূগোলই হয়ে দাঁড়াল তাদের সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ।

স্পেনীয়দের ফিরতে হতো দক্ষিণে, কিন্তু বাতাস বইছিল ঠিক উল্টো দিকে। তার ওপর উত্তর সাগরের মুখে ইংরেজরা তাদের ফেরার পথ আটকে বসে ছিল। বাধ্য হয়ে স্পেনীয়রা আরও উত্তরের দিকে পাড়ি জমায়। স্কটল্যান্ডের উত্তর প্রান্ত ঘুরে আসতেই উত্তর আটলান্টিকের ভয়ংকর এক ঝড়ের কবলে পড়ে তারা। ঠান্ডায় জর্জরিত অবস্থায় বহু জাহাজ গিয়ে আছড়ে পড়ে আয়ারল্যান্ডের পাথুরে উপকূলে। অক্টোবর মাসে যখন অবশিষ্ট বহর দেশে ফেরে, তখন বন্দরে পৌঁছায় মাত্র ষাটটি

জাহাজ। এই অভিযানে প্রায় ১৫,০০০ সেনা প্রাণ হারায় এবং এর সঙ্গে ধূলিসাৎ হয়ে যায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নৌবাহিনী হিসেবে স্পেনের মর্যাদা। নতুন শতাব্দীকে সামনে রেখে স্পেন তখনো নিজেকে বিশ্বের প্রধান শক্তি হিসেবে ভাবতে চাইছিল। কিন্তু বাস্তবতা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন।

তবে স্পেন সহজে তাদের আধিপত্যের ধারণা ছাড়েনি। কিন্তু বারবার চেষ্টা করেও নেদারল্যান্ডসে নিজেদের দখল টিকিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয় তারা। স্পেনের রাজশক্তি সেই সময় এমনকি নিজের দেশকেও পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিল না। ভৌগোলিক বাস্তবতা, অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা এবং অব্যবস্থাপনার সংমিশ্রণে স্পেনের শক্তি ক্রমেই ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে তখন।

১৬৩০-এর দশক থেকে শুরু হয় স্পেনের অভ্যন্তরীণ টালমাটাল সময়। কেন্দ্রীয় মাদ্রিদ সরকার এই সময় একের পর এক যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। সেগুলোর খরচ জোগাতে গিয়ে প্রদেশগুলোর ওপর নতুন কর চাপিয়ে দেয় সরকার। এই করনীতি প্রথমে আঘাত করে বাস্ক অঞ্চলে। বিলবাওয়ের গুরুত্বপূর্ণ বস্ত্রশিল্পে অতিরিক্ত কর আরোপ করা হয় এবং সেখানকার বিশাল লবণভাণ্ডার বাজেয়াপ্ত করা হয়। এই পদক্ষেপে বাস্ক জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে, যা ১৬৩০-এর দশকের মাঝামাঝি একটি তিন বছরব্যাপী বিদ্রোহে রূপ নেয়। অবশেষে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে বিদ্রোহটি দমন করা হয়। কিন্তু বাস্ক জনগণ এই দমনপীড়নকে দীর্ঘকাল ধরে স্মরণে রেখেছে। এই ঘটনা এই অঞ্চলের কেন্দ্রবিরোধী মনোভাব আরও দৃঢ় করেছে।

১৬৪০ সালে কাতালোনিয়ার পালা আসে। স্পেন কাতালোনিয়া থেকে ফ্রান্সের দিকে সামরিক অভিযান চালায়। এর মূল উদ্দেশ্য ছিল কাতালোনিয়াকে যুদ্ধে জড়ানো। মাদ্রিদের ধারণা ছিল, ফরাসি সীমান্তে লড়াই বাঁধিয়ে কাতালানদের সরাসরি যুদ্ধে জড়ানো হলে তারা বাধ্য হয়ে স্পেনের বাহিনীকে সমর্থন করবে। কিন্তু মাদ্রিদের সঙ্গে কাতালানদের ঐতিহাসিক সম্পর্ক বরাবরই ছিল সন্দেহপ্রবণ ও শীতল। এই পরিকল্পনায় অংশ নিতে তারা অস্বীকৃতি জানায় এবং এতে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে।

কাতালান নেতারা জোট বাঁধেন উল্টো ফরাসিদের সঙ্গে। শিগগিরই ফরাসি বাহিনী পিরেনিজ পর্বত অতিক্রম করে কাতালোনিয়ায় প্রবেশ করে এবং কাতালানদের সঙ্গে মিলে স্পেনীয় বাহিনীকে পরাস্ত করে। তবে ১৬৪৮ সালে এক শান্তিচুক্তির অংশ হিসেবে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয় ফ্রান্স। আর ১৬৫২ সালে

বার্সেলোনাকে অবরোধ করে অনাহারে ফেলে নতিস্বীকারে বাধ্য করার পর মাদ্রিদ পুনরায় নিয়ন্ত্রণ ফিরে পায়।

কাতালানরা এই সংঘাতকে বলে 'লা গুয়েরা দেলস সেগাদরস' অর্থাৎ 'কৃষকদের যুদ্ধ'। এই নামের মাধ্যমে তারা গ্রামের সাধারণ কৃষকশ্রেণিকে শ্রদ্ধা জানায়। অস্ত্র না থাকলেও শুধু সাহসের বলে এই কৃষকরা মাদ্রিদের বাহিনীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। এই ঐতিহাসিক স্মৃতির ধারাবাহিকতায় কাতালোনিয়ার জাতীয় সংগীতের নামও রাখা হয়েছে 'এল সেগাদরস' বা 'কৃষকেরা'। সংগীতটির সুর প্রথম প্রচলিত হয় সেই ১৬৪০ সালে, বিদ্রোহের সময়। তবে এর আধুনিক গীতিকবিতা রচিত হয় ১৮৯৯ সালে। দীর্ঘ রাজনৈতিক সংগ্রাম শেষে ১৯৯৪ সালে এটি আনুষ্ঠানিকভাবে কাতালোনিয়ার জাতীয় সংগীতের মর্যাদা পায়। আজও এর ছন্দ কাস্তিলের মানুষকে ভাবিয়ে তোলে। কারণ গানটির ভাষ্য শুধু অতীতের সংগ্রাম নয়, বরং বর্তমানেও স্পেনের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো আত্মপরিচয়ের ঘোষণা:

কাতালোনিয়া বিজয়ী,
আবার হবে সমৃদ্ধ ও উর্বর।
তাড়াও এই অহংকারী লোকদের,
যারা এত দাম্ভিক ও উদ্ধত।
কোরাস:
কাস্তে চালাও! আঘাত হানো!
...
শত্রু যেন কেঁপে ওঠে,
আমাদের প্রতীক দেখে।
যেমন আমরা সোনালি গমের শিষ কাটতে জানি,
সময় এলে তেমনি আমরা শৃঙ্খলও কাটতে জানি।

এই সময় স্পেনের ভাবমূর্তি, অর্থনীতি ও জনসংখ্যা ক্রমশ পতনের দিকে যাচ্ছিল। গোটা দেশজুড়ে তখন শুধু অস্থিরতা, সহিংসতা এবং দারিদ্র্য। ১৬০০ সালে স্পেনের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৮.৫ মিলিয়ন। কিন্তু শতাব্দীর শেষে তা নেমে দাঁড়ায় ৬.৬ মিলিয়নে। প্রতি বছর যুদ্ধের কারণে গড়ে নিহত হতো প্রায় ১০,০০০ জন মানুষ। পাশাপাশি আরও প্রায় ৫,০০০ মানুষ পাড়ি জমাত অ্যামেরিকার উপনিবেশগুলোতে। তার ওপর যুক্ত হয় চরম দারিদ্র্য আর ঘন ঘন প্লেগের

প্রাদুর্ভাব। ফলে স্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি একপ্রকার থেমে যায়। অষ্টদশ শতকের দিকে অগ্রসর হওয়ার সময় পর্যন্তও স্পেন ছিল একটা বৃহৎ সাম্রাজ্য। স্পেনের নিয়ন্ত্রণে ছিল ইউরোপ, অ্যামেরিকা ও এশিয়ার বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড। কিন্তু ভেতরে ভেতরে দুর্বল হয়ে পড়েছিল তারা। একের পর এক যুদ্ধে জড়িয়ে নেপলস, সিসিলি বা মিলানের মতো ইউরোপের গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ডগুলো হারাতে থাকে স্পেন। এমনকি ১৭০৪ সালে জিব্রাল্টার ব্রিটিশদের দখলে যায়, যার অবস্থান আইবেরীয় উপদ্বীপের দক্ষিণ প্রান্তে।

এই শতাব্দীজুড়ে অবিরাম যুদ্ধ চলেছে। অবশেষে ১৮০৫ সালে ট্রাফালগারের যুদ্ধে ব্রিটিশ নৌবাহিনীর কাছে স্পেন-ফ্রান্সের যৌথ নৌবহর পরাজিত হয়। এই ঘটনা স্পেনীয় সাম্রাজ্যের পতনকে আরও ত্বরান্বিত করে। এরপর ১৮০৭ সালে ৩০,০০০ ফরাসি সৈন্য ঢুকে পড়ে স্পেনে। শুরু হয় স্পেনের স্বাধীনতা যুদ্ধ। এই যুদ্ধের সময়ই ইতিহাসে প্রথমবারের মতো 'গেরিলা' যুদ্ধ প্রকৌশল আলোচনায় আসে। 'গেরিলা' শব্দটি এসেছে স্প্যানিশ শব্দ 'গুয়েরা' থেকে, যার অর্থ 'যুদ্ধ'। স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় নিয়মিত বাহিনীর যুদ্ধ বোঝাতে 'গুয়েরা' শব্দটি ব্যবহার করা হতো। কিন্তু স্পেনের অনিয়মিত বাহিনীর ছোট ছোট দলের আক্রমণকে বলা হতো 'গেরিলা বা 'ছোট যুদ্ধ'। এই অনিয়মিত বাহিনী ছিল সাধারণ নাগরিকদের নিয়ে গঠিত মিলিশিয়া। এই বাহিনী ফরাসিদের বিরুদ্ধে বিক্ষিপ্ত ও ছায়াযুদ্ধের কৌশলে প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং ভয়াবহ ক্ষয়ক্ষতি ঘটায়। তারা দ্রুত আঘাত হানা, অ্যামবুশ এবং নাশকতার মতো কৌশল ব্যবহার করত। এই ছোট্ট দলগুলো টার্গেট করত ফরাসি সাপ্লাই লাইন, যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং ছোট ছোট সৈন্যদলকে। ফরাসি সৈন্যদের মনোবল ভেঙে দিতে এবং স্পেনে তাদের অবস্থান অত্যন্ত কঠিন করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এই গেরিলা যুদ্ধ কৌশল। এই অভিনব পদ্ধতির যুদ্ধ পরবর্তীকালে সারা বিশ্বের অনেক স্বাধীনতা সংগ্রাম ও প্রতিরোধ আন্দোলনের জন্য একটি মৌলিক মডেল হিসেবে কাজ করেছে।

শুরুর দিকে স্প্যানিশ বাহিনীর প্রতিরোধের মুখে ফরাসি বাহিনী পিছু হটতে থাকে। ১৮০৮ সালের নভেম্বর মাসে ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপোর্ট নিজেই বিশাল এক বাহিনী নিয়ে স্পেনে আসেন। খুব দ্রুতই স্প্যানিশদের প্রতিরোধ ভেঙে দিয়ে তিনি মাদ্রিদ দখল করে নেন। এরপর স্পেনের বৈধ রাজা সপ্তম ফার্দিনান্দকে ক্ষমতাচ্যুত করে বন্দী করেন তিনি। এই ঘটনা স্প্যানিশ সাম্রাজ্যের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো ভেঙে দেয়। নিজের ভাই জোসেফ বোনাপার্টকে স্পেনের নতুন রাজা

হিসেবে ঘোষণা করেন নেপোলিয়ন। কিন্তু লাতিন অ্যামেরিকার স্প্যানিশ উপনিবেশের জনগণ এবং শাসকগোষ্ঠী জোসেফের শাসনকে বৈধ মনে করেনি। স্প্যানিশ উপনিবেশগুলো স্পেন রাষ্ট্রের অধীনে ছিল না, বরং সেগুলোকে রাজার ব্যক্তিগত সম্পত্তি মনে করা হতো। উপনিবেশের শাসকদের কাছে রাজা ছিলেন ঈশ্বরের নির্বাচিত সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। যখন রাজা ফার্দিনান্দ বন্দী হলেন, তখন লাতিন অ্যামেরিকার উপনিবেশগুলোতে প্রশ্ন উঠল, "যদি আমাদের রাজা বন্দী হন এবং স্পেনের সিংহাসন একজন অবৈধ শাসকের হাতে থাকে, তবে সেই অবৈধ স্প্যানিশ রাজা কেন আমাদের শাসন করবে? তাহলে আমাদের আনুগত্যের প্রতি মাতৃভূমি স্পেনের আর কী বৈধতা আছে?" এই রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সুযোগেই উপনিবেশগুলোতে বিদ্রোহের প্রস্তুতি শুরু হয়।

বহুদিন ধরেই উপনিবেশগুলোতে স্পেন বিরোধী ক্ষোভ জমছিল। স্প্যানিশ সাম্রাজ্যের শাসন কাঠামোয় সবচেয়ে বেশি বৈষম্যের শিকার হয়েছিল ক্রেওল শ্রেণি। এরা ছিল লাতিন অ্যামেরিকায় জন্মগ্রহণকারী স্প্যানিশ বংশোদ্ভূত ধনী অভিজাত এবং জমিদার। স্প্যানিশ বংশোদ্ভূত হওয়া সত্ত্বেও 'পেনিনসুলারেস' বা স্পেন থেকে সরাসরি আগত স্প্যানিশদের তুলনায় দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক হিসেবে গণ্য হতো তারা। উপনিবেশের প্রশাসনিক, সামরিক ও চার্চের উচ্চ পদগুলো একচেটিয়াভাবে পেনিনসুলারেসদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। আর ক্রেওলদের ব্যাবসা-বাণিজ্যের ওপরেও আরোপ করা হয়েছিল কঠোর বিধিনিষেধ। তাদের উৎপাদিত পণ্য সরাসরি ইউরোপে বিক্রির অনুমতিও ছিল না। ক্রেওলদের পণ্যগুলোকে হয় স্পেনে বিক্রি করতে হতো, অথবা স্পেনের মাধ্যমে ইউরোপে বিক্রি করতে হতো। এই বঞ্চনা ক্রেওলদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ সৃষ্টি করে। তবে স্প্যানিশ শাসনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কঠোর অবস্থানে ছিল স্থানীয় আদিবাসী এবং আফ্রিকান দাস সম্প্রদায়। নিজেদের ভূমির ওপর অধিকার হারানো এই আদিবাসীদের ওপর কঠোর শ্রম ও উচ্চ করের বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিল স্প্যানিশ সাম্রাজ্য। আর আফ্রিকা থেকে নিয়ে আসা দাসদের তো মানুষ হিসেবেই গণ্য করা হতো না। ন্যূনতম মৌলিক অধিকারও ছিল না দাসদের। স্বাধীনতার মাধ্যমে তারা রাজনৈতিক ক্ষমতা এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে চেয়েছিল। এই বিভিন্ন গোষ্ঠীর চাওয়াগুলো ভিন্ন হলেও তাদের সাধারণ শত্রু ছিল একটাই—স্প্যানিশ শাসন ব্যবস্থা।

নেপোলিয়ন স্পেনের বৈধতা ভেঙে দিলে ক্রেওলরা নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ পায়। স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্য নিয়ে নিজেদের সামরিক শক্তিকে আদিবাসী ও

দাসদের বিশাল জনশক্তির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ করতে শুরু করে তারা। উত্তর ও দক্ষিণ অ্যামেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলে শুরু হয় বিদ্রোহ। আদিবাসী ও দাসেরাও স্বাধীনতার আশায় ক্রেওলদের সাথে যোগ দেয়। গেরিলা যুদ্ধে সহায়তা করে তারা। এই প্রেক্ষাপটে উঠে আসেন দুই ক্যারিশম্যাটিক নেতা—সিমোন বলিভার ও হোসে দে সান মার্তিন। আর্জেন্টিনার সান মার্টিন বুঝেছিলেন, পেরুর মতো স্পেনের মূল ঘাঁটিগুলোতে আঘাত হানতে হলে প্রথমে পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলো মুক্ত করা জরুরি। ১৮১৭ সালে আন্দিজ পর্বতমালা অতিক্রম করে চিলি মুক্ত করা তার সবচেয়ে কঠিন ও বিখ্যাত সামরিক কৃতিত্বগুলোর একটি। এরপর ১৮২০ সালে তিনি সমুদ্রপথে পেরুতে আক্রমণ করেন এবং ১৮২১ সালের মধ্যেই সেখানে স্প্যানিশ শাসনের অবসান ঘটান। একই সময়ে বলিভার মুক্ত করেন ভেনেজুয়েলা, নিউ গ্রানাডা অর্থাৎ বর্তমান কলম্বিয়া এবং ইকুয়েডর। পরে ১৮২২ সালে প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলে অবস্থিত গুয়ায়াকিল শহরে দুই নেতার সাক্ষাৎ হয় এবং সেখানে ভবিষ্যতের রণনীতি নিয়ে আলোচনা করেন দুজনে। এরপর বলিভার আপার পেরু অঞ্চলে স্প্যানিশ অনুগতদের শেষ প্রতিরোধও দমন করেন। তার প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই অঞ্চলটি নতুন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে 'বলিভিয়া' নামে। মেক্সিকো একই পথ অনুসরণ করায় ১৮২৬ সালের মধ্যে সমগ্র দক্ষিণ ও মধ্য অ্যামেরিকা স্পেনের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে যায়।

স্পেন নিজেও তখন সহিংসতা ও অস্থিরতা থেকে মুক্ত ছিল না। পুরো ঊনবিংশ শতকজুড়েই দেশটি ছিল অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জরিত। শহর বনাম গ্রাম, প্রগতিশীল বনাম রক্ষণশীল, অঞ্চল বনাম অঞ্চল, স্পেনীয় বনাম স্পেনীয় এমন অনেক দলের মধ্যে লড়াই লেগেই ছিল। এসব গৃহযুদ্ধ সেনাবাহিনীকে দেশের রাজনৈতিক কাঠামোর ভেতরে আরও গভীরভাবে গেঁথে দেয়। দ্বন্দ্বের একদিকে ছিল কট্টর ক্যাথলিকরা; অন্যদিকে ছিল উদারপন্থীরা। যারা উদারপন্থী ছিল তারা চার্চের আধিপত্য কমিয়ে আধুনিক রাষ্ট্র গড়তে চাচ্ছিল। বিদ্রোহ, অভ্যুত্থান ও সরাসরি যুদ্ধের সময় দুই পক্ষই নৃশংসতা চালায়, যা এক দীর্ঘস্থায়ী তিক্ততার জন্ম দেয়। সেই তিক্ততা বিংশ শতকেও টিকে থাকে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মাদ্রিদ চেষ্টা করেছিল ব্রিটেন, জার্মানি এবং ফ্রান্সে চলা শিল্প বিপ্লবের গতির সাথে তাল মেলাতে। কিন্তু এই তিনটি প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ অনেক বেশি ঐক্যবদ্ধ ছিল। অন্যদিকে, রেলপথ এবং সড়ক যোগাযোগে ধীরগতির উন্নয়নের কারণে স্পেনের অর্থনীতি সংহত হতে পারেনি। ফলে স্পেন

জাতীয় ঐক্য গড়তে ব্যর্থ হয়। উত্তরের দেশগুলোর তুলনায় পিছিয়ে পড়ে স্পেন। জনগণের বৃহৎ অংশ তখনও স্পেনীয় পরিচয়ের চেয়ে নিজেদের আঞ্চলিক পরিচয়কেই বেশি প্রাধান্য দিত। যেমন, কাতালান অঞ্চলের মানুষ নিজেদেরকে কাতালান বলতেই বেশি পছন্দ করত। স্পেনের হাতে তখন উপনিবেশ বলতে বাকি ছিল কিছু ছোট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল। এর মধ্যে ছিল পুয়ের্তো রিকো, কিউবা এবং ফিলিপাইন। ঊনবিংশ শতকের শেষ দিকে কিউবা স্পেনের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিউবার পাশে অবস্থানের কারণে এবং নিজেদের অর্থনৈতিক স্বার্থে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওই আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। ১৮৯৮ সালে কিউবার হাভানা বন্দরে নোঙর করা একটি মার্কিন যুদ্ধজাহাজ রহস্যজনক বিস্ফোরণে ধ্বংস হয়। বহু মার্কিন সেনা নিহত হয় এই ঘটনায়। যুক্তরাষ্ট্রের সংবাদমাধ্যমগুলো কোনো সুনির্দিষ্ট প্রমাণ ছাড়াই এই ঘটনার জন্য স্পেনকে দায়ী করতে থাকে। এই বিস্ফোরণ এবং কিউবার 'স্বাধীনতার পক্ষে' জনমতকে কাজে লাগিয়ে স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে যুক্তরাষ্ট্র। এই যুদ্ধই ইতিহাসে পরিচিত হয় স্প্যানিশ-অ্যামেরিকান যুদ্ধ নামে। মাত্র তিন মাসের এই যুদ্ধে স্পেন সহজেই পরাজিত হয়। যুদ্ধ শেষে ১৮৯৮ সালের প্যারিস চুক্তির মাধ্যমে স্পেন যুক্তরাষ্ট্রকে পুয়ের্তো রিকো, গুয়াম এবং ফিলিপাইন ছেড়ে দেয়। স্বাধীন ঘোষণা করা হয় কিউবাকে।

এই চুক্তি স্পেনের জন্য ছিল একটি ঐতিহাসিক বাঁকবদল। শেষ উপনিবেশগুলোও হারানোর মাধ্যমে এক সময়ের অন্যতম প্রভাবশালী সাম্রাজ্য থেকে একটি পিছিয়ে পড়া ইউরোপীয় রাষ্ট্রে পরিণত হয় স্পেন। সেই সময় যদি অটোমান সাম্রাজ্যকে বলা হতো 'ইউরোপের অসুস্থ মানুষ', তবে স্পেনও তখন খুব একটা সুস্থ অবস্থায় ছিল না। যেহেতু দেশটি আর মহাশক্তি হিসেবে নিজেকে দাবি করতে পারছিল না, তাই তার অঞ্চলগুলোর মধ্যেও স্পেনীয় পরিচয়ে আবদ্ধ থাকার তাগিদ কমে যায়।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে নিজেকে দূরে রাখে স্পেন। কিন্তু ইউরোপজুড়ে ডানপন্থী ফ্যাসিবাদ ও বামপন্থী কমিউনিজমের ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্ব থেকে রক্ষা পায়নি দেশটি। তখনকার তথাকথিত স্প্যানিশ গণতন্ত্র ছিল খুবই দুর্বল ভিত্তির ওপর দাঁড়ানো। ১৯২৩ সালে স্পেনের রাজা ত্রয়োদশ আলফনসোর সমর্থনে এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জেনারেল মিগুয়েল প্রিমো দে রিভেরা ক্ষমতা দখল করেন। দেশে চালু হয় একনায়কতন্ত্র। তার শাসনব্যবস্থায় অবকাঠামোগত কিছু উন্নয়ন

ঘটলেও, স্বৈরতন্ত্র ও দুর্নীতির কারণে মাত্র ছয় বছরেই তার শাসনের অবসান ঘটে। ১৯৩১ সালে নতুন করে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বামপন্থী রিপাবলিকানরা জয়ী হয় এবং স্পেনকে একটি প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করে। তারা সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সরিয়ে দেয়, চার্চের বিশেষাধিকার খর্ব করে, জমিদারদের বিশাল ভূ-সম্পত্তি জাতীয়করণ করে এবং শিল্প শ্রমিকদের মজুরি উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ায়। সংক্ষেপে বলা যায়, তারা দেশের চারটি সবচেয়ে শক্তিশালী গোষ্ঠী—গির্জা, সেনাবাহিনী, জমিদার শ্রেণি এবং শিল্পপতিদের বিরোধিতা নিশ্চিত করে ফেলে। এদিকে স্প্যানিশ প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হওয়ার পর কাতালোনিয়ার জাতীয়তাবাদী দলগুলো স্বায়ত্বশাসনের দাবি তোলে। একটি চুক্তিপত্রও তৈরি করে তারা। ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই স্বায়ত্বশাসন বিধি স্প্যানিশ পার্লামেন্টে অনুমোদিত হয়। এই বিধির মাধ্যমেই কাতালোনিয়ায় অষ্টদশ শতকের পরে আবারও নিজস্ব জেনারেলিতাত সরকার প্রতিষ্ঠা করা হয়।

একসঙ্গে এতগুলো ক্ষমতাশালী গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার ফলে দ্রুত প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এক বছরেরও কম সময়ের মধ্যে আরেকটি অভ্যুত্থানের চেষ্টা হয়। সেটি ব্যর্থ হলেও এর প্রভাবে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয় এবং ১৯৩৩ সালে আবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এবার ক্ষমতায় আসে একটি ডানপন্থী সরকার। এই নতুন সরকার পূর্ববর্তী সরকারের প্রবর্তিত অধিকাংশ সংস্কার বাতিল করে দেয়। এমনকি ফিরিয়ে নেওয়া হয় কাতালোনিয়া অঞ্চলের স্বায়ত্তশাসনের অধিকারও। এরপর দেশজুড়ে ধর্মঘট, সরকারবিরোধী বিক্ষোভ, দমন-পীড়ন এবং আর্থিক অস্থিরতার আবহে ১৯৩৬ সালে আবার নির্বাচন হয়। এই নির্বাচনে বিজয়ী হয় বামপন্থী দলগুলোর সমন্বয়ে গঠিত 'ইউনাইটেড পপুলার ফ্রন্ট'। কিন্তু এই সময় স্পেনের রাজনীতি ক্রমেই চরমপন্থার দিকে ঝুঁকে পড়তে থাকে। উভয় পক্ষই রাজনৈতিক সহিংসতা ও প্রতিশোধপরায়ণতার পথে চলে যায়। দেশ এক ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়ায়।

এর পরিণতি ঘটে মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে। ১৯৩৬ সালের ১২ই জুলাই পপুলার ফ্রন্ট সরকারের অনুগত আধাসামরিক বাহিনী 'আসালতো গার্ড' এর প্রধান হোসে কাস্তিয়ো নিহত হন। তাকে হত্যা করে এক চরম ডানপন্থী গোষ্ঠী। এই দলটি তাকে 'বামপন্থার প্রতীক' হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। এই হত্যার প্রতিশোধ আসে দ্রুত এবং একদম রাষ্ট্রীয় সহিংসতার রূপে। সেই রাতেই পুলিশের সহায়তায় স্পেনের অন্যতম ডানপন্থী নেতা হোসে কালভো সোটেলোর বাড়িতে হানা দেয়

কিছু বামপন্থী অস্ত্রধারী। তাকে যখন পুলিশ ভ্যানে করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন গাড়ির ভেতরেই ঘাড়ের পেছনে গুলি করে হত্যা করা হয়।

সোটেলোর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় হাজার হাজার ডানপন্থী সমর্থক উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখান থেকে তারা শহরের কেন্দ্রে মিছিল করে গেলে 'আসালতো গার্ড' বাহিনী গুলি চালায় এবং কয়েকজন প্রতিবাদকারী নিহত হয়। সোটেলোর হত্যাকে চূড়ান্ত অপমান হিসেবে দেখেছিল ডানপন্থীরা। অন্ত্যেষ্টির মাত্র তিন দিন পরেই সেনা বিদ্রোহ শুরু হয়। আফ্রিকায় স্পেনের উপনিবেশ মেলিলায় অবস্থানরত সেনারা চার জেনারেলের অধীনে বিদ্রোহে নামে। এটাই ছিল স্পেনের গৃহযুদ্ধের সূচনালগ্ন। এই চার জেনারেলের একজন ছিলেন ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কো, যিনি পরবর্তীতে স্পেনের একনায়ক হয়ে ওঠেন।

এরপর প্রায় দুই বছর ধরে দেশজুড়ে রক্তক্ষয়ী সংঘাত চলতে থাকে। হিটলার ও মুসোলিনির প্রশিক্ষিত সেনাদের সহায়তায় ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বাধীন ন্যাশনালিস্টরা ধীরে ধীরে রিপাবলিকান বাহিনীর প্রতিরোধ ভেঙে ফেলতে থাকে। অবশ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন রিপাবলিকানদের অস্ত্র দিয়ে সহায়তা করেছিল। তবু শক্তির ভারসাম্য ছিল অসম।

১৯৩৮-৩৯ সালের শীতকালে রিপাবলিকান বাহিনী কার্যত ভেঙে পড়ে। ফ্রাঙ্কোর দখলকৃত অঞ্চল থেকে পালানো প্রায় ৩০ লক্ষ শরণার্থী আর অবরোধের চাপে খাদ্যসামগ্রীও প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। কাতালোনিয়া ছিল রিপাবলিকানদের শেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি। ১৯৩৯ সালের জানুয়ারি মাসে জেনারেল ফ্রাঙ্কোর বাহিনীর আক্রমণে বার্সেলোনা সহ সমগ্র কাতালোনিয়ার পতন হয়। কাতালোনিয়ার পতনের পর জানুয়ারির সেই তীব্র শীতে প্রায় পাঁচ লাখ সামরিক ও বেসামরিক মানুষ বার্সেলোনা ছেড়ে ফরাসি সীমান্তের পথে রওনা হয়। এই অভিযাত্রা ইতিহাসে লা রেতিরাদা বা পিছু হটা নামে পরিচিত। কিছু কিছু মানুষকে এই ১৬০ কিলোমিটার পথ পাড়ি হতে হয় পায়ে হেঁটে। পথের মধ্যে তাদের ওপর বারবার হামলা চালায় জার্মান ও ইতালীয় যুদ্ধবিমান।

অবশেষে ফ্রাঙ্কোর সেনারা বার্সেলোনায় প্রবেশ করে। ফেব্রুয়ারির শেষদিকে ব্রিটেন ও ফ্রান্স তাকে স্পেনের বৈধ সরকার প্রধান হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেয়। মার্চ মাসে ফ্রাঙ্কোর দুই লাখ সৈন্য কোনো প্রতিরোধ ছাড়াই মাদ্রিদে প্রবেশ করে। অনেক নাগরিক বিজয়ের আনন্দে রাস্তায় নামে, আবার অনেকে নির্ঘুম রাত

কাটায় আসন্ন প্রতিশোধের ভয়ে। তারা জানত যে ফ্রাঙ্কোর শুদ্ধি অভিযান নিশ্চিতভাবেই শুরু হবে।

এপ্রিল মাসে ফ্রাঙ্কো সকলের প্রতি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণের আহ্বান জানান। এই দীর্ঘ গৃহযুদ্ধে ঠিক কতজন প্রাণ হারিয়েছেন তা নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে। অনেকে বলেন পাঁচ লাখ মানুষ নিহত হয়েছিল। তবে অনেকের মতে, অনাহার, রোগ এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাসহ ধরলে সংখ্যাটা দশ লাখের কাছাকাছি পৌঁছাবে। যুদ্ধের সময় উভয় পক্ষই হাজার হাজার নারী-পুরুষকে হত্যা করেছিল। আর যুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিবাদী শাসন হয়ে ওঠে আরও নির্মম। নতুন স্পেন গঠনের নামে শুরু হয় নিধনযজ্ঞ। হাজার হাজার রিপাবলিকানকে বিচার ছাড়াই হত্যা করা হয়। কারাবন্দী করা হয় আরও অসংখ্য মানুষকে। যুদ্ধের শুরুর দিকেই ফ্রাঙ্কোর অন্যতম জেনারেল এমিলিও মোলা বলেছিলেন, “সন্ত্রাস ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন। আমাদের এমন দাপট তৈরি করতে হবে যেন সবকিছুর ওপর আমদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে। যারা আমাদের মতো ভাবে না, বিনা দ্বিধায় তাদের নির্মূল করতে হবে।”

ধীরে ধীরে ফ্রাঙ্কোর চারপাশে ব্যক্তিপূজার আবহ গড়ে উঠতে শুরু করে। তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেন ‘এল কৌদিও’ বা ‘নেতা’ নামে। রিপাবলিকান সরকারের প্রণীত উদারনৈতিক আইনগুলো একে একে বাতিল করা হয়। তার জায়গায় আসে এমন সব আইন, যেখানে নারীদের অধিকার কঠোরভাবে সংকুচিত করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং আদালতের বিচারক হিসেবে নারীদের নিয়োগ নিষিদ্ধ করা হয় স্পেনে। কেবল বিচারক হওয়াই নয়, আদালতে সাক্ষ্য দেওয়ার অধিকার থেকেও বঞ্চিত ছিল তারা। চার্চ কোনো আপত্তি তো জানায়ইনি, বরং এসব বিধি সমর্থন করেছিল। চার্চের ঘোষণা ছিল, ঐশ্বরিক বিধানই জাতি রক্ষার জন্য ফ্রাঙ্কোকে পাঠিয়েছে। ফলে ধর্মীয় অনুশাসন, পুরুষতান্ত্রিকতা ও সামরিক নিয়ন্ত্রণে গড়া এক কঠোর রাষ্ট্রব্যবস্থা দাঁড়িয়ে যায় অল্প সময়ের মধ্যেই। সামরিক জান্তা স্পেনকে ‘একক ও অভিন্ন জাতিসত্তা’ হিসেবে প্রচার শুরু করে। এই প্রচারণার আড়ালে মূলত জাতিগত বৈচিত্র্য ধ্বংসের পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছিল। একক জাতিসত্তার ধারণা কায়েমের নামে কাতালান ও বাস্ক জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র ভাষা, সংস্কৃতি ও রাজনৈতিক চেতনাকে দমন করার চেষ্টা চলে। জনসম্মুখে কাতালান ও বাস্ক ভাষায় কথা বলা নিষিদ্ধ করা হয়। চালু করা হয় এক ভয়াবহ স্লোগান: “সি এরেস এসপানোল, হাবলা এসপানোল!” অর্থাৎ “তুমি যদি স্প্যানিশ হও, তবে

স্প্যানিশ ভাষায় কথা বলো!" ফলে বাস্ক ও কাতালান ভাষা তখন কেবল গোপনে, ব্যক্তিগত পরিসরে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কো ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত স্পেন শাসন করেন। তার স্বপ্ন ছিল একক সংস্কৃতি ও একক পরিচয়ের স্পেন গড়ে তোলা। কিন্তু, তার আগের বহু শাসকের মতোই তিনিও পরাজিত হন সেই ভৌগোলিক বাস্তবতার কাছে, যা বহু শতাব্দী ধরে আঞ্চলিক ভাষা ও পরিচয়কে বাঁচিয়ে রেখেছিল। তার অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে ওঠে এফসি বার্সেলোনার তৎকালীন হোম গ্রাউন্ড 'ক্যাম্প দে লেস কোর্তস' স্টেডিয়াম। ফ্রাঙ্কো মাদ্রিদ ভিত্তিক ফুটবল ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদের সমর্থক হিসেবে পরিচিত ছিলেন। যদিও, ফুটবল খেলার প্রতি তার তেমন কোনো ভক্তি ছিল না। এই সমর্থন ছিল তার জাতীয়তাবাদী প্রকল্পের অংশ। ফ্রাঙ্কোর কাছে ফুটবল ছিল জাতীয় গৌরব ও ঐক্য প্রদর্শনের একটি হাতিয়ার। আর সে কারণেই রিয়াল মাদ্রিদকে তার শাসনের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করতেন তিনি। তার পক্ষে তো আর এমন কোনো ক্লাবকে জাতীয় প্রতীক বানানো সম্ভব ছিল না, যার আঞ্চলিক সমর্থকরা স্বায়ত্তশাসন চাইত।

ফ্রাঙ্কোর চোখে বার্সেলোনা ফুটবল ক্লাব কেবল একটি ফুটবল দল ছিল না, এটি ছিল কাতালান জনগণের সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক প্রতিরোধের একটি দুর্গ। ফ্রাঙ্কো তার 'এক জাতি, এক রাষ্ট্র' আদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য জোরপূর্বক কাতালোনিয়ার নিজস্বতা মুছে ফেলতে চেয়েছিলেন। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে বার্সেলোনার আসল কাতালান নাম 'ফুতবল ক্লাব বার্সেলোনা' বদলে কাস্তিলীয় রূপ 'ক্লাব দে ফুতবল বার্সেলোনা' করে দেওয়া হয়েছিল। ক্লাবের ব্যাজ থেকে কাতালান পতাকার পরিচিত চারটি লাল ডোরা সরিয়ে ফেলা হয়। এই ডোরাগুলো ছিল কাতালোনিয়ার বহু পুরোনো স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। এই প্রতীকের জায়গায় যোগ করা হয় স্পেনের জাতীয় পতাকার রঙ। কিন্তু এত আয়োজনের পরেও সমর্থকদের চেতনায় বিন্দুমাত্র পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়নি। কাতালান জনগণের কাছে ফুটবল মাঠ হয়ে ওঠে নিষিদ্ধ জাতীয়তাবাদ প্রকাশের একমাত্র নিরাপদ স্থান। স্টেডিয়ামের গ্যালারিতে হাজার হাজার সমর্থক সমবেতভাবে কাতালান ভাষায় গান গাইতেন এবং স্লোগান দিতেন। পুলিশ এবং প্রশাসনের কঠোর নজরদারি ছিল, কিন্তু হাজার হাজার আবেগপ্রবণ দর্শককে তো কেবল নিজেদের ভাষা ব্যবহারের অপরাধে গ্রেপ্তার করা যায় না। ১৯৫৭ সালে ক্লাবটি তার নতুন এবং সুবিশাল স্টেডিয়াম ক্যাম্প ন্যুতে

স্থানান্তরিত হওয়ার পরেও সেই প্রতিরোধ অব্যাহত থাকে। বাস্ক অঞ্চলে অ্যাথলেটিক বিলবাওয়ের সমর্থকেরাও একইভাবে মাদ্রিদের প্রতি তাদের মনোভাব প্রকাশ করত। আজও বহু মানুষ সেই ধারা বজায় রেখেছে।

শুধু ফুটবলই নয়, সাংস্কৃতিক পরিসরেও ফ্রাঙ্কোর দমননীতি ছিল সুস্পষ্ট। কাতালানদের ঐতিহ্যবাহী লোকনৃত্য 'সারদানা' নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। এই নৃত্যে অংশগ্রহণকারীরা হাত ধরে গোল বৃত্ত তৈরি করেন, যে বৃত্ত সদস্যসংখ্যা বাড়া বা কমার সঙ্গে প্রসারিত বা সংকুচিত হয়। স্বাভাবিকভাবেই, কাতালানরা যেখানে সুযোগ পেত, সেখানেই এই নৃত্য করত। এটা ছিল এক ধরনের প্রতিবাদ। বৃত্তটি ছিল কাতালান ঐক্য, অন্তর্ভুক্তি এবং সহাবস্থানের প্রতীক।

তবে প্রতিরোধের ভাষা সব সময় গান, নৃত্য কিংবা ফুটবল মাঠেই সীমাবদ্ধ ছিল না। কেউ কেউ বেছে নিয়েছিলেন আরও প্রত্যক্ষ ও বিপজ্জনক পথ। অনেকেই জড়িয়ে পড়েন সশস্ত্র সংগ্রামে। ১৯৪০-এর দশকজুড়ে স্পেনের বিভিন্ন পার্বত্য অঞ্চলে গেরিলা যোদ্ধারা ফ্রাঙ্কোর সিভিল গার্ড বাহিনীর বিরুদ্ধে হামলা চালাত। ফ্রাঙ্কোর সরকার সাধারণত তাদের 'ডাকাত' কিংবা 'দুষ্কৃতিকারী' বলে প্রচার করত। এদের বড় অংশই ছিল রিপাবলিকান প্রতিরোধ যোদ্ধা, যারা ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিবাদী শাসনের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল। এদের কেউ কেউ ফ্রান্স থেকে সীমান্ত পেরিয়ে অভিযান চালাত। আবার কেউ পাহাড়ি এলাকায় আত্মগোপন করে শহর ও সেনাঘাঁটিতে চালাত চোরাগোপ্তা আঘাত। তবে এসব গেরিলা হামলায় শাসনব্যবস্থার ওপর কখনো গুরুতর হুমকি তৈরি হয়নি। সরকার এই ঘটনাগুলো সম্পূর্ণ চেপে রাখত। সংবাদপত্র ও রেডিওতে গেরিলা সংগ্রামের কথা বলা ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এই বিষয়ে গবেষণা হলেও তথ্য অপ্রতুল। তবে গবেষণায় ধারণা করা হয়, কয়েক হাজার গেরিলা নিহত হয়েছিল, আর সিভিল গার্ডদের হতাহতের সংখ্যা ছিল কয়েক শত। শেষ বিদ্রোহী হিসেবে খ্যাত হোসে কাস্ত্রো ভেইগা ১৯৬৫ সালে গালিসিয়ায় গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হন।

রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম এই সময়ের বেশিরভাগ ঘটনাই চেপে গিয়েছিল। ফলে সাধারণ মানুষ পরিস্থিতি সম্পর্কে খুব কমই জানত। তাছাড়া, তারা নিজেরাই তখন যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির মধ্যে বেঁচে থাকার জন্য সংগ্রাম করছিল। স্পেনের অর্থনীতি সে সময় এতটাই ধ্বসে পড়েছিল যে, দেশের আর্থিক অবস্থা গিয়ে ঠেকেছিল ১৯০০ সালের স্তরে। এর মধ্যেই ফ্রাঙ্কো 'আটার্কি' নামে এক নতুন অর্থনৈতিক নীতি চাপিয়ে দিলেন। এর মূলনীতি ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণতা, মূল্যনিয়ন্ত্রণ, আর বাইরের

দেশের সঙ্গে বাণিজ্য সীমিত রাখা। এই নীতির ফলাফল ছিল ভয়াবহ। খাদ্যদ্রব্যের হাহাকার, কৃষিপণ্য উৎপাদনে ধ্বস, শিল্পকারখানায় স্থবিরতা—সব মিলিয়ে এই দশক পরিচিত হয়ে ওঠে 'লোস আনোস দে হামব্রে' অর্থাৎ 'ক্ষুধার বছরগুলো' নামে।

অর্থনীতির এই ভয়াবহ অবস্থা সত্ত্বেও বিপুল অর্থ ও জবরদস্তিমূলক শ্রম ব্যবহার করে ফরাসি সীমান্তে কয়েক হাজার বাংকার নির্মাণ করতে থাকে ফ্রাঙ্কোর সরকার। এই প্রতিরক্ষা বলয়কে বলা হতো 'পিরেনিজ লাইন'। এর উদ্দেশ্য ছিল স্পেনকে স্থলপথের হুমকি থেকে রক্ষা করা। সেনাবাহিনী জানত, দীর্ঘ সহিংস অতীত জুড়ে বহু আক্রমণকারী পিরেনিজ পর্বতমালার নিচু উপত্যকা ও আইবেরীয় উপদ্বীপে প্রবেশ করেছে। বিশেষ করে বাস্ক অঞ্চল ও কাতালোনিয়া ছিল প্রতিরক্ষার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি। সেই আশঙ্কা থেকেই পাহাড়ি অঞ্চলজুড়ে গড়ে তোলা হয় এই প্রতিরক্ষা কাঠামো। এর মধ্যে বহু বাঙ্কার এখনও টিকে আছে। তবে এখন সেগুলো পরিত্যক্ত ও আগাছায় ঢাকা। এগুলো ফ্রাঙ্কো আমলের আংশিক স্বেচ্ছা-নির্বাসনের স্মারক হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তৎকালীন শাসনব্যবস্থা বিশ্বাস করত, বিদেশি প্রভাব স্পেনের বিশুদ্ধতা ও শক্তিকে দুর্বল করে দেবে। এরই প্রতিধ্বনি ছিল এক উচ্চপদস্থ জেনারেলের উক্তিতে, "স্পেন ইউরোপ নয়, কখনোই ছিল না।"

ফ্রাঙ্কোর অবশ্য বন্ধুও ছিল। সমস্যা হলো, তাদের নাম ছিল আডলফ ও বেনিতো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন নাৎসি জার্মানি ও ফ্যাসিস্ট ইতালির ঘনিষ্ঠ মিত্র ছিল ফ্রাঙ্কোর স্পেন। এমনকি পূর্ব ফ্রন্টে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে হিটলারের সেনাদের পাশে যুদ্ধ করতে 'ডিভিসিওন আজুল' বা ব্লু ডিভিশনের ৫০,০০০ স্প্যানিশ সেনাও পাঠিয়েছিল স্পেন। কিন্তু যুদ্ধের পর চিত্র বদলে গেল। নাৎসি জার্মানি ও ফ্যাসিস্ট ইতালি ধ্বংস হয়ে গেলে। ফ্রাঙ্কোর স্পেন হয়ে পড়ল একা। নাৎসিদের মিত্র কোনো ব্যক্তির সাথে সম্পর্ক রাখতে পশ্চিমা দেশগুলো একদমই আগ্রহী ছিল না। ফলে স্পেন কার্যত একঘরে হয়ে পড়ে। তারা জাতিসংঘে সদস্যপদও পায়নি। ইউরোপ পুনর্গঠনের জন্য গৃহীত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মার্শাল প্ল্যান থেকেও বাদ পড়ে তারা। এমনকি ন্যাটো জোটের কাছেও স্পেন ছিল অবিশ্বাসের চোখে দেখা এক রাষ্ট্র।

ফ্রাঙ্কো ধৈর্য ধরে সময় কাটালেন। তিনি জানতেন, ব্রিটিশদের জন্য জিব্রাল্টার একটি অত্যন্ত কৌশলগত অঞ্চল। জিব্রাল্টারের মালিকানার কারণে আইবেরীয় উপদ্বীপের

স্থিতিশীলতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয় তারা। তাই তারা তার শাসন উৎখাতের মতো সহিংস কোনো পদক্ষেপে সমর্থন দেবে না। কিন্তু তার আসল বন্ধু হয়ে উঠল সময়। স্নায়ু যুদ্ধের সূচনা পশ্চিমা শক্তিগুলোকে বাধ্য করেছিল 'রিয়েলপলিটিক' বা রাজনৈতিক বাস্তবতার পথে হাঁটতে। ফ্যাসিবাদের বদলে ইউরোপের নতুন হুমকি হয়ে উঠেছিল সোভিয়েত কমিউনিজম। বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপে এমন কিছু অংশীদার চাইছিল, যারা অন্ততপক্ষে অ্যান্টি-কমিউনিস্ট হবে। এই নতুন ভূরাজনৈতিক সমীকরণ ফ্রাঙ্কোর জন্য এক সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয়।

অ্যামেরিকানদের বিশেষ দুশ্চিন্তা ছিল, সোভিয়েতরা যদি পশ্চিম ইউরোপে হামলা চালায়, তবে স্তালিনের বাহিনীর একটি অংশ দক্ষিণ-পশ্চিমে স্পেনে ঢুকে পড়তে পারে। তারা স্পেনকে ভাবছিল নিজেদের 'কৌশলগত গভীরতা' হিসেবে। অর্থাৎ এমন একটি স্থান, যেখানে প্রতিরক্ষার ঘাঁটি গড়ে তোলা যাবে এবং রাইন নদীর তীরে রেড আর্মিকে ঠেকাতে ব্যর্থ হলে সেখানেই পিছু হটা যাবে। ১৯৪৭ সালে মার্কিন জয়েন্ট ওয়ার প্ল্যানস কমিটি এক গবেষণায় অনুমান করে, পশ্চিম ইউরোপে আক্রমণের তিন মাসের মধ্যেই সোভিয়েতরা পিরেনিজ পর্বতমালা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। এরপর সেই পর্বত অতিক্রম করতে লাগবে বিশ দিন। তারপর আটলান্টিক উপকূল ধরে লিসবন আর ভূমধ্যসাগরীয় উপকূল ধরে বার্সেলোনা পর্যন্ত অগ্রসর হবে তারা। চল্লিশ দিনের মধ্যে তারা পৌঁছে যাবে জিব্রাল্টারে। তখন ভূমধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগর উভয়ই তাদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসবে।

এই প্রেক্ষাপটে স্পেনে সামরিক ঘাঁটির অধিকার পেতে প্রাথমিক আলোচনা শুরু হয়। আলোচনা চলতে থাকে কয়েক বছর ধরে। অবশেষে, ১৯৫১ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যান স্পষ্ট করে দেন যে, স্পেন-সংক্রান্ত নীতির পরিবর্তন হচ্ছে। তিনি বলেছিলেন, "আমি ফ্রাঙ্কোকে পছন্দ করি না, আর কোনোদিন করবও না। কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি তোমাদের সামরিক বিশ্লেষণের ওপরে প্রাধান্য পাবে না।"

দুই বছর পর ১৯৫৩ সালে স্বাক্ষরিত হয় ঐতিহাসিক 'মাদ্রিদ চুক্তি'। এই চুক্তির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র স্পেনে সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনীর ঘাঁটি স্থাপনের অধিকার পায়। বিনিময়ে স্পেন পায় বিশ বছরে দুই বিলিয়ন মার্কিন ডলারের সামরিক ও অর্থনৈতিক সহায়তা। ফ্রান্স তখন এই চুক্তির তীব্র বিরোধিতা করেছিল। ফরাসিদের আশঙ্কা ছিল, ইউরোপে যুদ্ধ শুরু হলে যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্সের চেয়ে

স্পেনের প্রতিরক্ষায় বেশি মনোযোগ দেবে। সেই পরিস্থিতিতে গণতান্ত্রিক ইউরোপের শেষ প্রতিরোধ গড়ে উঠবে ফ্যাসিবাদী স্পেনে।

চুক্তি স্বাক্ষর করার পরও প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যানকে ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হয়নি। সেই বিতর্কিত সম্মান জুটেছিল তার উত্তরসূরি ডুয়াইট ডি. আইজেনহাওয়ারের কপালে। ১৯৫৯ সালে প্রথম অ্যামেরিকান প্রেসিডেন্ট হিসেবে স্পেন সফর করেন তিনি। এই সফরটি ছিল প্রতীকি অর্থে সময়ের এক নির্মম প্যারাডক্স। ঠিক বিশ বছর আগে ফ্রাঙ্কোকে দেখা গিয়েছিল হিটলারের সঙ্গে কাতার মিলিয়ে হাঁটতে, নাৎসি অনার গার্ডের সামনে ফ্যাসিস্ট স্যালুট দিতে। আর এখন সেই ফ্রাঙ্কোই মাদ্রিদের রাজপথে হাঁটছেন এক মার্কিন প্রেসিডেন্টের পাশে, আর পেছনে বাজছে 'দ্য ইয়েলো রোজ অফ টেক্সাস'। স্পেনের যেসব মানুষ গণতন্ত্রের স্বপ্ন দেখতেন, তাদের কাছে এই দৃশ্য ছিল এক চরম মনস্তাত্ত্বিক আঘাত।

তবে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কিছুটা স্বস্তি ফিরে আসে। চুক্তির ফলে স্পেনকে বাণিজ্যিক বিধিনিষেধ শিথিল করতে হয় এবং বিদেশি বিনিয়োগেরও সুযোগ দিতে হয়। নীরবে পরিত্যাগ করা হয় আগের আত্মনির্ভরতার নীতি। এর ফলে সাময়িকভাবে মুদ্রাস্ফীতি বেড়েছিল, তবে ১৯৬০-এর দশকে দেশ জুড়ে দেখা দেয় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি। জনসাধারণের জীবনযাত্রায় দৃশ্যমান পরিবর্তন আসে। কষ্টের দিন পেছনে ফেলে মানুষ ঝুঁকে পড়ে আধুনিক ভোগ্যপণ্যের দিকে। পশ্চিম ইউরোপের বাকি দেশগুলোর মতো স্পেনের মধ্যবিত্ত ঘরেও প্রবেশ করতে থাকে টেলিভিশন, রেফ্রিজারেটর, ওয়াশিং মেশিনের মতো ভোগ্যপণ্য।

১৯৬৯ সালে বার্ধক্য আর অসুস্থতায় ফ্রাঙ্কোর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। সেই অবস্থায় তিনি একটি উত্তরাধিকার আইন স্বাক্ষর করে রাজপুত্র হুয়ান কার্লোসকে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রপ্রধান ও রাজা হিসেবে মনোনীত করেন। ফ্রাঙ্কো বিশ্বাস করেছিলেন কার্লোস রাজনৈতিক কাঠামো অক্ষুণ্ণ রাখবেন। অন্যদিকে ফ্রাঙ্কোর অনুসারী শাসকগোষ্ঠী ভেবেছিল কার্লোসকে নিজেদের ইচ্ছেমতো নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। আর সাধারণ মানুষ ধারণা করেছিল তিনি তাদের জীবনে কোনো পরিবর্তনই আনতে পারবেন না। তিন পক্ষকেই ভুল প্রমাণ করেছিলেন কার্লোস।

দীর্ঘ ছত্রিশ বছরের স্বৈরশাসনের পর ১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসে মারা যান ফ্রান্সিসকো ফ্রাঙ্কো। মৃত্যুর সময় তার বয়স ছিল বিরাশি। সামরিক জান্তা তখনো আশাবাদী ছিল নতুন রাজাকে ব্যবহার করে নিজেদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখবে। কিন্তু তারা ধারণাও করেনি যে রাজা নিজেই রাষ্ট্র গড়ার কাজ শুরু করবেন।

স্পেনের পার্লামেন্ট কোর্তেসের প্রেসিডেন্ট আলেহান্দ্রো রদ্রিগেস দে ভালকার্সেল মন্তব্য করেছিলেন, "নতুন রাজপুত্রের দায়িত্ব কেবল আনুষ্ঠানিকতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে।" এই বক্তব্য আসলে স্পষ্ট করে দেয়, তারা হুয়ান কার্লোসকে কতটা ঠুনকো প্রতীক হিসেবে ভাবছিল। কিন্তু অভিষেকের দিনেই রাজা সেই ধারণা সম্পূর্ণ বদলে দেন। অভিষেক অনুষ্ঠানের ভাষণে তিনি স্পষ্টভাবে বলেন, "স্পেনকে ইউরোপের অংশ হতে হবে, কারণ স্প্যানিশরাও ইউরোপীয়।" তিনি সরাসরি গণতন্ত্রের কথা উচ্চারণ করেননি, কিন্তু তার এই বক্তব্য ছিল এক সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। কারণ, রাজনৈতিকভাবে ইউরোপের অংশ হতে চাইলে স্পেনকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হতেই হতো।

হুয়ান কার্লোস খুব সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রেখে এগিয়ে চলার পথ বেছে নিলেন। ধাপে ধাপে কর্তৃত্ববাদী কাঠামো ভেঙে নতুন গণতান্ত্রিক স্পেন গড়ে তোলার কাজে হাত দেন তিনি। তিনি জানতেন, স্পেনের নানামুখী বিভাজনের মাঝে তাকে সবার সঙ্গে কথা বলতে হবে। আগেই তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে তিনি 'সব স্পেনীয়দের রাজা' হতে চান। এই ঘোষণার মধ্য দিয়েই তিনি কার্যত স্বীকার করে নেন যে, বহু শতাব্দীর একক জাতি গড়ার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। এরপর তিনি কাতালোনিয়া ও গালিসিয়া সফর করলেন। তাদের স্থানীয় ভাষা ও স্বতন্ত্র পরিচয়কে স্বীকৃতি দিয়ে ভাষণ দিলেন। ফ্রাঙ্কো যেখান থেকে এসেছিলেন, সেই গালিসিয়ায় গিয়ে তিনি গালিসীয় ভাষায় একটি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য দেন। এই ভাষাটি স্প্যানিশের তুলনায় পর্তুগিজের খুব কাছাকাছি এবং বহুদিন উপেক্ষিত ছিল। তিনি বক্তৃতা শেষ করেন, "ভিভা গালিসিয়া!" অর্থাৎ "গালিসিয়া দীর্ঘজীবী হোক!" বলে। স্পেনে এক নতুন যুগের সূচনা হলো।

এরপর পরিবর্তন দ্রুতই স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করে। ফ্রাঙ্কোর শাসনামলে রাজনৈতিক দলগুলোর ওপর যে নিষেধাজ্ঞা ছিল, তা একে একে তুলে নেওয়া হয়। গণমাধ্যমের ওপর নিয়ন্ত্রণও শিথিল করা হয়। তবে, পুরোনো শাসকগোষ্ঠী এসব সংস্কারের পথে বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। সেনাবাহিনীর মধ্যে তখনও ফ্রাঙ্কোর অনুগত একটি অংশ সক্রিয় ছিল, তাই আশঙ্কা ছিল সেনা অভ্যুত্থানেরও। তবুও হুয়ান কার্লোস নিজের ধৈর্য, রাজনৈতিক বিচক্ষণতা ও কৌশল দিয়ে গণতন্ত্রের পথে এগিয়ে যেতে থাকেন। অবশেষে ১৯৭৬ সালে একটি গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে ভোটারের উপস্থিতি ছিল ৭৭.৭ শতাংশ। ৯৭.৪ শতাংশ ভোটার প্রস্তাবিত সংস্কারের পক্ষে ভোট দেন। আর এর মাধ্যমে সংসদীয় রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়

স্পেন। অর্থাৎ—রাজা থাকবেন, কিন্তু তার ক্ষমতা হবে সাংবিধানিকভাবে নিয়ন্ত্রিত। নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই নেবেন মূল সিদ্ধান্ত। এই গণভোটের পর সব রাজনৈতিক দলকে বৈধতা দেওয়া হয়। এমনকি ফ্রাঙ্কো-সমর্থকরা যাদের সবচেয়ে বেশি ভয় পেত সেই কমিউনিস্ট পার্টিও বৈধতা পায়।

এর পরের বছর, ১৯৩৬ সালের পর প্রথমবারের মতো স্পেনে গণতান্ত্রিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ৩৫০টি আসনের মধ্যে মধ্য-ডানপন্থী দল ১৬৫ আসনে জয় পায় এবং সরকার গঠন করে। সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটরা ১১৮ আসন পেয়ে দ্বিতীয় হয়, আর কমিউনিস্ট পার্টি ২০ আসন পেয়ে থাকে তৃতীয় স্থানে। তবে বিজয়ীর মতোই গুরুত্বপূর্ণ ছিল পরাজিত পক্ষ। ফ্রাঙ্কোর অনুগতদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এপি পার্টি পায় মাত্র ১৬টি আসন। তাদের নেতা মানুয়েল ফ্রাগা ডানপন্থীদের একত্রে ধরে রাখতে পেরেছিলেন। তবে তিনি সবচেয়ে বেশি স্মরণীয় হয়ে আছেন এক হান্টিং ট্রিপে ভুলবশত ফ্রাঙ্কোর মেয়ের নিতম্বে গুলি করার ঘটনার জন্য। যাই হোক, ফলাফল ছিল স্পষ্ট। স্পেনের জনগণ ব্যাপকভাবে এবং স্পষ্টভাবে ফ্রাঙ্কোবাদকে প্রত্যাখ্যান করেছিল।

তবে ফ্রাঙ্কোবাদ এত সহজে মরতে রাজি হয়নি। ১৯৮১ সালে ফ্রাঙ্কোবাদী আদর্শে বিশ্বাসী একদল সামরিক কর্মকর্তা গণতন্ত্রকে উল্টে দিতে চেয়েছিল। লেফটেন্যান্ট-কর্নেল আন্তোনিও তেহেরোর নেতৃত্বে সিভিল গার্ডের ২০০ সদস্য পার্লামেন্ট ভবনে প্রবেশ করে অভ্যুত্থানের চেষ্টা চালায়। বিশাল গোঁফওয়ালা তেহেরো পিস্তল হাতে এমনসব কাণ্ডকারখানা করতে থাকেন যে তাকে একজন নাটকীয় খলনায়ক মনে হচ্ছিল। তেহেরো অস্ত্র তাক করে সংসদ সদস্যদের জিম্মি করেন এবং একপর্যায়ে ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী জেনারেল ম্যানুয়েল গুতিয়েরেস মেলাদোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে মাটিতে ফেলার চেষ্টা করেন। কিন্তু ৬৮ বছর বয়সী জেনারেল শুয়ে পড়তে অস্বীকার করলে তিনি হাল ছেড়ে দেন। ঘটনাটি হাস্যকর মনে হলেও কিছুক্ষণের মধ্যেই গুরুতর হয়ে ওঠে। তেহেরো তার পিস্তল থেকে ওপরের দিকে গুলি ছোঁড়েন, তার সঙ্গী সাব-মেশিনগানধারী কিছু গার্ডও ফাঁকা গুলি চালায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই তিনি স্পেনের প্রধানমন্ত্রী আদোলফো সুয়ারেসের দিকে বন্দুক তাক করেন। কিন্তু সুয়ারেস অবিচলভাবে তেহেরোর দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আর এই পুরো ঘটনাই সরাসরি টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হচ্ছিল।

রাত ১টায় রাজা হুয়ান কার্লোস সামরিক পোশাক পরে টেলিভিশনে হাজির হয়ে বললেন, "রাজমুকুট জাতির স্থায়িত্ব ও ঐক্যের প্রতীক। আর এই প্রতীক

কোনোভাবেই বলপ্রয়োগের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ব্যাহত করার কোনো প্রচেষ্টা বা মনোভাব মেনে নিতে পারে না।" এরপরই অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা শেষ হয়ে গেল। পরদিন গ্রেপ্তার অভিযান শুরু হলো, আর দুপুর নাগাদ হতাশ তেহেরো পার্লামেন্ট ভবন থেকে বেরিয়ে এসে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন। তেহেরো ও অন্য অভ্যুত্থানকারীদের ৩০ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। আর এই ৩০ বছরেই স্পেনের গণতন্ত্র দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়।

১৯৮১ সালে সোশ্যালিস্ট পার্টির বিজয় ছিল স্পেনের রাজনৈতিক ইতিহাসে এক প্রকৃত 'মাইলফলক'। এই প্রথমবারের মতো দেশটি এমন একটি সরকার পেল, যার নেতারা কেউই ফ্রাঙ্কোর একনায়কতান্ত্রিক শাসনামলে প্রশাসনিক ক্ষমতার অংশ ছিলেন না। স্পেন যেন সত্যিকার অর্থেই গণতান্ত্রিক নবযাত্রা শুরু করল। এর ঠিক এক বছর পর, ১৯৮২ সালে স্পেন ন্যাটোতে যোগ দেয়। এরপর ১৯৮৬ সালে দেশটি ইউরোপিয়ান ইকোনমিক কমিউনিটি অর্থাৎ বর্তমানে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্য হয়। ১৯৯৯ সালে তারা গ্রহণ করে ইউরো মুদ্রা। নতুন সংবিধান দেশটিকে ১৭টি আঞ্চলিক প্রশাসনে ভাগ করে। এখন অবশ্য আরও দুইটি প্রশাসনিক অঞ্চল যোগ হয়ে মোট হয়েছে ১৯টি, যার মধ্যে দুইটি উত্তর আফ্রিকার সেউতা ও মেলিয়া। এই প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের মাধ্যমে ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক পার্থক্যগুলোকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তবে এর পরেও প্রাচীন দ্বন্দ্ব থেকে যায়—বিশেষ করে গালিসিয়া, কাতালোনিয়া, বাস্ক দেশ এবং খানিকটা হলেও আন্দালুসিয়ার ক্ষেত্রে।

একটি দেশে একনায়কতন্ত্র চলা অবস্থায় যখন ওই দেশের কোনো অঞ্চল স্বায়ত্তশাসন বা স্বাধীনতার দাবি তোলে, তখন তার 'সমাধান' হয় সাধারণত নির্মম দমননীতি। কিন্তু গণতন্ত্রের ক্ষেত্রে পরিস্থিতি অনেক বেশি জটিল। কারণ, গণতন্ত্রে জনগণের ইচ্ছাই চূড়ান্ত। ফলে কোনো অঞ্চলে যদি আত্মপরিচয় রক্ষার জন্য আলাদা দাবি থাকে, সেটা সরাসরি বাতিল করা বেশ কঠিন। স্পেন যখন ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে যোগ দেয়, তখন অনেকেই মনে করেছিল যে, এই সদস্যপদ হয়তো দেশটির দীর্ঘদিনের পিছিয়ে থাকা অর্থনীতি, দুর্বল প্রশাসনিক কাঠামো এবং কর্তৃত্ববাদী মানসিকতার বিরুদ্ধে একটি টেকসই সমাধান নিয়ে আসবে। এই প্রসঙ্গে জোসে ওর্তেগা ই গাসেত নামক একজন প্রখ্যাত স্প্যানিশ দার্শনিকের একটি উদ্ধৃতি প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। তিনি ১৯১০ সালে লিখেছিলেন, "স্পেনই হলো সমস্যা, আর ইউরোপ তার সমাধান।" স্পেনের বহু নাগরিক

স্বেচ্ছায় সার্বভৌমত্বের কিছুটা অংশ ছেড়ে দিয়েছিল অর্থনৈতিক সুবিধার পাশাপাশি সুশাসনের পাওয়ার আশায়। আসলে, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের দেশগুলোর মধ্যে নিজেদের সরকারের প্রতি অবিশ্বাসের দিক থেকে স্পেনীয়রা আছে রোমানীয়দের ঠিক পরেই। তবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে যোগ দেওয়ার পর আরেকটি নতুন প্রশ্ন সামনে এলো—'কোনো অঞ্চল কি স্পেনের অংশ না হয়েও ইউরোপের অংশ হতে পারে?' স্পেনের ভেতরের কিছু অঞ্চল এখন ভাবতে শুরু করেছে: যদি আমরা ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্য থেকে যাই, তাহলে স্পেনের সঙ্গে বাধ্যতামূলক ঐক্যের প্রয়োজনই বা কেন? এমন প্রবণতা কেবল স্পেনেই নয়, এই বিষয়টা দেখা যায় যুক্তরাজ্য, বেলজিয়াম, ইতালি, এমনকি জার্মানির কিছু অংশেও।

সাম্প্রতিক দশকগুলোতে মাদ্রিদের শাসনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে সহিংস প্রতিরোধ দেখা গেছে বাস্ক অঞ্চলে। এই অঞ্চলটি সাতটি ঐতিহাসিক প্রদেশ নিয়ে গঠিত। এর মধ্যে চারটি আজ স্পেনের অধীনে এবং তিনটি রয়েছে ফ্রান্সের মধ্যে। ১৫১২ সালে স্পেন ও ফ্রান্সের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হয় এই এলাকাটি। স্পেনের অংশের আয়তন উত্তর আয়ারল্যান্ডের প্রায় অর্ধেক এবং জনসংখ্যা ২২ লক্ষ। বাস্ক অঞ্চলটি শুরু হয় পিরেনিজ পর্বতমালার পশ্চিম অংশ থেকে। এরপর এটি ধীরে ধীরে নেমে গেছে বিসকায় উপসাগরের তীরে। উপকূলজুড়ে প্রায় ১৭৬ কিলোমিটার বিস্তৃত এই অংশেই জনসংখ্যার বড় অংশ বাস করে। এখানে গড়ে উঠেছে বেশ কিছু ভারী শিল্প। এই অঞ্চলের অভ্যন্তরীণ অংশটি প্রধানত পাহাড়ি, যা এই অঞ্চলটিকে স্পেনের অন্য অংশ থেকে ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। একইসঙ্গে বাস্ক জাতিসত্তার বিকাশেও ভূমিকা রেখেছে এই বিচ্ছিন্নতা। বাস্ক অঞ্চলটি বর্তমানে দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে বিভক্ত হলেও বহু বাস্ক নাগরিক এখনো নিজেদের একক জাতি হিসেবেই ভাবেন। ওদের কাছে নিজেদের দেশের নাম হলো 'ইউস্কাল হেরিয়া'। ওদের ভাষার নাম 'ইউস্কারা'। এই ভাষাটি এখনো প্রায় এক-চতুর্থাংশ বাস্ক জনগণ ব্যবহার করেন। এটি ইউরোপে প্রচলিত অন্যান্য ভাষার চাইতেও প্রাচীন। ইউরোপের অন্যান্য ভাষা যেখানে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবারের মধ্যে পড়ে, ইউস্কারা সেখানে একদমই ভিন্ন। ভাষাটির উৎস এখনও অজানা এবং এই ভাষাটি ইউরোপের ভাষাগত ইতিহাসের এক রহস্য। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, কাস্তিয়ান স্প্যানিশ ভাষায় I live in Bilbao বাক্যটির অনুবাদ হয় Yo vivo en Bilbao। অর্থাৎ, এক্ষেত্রে বাক্য গঠনের রীতি ইংরেজির মতো। কিন্তু ইউস্কারা ভাষায় এর অনুবাদ হয় Ni Bilbon bizi naiz, যার গঠন দাঁড়ায় কিছুটা এরকম I Bilbao into live am। অর্থাৎ ইংরেজি বা স্প্যানিশ

ভাষার গঠনভঙ্গির সঙ্গে এর সামঞ্জস্য নেই। এর ব্যাকরণগত গঠন এবং শব্দচয়ন এতটাই স্বতন্ত্র যে, হাজার বছর ধরে রোমান লাতিন, আরবি কিংবা আধিপত্যশীল স্প্যানিশ ভাষাও একে পুরোপুরি মুছে দিতে পারেনি।

এই স্বাতন্ত্র্যবোধ থেকেই বাস্ক জনগণ সবসময় স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলেছে। এমনকি সরাসরি স্বাধীনতার আন্দোলনেও নেমেছে তারা। এর আধুনিক রূপ দেখা দেয় ১৯৫৯ সালে প্রতিষ্ঠিত ইটিএ (ETA) এর মাধ্যমে। সংগঠনটির পূর্ণ নাম 'ইউস্কাদি তা আস্কাতাসুনা' অর্থাৎ 'বাস্ক মাতৃভূমি ও স্বাধীনতা'। ETA এর জন্ম হয়েছিল ফ্রাঙ্কোর একনায়কতন্ত্রের প্রতিবাদে। ফ্রাঙ্কোর শাসনামলে ইউস্কারা ভাষায় প্রকাশ্যে কথা বলা ছিল নিষিদ্ধ। এই আইন ভাঙলে জেল পর্যন্ত হতে পারত। নাগরিক রেজিস্ট্রিতে জন্ম ও বিবাহ সনদে থাকা বাস্ক নামগুলো মুছে ফেলে তার জায়গায় স্প্যানিশ নাম বসানো হতো। তখনকার শাসনব্যবস্থা বাস্ক অঞ্চল থেকে সব ধরনের স্বায়ত্তশাসন কেড়ে নিয়েছিল। তবে ETA কেবলমাত্র সেই মর্যাদা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যেই গঠিত হয়নি। তাদের লক্ষ্য ছিল স্পেন–ফ্রান্স সীমান্ত জুড়ে একটি স্বাধীন বাস্ক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা।

ETA এর রক্তাক্ত অধ্যায় শুরু হয়েছিল ১৯৬৮ সালে, এক পুলিশ কর্মকর্তাকে হত্যার মধ্য দিয়ে। এর পরের চার দশকে তারা রাজনীতিবিদ, বিচারক ও সাধারণ নাগরিকদের ওপর হামলা চালায়। গুলি ও বোমা বিস্ফোরণে হত্যা করে ৮৫০ জনেরও বেশি মানুষকে। রাষ্ট্রপক্ষও পাল্টা দমন অভিযানে নামে এবং ETA ইউনিটগুলোকে ধাওয়া করে। কিন্তু এই অভিযানের সময় সাধারণ জনগণের ওপর নির্যাতনের শত শত অভিযোগ ওঠে। এমনকি স্বৈরতন্ত্রের পতনের বহু বছর পরেও এই নিপীড়ন-প্রক্রিয়া থামেনি।

১৯৮৯ সালে ETA বার্সেলোনার এক সুপারমার্কেটে বোমা বিস্ফোরণ ঘটায়। ২১ জন পুরুষ, নারী ও শিশু নিহত হয় এই হামলায়। এটি ছিল টানা চার দশকের রক্তক্ষয়ী সহিংসতায় সবচেয়ে ভয়াবহ ঘটনা। তবে যে হত্যাকাণ্ডটি সংগঠনটির জন্য সবচেয়ে বড় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়, তা ছিল এক ব্যক্তির মৃত্যু। ১৯৯৭ সালে ২৯ বছর বয়সী বাস্ক কাউন্সিলর মিগেল আংহেল ব্লাঙ্কোকে অপহরণ করে ETA. তারা দাবি তোলে, দেশজুড়ে বিভিন্ন কারাগারে থাকা তাদের সদস্যদের ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে বাস্ক অঞ্চলের কারাগারে স্থানান্তর করতে হবে। ঘটনাটি দেশজুড়ে আলোড়ন তোলে। সবাই জানত সরকার এই দাবিতে রাজি হবে না। ব্লাঙ্কোর মুক্তির দাবিতে রাস্তায় নেমে আসে প্রায় ৬০ লাখ মানুষ। শহর থেকে শহরে 'ব্লাঙ্কো

ভিভে' লেখা পোস্টার হাতে মানুষ ভিড় করে রাজপথে। কিন্তু অপহরণের দুইদিন পর তাকে এক বনে নিয়ে যাওয়া হয়, হাঁটু গেড়ে বসতে বাধ্য করা হয়, এবং মাথার পেছন থেকে গুলি করে হত্যা করা হয় তাকে।

এই ঘটনার প্রভাব ছিল মারাত্মক। স্বাধীনতা আন্দোলনের নামে এই ধরনের নিষ্ঠুরতা বহু বাস্ক নাগরিকের কাছেই অসহনীয় হয়ে ওঠে। কেবল সাধারণ মানুষ নয়, বহু স্বাধীনতাপন্থীকেও গভীরভাবে বিচলিত করে তোলে এই নির্মমতা। ETA যে সামান্য জনসমর্থন পেত, সেটিও ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যেতে শুরু করে। ১৯৭৮ সালের স্পেনের সংবিধানে আবারও স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হয়। বাস্ক অঞ্চল তখন থেকে নিজস্ব পুলিশ বাহিনী, কর ব্যবস্থা ও গণমাধ্যম নিয়ন্ত্রণ করছে। অধিকাংশ বাস্ক নাগরিকের কাছেই এটা যথেষ্ট মনে হয়েছে। বহুবার যুদ্ধবিরতির প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের পর অবশেষে ২০১১ সালে ETA ঘোষণা দেয় যে, তারা সম্পূর্ণরূপে সহিংসতা পরিহার করছে। এর সাত বছর পর, ২০১৮ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের সংগঠনকেই বিলুপ্ত ঘোষণা তারা করে। বাস্ক জনগণ এখনো নিজেদের আলাদা জাতিসত্তা হিসেবে দেখে। তবে সাম্প্রতিক জনমত জরিপগুলো বলছে, তারা আধুনিক স্পেন রাষ্ট্রের অংশ হয়ে স্বায়ত্তশাসিত জাতি হিসেবে থাকতে রাজি। এই বিষয়টিকে সবচেয়ে সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছিলেন বাস্ক ন্যাশনালিস্ট পার্টির সভাপতি আন্দোনি অর্তুসার। ফাইন্যান্সিয়াল টাইমসের সাংবাদিক ডেভিড গার্ডনারকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "প্রতিটি সাধারণ বাস্ক নাগরিককে স্পেন রাষ্ট্রের সঙ্গে মাত্র তিনবার যোগাযোগ করতে হয়—ড্রাইভিং লাইসেন্স নিতে, পাসপোর্ট করতে আর পেনশন পেতে। বাকিটা আমরা বাস্ক প্রতিষ্ঠানগুলোই দেখি।"

কিন্তু কাতালোনিয়ার অনেকের কাছে স্বায়ত্তশাসনই যথেষ্ট ছিল না। তাদের চাওয়া ছিল পূর্ণ স্বাধীনতা। এই আকাঙ্ক্ষাকে কেন্দ্র করেই স্পেনের সাম্প্রতিক ইতিহাসের সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক সংকটটি জন্ম নেয়। ১৯৮১ সালের ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থানের পর এত বড় সংকট আর দেখা যায়নি। সপ্তদশ শতাব্দী থেকে কাতালোনিয়া বহুবার মাদ্রিদের শাসন থেকে মুক্ত হওয়ার চেষ্টা করেছে। তবে কাতালানদের সাম্প্রতিক স্বাধীনতাকামী আন্দোলন অনেককেই বিস্মিত করেছিল। কারণ ফ্রাঙ্কোর মৃত্যুর পর কাতালোনিয়াও যথেষ্ট মাত্রার স্বায়ত্তশাসন পেয়েছিল। তখন অনেকেই ভেবেছিলেন, এতেই হয়তো বহুদিনের সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে।

কিন্তু আসলে পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন। কাতালোনিয়া হচ্ছে স্পেনের সবচেয়ে উৎপাদনক্ষম ও ধনী অঞ্চল। আর এটিই সাম্প্রতিক অস্থিরতায় একটি বড় ভূমিকা রেখেছে। আয়তনে এটি বাস্ক অঞ্চলের প্রায় চারগুণ, প্রায় বেলজিয়ামের সমান। জনসংখ্যা প্রায় ৭৫ লাখ। এদের অধিকাংশই কাতালান ভাষায় কথা বলে। ভৌগোলিকভাবে কাতালোনিয়া স্পেনের উত্তর-পূর্ব কোণের ত্রিভুজাকার একটি অঞ্চল। পূর্ব দিকে ভূমধ্যসাগর, উত্তরে পিরেনিজ পর্বতমালা, পশ্চিমে এব্রো নদী আর দক্ষিণে ভ্যালেন্সিয়া অঞ্চল দিয়ে এর সীমানা নির্ধারিত। বাস্ক অঞ্চলের মতো এখানেও অধিকাংশ মানুষ উপকূলবর্তী এলাকায় বাস করে।

কাতালোনিয়ার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির গোড়াপত্তন হয় ঊনবিংশ শতকে টেক্সটাইল শিল্পকে ঘিরে। তবে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অঞ্চলটির অর্থনীতি বহুমুখী রূপ নেয়। বর্তমানে ভারী শিল্প, প্রযুক্তি খাত, রপ্তানি বাণিজ্য ও পর্যটন এখানে সমান গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষত, বার্সেলোনা শহর বর্তমানে ইউরোপের অন্যতম প্রধান অর্থনৈতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। একবিংশ শতকে এসে স্বাধীনতাপন্থীরা স্পেনের বাকি অংশকে স্মরণ করিয়ে দিতে থাকে যে কাতালোনিয়া জাতীয় কোষাগারে যত অর্থ দেয়, সে অনুপাতে সেবাপ্রাপ্তি অনেক কম। এক ধরনের অর্থনৈতিক অবদানের যুক্তি ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের ক্ষেত্রেও অনেক বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। সমৃদ্ধ অঞ্চলগুলো অনেক সময় মনে করে, তাদের অর্থ অপেক্ষাকৃত দরিদ্র অঞ্চলে চলে যাচ্ছে। কিন্তু রাজনৈতিক প্রভাব ও অন্যান্য সুবিধার ক্ষেত্রে তারা যতটা পাওয়ার কথা, সেটা তারা পাচ্ছে না। এই ধরনের হিসাব অত্যন্ত জটিল এবং একাধিক পদ্ধতিতে বিশ্লেষণ করা যায়। তারপরও এই বিষয়টি স্পষ্ট যে, দেশের মোট জনসংখ্যার মাত্র ১৬ শতাংশ কাতালোনিয়ায় বসবাস করলেও স্পেনের মোট জিডিপির প্রায় ২০ শতাংশ এবং রপ্তানির এক-চতুর্থাংশ এই অঞ্চল থেকে আসে।

২০০৮ সালের অর্থনৈতিক মন্দা আঘাত হানলে স্বাধীনতাপন্থীরা সহজেই পুরোনো ক্ষোভ উস্কে দিতে সক্ষম হয়। তাদের অভিযোগে ছিল, মাদ্রিদের খরচ চালাতে কাতালোনিয়ার কর অন্যায্যভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এই রাজনৈতিক আবহেই ২০১৪ সালে কাতালোনিয়ায় একটি অনানুষ্ঠানিক গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্রীয় সরকার এই গণভোটকে স্বীকৃতি না দিলেও স্বাধীনতাপন্থীরা এটিকে জনমত যাচাইয়ের একটি বড় পদক্ষেপ বলে মনে করেছিল। ২০১৭ সালে কাতালোনিয়ার আঞ্চলিক সংসদ একটি আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতা-গণভোট আয়োজনের

অনুমোদন দেয়। স্পেনের সংবিধান অনুযায়ী এটি ছিল অবৈধ। পাশাপাশি সুপ্রিম কোর্ট সেটাকে বাতিলও করে দেয়। দুই ক্ষেত্রেই স্বাধীনতার পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখা গেলেও ভোটদানের হার ছিল অত্যন্ত কম। এই কারণে অনেকেই এই ফলাফলকে বিভাজিত জনমতের প্রতিফলন বলে মনে করেন।

২০১৭ সালের গণভোটকে ঘিরে বার্সেলোনা ও মাদ্রিদের মধ্যে বহুদিনের জমে থাকা রাজনৈতিক উত্তেজনা বিস্ফোরিত হয়ে ওঠে। ভোটের মাত্র কয়েকদিন আগে স্পেনের জাতীয় পুলিশ কাতালোনিয়ার একটি গুদাম থেকে লাখ লাখ ব্যালট পেপার জব্দ করে। গ্রেফতার করা হয় কাতালান সরকারের কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ কর্মকর্তা ও ভোট আয়োজনের দায়িত্বে থাকা কর্মীদের। আঞ্চলিক পুলিশ বাহিনী মোসোস দে এসকোয়াদ্রার ওপর কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালায়। মোসোস দে এসকোয়াদ্রা কাতালোনিয়ার নিজস্ব আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী। এটি স্পেনের সংবিধান অনুযায়ী স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের নিজস্ব অধিকার হিসেবে গঠন করা হয়েছে। এভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপ অনেকের কাছেই 'সংবিধানের লঙ্ঘন' বা 'আঞ্চলিক অধিকারে হস্তক্ষেপ' হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল। ভোটের দিন পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে পড়ে। দেশের নানা প্রান্ত থেকে আনা দাঙ্গা পুলিশ লাঠিচার্জ করে ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে ঢুকতে বাধা দেয়। বহু কেন্দ্রে সংঘর্ষ বাঁধে, আহত হয় শতাধিক ভোটার। ভোটদাতাদের মধ্যে প্রবল আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

এই সহিংস পরিবেশের মধ্যেই কাতালান কর্তৃপক্ষ দাবি করে যে, ৪২ শতাংশ ভোটার উপস্থিত ছিলেন এবং তাদের মধ্যে প্রায় ৯০ শতাংশই স্বাধীনতার পক্ষে ভোট দিয়েছেন। কিন্তু এই তথ্য নিরপেক্ষভাবে যাচাই করা ছিল অসম্ভব। তবে এই ভোটে একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে যায়, স্বাধীনতার বিপক্ষে থাকা অধিকাংশ কাতালান ভোট বর্জন করেছিল।

তবুও কাতালোনিয়ার আঞ্চলিক পার্লামেন্ট ২০১৭ সালের ২৭ অক্টোবর একতরফাভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করে বসে। এর প্রতিক্রিয়া হিসেবে মাদ্রিদ সংবিধানের ১৫৫ নম্বর অনুচ্ছেদ কার্যকর করে। এই ধারা ব্যবহার করে আঞ্চলিক সরকার ভেঙে দেওয়া হয়, কাতালোনিয়ার স্বায়ত্তশাসন বাতিল করা হয় এবং সরাসরি কেন্দ্রীয় শাসন জারি করা হয়। ১৫৫ নম্বর অনুচ্ছেদটি ১৯৭৮ সালে যুক্ত হলেও এই প্রথমবার এটি কার্যকর করা হলো। এরপর কাতালোনিয়ার কিছু নেতাকে 'বিদ্রোহ ও রাষ্ট্রদ্রোহ' করার অভিযোগে কারাগারে পাঠানো হয়।

কাতালোনিয়ার প্রেসিডেন্ট কার্লেস পুচডেমনসহ কয়েকজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেন বেলজিয়াম, জার্মানি ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে। পরবর্তীতে তাদের বিরুদ্ধে ইউরোপিয়ান অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট ইস্যু করা হলেও রাজনৈতিক ও আইনি জটিলতার কারণে প্রত্যর্পণ সম্ভব হয়নি।

স্পেন কাতালোনিয়াকে এত সহজে হাতছাড়া করতে রাজি নয়। কাতালোনিয়ার বিচ্ছিন্নতা স্পেনের জন্য একদিকে যেমন আত্মমর্যাদার ওপর আঘাত হতো, অন্যদিকে অর্থনৈতিকভাবেও এটি হতো অপূরণীয় ক্ষতি। তবে ভৌগোলিক কারণটা প্রায়শই অন্যরা উপেক্ষা করে যান। পুরো ইতিহাস জুড়ে উত্তর দিক থেকে আসা শত্রু বাহিনী স্পেনে প্রবেশ করেছে পিরেনিজ পর্বতমালার দুই প্রান্তের সরু সমতল করিডোর ব্যবহার করে। পশ্চিম প্রান্তে আছে বাস্ক দেশ আর পূর্ব প্রান্তে কাতালোনিয়া। স্পেনের উত্তর সীমান্ত রক্ষার সবচেয়ে কার্যকর কৌশল হলো এই করিডোরগুলো নিয়ন্ত্রণে রাখা। কাজেই ভবিষ্যতে কাতালোনিয়া বা বাস্ক দেশ যদি স্বাধীন হয়ে যায়, তাহলে মাদ্রিদের জন্য তা হবে দুঃস্বপ্ন। কোনো একটি অঞ্চলের সঙ্গে স্পেনের কেন্দ্রীয় সরকারের শত্রুতাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠলেও পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে। বর্তমানে পিরেনিজের নিচ দিয়ে সড়ক টানেল তৈরি হলেও সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে সেগুলো সহজেই অবরুদ্ধ করা সম্ভব। এই টানেলগুলো বর্তমানে স্পেনের অর্থনৈতিক রক্তনালীতেও পরিণত হয়েছে। ইউরোপের বাকি অংশের সঙ্গে স্পেনের স্থলভিত্তিক পণ্য ও রসদ সরবরাহের প্রধান মাধ্যম এই অঞ্চল দুইটি। তাছাড়া, স্পেনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দুইটি বন্দর বার্সেলোনা ও বিলবাও এই দুই অঞ্চলে অবস্থিত। ফলে সাপ্লাই চেইন, অর্থনীতি এবং সামগ্রিক জাতীয় নিরাপত্তার জন্য কাতালোনিয়া ও বাস্ক অঞ্চল স্পেনের কাছে অপরিহার্য।

কাতালোনিয়ার এই স্বাধীনতা-আন্দোলন বর্তমানে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বিশ্বের বহু রাষ্ট্র গভীর মনোযোগ নিয়ে এই ঘটনাপ্রবাহের দিকে তাকিয়ে আছে। কারণ, কাতালোনিয়া যদি সত্যিই স্বাধীন হয়ে যায় এবং ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন রাখা হয়, তবে চীন ও রাশিয়া সেখানে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ খুঁজবে। রাশিয়া গত দুই দশক ধরে গ্রিসে অবস্থান শক্ত করতে চেয়েছে, পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে একই সাফল্য তাদের জন্য বিশাল অর্জন হতো। তবে রাশিয়ার চেয়েও বাস্তব ও তাৎক্ষণিক হুমকি হলো চীনের অর্থনৈতিক শক্তি। চীন তার বেল্ট অ্যান্ড রোড ইনিশিয়েটিভের অংশ হিসেবে বার্সেলোনার

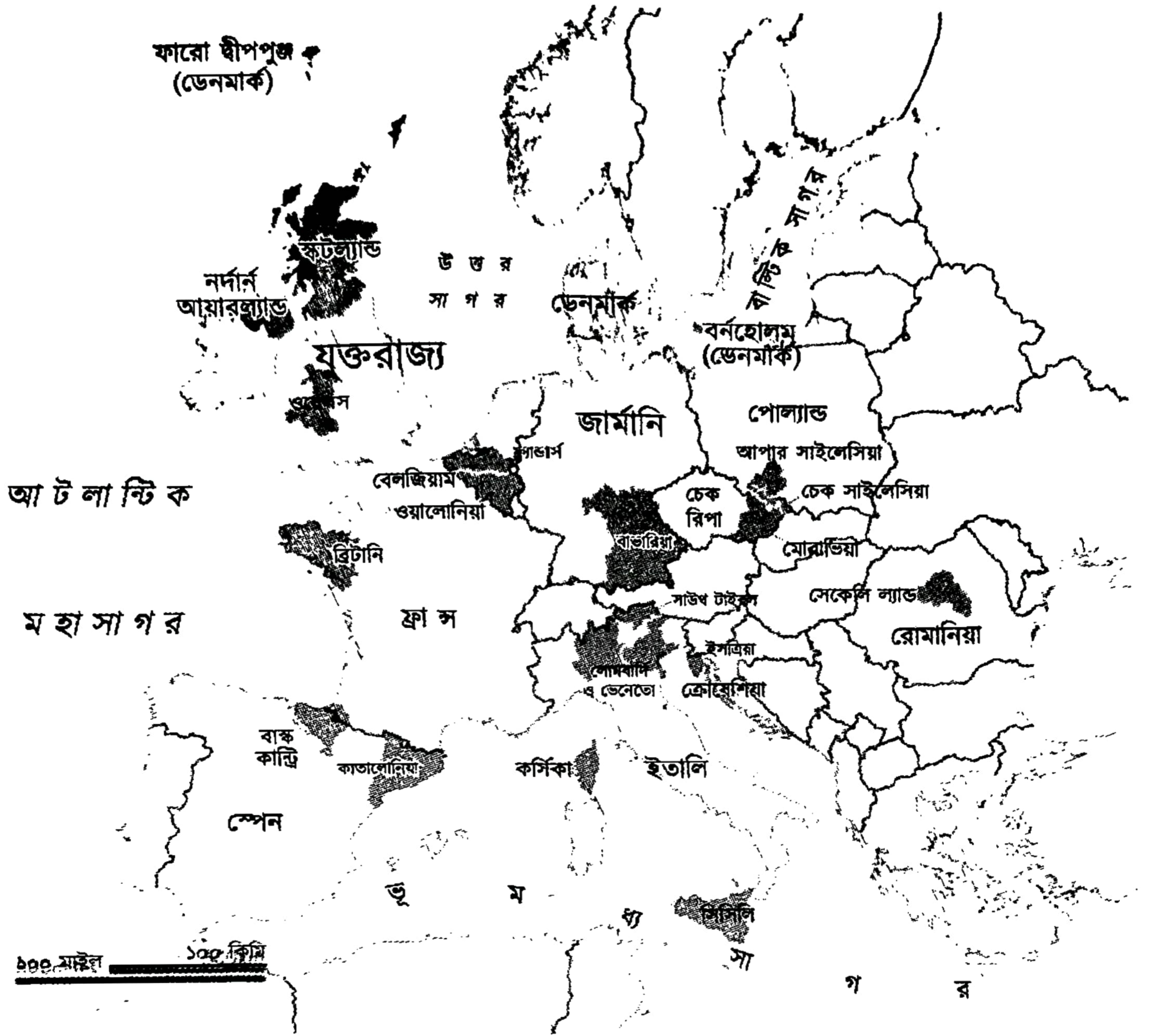
বন্দরগুলোয় বিনিয়োগ ও বাণিজ্যের প্রস্তাব দিতে পারে। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের কঠোর অর্থনৈতিক নীতি ও সদস্য রাষ্ট্রভিত্তিক আলাদা চুক্তি করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা চীনকে ইউরোপীয় বাজারে প্রবেশে বাধাগ্রস্ত করেছে। ফলে তারা দীর্ঘদিন ধরেই ইউরোপের ইইউ-বহির্ভূত দেশগুলোতে প্রবেশের চেষ্টা করছে। বলকান অঞ্চলে, বিশেষ করে সার্বিয়ায় বড় খেলোয়াড়ে পরিণত হয়েছে তারা। কোভিড-১৯ মহামারির সময় সার্বিয়ার রাজনীতিকেরা প্রকাশ্যে বলেছিলেন, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন তাদের সাহায্য করেনি, কিন্তু বেইজিং এগিয়ে এসেছে। এমন পরিস্থিতিতে কাতালোনিয়া যদি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয় এবং স্পেন ভেটো দিয়ে তাকে ইইউ সদস্যপদ থেকে বিরত রাখে, তবে দেশটি সহজেই চীনা কৌশলের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যাবে।

অনেকটা এই কারণেই কাতালোনিয়ার অধিকারের প্রশ্নে ইইউ সবসময় শীতল অবস্থান নিয়েছে। ২০১৭ সালের সেই গণভোটে স্পেনের পুলিশ যখন স্বাধীনতাপন্থী ভোটারদের ভোটকেন্দ্র এবং রাস্তাঘাট থেকে জোর করে সরিয়ে দেয়, তখন সারা ইউরোপ স্তম্ভিত হয়ে তাকিয়ে ছিল। সেই দৃশ্য ছিল একবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে প্রায় অকল্পনীয়। কিন্তু মাদ্রিদ যুক্তি দেখায় যে, কাতালোনিয়ার একতরফাভাবে ভোট আয়োজনের অধিকার নেই। গণভোটের পরদিন ইইউর আনুষ্ঠানিক বিবৃতি শুনে মনে হচ্ছিল, তা যেন মাদ্রিদেই রচিত হয়েছে। ইইউ বলেছিল, "স্পেনের সংবিধান অনুযায়ী কাতালোনিয়ার গতকালের ভোট বৈধ ছিল না... এটি স্পেনের অভ্যন্তরীণ বিষয়, যা স্পেনের সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে থেকেই সমাধান করতে হবে... এখন বিভাজন ও বিচ্ছিন্নতার সময় নয়, বরং ঐক্য ও স্থিতিশীলতার সময়।"

ইইউ এবং এর সদস্য দেশগুলোর নেতারা চান কাতালোনিয়ার সমস্যাটি মিটে যাক। কিন্তু ২০২১ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত কাতালোনিয়ার নির্বাচনে স্বাধীনতাপন্থী দলগুলো আঞ্চলিক পার্লামেন্টে প্রথমবারের মতো সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলে নতুন করে চিন্তিত হয়ে ওঠেন তারা। কারণ, এটি ইউরোপের অন্যান্য বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনগুলোকে অনুপ্রাণিত করতে পারে। স্কটল্যান্ড, কর্সিকা, ফ্ল্যান্ডার্স, সিসিলি বা বাভারিয়ার মতো অঞ্চলগুলো দীর্ঘদিন ধরেই আলাদা হওয়ার দাবি জানিয়ে আসছে। তাদের জন্য কাতালোনিয়ার এই ঘটনাপ্রবাহ এক ধরনের রোডম্যাপে পরিণত হতে পারে।

এখানেই দেখা যায় একটি প্যারাডক্স। ইইউ প্রকল্পের দৃঢ় সমর্থকেরা এখনো চায় একক মুদ্রা ও আর্থিক নীতিসহ একটি ঘনিষ্ঠ ইউনিয়নের দিকে অগ্রসর হতে। কিন্তু একই সঙ্গে, ব্রাসেলস অর্থাৎ ইইউ এর কেন্দ্রীয় প্রশাসন তার কোহেশন পলিসির একটি ভিন্ন পথে হাঁটছে। এই নীতির লক্ষ্য হলো, ইউনিয়নের অন্তর্গত অঞ্চলগুলির মধ্যে থাকা আর্থ-সামাজিক বৈষম্য হ্রাস করা। এই নীতির মাধ্যমে, ইইউ তার কেন্দ্রীয় বাজেট থেকে ২৫০টিরও বেশি অঞ্চলে সরাসরি অর্থায়ন করে স্থানীয় ও আঞ্চলিক সরকারগুলোকে শক্তিশালী করে। এর ফলে, অঞ্চলগুলো ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের সুবিধা পায় এবং নিজস্ব প্রয়োজন অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে বা প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে পারে। বিষয়টি দরিদ্র অঞ্চলগুলোর জীবনযাত্রার মান উন্নত করতে সাহায্য করে। তবে এই প্রক্রিয়ায় আঞ্চলিক শাসনব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার ফলে বিচ্ছিন্নতাবাদ উৎসাহিত হওয়ার ঝুঁকি থাকে। ফলে রাষ্ট্রীয় একতা ভেঙে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়। আবার, যদি কোনো অঞ্চল স্বাধীনতা অর্জন করেই ফেলে, তাহলে সেই নতুন রাষ্ট্র আদৌ ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে কি না—তা নিয়ে কোনো সুস্পষ্ট নীতিমালা নেই।

অন্যদিকে, কাতালোনিয়া যদি সত্যিই স্বাধীনতা অর্জন করে, তাহলে চীনের ভূরাজনৈতিক প্রভাব ঠেকাতে ব্রাসেলস শেষপর্যন্ত তাকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সদস্যপদ দিতে আগ্রহী হতে পারে। কারণ, স্বাধীন কাতালোনিয়া যদি ইইউ এর বাইরে থাকে, তাহলে সেখানে চীনের বিনিয়োগ, অবকাঠামো নির্মাণ বা প্রযুক্তিগত প্রভাব বিস্তারের ঝুঁকি বেড়ে যায়। ফলে তা ইউরোপের নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক সংহতির জন্য হুমকি হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু সেক্ষেত্রে আবার এমন সিদ্ধান্ত ইউরোপের অন্যান্য বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনগুলোর কাছে একরকম গ্রিন সিগন্যাল হিসেবেই ধরা পড়বে। এতে চীনের প্রভাব ঠেকানো সম্ভব হলেও ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ভাঙনের আশঙ্কাও বেড়ে যাবে অনেকখানি। এই দ্বিধার আরেকটি দিক হলো, যদি কাতালোনিয়াকে ইইউ সদস্যপদ না দেয়, তাহলে তারা বিকল্প হিসেবে ইউরোপিয়ান ফ্রি ট্রেড অ্যাসোসিয়েশন বা EFTA-তে যোগ দেওয়ার কথা ভাবতে পারে। EFTA এর বর্তমান সদস্য দেশগুলো হলো নরওয়ে, সুইজারল্যান্ড, আইসল্যান্ড ও লিচেনস্টেইন। এদের কেউই ইইউ এর পূর্ণ সদস্য নয়। তবে তারা বিশেষ চুক্তির মাধ্যমে ইইউ এর অভ্যন্তরীণ বাজারে প্রবেশাধিকার পায়। আর এখানেই যুক্তরাজ্যের প্রসঙ্গ এসে পড়ে।



চিত্র: পশ্চিম ইউরোপ তো বটেই, পূর্ব ইউরোপের কিছু দেশেও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলমান আছে। যদি কাতালোনিয়া স্পেন থেকে স্বাধীন হয়, তাহলে তারা আরো উৎসাহ পাবে। ছবিতে দেখানো গাঢ় রঙের অংশগুলোর প্রত্যেকটিতেই কোনো না কোনো মাত্রায় বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চলছে।

এমনিতে কাতালোনিয়া EFTA এর সদস্যপদ পেলে তা ব্রাসেলসের জন্য খুব বড় চিন্তার কারণ নয়। কিন্তু তারা যদি যুক্তরাজ্য প্রভাবিত EFTA-তে যোগ দেয়, তাহলে পরিস্থিতি পুরোপুরি অন্য মাত্রা পেতে পারে। ব্রেক্সিটের পর যুক্তরাজ্য আপাতত ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের বাইরে রয়েছে। তবে ভবিষ্যতে যদি তারা EFTA-তে যোগ দেয়, তাহলে নরওয়ে, আইসল্যান্ড, লিচটেনস্টাইন, সুইজারল্যান্ড, কাতালোনিয়া এবং যুক্তরাজ্যকে নিয়ে এই জোটটি অনেক শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে। এতে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের অন্য দেশগুলোও ইউনিয়ন ছেড়ে EFTA-তে যোগ দেওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। তবে এই সবকিছুই এখনও সম্ভাবনার

কথা। EFTA এর বর্তমান সদস্যদের ভেতরেও যুক্তরাজ্যের যোগদান নিয়ে একধরনের অনিশ্চয়তা ও দ্বিধা রয়েছে। তবুও ইউরোপিয়ান ইউনিয়নকে সব সম্ভাবনাই বিবেচনায় নিতে হয়। তাদের প্রাথমিক চাওয়া হলো, স্পেনের ভৌগোলিক অখণ্ডতা বজায় থাকুক। কিন্তু সেই চেষ্টা ব্যর্থ হলে চীনের প্রভাব রোধ এবং শক্তিশালী EFTA গঠনের সম্ভাবনা ঠেকাতে বিকল্প কৌশলের পথ খোলা রাখতে চাইবে তারা।

কাতালোনিয়া প্রসঙ্গে যুক্তরাজ্যও এক জটিল অবস্থায় রয়েছে। ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জ বা জিব্রাল্টারের ক্ষেত্রে তারা স্ব-নির্ধারণের অধিকারের পক্ষে কথা বলে। কিন্তু কাতালোনিয়ার স্ব-নির্ধারণের প্রশ্নে তারা বিরোধিতা করে। কারণ কাতালোনিয়ার দাবি সমর্থন করলে স্কটল্যান্ডের স্বাধীনতা দাবির বিরোধিতা করা যায় না। ২০১৭ সালের কাতালোনিয়া গণভোটের পর যুক্তরাজ্য প্রকাশ্যে স্পেনের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। তবে বিষয়টি তাকে দুইটি বিপরীত অবস্থানের মাঝে অস্বস্তিকর এক অবস্থানে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে।

অন্যদিকে, অষ্ঠাদশ শতকের গোড়ায় ব্রিটিশদের কাছে জিব্রাল্টার হারানোর পর থেকেই এটি ফেরত পাওয়ার চেষ্টা চালিয়ে আসছে স্পেন। কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই ভূখণ্ড আটলান্টিক ও ভূমধ্যসাগরের সংযোগস্থলে একটি আদর্শ অবস্থান। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ব্রিটিশ রয়্যাল নেভি এই সুবিধা ভোগ করে এসেছে। যুক্তরাজ্যের বক্তব্য হলো, তারা জিব্রাল্টারের জনগণের ইচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকবে। ২০০২ সালে এক গণভোটে যখন স্থানীয়দের জিজ্ঞেস করা হয়, তারা স্পেনের সঙ্গে যৌথ সার্বভৌমত্ব চায় কি না, তখন প্রায় ৯৯ শতাংশ মানুষ স্পষ্টভাবে 'না' বলে দিয়েছিল।

জিব্রাল্টার মাদ্রিদের নিয়ন্ত্রণে এলে তা স্পেনের আধুনিক প্রতিরক্ষা কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে পরিণত হতো। বর্তমানে স্পেনকে ৮,০৫০ কিলোমিটারেরও বেশি উপকূলরেখা রক্ষা করতে হয়। দেশটির আমদানির প্রায় ৮০ শতাংশই আসে সমুদ্রপথে। স্পেনের ফিশিং ট্রলার বহর ইইউ এর মধ্যে সবচেয়ে বড়, যার একাংশ ভারত মহাসাগর পর্যন্তও চলে যায়। স্পেনের অধীনে রয়েছে ৬০টিরও বেশি দ্বীপ, যেগুলোর কয়েকটি মূল ভূখণ্ড থেকে বহু দূরে অবস্থিত। এই বিশাল অঞ্চল রক্ষা করতে হলে প্রয়োজন হয় শক্তিশালী নৌবাহিনী। আর শক্তিশালী নৌবাহিনী চালাতে হলে লাগে যথেষ্ট সংখ্যক বন্দর।

সৌভাগ্যবশত, স্পেনের রয়েছে বেশকিছু গভীর সমুদ্রবন্দর। উত্তর-পশ্চিমের গালিসিয়া প্রদেশে আছে লা কোরুনা ও এল ফেরোল বন্দর। বিসকায় উপসাগরের এই দুইটি বন্দর আটলান্টিকের দিকে মুখ করে আছে। ফ্রান্স ও ইংলিশ চ্যানেলের প্রবেশপথ পাহারা দেয় এই বন্দর দুইটি। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে স্পেনের প্রধান নৌঘাঁটি দক্ষিণ-পূর্বের কার্তাহেনায়। এখানে যুদ্ধজাহাজের পাশাপাশি সাবমেরিনও রাখা হয়। এখানেই রয়েছে স্পেনের 'মেরিটাইম সার্ভেইলেন্স অ্যান্ড অ্যাকশন অপারেশনস সেন্টার'। দেশটির সামুদ্রিক নিরাপত্তার মস্তিষ্ক হিসেবে পরিচিত এই কেন্দ্র ভূমধ্যসাগর থেকে শুরু করে আটলান্টিকের ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত জলসীমার ওপর নজর রাখে। এখান থেকে সংগ্রহ করা গোয়েন্দা তথ্য মাদ্রিদের একটি বিশাল ভূগর্ভস্থ বাঙ্কারে পাঠানো হয়, যেখানে সেগুলো বিশ্লেষণ করে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়া হয়।। দক্ষিণ স্পেনের কাদিজ বন্দর 'স্ট্রেইটস মেরিটাইম জোন' বা জিব্রাল্টার প্রণালিতে নজরদারি করে। সেখান থেকে ৮০ কিলোমিটার ভেতরে অবস্থিত গভীরজলের বন্দর সেভিয়ার নিরাপত্তা নিশ্চিত করাও কাদিজ বন্দরের দায়িত্ব। উপকূলে অবস্থিত স্পেনের দুইটি ছিটমহল সেউতা ও মেলিলার প্রতিটিতেই কয়েক হাজার সেনা এবং সীমিত আকারে নৌবাহিনী মোতায়েন করা আছে।

মরক্কো ও জিব্রাল্টারের মধ্যবর্তী অঞ্চল বর্তমানে মানবপাচার ও মাদক চোরাচালানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ করিডোর। বিপুল পরিমাণে মানুষ ও মাদক জিব্রাল্টার প্রণালি পেরিয়ে স্পেন হয়ে ইউরোপে প্রবেশ করে। প্রতিবছর হাজারো অভিবাসী মরক্কো ও স্পেনকে আলাদা করা কাঁটাতারের বেড়া টপকে সেউতা ও মেলিলায় প্রবেশের চেষ্টা করে। কারণ তারা জানে, এখানেই আফ্রিকার সঙ্গে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সীমান্ত। তবে ইউরোপে প্রবেশের প্রধান রুট এখনো লিবিয়া হয়ে ইতালি। মরক্কো হয়ে আসার প্রবাহ তুলনামূলকভাবে কম। কারণ লিবিয়া কার্যত একটি ব্যর্থ রাষ্ট্র, সেখানে উপকূলীয় নিরাপত্তার ঘাটতির সুযোগে মানব পাচারকারীদের কাজ অনেক সহজ। অন্যদিকে মরক্কো তুলনামূলকভাবে স্থিতিশীল এবং সীমান্ত নিরাপত্তায় স্পেনের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা রয়েছে। স্পেন ও মরক্কো এই দুই দেশই সাহেল অঞ্চলের অস্থিরতা নিয়ে গভীরভাবে সচেতন। তাদের আশঙ্কা, সাহেল অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলো ভেঙে পড়লে মরক্কো অস্থিতিশীল হয়ে পড়বে। আর তার প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়বে সেউতা, মেলিলা এবং শেষ পর্যন্ত স্পেনের মূল ভূখণ্ডে। এই সম্ভাব্য ঝুঁকি মোকাবিলায় স্পেন ইতিমধ্যেই

মালি ও অন্যান্য স্থানে সরকারি বাহিনীকে প্রশিক্ষণ প্রদানে সক্রিয়ভাবে যুক্ত রয়েছে।

স্পেনের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নৌঘাঁটির অবস্থান ক্যানারি দ্বীপপুঞ্জে। সেখানে সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনীর স্থাপনাও রয়েছে। ভৌগোলিকভাবে এই দ্বীপপুঞ্জ গিনি উপসাগরের দিকে মুখ করে আছে। গিনি উপসাগর অঞ্চল স্পেনের অর্থনৈতিক স্বার্থে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাণিজ্যপথ ছাড়াও এই উপসাগরে রয়েছে আধুনিক যোগাযোগব্যবস্থা পরিচালানার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সাবমেরিন ক্যাবল।

বাণিজ্যপথ, জাহাজ চলাচল ও মাছ ধরার বহর রক্ষা করার জন্য বর্তমানে স্পেনের নৌবাহিনীতে রয়েছে প্রায় ১৩০টি জাহাজ ও ২০,০০০ সদস্যের জনবল। এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে 'ইনফান্তেরিয়া দে মারিনা' বা মেরিন বাহিনীর ১১,৫০০ সৈন্য, যাদের পেছনে সমর্থন জোগায় সেনাবাহিনী ও বিমানবাহিনী। তাছাড়া যুক্তরাষ্ট্র ও ন্যাটোও এক্ষেত্রে স্পেনের গুরুত্বপূর্ণ মিত্র। যুক্তরাষ্ট্র স্পেনে দুইটি সামরিক ঘাঁটি পরিচালনা করে: একটি জিব্রাল্টারের কাছাকাছি 'রোটা ন্যাভাল স্টেশন' এবং অন্যটি সেভিয়া থেকে ৫০ কিলোমিটার দক্ষিণে 'মোরন এয়ার বেস'। স্পেন বর্তমানে হর্ন অব আফ্রিকার উপকূলে জলদস্যু দমনে ইইউর নৌ-অভিযান 'অপারেশন আতালান্তাতে' সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করছে। যুক্তরাজ্য ইইউ থেকে বেরিয়ে গেলে এই অভিযানের সদরদপ্তর স্থানান্তরিত হয় রোটা নৌঘাঁটির স্পেনের নিয়ন্ত্রণাধীন অংশে।

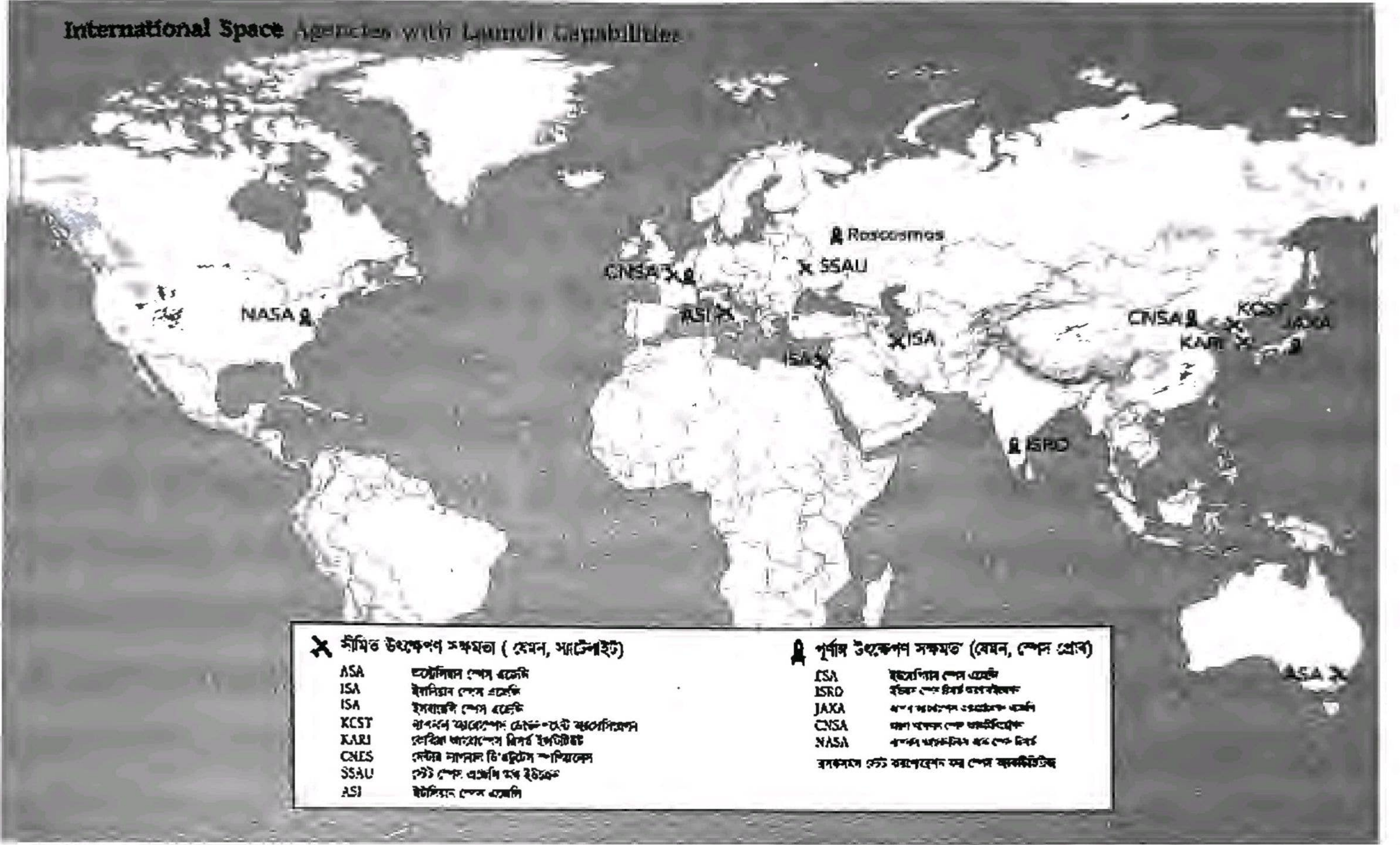
সব সীমাবদ্ধতা ও সমস্যার পরও আধুনিক স্পেনকে একটা সফল রাষ্ট্র হিসেবে ধরা হয়। ২০০৮–০৯ সালের বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ধাক্কা সামলে দেশটি আবারও ইউরোপের অন্যতম বৃহৎ ও স্থিতিশীল অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে। উন্নত অবকাঠামো, প্রাণবন্ত শহরজীবন এবং ইউরোপের সর্বোচ্চ গড় আয়ু—সব মিলিয়ে স্পেনকে এক আধুনিক ও সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে দেখা হয়।

তবে, অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের মতো স্পেনকেও জলবায়ু পরিবর্তন, অভিবাসন সংকট, অর্থনৈতিক বৈষম্য এবং রাজনৈতিক মেরুকরণের মতো জটিল চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করতে হচ্ছে। এসব সামলাতে দেশটি নিজেকে ক্রমশ প্রস্তুতও করে তুলেছে। স্পেনের কয়লার ভাণ্ডার প্রায় নিঃশেষ হয়ে গেছে, তেল ও গ্যাসের মজুতও খুব সীমিত। তবু স্পেন বর্তমানে তার মোট জ্বালানি চাহিদার এক-ষষ্ঠাংশ পূরণ করছে জলবিদ্যুৎ থেকে। পাশাপাশি সৌর ও বায়ুশক্তি উৎপাদনে দেশটি ইউরোপের শীর্ষ অগ্রগামী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে।

ভবিষ্যতেও স্পেনকে বহিরাগত চাপ মোকাবিলা করতে হবে। বিশেষ করে অভিবাসন ও নিরাপত্তাজনিত ইস্যুতে স্পেনের চিন্তিত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু এর থেকেও বড় চ্যালেঞ্জ রয়ে যাবে দেশটির ভেতরের ভৌগোলিক বিভাজন ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের ভারসাম্য রক্ষা করা। ষোড়শ শতকে যে রাজ্য একীভূত হয়েছিল, আধুনিক স্পেন এখনো সেই বহুজাতিক ঐক্যের ভেতরেই টানাপোড়েন নিয়ে এগোচ্ছে। স্বৈরশাসক ফ্রাঙ্কোর সেই বহুল উদ্ধৃত উক্তি, "স্পেন ইউরোপ নয়, কখনো ছিলও না" এই উক্তিটি আজকের দিনে যতটা অপ্রাসঙ্গিক শোনায়, আগে কখনো এতটা মনে হয়নি।

অধ্যায় ১০

মহাকাশ



"পৃথিবীর কক্ষপথে পৌঁছে গেলেই,
যে দিকে দুই চোখ যায় সেদিকে
অর্ধেক পথ এগিয়ে গেলেন আপনি।"

- রবার্ট এ হেইনলিন, প্রকৌশলী ও কল্পবিজ্ঞান লেখক

কেউ যদি চাঁদের বুকে একটি স্থায়ী ঘাঁটি তৈরি করে, তাহলে কি তাকে ঔপনিবেশিক শক্তি বলা যাবে? রাশিয়া ও চীন কিন্তু সেটাই বলবে। তাদের এই বক্তব্য পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়ার মতো নয়।

মানুষ যেদিন প্রথম পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল পার হয়ে মহাশূন্যে পা রেখেছিল, তখন থেকেই মহাকাশ ধীরে ধীরে রাজনৈতিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। কেবল চাঁদ বা মঙ্গলের মতো গ্রহ-উপগ্রহের জমি দখল নয়, প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে জ্বালানি নেওয়ার স্টেশন, কক্ষপথের অল্প কিছু গুরুত্বপূর্ণ এলাকা এবং ভিনগ্রহে অভিযানের রুট নিয়ন্ত্রণ নিয়ে। ইতিহাসে যেভাবে সমুদ্রপথ ও বাণিজ্য বন্দর দখলকে কেন্দ্র করে ঔপনিবেশিক সংঘাত শুরু হয়েছিল, ঠিক তেমনই

মহাকাশেও শুরু হয়েছে এক নতুন ধরনের দখল প্রতিযোগিতা। এসব ক্ষেত্রে আমরা যদি কোনো আন্তর্জাতিক আইনি কাঠামো তৈরি করতে না পারি, তাহলে সম্ভবত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে। লড়াই অনিবার্য হয়ে উঠবে মহাশূন্যেও।

বাস্তবতা হলো, এই প্রতিযোগিতা এখন প্রায় নিশ্চিত। 'মহাকাশ প্রতিযোগিতা' আবার নতুন করে গতি পেয়েছে। আর এর সঙ্গে এসেছে এককভাবে কিংবা মিত্রদের নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার প্রবণতা। অর্থাৎ 'আমরা' যেন 'তাদের' আগে পৌঁছাতে পারি সেটা একটা বড় লক্ষ্য। ২০২০ সালের অক্টোবর মাসে 'আর্টেমিস অ্যাকর্ডস' নামে একটি নতুন চুক্তি স্বাক্ষর করে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, ইতালি, যুক্তরাজ্য, কানাডা, লুক্সেমবার্গ এবং অস্ট্রেলিয়া। এই চুক্তির আওতায় চাঁদে অনুসন্ধান কার্যক্রম এবং সম্পদ আহরণের জন্য এক ধরনের নিয়ম-কানুন নির্ধারণ করা হয়। এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশগুলো প্রতিশ্রুতি দেয় যে, তারা তাদের নিজেদের কার্যক্রম সম্পর্কে সদস্য দেশগুলোকে অবহিত রাখবে। এই আর্টেমিস প্রকল্পের অংশ হিসেবে ২০২৪ সালের মধ্যে চাঁদের মাটিতে প্রথম নারী এবং ত্রয়োদশতম পুরুষকে পাঠানোর পরিকল্পনা হয়েছে। বিভিন্ন কারণে সময়সীমা কিছুটা পিছিয়ে ২০২৬ সালের আশেপাশে ধরা হয়েছে। কিন্তু এখানেই পরিকল্পনার শেষ নয়। ২০২৮ সালের মধ্যে চাঁদে স্থায়ী ঘাঁটি স্থাপন করে সেখানে খনিজ অনুসন্ধান ও খননের কাজ চলবে। এই ঘাঁটিগুলোই পরে ব্যবহার করা হবে আরো বড় মহাকাশ অভিযানের জন্য উৎক্ষেপণ মঞ্চ হিসেবে।

কিন্তু রাশিয়া ও চীন এই চুক্তিতে সই করেনি। শুরু থেকেই এই দেশ দুইটি অনাগ্রহী ছিল। তবে ইচ্ছা থাকলেও কোনো লাভ হতো না, তাদের শেষ পর্যন্ত বাদই দেওয়া হতো। রাশিয়া এখনো পর্যন্ত আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে (ISS) নাসার অংশীদার হলেও পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাস তাদের সম্পর্ককে ক্রমেই তিক্ত করে তুলেছে। ২০২০ সালে মার্কিন স্পেস ফোর্স অভিযোগ তোলে যে, রাশিয়া মার্কিন গোয়েন্দা উপগ্রহগুলোকে বিপজ্জনকভাবে অনুসরণ করছে। এমন 'অস্বাভাবিক ও উদ্বেগজনক আচরণের' জন্য রাশিয়াকে কার্যত দূরে রাখা হয়। অন্যদিকে, চীনকে শুরু থেকেই এই প্রকল্পের বাইরে রাখা হয়েছিল। মার্কিন কংগ্রেস ২০১১ সালে একটি আইন পাস করেছিল, যেখানে বেইজিংয়ের সঙ্গে নাসার যেকোনো সহযোগিতা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। রাশিয়া ও চীন এখন নিজেদের মতো করে চাঁদে ঘাঁটি গড়ার পরিকল্পনা করছে। তারা এমন কোনো নিয়ম মেনে চলতে প্রস্তুত নয়, যেখানে তাদের সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছে।

রাশিয়ার মহাকাশ সংস্থার প্রধান দিমিত্রি রোগোজিন একে সরাসরি আক্রমণ হিসেবেই দেখছেন। তার ভাষায়, একতরফাভাবে চাঁদে যাওয়া মানে চাঁদে এক ধরনের আগ্রাসন চালানো। এই ধরনের পরিকল্পনা চাঁদকে আরেকটি আফগানিস্তান বা ইরাকে পরিণত করতে পারে। এটি নিছক রাজনৈতিক বক্তব্য নয়, রীতিমতো যুদ্ধংদেহী বার্তা। মহাকাশকে যদি সহযোগিতার বদলে প্রতিযোগিতা ও সামরিকীকরণের মঞ্চে পরিণত করা হয়, তবে তার পরিণতি পৃথিবীর দীর্ঘ ইতিহাস থেকে দেখা যুদ্ধক্ষেত্রের মতোই হতে পারে।

মহাকাশকে যুদ্ধক্ষেত্রে পরিণত না করতে চাইলে রাষ্ট্রভিত্তিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বেরিয়ে এসে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার চিন্তায় প্রবেশ করতে হবে। আমাদের মহাকাশযাত্রার প্রথম দিকের ইতিহাসই আসলে দ্বৈত চরিত্রের। একদিকে আমরা দেখেছি প্রতিযোগিতা, যেমন যুক্তরাষ্ট্র বনাম সোভিয়েত ইউনিয়নের 'স্পেস রেস', তেমনি এক পর্যায়ে উদ্ভব হয়েছে কূটনৈতিক সহযোগিতারও, যেমন আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনের ক্ষেত্রে সম্মিলিত পরিচালনা। আমাদের এখন বেছে নিতে হবে আমরা কোন পথে চলতে চাই।

মহাকাশ প্রতিযোগিতার শুরু থেকেই এর পেছনে সক্রিয় ছিল সামরিক কৌশল ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার তীব্র ছায়া। উদাহরণ হিসেবে মহাকাশ অভিযানের পথিকৃৎ ভার্নার ভন ব্রাউনের কথা বলা যায়। তিনি মহাকাশযাত্রার সম্ভাবনার প্রতি এতটাই মোহিত হয়ে ছিলেন যে, ১৯৩০-এর দশকে নাৎসি জার্মানির হয়ে কাজ করতেও রাজি হন তিনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী ভার্সাই চুক্তিতে জার্মানির অস্ত্র উৎপাদনে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হলেও রকেট গবেষণা নিয়ে কিছুই বলা হয়নি। এই ফাঁকটি কাজে লাগিয়েই ভন ব্রাউনের গবেষণায় অর্থ ঢালতে শুরু করে নাৎসিরা। ফলাফল ছিল Berüchtigt Vergeltungswaffe 2 বা সংক্ষেপে 'ভি-২' রকেট। এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে লন্ডনের ওপর নিক্ষেপ করা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে যখন নাৎসি জার্মানি যুদ্ধে পরাজয়ের মুখে, তখন ব্রিটিশ ও মিত্রবাহিনীর বিমান হামলায় জার্মানির শহরগুলো বিধ্বস্ত হচ্ছিল। এই ধ্বংসযজ্ঞের প্রতিশোধ নিতে হিটলার ১৯৪৪ সালে 'Vergeltungswaffe' প্রকল্প শুরু করেন। এই বছরই একটি ভি-২ রকেট সোজাসুজি ওপরের দিকে উৎক্ষেপণ করা হলে রকেটটি প্রায় ১৭৬ কিলোমিটার উচ্চতায় উঠে যায়। এটিই ছিল ইতিহাসের প্রথম মানবনির্মিত বস্তুর মহাশূন্যে প্রবেশ। যুদ্ধ শেষে 'অপারেশন পেপারক্লিপে'র মাধ্যমে ভন ব্রাউন ও তার সহকর্মী প্রায় ১২০ জন জার্মান রকেট

বিজ্ঞানীকে অ্যামেরিকায় নিয়ে আসা হয়। সেই সঙ্গে নিয়ে আসা হয় বেশ কিছু আটককৃত ভি-২ রকেট। সেই ভন ব্রাউনই পরবর্তী দুই দশকে যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন। মাত্র ২৪ বছর পরে, ১৯৬৯ সালে তাকে দেখা যায় কেনেডি স্পেস সেন্টারে দাঁড়িয়ে অ্যাপোলো ১১-এর চাঁদে অভিযানের সূচনা দেখতে।

এই দৌড়ে সোভিয়েত ইউনিয়নও পিছিয়ে ছিল না। বরং অনেকক্ষেত্রে তারা ছিল এক ধাপ এগিয়ে। বিশ শতকের শুরুর দিকে স্বশিক্ষিত নির্জন জীবনযাপনকারী এক রুশ বিজ্ঞানী কনস্তান্তিন সিওলকভস্কি মহাকাশযাত্রার তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরি করেন। তিনিই প্রথম হিসাব কষেন, পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ ছাড়িয়ে যেতে হলে যাত্রার গতি হতে হবে প্রতি সেকেন্ডে অন্তত ৮ কিলোমিটার। এমনকি তরল জ্বালানিচালিত বহু-ধাপের রকেট ব্যবহার করে এই গতি অর্জনের পদ্ধতিও বের করেছিলেন তিনি। তিনিই প্রথম মহাকাশ স্টেশনের নকশা, এয়ারলক ও অক্সিজেন ব্যবস্থার পরিকল্পনা প্রস্তাব করেন। তাঁর বহু লেখা প্রকাশিত হয়েছিল এমন সময়, যখন প্রথম বিমানটিও আকাশে ওড়েনি। এজন্যই অনেকে তাঁকে 'মহাকাশ ভ্রমণের জনক' বলেন। ১৯১১ সালে লেখা এক চিঠিতে সিওলকভস্কি লিখেছিলেন, "পৃথিবী হলো মানবজাতির দোলনা। কিন্তু চিরকাল তো আর দোলনায় পড়ে থাকা যায় না।" তাঁর সেই দর্শন আজও জীবন্ত। চাঁদের যে পাশটি কখনো আমাদের চোখে পড়ে না, সেই পাশের একটি গহ্বরের নামকরণ করা হয়েছে তাঁর নামে।

সিওলকভস্কির তত্ত্ব ও কল্পনার ভিত্তিতে সোভিয়েতরা দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে। ১৯৫৭ সালেই তারা প্রথম ইন্টারকন্টিনেন্টাল ব্যালিস্টিক মিসাইল উৎক্ষেপণ করে, যা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ছাড়িয়ে যায়। সেই বছরেই উৎক্ষেপণ করা হয় বিশ্বের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ 'স্পুটনিক'। একই বছর তারা আরো এক ধাপ এগিয়ে যায়। উৎক্ষেপণ করা হয় স্পুটনিক ২। আর এবার তার ভেতরে ছিল এক অপ্রত্যাশিত যাত্রী—একটি কুকুর। ইতিহাসে ইউরি গ্যাগারিন ও নিল আর্মস্ট্রং-এর নাম মার্কো পোলো, ইবন বতুতা কিংবা কলম্বাসের মতো মহান অভিযাত্রীদের পাশে স্থান পায় ঠিকই, কিন্তু প্রথম প্রাণীটির কথাও মনে রাখা উচিত। সে ছিল এক শান্ত স্বভাবের কুকুর। উৎক্ষেপণের আগে তার কণ্ঠের ঘেউঘেউ শব্দ রেডিও তরঙ্গে ভেসে বেড়াত। তাই সোভিয়েত নাগরিকরা ভালোবেসে তার নাম দিয়েছিল 'লাইকা', অর্থাৎ 'যে ঘেউঘেউ করে'। ছোট্ট মহাকাশ স্যুটে আবদ্ধ হয়ে শরীরে নানা ধরনের সেন্সর লাগিয়ে তাকে পাঠানো হয় পৃথিবীর কক্ষপথে। শিশুদের জন্য রচিত একটি সোভিয়েত বইয়ে লাইকার 'সুখকর সমাপ্তি' দেখানো হলেও আসল ঘটনা ছিল

অন্যরকম। কক্ষপথ একবার প্রদক্ষিণের পর অতিরিক্ত তাপ ও চাপ সহ্য করতে না পেরে লাইকা মারা যায়। তবু তার এই তার মৃত্যুই প্রমাণ করেছিল মানুষ মহাকাশে বেঁচে থাকতে পারবে।

এর কয়েক মাস পর অ্যামেরিকানরা নিজস্ব স্যাটেলাইট পাঠালেও সোভিয়েতরা আবারও এগিয়ে যায়। ১৯৬১ সালের ১২ এপ্রিল মহাকাশচারী ইউরি গ্যাগারিন প্রথম মানুষ হিসেবে পৃথিবীর বন্ধন ছাড়িয়ে মহাশূন্যে প্রবেশ করেন। ফাইটার পাইলট ও কবি জন গিলেস্পি ম্যাগির ভাষায়, তিনি প্রবেশ করেন 'মহান, অজেয় ও পবিত্র মহাকাশে'। এটি ছিল মানব ইতিহাসের এক অসাধারণ মুহূর্ত। এই ঘটনার গুরুত্ব নিল আর্মস্ট্রংয়ের চাঁদে পা রাখার সমান বলা চলে। কিন্তু অনুতাপের বিষয়, গ্যাগারিনের নাম আজ রাশিয়ার বাইরে তেমন উচ্চারিত হয় না। বরং তাঁর সমসাময়িক ব্যক্তি মিখাইল কালাশনিকভ অনেক বেশি পরিচিত। কালাশনিকভের তৈরি বিখ্যাত একে-৪৭ রাইফেলের নাম গ্যাগারিনের চেয়ে অনেক বেশি মানুষ জানে। ইতিহাসের এই পক্ষপাতদুষ্ট স্মৃতি নির্বাচন সম্ভবত মানব প্রকৃতিরই এক অন্তর্নিহিত দুর্বলতা।

অ্যামেরিকা পাল্টা জবাব দিতে দেরি করেনি। গ্যাগারিনের অভিযানের মাত্র ছয় সপ্তাহ পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট জন এফ কেনেডি ঘোষণা দেন যে, এই দশক শেষ হওয়ার আগেই যুক্তরাষ্ট্র মানুষকে চাঁদে পাঠাবে এবং নিরাপদে ফিরিয়ে আনবে। এটি কেবল একটি প্রযুক্তিগত লক্ষ্য ছিল না, এই ঘোষণা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে স্নায়ু যুদ্ধের প্রতিযোগিতায় অ্যামেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার লড়াই।

সময়সীমার পাঁচ মাস বাকি থাকতেই সেই লক্ষ্য পূরণ করে ফেলে যুক্তরাষ্ট্র। তার আগেই ১৯৬৮ সালে অ্যাপোলো ৮ মিশনে নভোচারীরা চাঁদের কক্ষপথ প্রদক্ষিণ করে পৃথিবীতে ফিরে আসেন। এই অভিযানের সময় নভোচারী উইলিয়াম অ্যান্ডার্স তোলেন সেই বিখ্যাত 'আর্থরাইজ' ছবিটি—চাঁদের ধূসর নিষ্প্রাণ ভূমির পটভূমিতে ভেসে থাকা নীল-সবুজ পৃথিবী। সম্ভবত এটিই বিশ্বের সবচেয়ে বিখ্যাত আলোকচিত্র। পরিবেশ আন্দোলনের ওপর এই ছবির প্রভাব ছিল অসামান্য। সেই মুহূর্তের আবেগকে ধরে রাখতে চাঁদের কক্ষপথ থেকে পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে অ্যান্ডার্স ও তার সঙ্গীরা পাঠ করেন বাইবেলের ওল্ড টেস্টামেন্ট থেকে 'জেনেসিস' অধ্যায়ের প্রথম অনুচ্ছেদ—"আদিতে ঈশ্বর সৃষ্টি করেছিলেন আকাশ ও পৃথিবী।"

এর ঠিক এক বছর পর ১৯৬৯ সালের ২০শে জুলাই ইতিহাস গড়লেন নিল আর্মস্ট্রং। অ্যাপোলো ১১-এর মুন ল্যান্ডার ঈগলে চেপে দুইজন নভোচারী চাঁদে

অবতরণ করেন। নিল আর্মস্ট্রং প্রথম মানুষ হিসেবে পদচিহ্ন এঁকে দেন চাঁদের মাটিতে। সেই মুহূর্তে তিনি উচ্চারণ করলেন সেই আট সেকেন্ডের বাক্য, "এটি একজন মানুষের ছোট্ট পদক্ষেপ, কিন্তু মানবজাতির জন্য এক বিশাল অগ্রযাত্রা।" যতদিন মানবসভ্যতা টিকে থাকবে, ততদিন স্মরণ করা হবে এই বাক্য। ১৯৬৯ থেকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত মোট ছয়টি অ্যাপোলো অভিযানে মোট বারোজন অ্যামেরিকান নভোচারী চাঁদের মাটিতে হেঁটেছেন। তবে তারা যে অংশ ঘুরে দেখেছেন, তার আয়তন একটি ছোট শহরের সমানও নয়। সুতরাং এটিকে চাঁদের প্রকৃত অনুসন্ধান বলা যায় না। ভিনগ্রহের কোনো প্রজাতি যদি হঠাৎ রসওয়েল শহরে নেমে এসে ঘোষণা করে যে তারা পৃথিবী ঘুরে দেখেছে, তাহলে যেমন অতিরঞ্জন শোনায়, চাঁদকে 'সম্পূর্ণ অন্বেষণ' করা হয়েছে বলাটাও তেমনই এক বাড়াবাড়ি।

অ্যামেরিকা তখন যা করেছিল তা ছিল স্নায়ুযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে একটি শক্তিশালী ভূরাজনৈতিক বার্তা। মহাবিশ্বের নীরবতার পটভূমিতে পৃথিবীকে পাশে রেখে চাঁদের বুকে গেঁথে দেওয়া হলো স্টারস অ্যান্ড স্ট্রাইপস। তবে প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়ার পর হঠাৎ করেই যেন আগ্রহ হারিয়ে ফেলল তারা।

এর মূল কারণ ছিল খরচ। মহাকাশযাত্রা ছিল অত্যন্ত ব্যয়বহুল। অ্যামেরিকার নীতিনির্ধারকেরা মনে করলেন প্রতিযোগিতায় জেতার পরে চন্দ্রাভিযানে বিপুল অর্থ ব্যয় করার আর কোনো যৌক্তিকতা নেই। তাই অ্যামেরিকানরা তাদের চন্দ্রযান গুটিয়ে নিয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে। আর পেছনে ফেলে আসে কয়েকটি পতাকা, কিছু পায়ের ছাপ এবং ৯৬টি ব্যাগ ভর্তি মানববর্জ্য। এরপর অ্যামেরিকানরা লক্ষ্য নামিয়ে আনল অপেক্ষাকৃত সস্তা প্রকল্পে। তাদের মহাকাশ প্রকল্পের পরবর্তী লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল পৃথিবীর কক্ষপথে স্থায়ী মহাকাশ স্টেশন নির্মাণ করা এবং সেখানে গবেষণা পরিচালনা করা। এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই শুরু হয় স্পেস শাটল কর্মসূচি। এই প্রকল্পের অধীনে মহাকাশ স্টেশন নির্মাণ এবং কক্ষপথে উপগ্রহ স্থাপনের লক্ষ্য নেওয়া হয়। আসলে আরো তিনবার চাঁদে যাওয়ার কথা ছিল তখন। কিন্তু অ্যাপোলো মিশনের শেষ তিনটি অভিযান তৎকালীন প্রেসিডেন্ট নিক্সন বাতিল করে দেন। এরপর নাসা তাদের দৃষ্টি ফেরায় আরো টেকসই কিছু নির্মাণের দিকে। অ্যাপোলো যুগের যেসব যন্ত্রপাতি ও প্রযুক্তি পড়ে ছিল, সেগুলোর কিছু অংশ জোড়া লাগিয়ে পৃথিবীর কক্ষপথে পাঠানো হয় দোতলা একটি মহাকাশ গবেষণাগার— 'স্কাইল্যাব'। স্কাইল্যাব বিশ্ববাসীর দৃষ্টি খুব একটা আকর্ষণ করতে পারেনি, কিন্তু

মানুষের জ্ঞানকে এগিয়ে নিয়েছিল। এখানে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পন্ন হয় এবং নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে মানুষ দীর্ঘ সময় মহাশূন্যে বেঁচে থাকতে সক্ষম। এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষাই পরবর্তী মহাকাশ গবেষণার ভিত্তি গড়ে দেয়।

এর পরে এলো একটা প্রতীকী মুহূর্ত। তখন ১৯৭৫ সাল, স্নায়ুযুদ্ধ তখনও শেষ হয়নি। কিন্তু উত্তেজনার পারদ খানিকটা নিম্নগামী। এই সময়েই ঘটে এক ঐতিহাসিক ঘটনা: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি অ্যাপোলো মহাকাশযান আর সোভিয়েত ইউনিয়নের সয়ুজ মহাকাশযানের সংযুক্তি। স্নায়ু যুদ্ধের দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর মধ্যে যে 'détente' বা সম্পর্কের উষ্ণতা শুরু হয়েছিল, এই ঘটনা ছিল তারই প্রতিফলন। প্রায় এক হাজার কিলোমিটার দূরে থাকা অবস্থায় দুইটি মহাকাশযান একে অপরের দিকে অগ্রসর হতে শুরু করে। এর পর শুরু হয় সংযোগের সূক্ষ্ম কলাকৌশল। দুই ঘণ্টা পর অ্যাপোলো কমান্ডার থমাস পি. স্ট্যাফোর্ড এক সেকেন্ডের জন্য ইঞ্জিন চালু করেন যেন এটি সয়ুজের সঙ্গে এক সরলরেখায় আসতে পারে। তিনি রেডিওতে বলেন, "এখনও ওদেরকে একটা ছোট বিন্দুর মতো দেখাচ্ছে।" দূরত্ব ২০০ কিলোমিটারে নেমে এলে সয়ুজ তার রাডার চালু করে এবং অ্যাপোলো সিগন্যাল লক করে। ৩৫ কিলোমিটার দূরে থাকতে অ্যাপোলো আরো দুই বার দ্রুত ইঞ্জিন চালিয়ে কক্ষপথ সংশোধন করে। তারপর স্ট্যাফোর্ড ধীরে ধীরে অ্যাপোলোর গতি কমিয়ে আনলেন এবং তারা মিলিত হলো। 'কনট্যাক্ট!' বলে চিৎকার করলেন স্ট্যাফোর্ড। সয়ুজ থেকে অ্যালেক্সেই লিওনভ উত্তর দিলেন, 'কনট্যাক্ট!'। এরপর উভয় মহাকাশযানের এয়ারলক খুলে গেল এবং লিওনভ ও স্ট্যাফোর্ড হাত মেলালেন। কনস্তানতিন সিওলকভস্কি যে তত্ত্বের ভিত গড়েছিলেন, ছয় দশক পরে তা বাস্তবে রূপ নিল দুই প্রতিপক্ষ মহাশক্তির যৌথ প্রয়াসে!

করমর্দনের এই মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দী হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমে। এই অভিযান প্রমাণ করেছিল যে, মহাকাশে সহযোগিতা কেবল বিজ্ঞানের কল্পনাজগতে সীমাবদ্ধ নয়, বাস্তবেও সম্ভব। এর আগেই অবশ্য বহু দেশ একত্রিত হয়ে আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগ সংগঠন ইনমারস্যাট ও ইন্টেলস্যাট প্রতিষ্ঠা করেছিল। দেশগুলো জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত তথ্য বিনিময় করেছে এবং একে অপরকে দূষণ-হটস্পট চিহ্নিত করতে সাহায্য করেছে। এমনকি, উপগ্রহ প্রযুক্তির মাধ্যমেই অ্যান্টার্কটিকার আকাশে ওজোন স্তরের ছিদ্রের বিষয়ে নিশ্চিত হওয়া যায়। এসব বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রমাণ করে যে, সর্বোচ্চ প্রযুক্তির স্তরে একসঙ্গে কাজ করলে

তা আমাদের কতটা উপকারে আসে। সয়ুজ-অ্যাপোলো মিশন ছিল এরই এক দৃশ্যমান উদাহরণ। আর এই যৌথ অভিযানের পথ ধরেই আসে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন (ISS)।

১৯৯৮ সালের নভেম্বরে ISS-এর প্রথম অংশটি মহাকাশে পাঠায় রাশিয়া। এর দুই সপ্তাহ পর যুক্তরাষ্ট্রের স্পেস শাটল এনডেভার দ্বিতীয় অংশটি নিয়ে মহাকাশে পৌঁছায় এবং সেটিকে প্রথম অংশের সঙ্গে সংযুক্ত করে। পুরো নির্মাণপ্রক্রিয়াটি অনেকটা ছিল বিশাল এক মেকানো সেটের মতো। একের পর এক যন্ত্রাংশ জুড়ে দিয়ে মহাকাশে তৈরি হচ্ছিল একটি গবেষণা ও বসবাসযোগ্য প্ল্যাটফর্ম। মাত্র দুই বছরের মাথায় সেখানে মহাকাশচারীদের বসবাসের মতো প্রয়োজনীয় জায়গা তৈরি হয়ে যায়। ২০১১ সালে নির্মাণ সম্পন্ন হলে স্টেশনের ভেতরে পাঁচ বেডরুমের একটি বাড়ির সমান জায়গা তৈরি হয়। তবে স্টেশনটি থেকে অসাধারণ দৃশ্য দেখা গেলেও, যাতায়াত ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা রয়েই যায়।

আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন পৃথিবীর কক্ষপথে মানুষের সবচেয়ে বড় স্থাপনা। এটি এতটাই বিশাল যে, রাতের আকাশে খালি চোখেও উজ্জ্বল এক চলমান বিন্দুর মতো দেখা যায় এটাকে। ১০৯ মিটার দৈর্ঘ্য ও ৭৫ মিটার প্রস্থবিশিষ্ট এই স্টেশন আয়তনে প্রায় একটি ফুটবল মাঠের সমান। এর ভেতরে রয়েছে তিনটি গবেষণাগার এবং ছয়জন নভোচারীর জন্য বসবাসের জায়গা। জায়গা কিছুটা সংকীর্ণ হলেও অনেকেই এর মধ্যে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন। মার্কিন নভোচারী পেগি হুইটসন এই স্টেশনে সবচেয়ে বেশি সময় কাটানো নভোচারী। তিনি মোট ৬৬৫ দিন মহাকাশে থাকার রেকর্ড গড়েছেন। এখন পর্যন্ত ১৯টি দেশের প্রায় ২৪০ জন নভোচারী ISS-এ কাজ করেছেন। স্টেশনের ভেতরে দৈনন্দিন জীবনযাপন পৃথিবী থেকে বেশ আলাদা। স্বাচ্ছন্দ্য প্রায় নেই বললেই চলে। স্টেশনের ভেতর মহাকর্ষ বল প্রায় শুন্য হওয়ার কারণে সেখানে কিছুই স্বাভাবিকভাবে থাকে না। তাই ঘুমাতে হয় দেয়ালে বেঁধে রাখা স্লিপিং ব্যাগে, যাতে মানুষ ভেসে না বেড়ায়। প্রতিদিনের কাজগুলো করাও অনেক কঠিন। তবে এসব সামাল দিতে সহায়তা করে কিছু বিশেষ প্রযুক্তি। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো ওয়াটার রিকভারি সিস্টেম (WRS)। এই যন্ত্র বাতাসে থাকা আর্দ্রতা, ঘাম, এমনকি শ্বাসপ্রশ্বাস ও মূত্র পর্যন্ত সংগ্রহ করে প্রায় ৯৩ শতাংশ পানি পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম। সেগুলো পাতন ও প্রক্রিয়াজাত করে বিশুদ্ধ পানিতে রূপান্তরিত হয়, যা আবার ধোয়া-মোছা বা পান করার কাজে ব্যবহার করা যায়। এভাবে একই পানি ঘুরে ফিরে ব্যবহার করা হয়

বারবার। ফলে সরবরাহ মিশনে অতিরিক্ত পানি বহনের প্রয়োজন অনেকটাই কমে যায়। যদিও প্রযুক্তিটি বেশ উন্নত, তবুও ৯৩ শতাংশ পুনর্ব্যবহার সীমা এখনও একে পুরোপুরি নিখুঁত সমাধান বানাতে পারেনি। ভবিষ্যতে দূরগ্রহের দীর্ঘ অভিযানে এই যন্ত্রের আরো উন্নত সংস্করণ অপরিহার্য হয়ে উঠবে।

ISS শুধু মহাকাশে মানুষের উপস্থিতির প্রতীক নয়, বরং এটি একটি ভাসমান গবেষণাগার। সেখানে পরিচালিত পরীক্ষা-নিরীক্ষা পৃথিবীর সাধারণ মানুষের জীবনেও সরাসরি প্রভাব ফেলছে। WRS প্রযুক্তি থেকেই অনুপ্রাণিত হয়ে পৃথিবীর অত্যন্ত দূষণপ্রবণ অঞ্চলে বা পানিশূন্য অঞ্চলে পানি শোধনের নতুন ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে। ফলে আগে যেখানে নিরাপদ পানি পাওয়া যেত না, এখন মানুষ সেখানে পরিষ্কার পানির সুযোগ পাচ্ছে। তেমনি, মহাকাশের অভিকর্ষহীন পরিবেশে বৈজ্ঞানিকরা প্রোটিন ক্রিস্টালের গঠন অনেক বেশি স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছেন। পৃথিবীতে এই গঠনগুলো প্রাকৃতিক সীমাবদ্ধতার কারণে পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ে না। কিন্তু মহাকাশের গবেষণা থেকে পাওয়া নিখুঁত তথ্য চিকিৎসাবিজ্ঞানে নতুন ওষুধ তৈরিতে এবং নানা জটিল রোগ বোঝার ক্ষেত্রে সহায়তা করছে। ISS-এ ব্যবহৃত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভাবন হলো রোবোটিক বাহু। এটি মূলত স্টেশনের বাইরের মেরামত করার কাজে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু পৃথিবীতে এই প্রযুক্তি এখন নানা ক্ষেত্রে কাজে লাগছে। বিশেষ করে সূক্ষ্ম অস্ত্রোপচারে এই প্রযুক্তি বলতে গেলে এখন সাধারণ বিষয়। সব মিলিয়ে বলা যায়, ISS আসলে ভবিষ্যতের এক মডেল। এটি আমাদের দেখাচ্ছে কীভাবে মহাকাশে টিকে থাকা যায় এবং পৃথিবীর বাইরে দীর্ঘ সময় বসবাস করা সম্ভব হতে পারে। মহাকাশে প্রতিদিন যে শিক্ষা আমরা অর্জন করছি, সেগুলো একদিকে যেমন পৃথিবীর জীবনমান উন্নত করছে, অন্যদিকে আমাদের প্রস্তুত করছে একদিন দূরবর্তী গ্রহে মানুষের বসতি গড়ার জন্য।

মহাকাশযাত্রা আর কেবল পরাশক্তিগুলোর একচেটিয়া ক্ষেত্র নয়। এক সময়ের ব্যয়বহুল এই খাত এখন তুলনামূলকভাবে সস্তা ও অধিক উন্মুক্ত। বর্তমানে বেসরকারি প্রতিষ্ঠানও এই খাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। ফলে অনুমান করা যায়, আগামী দিনে চাঁদের সম্পদ নিয়ে শুরু হবে এক নতুন প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতার অন্যতম মুখ হলেন পেপালের সহ-প্রতিষ্ঠাতা এবং টেসলা গাড়ির উদ্যোক্তা ইলন মাস্ক। তার লক্ষ্য মহাকাশকে কেবল বৈজ্ঞানিক গবেষণার জায়গায় না রেখে বাণিজ্যিক, শিল্প ও মানববসতির ক্ষেত্র করে তোলা। তিনি প্রতিশ্রুতি

দিয়েছেন—তার জীবদ্দশাতেই, সম্ভব হলে চলতি দশকেই, মানুষকে মঙ্গল গ্রহে পাঠাবেন। তার প্রতিষ্ঠান স্পেসএক্স ইতোমধ্যেই নাসার সঙ্গে অংশীদার হয়ে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে সরবরাহ মিশন পরিচালনা করছে। ২০২০ সালে তারা প্রথমবারের মতো দুইজন নাসা নভোচারীকে মহাকাশ স্টেশনে পৌঁছে দিয়েছে। স্পেসএক্স এর সবচেয়ে যুগান্তকারী উদ্ভাবন হলো পুনর্ব্যবহারযোগ্য রকেট। আগে প্রতিটি উৎক্ষেপণে বহুমূল্য রকেট সমুদ্রে পড়ে যেত। মাস্কের ভাষায়, "ছয় মিলিয়ন ডলার আকাশ থেকে পড়ে যাচ্ছে। আমরা কি সেটাকে ধরার চেষ্টা করব না?" ব্যবহৃত রকেটকে ফিরিয়ে এনে আবার উড়ানোর প্রযুক্তি মহাকাশ অভিযানের খরচকে নাটকীয়ভাবে কমিয়েছে। এর ফলে এখন অনেক বেশি মিশন চালানো সম্ভব হচ্ছে। উন্মুক্ত হচ্ছে মহাকাশ বাণিজ্যের পথ। বেসরকারি সংস্থাগুলি এখন মহাকাশে কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষমতা রাখে এবং তা অনেক ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রের চেয়ে দক্ষভাবে সম্পাদিত হচ্ছে। এইসব উদ্যোগ রাষ্ট্রীয় সংস্থার ছায়াতেই গড়ে উঠছে। কারণ প্রযুক্তি, নিরাপত্তা ও নীতিমালা নির্ধারণ এখনো অনেকাংশে সরকারের হাতে। নাসা, ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি (ESA), কিংবা চীনের মহাকাশ সংস্থাগুলি (CNSA) বেসরকারি খাতের জন্য দরজা খুলে দিচ্ছে, অর্থায়ন করছে এবং গবেষণা শেয়ার করছে। ইতিহাসে বাণিজ্য ও রাষ্ট্রের স্বার্থের মেলবন্ধনের অজস্র নজির আছে। এর অন্যতম ঐতিহাসিক উদাহরণ ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানটি শেষ পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। কোনো কোনো ক্ষেত্রে রাজমুকুটের পক্ষে সরাসরি প্রশাসনিক দায়িত্বও পালন করত তারা।

বেসরকারি মহাকাশ প্রকল্পে ইলন মাস্ক সবচেয়ে এগিয়ে থাকলেও পেছন থেকে এগিয়ে আসছেন আরেক প্রযুক্তি উদ্যোক্তা, অ্যামাজনের প্রতিষ্ঠাতা জেফ বেজোস। তার কোম্পানি ব্লু অরিজিন স্পেসএক্সের মতো সরাসরি মঙ্গলযাত্রার স্বপ্ন না দেখালেও, এক দীর্ঘমেয়াদি দর্শনের কথা বলছে। জেফ বেজোসের ভাষায়, "এমন একটি ভবিষ্যৎ কল্পনা করুন, যেখানে কোটি কোটি মানুষ মহাকাশে বসবাস করছে, কাজ করছে। ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পৃথিবীর বাসযোগ্যতা টিকিয়ে রাখতে হলে আমাদের যেতে হবে মহাকাশে। সেখানে সীমাহীন সম্পদ ও শক্তি অপেক্ষা করছে আমাদের জন্য।" এখানে মূল শব্দ হলো 'সীমাহীন'। বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন, চাঁদ কিংবা বিভিন্ন উল্কাপিণ্ডে টাইটানিয়াম, প্লাটিনাম, নিকেলসহ মহামূল্যবান খনিজ ধাতুর বিশাল ভাণ্ডার রয়েছে। এসব সম্পদ কেবল পৃথিবীর

চাহিদা মেটাবে না; বরং মহাকাশ স্টেশন, চন্দ্র ঘাঁটি কিংবা দীর্ঘমেয়াদি মহাকাশ অভিযানের অসংখ্য পরিকল্পনাকেও বাস্তবায়নযোগ্য করে তুলবে। শুধু বেসরকারি খাত নয়, রাষ্ট্রীয় পর্যায়েও প্রতিযোগিতা তীব্র হচ্ছে। এর বড় প্রমাণ চীনের সাফল্য। ২০২০ সালের ডিসেম্বরে তারা একটি চালকবিহীন মহাকাশযান পাঠায় চাঁদের না-দেখা অংশে। মহাকাশযানটি সেখানে সফলভাবে অবতরণ করে চীনের পতাকা স্থাপন করে এবং শিলা সংগ্রহ শুরু করে। তবে বেসরকারি খাতের নেতৃত্ব এখনো অ্যামেরিকানদের হাতেই।

আমরা ইতোমধ্যেই মঙ্গল, শুক্র ও বৃহস্পতিতে মানুষবিহীন মহাকাশযান পাঠিয়েছে। এছাড়াও শনির উপগ্রহ টাইটানে একটি ল্যান্ডার অবতরণ করেছে এবং নিউ হরাইজোন মহাকাশযান প্লুটোর পাশ দিয়ে উড়ে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করেছে। আমাদের অভিযাত্রা মহাশূন্যে ক্রমশ বিস্তৃত হচ্ছে। তবে, ভবিষ্যতের দিকে যাওয়ার আগে আবার ফিরে আসতে হচ্ছে পৃথিবীর রাজনৈতিক বাস্তবতায়।

'আর্টেমিস অ্যাকর্ডস' এই বাস্তবতারই উদাহরণ, যেখানে মহাকাশ অনুসন্ধানের ফলে উদ্ভূত কিছু আইনগত, কূটনৈতিক ও সামরিক জটিলতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর্টেমিসকে কেন্দ্র করে মস্কো ও বেইজিং বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন। কারণ এই চুক্তির ধারা অনুযায়ী স্বাক্ষরকারী দেশগুলোকে চাঁদে নিজেদের কর্মক্ষেত্রের চারপাশে 'সেফটি জোন' ঘোষণা করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। অন্য রাষ্ট্রগুলোকে ওই অঞ্চলের প্রতি 'সম্মান প্রদর্শন' করতে বলা হয়েছে, যেন 'ক্ষতিকর হস্তক্ষেপ এড়িয়ে চলা' যায়। এই ব্যবস্থা একটি জটিল প্রশ্ন সামনে নিয়ে আসে। যদি একটি রুশ মহাকাশযান এসে সেই জোনের ভেতরেই অবতরণ করে, এবং পাশেই নিজেদের খননযন্ত্র বসাতে শুরু করে, তাহলে জাপান বা যুক্তরাষ্ট্র কোন আইনের ভিত্তিতে আপত্তি তুলবে? আর যদি আইন না থাকে, তবে সংশ্লিষ্ট দেশগুলো আসলে কী করতে পারবে? এই অনিশ্চয়তা ভবিষ্যৎ মহাকাশ রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হয়ে উঠছে।

এখনও পর্যন্ত মহাকাশ ব্যবহারের প্রায় সব নিয়ম নির্ভর করছে ১৯৬৭ সালের 'আউটার স্পেস ট্রিটির' ওপর। তবে প্রযুক্তি ও ভূরাজনৈতিক বাস্তবতা যে গতিতে এগিয়েছে, সেই তুলনায় এই চুক্তি অনেকটাই সেকেলে হয়ে গেছে। চুক্তিতে বলা আছে, "মহাশূন্যে কোনো রাষ্ট্রীয় দাবি, সার্বভৌমত্ব, ব্যবহার বা দখলের মাধ্যমে মালিকানা দাবি করা যাবে না।" কিন্তু বাস্তবে সেফটি জোন বিষয়টি অনেকটা রাষ্ট্রীয়

দখলদারিত্বের মতোই দেখায়। যত বেশি সেফটি জোন তৈরি হবে ততটাই ভিড় বাড়বে চাঁদে। আর এখন তো বেসরকারি কোম্পানিগুলোও প্রতিযোগিতায় নামছে।

আউটার স্পেস ট্রিটিতে আরো বলা হয়েছে, চাঁদ শুধু শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে। কিন্তু সমস্যাটা হলো, এখানে 'শান্তিপূর্ণ' বলতে ঠিক কী বোঝানো হয়েছে তা কোথাও স্পষ্ট করে লেখা হয়নি। এর ফলে একটি বড় গ্রে এরিয়া থেকে গেছে। যদি কোনো দেশ চাঁদে স্থায়ী ঘাঁটি স্থাপন করে, তারা হয়তো বলতেই পারে যে শান্তি বজায় রাখার স্বার্থে কিছু প্রতিরক্ষামূলক পদক্ষেপ জরুরি। অর্থাৎ, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে তারা শান্তিপূর্ণ ব্যবহারের আওতায় ফেলতে চাইতে পারে। 'শান্তিপূর্ণ' শব্দটির সংজ্ঞা তখন অনেকটাই প্রসারিত হয়ে যেতে পারে।

এই কারণেই আধুনিক প্রযুক্তি, ভূরাজনীতি এবং কূটনীতির সঙ্গে মিলিয়ে আউটার স্পেস ট্রিটির পুনর্বিন্যাস এখন জরুরি হয়ে উঠেছে। তবে চুক্তির মৌলিক প্রতিশ্রুতিটা ঠিক রাখা দরকার—"মহাকাশ অনুসন্ধান হবে সকল দেশের কল্যাণে, মানবজাতির স্বার্থে এবং তা হবে মানবজাতির যৌথ উত্তরাধিকার।" কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা এমনকি পৃথিবীর সীমানা কোথায় শেষ হয় আর মহাকাশ কোথায় শুরু হয়, সেই বিষয়েই একমত হয়ে উঠতে পারিনি।

আমাদের পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল কোনো পয়েন্টে এসে হঠাৎ শেষ হয়ে যায় না। এটি আসলে কয়েকশ কিলোমিটার পর্যন্ত ধীরে ধীরে হালকা হতে থাকে এবং একসময় মহাকাশের পরিবেশে রূপ নেয়। মহাকাশ ঠিক কোথা থেকে শুরু, তা নিয়ে আজও একক কোনো আন্তর্জাতিক সংজ্ঞা নেই। নাসা ও যুক্তরাষ্ট্রের অন্যান্য সংস্থা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৮০ কিলোমিটার ওপরে মহাকাশ শুরু হয়েছে বলে সংজ্ঞায়িত করে। অন্যদিকে, মহাকাশ অভিযানের রেকর্ড অনুমোদনকারী সুইজারল্যান্ডভিত্তিক সংস্থা Fédération Aéronautique Internationale (FAI)-এর মতে, মহাকাশ শুরু হয় ১০০ কিলোমিটার ওপর থেকে। এটি Kármán line নামে পরিচিত। আরো কিছু সংজ্ঞা অবশ্য আছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো সর্বজনগ্রাহ্য ও চূড়ান্ত সীমা নির্ধারিত হয়নি। কিছু দেশ দীর্ঘদিন ধরে বলেছে, আন্তর্জাতিকভাবে এর সংজ্ঞা নির্ধারণ করার প্রয়োজন নেই। একসময় হয়তো এই যুক্তি যথাযথ ছিল, কিন্তু বর্তমান সময়ে তা আর প্রযোজ্য নয়। ধরে নেওয়া যাক—'ক' নামের একটি দেশ মহাকাশের শুরু ধরে ১০০ কিলোমিটার ওপর থেকে, আর 'খ' নামের আরেকটি দেশ মনে করে ৮০ কিলোমিটার থেকেই তা শুরু হয়। সেক্ষেত্রে 'ক' যদি ৯০ কিলোমিটার উচ্চতায় 'খ'-এর ঠিক ওপরে একটা স্যাটেলাইট পাঠায়,

তাহলে 'খ'-এর পক্ষে সেটি ভূপাতিত করার একটা যুক্তি তৈরি হয়ে যাবে। ফলে বিষয়টি শুধু প্রযুক্তি বা বিজ্ঞান নয়, জাতীয় নিরাপত্তা এবং আন্তর্জাতিক কূটনীতির প্রশ্নেও পরিণত হয়।

সৌভাগ্যক্রমে এসব সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদের রয়েছে জাতিসংঘের 'অফিস ফর আউটার স্পেস অ্যাফেয়ারস'। সংস্থাটির সদর দপ্তর ভিয়েনায়। এর অধীনে আছে 'কমিটি অন দ্য পিসফুল ইউজেজ অব আউটার স্পেস' (COPUOS), যা জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের 'ফোর্থ কমিটিতে' প্রতিবেদন জমা দেয়। এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সাধারণ পরিষদ প্রতিবছর "মহাকাশের শান্তিপূর্ণ ব্যবহারে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংক্রান্ত বার্ষিক প্রস্তাব" গ্রহণ করে। তাহলে নিশ্চিন্তে আমরা ঘুমাতে যেতে পারি, তাই না?

তবে এখানে ছোট্ট একটি সমস্যা আছে। যেমন ১৯৭৯ সালের 'মুন ট্রিটির' কথাই ধরা যাক। আউটার স্পেস ট্রিটির ওপর ভিত্তি করে COPUOS-এর উদ্যোগে এই চুক্তিটি গঠিত হয়। সেটি গৃহীত হয় জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মাত্র হাতে গোনা কয়েকটি দেশ এই চুক্তি অনুমোদন করেছে। বিশ্বের প্রধান মহাকাশ শক্তি রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও চীন এই চুক্তিতে স্বাক্ষর বা অনুমোদন কোনোটিই করেনি। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে কোনো রাষ্ট্র যখন কোনো চুক্তিতে স্বাক্ষর করে, তখন সেটি শর্তসাপেক্ষ সমর্থনের ইঙ্গিত মাত্র। আর অনুমোদন মানে হলো আইনগতভাবে বাধ্য থাকার প্রতিশ্রুতি। অধিকাংশ মহাকাশযাত্রা-সক্ষম দেশ যেহেতু স্বাক্ষরও করেনি, অনুমোদনও দেয়নি, মুন ট্রিটি তাই কার্যত কাগজে-কলমেই রয়ে গেছে।

তবে একটি ইতিবাচক দিক হলো—মুন ট্রিটি যদি কোনোদিন সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়, তাহলে এটি আউটার স্পেস ট্রিটির একটি বড় ফাঁক বন্ধ করবে। আউটার স্পেস ট্রিটি কেবল রাষ্ট্রীয় মালিকানা নিয়ে কথা বলেছিল, ব্যক্তিগত মালিকানা বা কোনো প্রতিষ্ঠানের মালিকানার বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। মুন ট্রিটি সেই ত্রুটি সংশোধন করে ঘোষণা করে যে, চাঁদ এবং তার প্রাকৃতিক সম্পদ কোনো সংগঠন বা ব্যক্তিগত মালিকানায় যেতে পারবে না। তবে যতক্ষণ না এই চুক্তি স্বাক্ষর ও অনুমোদিত হচ্ছে, ততক্ষণ পুরোনো চুক্তিই কার্যকর থাকবে। আর এখানেই সুযোগ দেখেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের এক উদ্যোগী নাগরিক, ডেনিস হোপ। ১৯৮০ সালে তিনি জাতিসংঘে একটি দাবি-পত্র দাখিল করেন, যেখানে তিনি নিজেকে চাঁদের একটি অংশের মালিক হিসেবে ঘোষণা করেছিলেন। জাতিসংঘ

এই দাবির কোনো উত্তর দেয়নি। এই নিরুত্তর থাকাকেই ডেনিস হোপ সম্মতি হিসেবে ধরে নেন। এরপর তিনি শুরু করেন চাঁদের জমি বিক্রি। এক একর জমির দাম ধরা হয় ২৫ ডলার, আর সঙ্গে দেওয়া হয় একটি ঝকঝকে মালিকানার সনদপত্র। হোপের দাবি, তিনি ইতোমধ্যে ৬১১ মিলিয়ন একর জমি বিক্রি করেছেন। আপনি যদি নিছক কৌতুক বা উপহারের জন্য এমন একটি সনদ কিনে থাকেন, তাহলে তা বোধগম্য। কিন্তু এর বাইরে যেকোনো কারণে কিনলে, তা আসলে হোপের প্রতারণার বিজয়। বলা চলে এটি আসলে যুক্তির পরাজয়। ঠিক এভাবেই আপনি চাইলে যে কাউকে ব্রুকলিন ব্রিজও বিক্রি করে দিতে পারেন!

আউটার স্পেস ট্রিটি এমন এক সময়ে রচিত হয়েছিল, যখন মহাকাশ অন্বেষণের প্রযুক্তিগত ক্ষমতা ছিল সীমিত। তখন মহাকাশকে ভাবা হতো বৈশিষ্ট্যহীন একটা শূন্যতা হিসেবে। ফলে মহাকাশের কোনোকিছুর সাথে পৃথিবীর ভূরাজনীতির তেমন কোনো সম্পর্ক ছিল না। স্নায়ু যুদ্ধের সময় অবশ্য সোভিয়েত-অ্যামেরিকা মহাকাশ প্রতিযোগিতা ঘটেছিল, তবে সেটিও মূলত ছিল মর্যাদার লড়াই। কোন রাজনৈতিক মডেল নিজেকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণ করতে পারে, সেটাই ছিল মূল প্রশ্ন। কিন্তু প্রযুক্তির অভাবনীয় অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেই দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে গেছে। আর এর ফলে তৈরি হয়েছে নতুন সব 'অ্যাস্ট্রোপলিটিক্যাল থিওরি' বা 'মহাকাশ রাজনীতির তত্ত্ব'।

এর মধ্যে একটি মত হলো—অতীতে যেভাবে পরাশক্তিগুলো ভূখণ্ড দখলের মাধ্যমে বাণিজ্য ও সামরিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছিল, ঠিক সেই কৌশলেই তারা এখন মহাকাশেও প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চালাবে। রাজনৈতিক বাস্তববাদ বা রিয়েলপলিটিকের এই সংস্করণকে বলা হচ্ছে মহাজাগতিক বাস্তববাদ বা 'অ্যাস্ট্রোপলিটিক'। এই তত্ত্বের ভিত্তি হলো—মহাকাশ আসলে কোনো ফাঁকা শূন্যতা নয়। অ্যাস্ট্রোপলিটিক তত্ত্বের জনক হিসেবে পরিচিত মার্কিন অধ্যাপক এভারেট ডলম্যানের ভাষায় মহাকাশ হলো "মাধ্যাকর্ষণের পর্বতমালা আর উপত্যকার সমৃদ্ধ দৃশ্যপট, যেখানে সম্পদ ও শক্তির মহাসমুদ্র আর নদী প্রবাহিত হচ্ছে।"

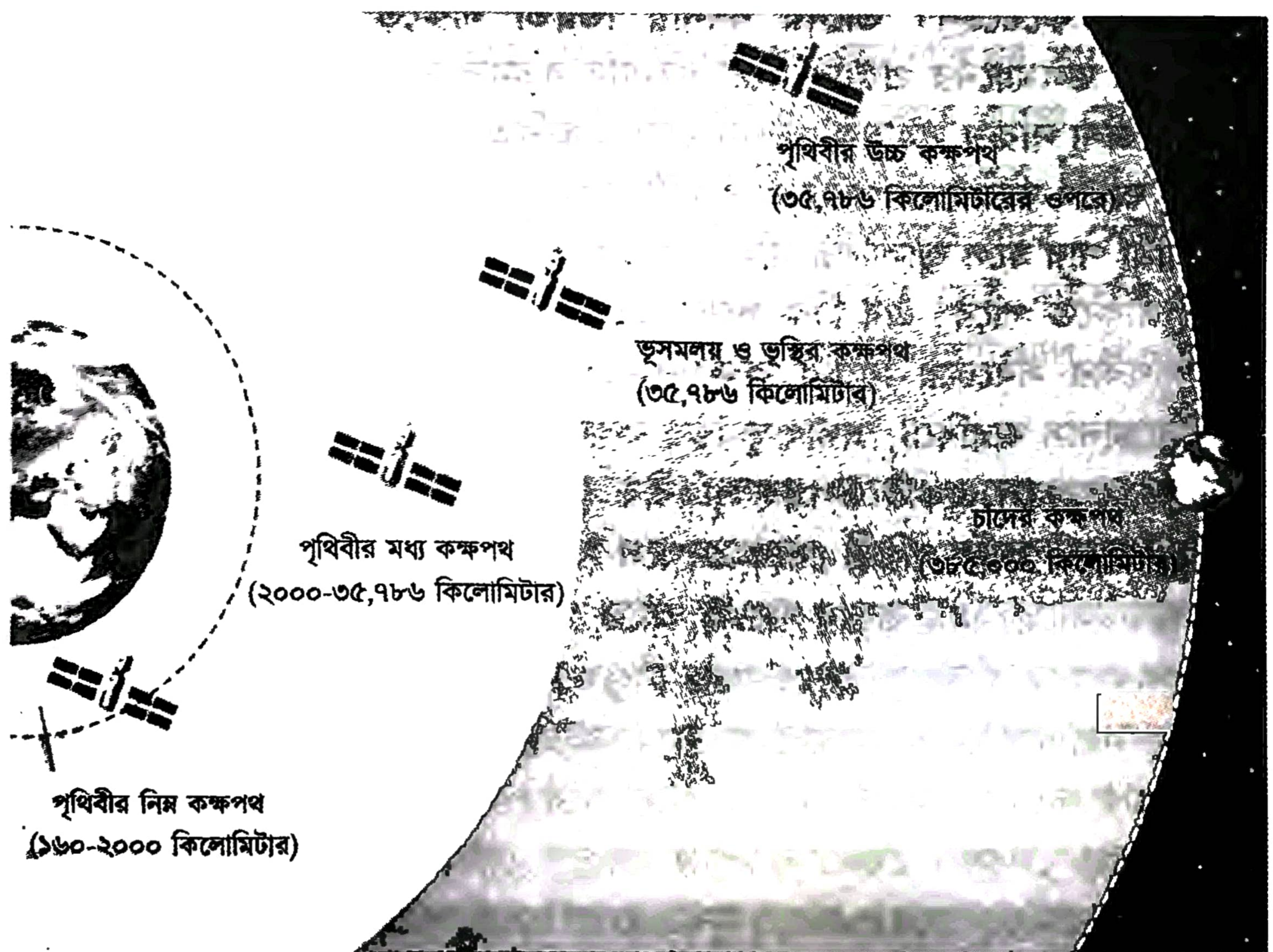
মার্কিন বিমান বাহিনীর 'এয়ার কমান্ড অ্যান্ড স্টাফ কলেজের' অধ্যাপক ডলম্যান তার অ্যাস্ট্রোপলিটিক তত্ত্ব নির্মাণ করেছেন বিশ শতকের মহান ভূরাজনৈতিক তাত্ত্বিক হ্যালফোর্ড ম্যাকিন্ডার ও আলফ্রেড মাহানের ধারণাকে ভিত্তি করে। এরা দুইজন ভৌগোলিক বাস্তবতা, ভূখণ্ড এবং প্রযুক্তির প্রভাব বিশ্লেষণ করে কৌশলগত চিন্তাধারায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। ম্যাকিন্ডার দেখিয়েছিলেন,

ভূখণ্ড ও ভৌগোলিক পরিস্থিতি কীভাবে বিশ্বশক্তির ভাগ্য নির্ধারণ করে। আর মাহান বিশ্লেষণ করেছিলেন, সমুদ্রপথ ও নৌশক্তির নিয়ন্ত্রণ ইতিহাসে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ভূরাজনীতির ছাত্ররা জানে, বাণিজ্যপথ ও তার নিয়ন্ত্রণ বারবার সাম্রাজ্য গঠনে ও সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনে নির্ণায়ক বিষয় হয়ে উঠেছে। অ্যাস্ট্রোপলিটিকস মূলত এই ভূরাজনৈতিক ধারণাকেই মহাকাশে প্রয়োগ করে। অর্থাৎ, এখানে অবস্থান ও দূরত্বের গুরুত্ব, জ্বালানি সরবরাহের সীমাবদ্ধতা, কক্ষপথ এবং বিজ্ঞানের নানা জটিলতা বিশ্লেষণ করা হয়। কে কখন, কীভাবে সেসব এলাকায় পৌঁছাবে—তা আগামী দিনের শক্তির রাজনীতিকে প্রভাবিত করবে।

সামরিক মহাকাশ-কৌশলবিদরা মহাকাশের ভৌগোলিক পরিসরকে কয়েকটি স্তরে ভাগ করেছেন। তাদের বর্ণনায় ভিন্নতা থাকতে পারে, তবে অধ্যাপক অ্যাভারেট ডলম্যানের প্রস্তাবিত শ্রেণিবিন্যাস বর্তমান মহাকাশ রাজনীতির কাঠামো বোঝার জন্য দারুণ সহায়ক। ডলম্যানের প্রস্তাবিত তত্ত্বে সবার নিচের স্তরটির নাম 'টেরা', অর্থাৎ আমাদের পরিচিত পৃথিবী এবং তার বায়ুমণ্ডল এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত। এই সীমা পার হলে জ্বালানির সাহায্য ছাড়াই একটি মহাকাশযান পৃথিবীর কক্ষপথে ভেসে থাকতে পারে। এর ঠিক পরের স্তরটিকে বলা হয় 'আর্থ স্পেস'। এটি শুরু হয় পৃথিবীর সবচেয়ে নিচের কক্ষপথ—লোয়ার অরবিট থেকে, এবং শেষ হয় জিওসিঙ্ক্রোনাস অরবিটে, অর্থাৎ ভূ-স্থির কক্ষপথে। ভূ-স্থির কক্ষপথ এমন উচ্চতায় অবস্থিত, যেখানে একটি উপগ্রহ পৃথিবীর ঘূর্ণনের গতির সঙ্গে ঠিক তাল মিলিয়ে ঘুরতে থাকে। ফলে পৃথিবী থেকে দেখলে মনে হয়, উপগ্রহটি যেন এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে। এই স্তরের পরেই আছে 'লুনার স্পেস'—এটি ভূ-স্থির কক্ষপথ থেকে শুরু হয়ে চাঁদের কক্ষপথ পর্যন্ত বিস্তৃত। এই স্তরে প্রবেশ করা মানে পৃথিবী কেন্দ্রিক মহাকাশ থেকে বেরিয়ে যাওয়া। এই স্তরে পৃথিবীর আকর্ষণ ক্রমশ কমে আসে আর চাঁদের আকর্ষণ বাড়তে শুরু করে। সবচেয়ে বাইরের স্তরটিকে বলা হয় 'সোলার স্পেস'। চাঁদের কক্ষপথ ছাড়িয়ে সৌরজগতের বিস্তীর্ণ সীমা পর্যন্ত পুরোটাই এর মধ্যে পরে। এখানে সূর্যই হলো প্রধান শক্তি। এই অঞ্চলে যেকোনো বস্তুর গতিপথ নির্ধারণ করে সূর্য ও অন্যান্য গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ বলের যুগল প্রভাব।

আগামী কয়েক দশকের জন্য মহাকাশ অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হলো আর্থ স্পেস, বিশেষ করে নিম্ন কক্ষপথ। কারণ এখানেই আমাদের কমিউনিকেশন স্যাটেলাইটগুলো স্থাপন করা হয়। দিন দিন বাড়ছে সামরিক স্যাটেলাইটের সংখ্যাও। যে দেশগুলো এই অঞ্চল নিয়ন্ত্রণে নিতে পারবে

সেসব দেশ পৃথিবীতে বিশাল সামরিক সুবিধা পাবে। এই বিষয়ে ডলম্যান যে বক্তব্য দিয়েছেন, তা বিখ্যাত ভূরাজনৈতিক চিন্তাবিদ হ্যালফোর্ড ম্যাকিন্ডারের 'হার্টল্যান্ড তত্ত্বকে' স্মরণ করিয়ে দেয়। ১৯০৪ সালে একটি প্রবন্ধে ম্যাকিন্ডার বলেছিলেন, "যে পূর্ব ইউরোপকে নিয়ন্ত্রণ করে, সে ইউরেশিয়ার হার্টল্যান্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর যে হার্টল্যান্ডকে নিয়ন্ত্রণ করে, সে পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করে।" ডলম্যানের সংস্করণটি আরো বিস্তৃত ও ভবিষ্যতমুখী, "যে নিম্ন কক্ষপথ নিয়ন্ত্রণ করে, সে নিকট মহাকাশ নিয়ন্ত্রণ করে। যে নিকট মহাকাশ নিয়ন্ত্রণ করে, সে পুরো টেরাকে নিয়ন্ত্রণ করে। আর যে টেরাকে নিয়ন্ত্রণ করে, সে মানবজাতির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে।"



চিত্র: পৃথিবীর চারপাশে কক্ষপথের স্তরগুলোর বিস্তার।

আগের শতাব্দীগুলোতে পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার মানে ছিল স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীকে কৌশলগত অবস্থানে মোতায়েন করা। সেইসঙ্গে সমুদ্রপথ আর জিব্রাল্টার প্রণালি বা মালাক্কা প্রণালির মতো সংকীর্ণ পথের প্রবেশ-প্রস্থান কঠোরভাবে পাহারা দেওয়া হতো। বিংশ শতকে সেই তালিকায় যোগ হলো

আকাশসীমার দখল। আর একবিংশ শতকে প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে না পড়তে চাইলে প্রতিটি রাষ্ট্রের জন্য আর্থ স্পেসে অবস্থান নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

নিম্ন কক্ষপথ ভবিষ্যতের গভীর মহাকাশ ভ্রমণেরও কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে। চাঁদ ছাড়িয়ে আরো দূরে যেতে চাইলে মহাকাশযান এখানে জ্বালানি সংগ্রহ করতে পারবে। মঙ্গলগ্রহ পৃথিবী থেকে চাঁদের তুলনায় কয়েক লাখ কিলোমিটার দূরে। অথচ পৃথিবীর মহাকর্ষীয় আকর্ষণ ভেদ করে বেড়িয়ে যেতে যতটা শক্তি লাগে, তার চেয়ে কম শক্তি লাগে নিম্ন কক্ষপথ থেকে মঙ্গল পর্যন্ত যেতে। তাই যদি কোনো শক্তিশালী রাষ্ট্র এই করিডোর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে নেয়, তবে সে হয়ে উঠবে মহাকাশের দ্বাররক্ষী। প্রতিদ্বন্দ্বীদের জ্বালানি ভরার সুযোগ বন্ধ করে গভীর মহাকাশে অভিযানের পরিচালনার ক্ষমতা কঠোরভাবে সীমিত করে দিতে পারবে সেই দেশটি।

এই পরিস্থিতি বোঝার জন্য ভূরাজনীতি থেকে একটি সহজ উদাহরণ দেওয়া যায়। আজকের দিনে কৃষ্ণসাগর অঞ্চলের কোনো রাষ্ট্র যদি তার যুদ্ধজাহাজ নিয়ে বসফরাস প্রণালি পেরিয়ে ভূমধ্যসাগরে ঢুকতে চায়, সেক্ষেত্রে তাকে তুরস্কের অনুমতি চাইতে হয়। সংকটময় পরিস্থিতিতে তুরস্ক চাইলে সেই অনুমতি নাও দিতে পারে। ঠিক তেমনি, আর্থ স্পেসের নিয়ন্ত্রণ হাতে থাকলে একই ধরনের কৌশলগত কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হবে। তবে তা হবে অনেক বেশি প্রভাবশালী ও বিস্তৃত। কোনো কার্যকর চুক্তি না থাকলে সেখানে শুধু 'জঙ্গলের আইন' চলবে। অর্থাৎ যার হাতে শক্তি, তারই শাসন চলবে।

এটি শুধুই কৌশলগত বা সামরিক সুবিধার ব্যাপার নয়। এর সঙ্গে জড়িত রয়েছে বিশাল বাণিজ্যিক স্বার্থও। ভবিষ্যতে প্রযুক্তির উন্নয়নের ফলে যদি এমন সোলার প্যানেল তৈরি হয়, যা মহাকাশ থেকে পৃথিবীতে সৌরশক্তি প্রেরণ করে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করতে সক্ষম, সেক্ষেত্রে এই প্যানেল সম্ভবত নিম্ন কক্ষপথেই স্থাপন করা হবে। একইভাবে, খনিজ আহরণের জন্য কোনো গ্রহাণুতে যাত্রার প্রয়োজন পড়লে, সেই যাত্রাও শুরু হবে নিম্ন কক্ষপথে জ্বালানি ভরেই। তখন দ্বাররক্ষকের অনুমতি ও শর্ত মেনে চলতে হবে। এমনকি চেয়ে বসলে তাকে একটি ভাগও দিতে হতে পারে।

মহাকাশের অঞ্চলগুলো সম্পর্কে আমরা যতই জানছি, আমাদের মহাকাশ মানচিত্র ততই হালনাগাদ করতে হচ্ছে। আর প্রতিযোগিতার সম্ভাবনাও তত বাড়ছে। উদাহরণ হিসেবে ভ্যান অ্যালেন রেডিয়েশন বেল্টের কথা উল্লেখ করা

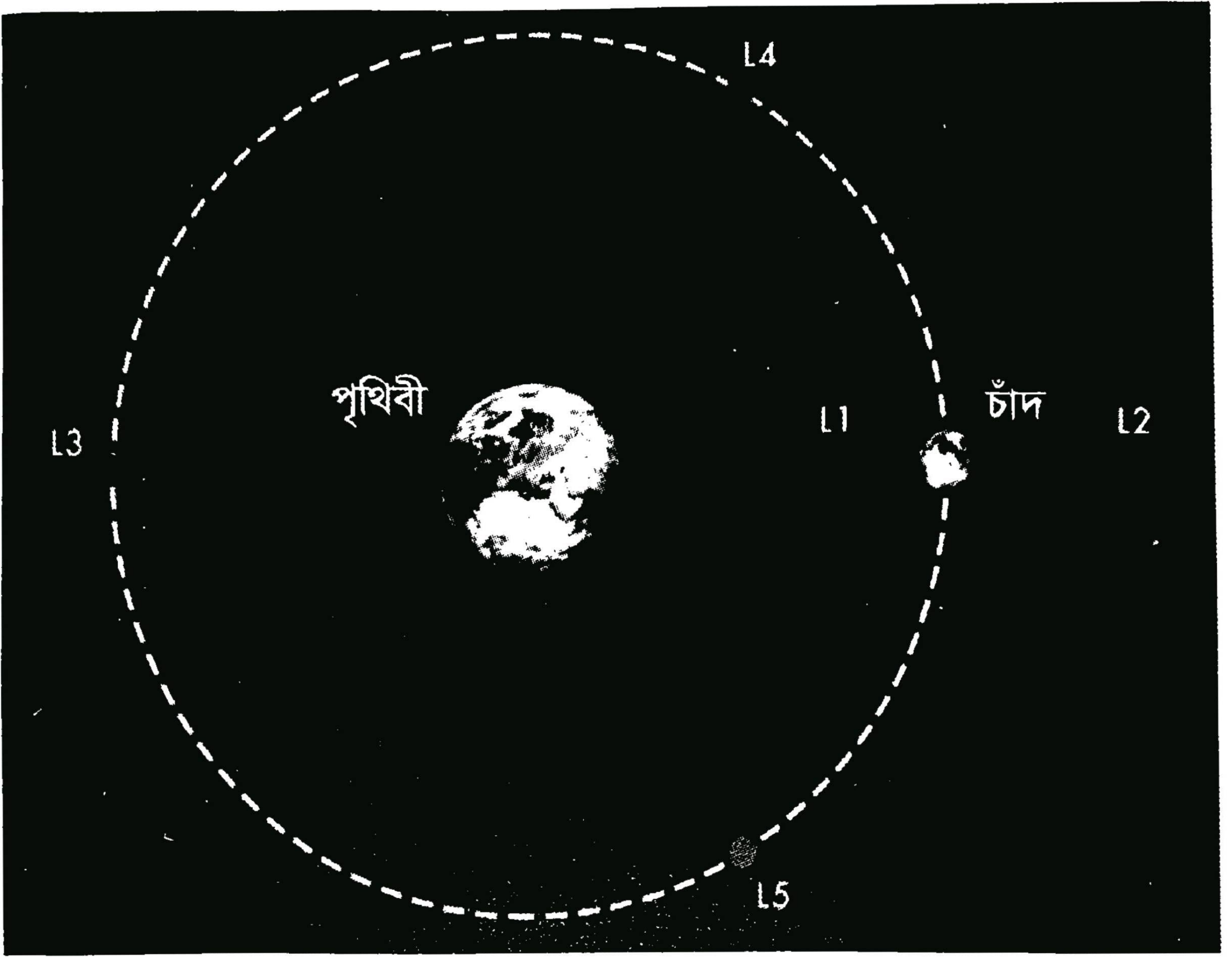
যায়। ভ্যান অ্যালেন রেডিয়েশন বেল্ট হলো পৃথিবীর চারপাশে থাকা তেজস্ক্রিয় কণার দুইটি অঞ্চল, যা পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা আটকে থাকে। এই বেল্ট প্রধানত দুইটি স্তরে বিভক্ত। প্রথম স্তরের নাম ইনার বেল্ট। এটি পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে তুলনামূলকভাবে কাছাকাছি। এই স্তরের বিস্তার ৬০০ কিলোমিটার উচ্চতা থেকে শুরু করে ৬,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত। এই অঞ্চলে প্রধানত উচ্চ-শক্তির প্রোটন এবং ইলেকট্রন থাকে। দ্বিতীয় স্তরের নাম আউটার বেল্ট। এটি ইনার বেল্টের চেয়ে অনেক দূরে, পৃথিবীর পৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১৩,০০০ থেকে ৬০,০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এই অঞ্চলে প্রধানত উচ্চ-শক্তির ইলেকট্রন থাকে। এই বেল্টগুলি পৃথিবীর জন্য একটি প্রাকৃতিক ঢাল হিসেবে কাজ করে। এই স্তর দুইটি সূর্য থেকে আসা ক্ষতিকারক চার্জিত কণা এবং মহাজাগতিক রশ্মিগুলিকে পৃথিবীতে পৌঁছানো থেকে বিরত রাখে। এতে আমাদের বায়ুমণ্ডল এবং ভূপৃষ্ঠের জীবকূল তেজস্ক্রিয় রশ্মির ক্ষতি থেকে রক্ষা পায়। তবে এই অঞ্চলে বিকিরণের মাত্রা এতটাই বেশি যে, মানুষবাহী মহাকাশযানের জন্য এগুলো এড়িয়ে যাওয়াই ভালো। এই স্তরে বেশি সময় কাটালে মহাকাশযানের যন্ত্রপাতি নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি যাত্রীদের শরীরের কোষগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

এছাড়াও রয়েছে বিশেষ কিছু মহাজাগতিক পথ। এই পথগুলো ব্যবহার করে কোনো গ্রহের মহাকর্ষকে কাজে লাগিয়ে দূর মহাকাশের যাত্রাকে সহজ করা যায়। এতে জ্বালানি খরচ বাঁচে। গ্রহের মহাকর্ষ বল কাজে লাগানোর এই পদ্ধতিকে বলা হয় 'স্লিংশট' বা 'গ্র্যাভিটি অ্যাসিস্ট' কৌশল। এই কৌশলটি পদার্থবিজ্ঞানের শক্তি ও ভরবেগ সংরক্ষণের নীতির উপর ভিত্তি করে কাজ করে। যখন একটি মহাকাশযান কোনো গ্রহের খুব কাছ দিয়ে একটি নির্দিষ্ট পথে যায়, তখন গ্রহের মহাকর্ষীয় টান এটিকে দ্রুত আকর্ষণ করে। মহাকাশযানটি গ্রহকে অতিক্রম করে বেরিয়ে যাওয়ার সময় এটি গ্রহের কক্ষপথীয় গতির কিছু অংশকে নিজের গতিশক্তিতে পরিণত করতে পারে। এর ফলে, মহাকাশযানটির গতি ব্যাপকভাবে বেড়ে যায়। এই কৌশল মহাকাশ মিশনগুলির জন্য অপরিহার্য। বৃহস্পতি বা শনির মতো দূরবর্তী গন্তব্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বিশাল পরিমাণ জ্বালানি বহন করা একটা বড় বাঁধা। এই পদ্ধতিতে জ্বালানির সমস্যা সমাধান করা যায়। স্লিংশট কৌশল প্রয়োগ করলে মিশনের সময় ও খরচ দুটোই উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। ভয়েজার এবং ক্যাসিনির মতো ঐতিহাসিক মিশনগুলোতে এই কৌশল সফলভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল।

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো 'লিব্রেশন পয়েন্ট'। লিব্রেশন পয়েন্ট মূলত পৃথিবীর কাছাকাছি এমন পাঁচটি বিশেষ অবস্থান, যেখানে 'পৃথিবী ও চাঁদের' অথবা 'সূর্য ও পৃথিবীর' মহাকর্ষ বলের আকর্ষণ এবং মহাকাশযানের ঘূর্ণনের ফলে তৈরি বলের মধ্যে একটা নিখুঁত ভারসাম্য তৈরি হয়। সেখানে স্থাপিত কোনো বস্তুকে অবস্থান ধরে রাখার জন্য অতিরিক্ত জ্বালানি খরচ করতে হয় না। এই স্থিতিশীলতার কারণেই এসব পয়েন্ট বর্তমানে ভূ-রাজনীতি এবং মহাকাশ প্রতিযোগিতার গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে। এর মধ্যে দুইটি অবস্থান বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, যেখান থেকে পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথে ঘুরে বেড়ানো কৃত্রিম উপগ্রহগুলোকে নজরদারি করা যায়। এল-টু (L2) নামে পরিচিত আরেকটি লিব্রেশন পয়েন্ট চাঁদের অদেখা পাশে অবস্থিত। অর্থাৎ পৃথিবী থেকে চাঁদের এই অংশকে কখনোই সরাসরি দেখা যায় না। চীন ইতোমধ্যেই এই এল-টু পয়েন্টে একটি স্যাটেলাইট পাঠিয়েছে। এটির সাহায্যে চীন চাঁদের অদেখা অংশের ব্যাপারে মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করছে। এমনকি চাঁদের ওই অংশে চীন একটি ঘাঁটি স্থাপনেরও পরিকল্পনা করছে।

এই ধরনের বিষয় নিয়ে আলোচনা আমরা আগামী দিনে হয়তো আরো বেশি শুনব। কারণ অ্যাস্ট্রোপলিটিকস ধীরে ধীরে পরিপূর্ণ আকার নিচ্ছে এবং মহাশক্তিগুলো তাদের সামরিক বাজেটে মহাকাশযুদ্ধের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করছে। যদি মহাকাশের সামরিকীকরণ সীমিত করার জন্য কোনো বাধ্যতামূলক চুক্তি না থাকে, তবে নিম্ন কক্ষপথই হয়ে উঠবে সম্ভাব্য যুদ্ধক্ষেত্র। প্রথমে সেখানে অবস্থানরত প্রতিদ্বন্দ্বী স্যাটেলাইটগুলোই লক্ষ্যবস্তু হবে, এরপর আক্রমণের মুখে পড়বে পৃথিবীর পৃষ্ঠতল।

রাশিয়া এবং চীন ইতোমধ্যেই নিজেদের সামরিক কাঠামোয় ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। যুক্তরাষ্ট্রও ২০১৯ সালে 'ইউএস স্পেস ফোর্স' নামে একটি নতুন মহাকাশবাহিনী গঠন করে একই পথে হাঁটছে। অনেকে আশঙ্কা করছেন, এসব কার্যক্রম আউটার স্পেস ট্রিটির চেতনা লঙ্ঘন করতে পারে। তবে ওই চুক্তিতে বলা হয়েছে, পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্রের মতো গণবিধ্বংসী অস্ত্র কক্ষপথে বা মহাজাগতিক বস্তুর ওপর বা অন্য কোনোভাবে মহাকাশে স্থাপন করা যাবে না। কিন্তু আন্তর্জাতিক আইনে কোথাও বলা নেই যে, লেজার-সজ্জিত স্যাটেলাইট মোতায়েন করা যাবে না। আর ইতিহাস বারবার প্রমাণ করেছে, যখন কোনো দেশ নতুন কোনো প্রযুক্তিগত পদক্ষেপ নেয়, তখন প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলো তা দ্রুত অনুসরণ করে।



চিত্র: পৃথিবী ও চাঁদের মধ্যবর্তী লিব্রেশন পয়েন্টগুলো। এসব অবস্থান স্যাটেলাইট স্থাপনের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর এই অবস্থানগুলোকে কেন্দ্র করেই ভবিষ্যতে বিভিন্ন দেশের মধ্যে তুমুল প্রতিযোগিতা দেখা দিতে পারে।

এই কারণেই বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা দপ্তরের অন্যতম মূলমন্ত্র হলো—"মহাকাশ এখন একটি যুদ্ধক্ষেত্র।" বিংশ শতকে পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কা যেভাবে মানব সভ্যতাকে বিপর্যয়ের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছিল; একবিংশ শতকে এসে মহাকাশের সামরিকীকরণ তেমনই এক নতুন বিপদের পূর্বাভাস দিচ্ছে। মহাকাশে যুদ্ধ হলে তা হবে আক্ষরিক অর্থেই পৃথিবী কাঁপানো এক ঘটনা।

এই ভাবনা থেকেই ইউএস স্পেস ফোর্স গঠন করা হয়েছে। এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন, "মহাকাশে অ্যামেরিকার শ্রেষ্ঠত্ব অপরিহার্য ... স্পেস ফোর্স আমাদের আগ্রাসন প্রতিরোধে সাহায্য করবে এবং মহাকাশের সর্বোচ্চ উচ্চতা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করবে।" চীন ও রাশিয়াও মহাকাশকে একইরকম সামরিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখে। তুলনামূলক দুর্বল কিছু রাষ্ট্রও এই প্রতিযোগিতায় যুক্ত হচ্ছে। কিন্তু এই মহাকাশ প্রতিযোগিতার

সবচেয়ে বড় তিন খেলোয়াড় নিঃসন্দেহে যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও রাশিয়া। তারা মহাকাশ অভিযানে যেমন অগ্রগামী, সামরিকীকরণের ক্ষেত্রেও সমান মনোযোগী।

এই তিন দেশই স্বীকার করেছে যে তাদের সামরিক কৌশল 'ফুল-স্পেকট্রাম ডমিন্যান্স' অর্থাৎ চতুর্পার্শ্বিক আধিপত্যের ধারণায় এখন মহাকাশও অন্তর্ভুক্ত। এই ধারণা মূলত এমন এক কৌশলগত অবস্থানকে বোঝায়, যেখানে স্থল, জল, আকাশ, সাইবার ও মহাকাশ—সব ক্ষেত্রেই একসাথে প্রভাব বা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা চলে। নিম্ন কক্ষপথ থেকে শুরু করে চাঁদের গণ্ডি পেরিয়ে আরো দূর পর্যন্ত সবই পরবর্তী যুদ্ধক্ষেত্রের সম্ভাব্য ক্ষেত্র। এই ধরনের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার প্রাথমিক প্রয়াস ছিল ১৯৮০-এর দশকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের "স্ট্র্যাটেজিক ডিফেন্স ইনিশিয়েটিভ" (SDI) কর্মসূচি। এই কর্মসূচি মূলত ছিল পারমাণবিক হামলা প্রতিরোধে মহাকাশভিত্তিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গঠনের প্রচেষ্টা। এই প্রকল্পের সম্ভাব্য পদ্ধতিগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল মহাকাশে অস্ত্র মোতায়েন করা। যেমন কক্ষপথে লেজার বা মিসাইল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বসানো, যা শত্রু দেশের ক্ষেপণাস্ত্র আকাশেই ধ্বংস করতে পারবে। এ কারণেই এই কর্মসূচিকে 'স্টার ওয়ারস' বলা হতো। তবে সময়ের তুলনায় প্রকল্পটি ছিল অত্যন্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষী। পরিকল্পনার প্রযুক্তিগত এবং আর্থিক জটিলতা এত বেশি ছিল যে, তা সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। তবু, এর প্রতীকী ও কৌশলগত প্রভাব ছিল ব্যাপক এবং সেখান থেকেই শুরু হয় মহাকাশের সামরিকীকরণের যুগ।

বর্তমান সময়ের সামরিক মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠছে হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্র। এগুলো গতিবেগ শব্দের গতির চেয়ে প্রায় বিশ গুণ বেশি। দ্রুতগামী এই ক্ষেপণাস্ত্রগুলো সাধারণ ব্যালিস্টিক মিসাইলের মতো নির্দিষ্ট পথে উড়ে যায় না। বরং যেকোনো সময় দিক ও উচ্চতা পরিবর্তন করতে পারে এগুলো। এই কারণে যে রাষ্ট্রের উদ্দেশ্যে ক্ষেপণাস্ত্রটি ছোড়া হয়েছে, উৎক্ষেপণের পর সেই রাষ্ট্র বুঝতেই পারে না যে, ক্ষেপণাস্ত্রটি আসলে কোনদিকে যাচ্ছে। ফলে, প্রতিরক্ষা সমন্বয় কঠিন হয়ে পড়ে। একটি ক্ষেপণাস্ত্রকে অপর একটি ক্ষেপণাস্ত্র দিয়ে ধ্বংস করাই যেখানে অত্যন্ত দুঃসাধ্য, সেখানে হাইপারসনিক প্রযুক্তি সেই কাজকে অভাবনীয় রকম জটিল করে তুলেছে। এগুলো এতটাই দ্রুতগতির এবং গতিপথে এত বেশি পরিবর্তন আনতে সক্ষম যে প্রচলিত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দিয়ে সেগুলোর গতি বা গন্তব্য অনুমান করে সময়মতো বাধা দেওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সরকারগুলো এখন মহাকাশে অ্যান্টি-হাইপারসনিক

লেজার সিস্টেম স্থাপনের সম্ভাবনা পরীক্ষা করছে। এই লেজারগুলো পৃথিবীর দিকে তাক করে ক্ষেপণাস্ত্রের ওপর আঘাত হানতে পারবে। কিন্তু একবার যদি মহাকাশে এই ধরনের অস্ত্র বসানো হয়, স্বাভাবিকভাবেই তখন সেই লেজার ধ্বংস করার জন্য নতুন অস্ত্র তৈরি হবে। এরপর সেই অস্ত্রগুলোকেও রক্ষা করতে হবে নতুন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে। আবার সেই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত রাখতে লাগবে আরো উন্নত প্রযুক্তি। এরপর আর কিছু নয়, শুধু একটি 'ইত্যাদি' যোগ করলেই আমরা প্রবেশ করি পূর্ণাঙ্গ মহাকাশ অস্ত্র প্রতিযোগিতার যুগে।

বিজ্ঞান কল্পকাহিনিকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে উঠছে। এর একটি বাস্তব উদাহরণ দেখা যায় ২০২০ সালের জুলাই মাসে। রাশিয়ার একটি সামরিক উপগ্রহ 'কসমস ২৫৪২' গোপনে অ্যামেরিকান গোয়েন্দা উপগ্রহ 'ইউএসএ ২৪৫'-এর গতিবিধি অনুসরণ করছিল। কখনো কখনো রুশ উপগ্রহটি মাত্র ১৫০ কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত চলে আসছিল, যা মহাকাশের নিরিখে বিপজ্জনক রকমের কাছাকাছি। এরপর হঠাৎই কসমস ২৫৪২-এর ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো আরো একটি ছোট উপগ্রহ, 'কসমস ২৫৪৩'। মার্কিন সামরিক বাহিনী এমন উপগ্রহগুলিকে বলেন 'রাশিয়ান ডল স্যাটেলাইট'। কারণ এগুলো তৈরি করা হয় একটির ভিতরে আরেকটি লুকিয়ে রাখার মত নকশা করে। ঠিক যেমন রাশিয়ার ঐতিহ্যবাহী কাঠের পুতুল 'মাত্রুশকা'। এক্ষেত্রেও একটি পুতুলের ভেতরে আরো ছোট একটি পুতুল থাকে। এই শিশু কসমসও একইভাবে আমেরিকান স্যাটেলাইটটিকে অনুসরণ করতে থাকে, পরে ধীরে ধীরে ঘুরে গিয়ে আরেকটি রুশ উপগ্রহের দিকে চলে যায়। এরপর ঘটে সেই তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা— ছোট স্যাটেলাইটটি মার্কিন স্যাটেলাইট লক্ষ্য করে ছুড়ে দেয় একটি প্রজেক্টাইল, যার গতি ছিল ঘণ্টায় প্রায় ৭০০ কিলোমিটার। ক্রেমলিন দাবি করেছিল, এটি নাকি কেবল নিজেদের স্যাটেলাইটের অবস্থা পরীক্ষার জন্য করা একটি নিয়মিত মহড়া। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের প্রতিরক্ষা কর্তৃপক্ষ বিষয়টিকে দেখেছে ভিন্নভাবে। তাদের দৃষ্টিতে এটি ছিল একটি মহাকাশীয় অস্ত্রের বাস্তব প্রয়োগ, বা অন্তত এমন সম্ভাবনার একটি পরীক্ষামূলক ধাপ।

অবশ্য অ্যামেরিকাও অন্যান্য দেশের স্যাটেলাইটের ওপর একইভাবে নজরদারি চালায়। তারাও নিজস্ব মহাকাশ-অস্ত্র নিয়ে সক্রিয় গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছে। তার পরেও এই ঘটনাটি অ্যামেরিকাকে প্রবলভাবে ক্ষুব্ধ করেছিল। কারণ তাদের মতে এটি ছিল প্রচলিত মহাকাশ আচরণবিধির এক স্পষ্ট লঙ্ঘন। মহাকাশে

সরাসরি অস্ত্র প্রয়োগের ঘটনা। এখানেও সেই পুরোনো সমস্যাটিই ফিরে আসে। এই আচরণবিধিগুলোর কোনোটিই আন্তর্জাতিকভাবে অনুমোদিত আইনের মাধ্যমে সংরক্ষিত নয়। এমনকি মহাকাশে অস্ত্র ব্যবহার বা স্যাটেলাইট ধ্বংস করার মতো আচরণকে নিষিদ্ধ বা সীমিত করার মতো আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কোনো আইনও এখন পর্যন্ত নেই। তাই স্যাটেলাইটের ওপর এমন হুমকি আজ প্রতিটি দেশের জন্যই গুরুতর উদ্বেগের বিষয়।

বিষয়টিকে হালকা করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। কারণ স্যাটেলাইট এখন আর কেবল টিভি সংকেত বা ফোন কল প্রেরণের মাধ্যম নয়, এগুলো আধুনিক জীবন ও যুদ্ধ—দুইটিরই অবিচ্ছেদ্য অংশ। একটি গুরুত্বপূর্ণ স্যাটেলাইট অকেজো হয়ে গেলে বা অন্ধ হয়ে পড়লে নাগরিক জীবনে তার প্রভাব হতে পারে তাৎক্ষণিক এবং বিধ্বংসী। এমন হলে গাড়ির জিপিএস কাজ করবে না, এটিএম কার্ড কাজ করবে না, ব্যাংকিং সেবা বিঘ্নিত হবে। খবর জানতে টেলিভিশন চালালে পর্দায় দেখা যাবে শুধু এক শূন্য নীল পর্দা। এই ধাক্কা কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রূপ নিতে পারে ভয়াবহ বিশৃঙ্খলায়। দিন কয়েকের মধ্যেই দোকানে খাবার পৌঁছানো বন্ধ হয়ে যাবে, অনলাইন অর্ডার আসবে না, সুপারমার্কেটের তাক থাকবে খালি। জিপিএস না থাকলে জাহাজ ও বিমানের নেভিগেশন বিঘ্নিত হবে। আর চরম পরিস্থিতিতে বিদ্যুৎ গ্রিডই পুরোপুরি ধ্বসে পড়তে পারে। আবহাওয়ার খবর পাওয়ার আশা তো একরকম ভুলেই যেতে হবে।

সামরিক দিক থেকেও এর প্রভাব হবে ভয়াবহ। বর্তমানে উন্নত বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশ গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ, নজরদারি ও প্রতিরক্ষার জন্য স্যাটেলাইটের ওপর নির্ভরশীল। এই ব্যবস্থার ওপর আঘাত মানেই গোটা সামরিক কমান্ড কাঠামোকে অন্ধ করে দেওয়া। যদি কোনো দেশের কয়েকটি সামরিক স্যাটেলাইট একযোগে ধ্বংস হয়ে যায়, তাহলে উচ্চপর্যায়ের কর্তৃপক্ষ সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কা করবে যে, এটি হয়তো স্থলভাগে বড় মাপের আক্রমণের আগাম সংকেত। এর চেয়েও ভয়াবহ হলো, পরমাণু অস্ত্র হামলার আগাম সতর্কবার্তা দেওয়ার সিস্টেমও বিকল হয়ে যেতে পারে। সেই পরিস্থিতিতে কর্তৃপক্ষের সামনে প্রশ্ন দাঁড়াবে: 'আমরাই আগে আঘাত করব, নাকি অপেক্ষা করব?' এমন মুহূর্তে সামান্য ভুল বোঝাবুঝিও পারমাণবিক বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দিতে পারে পৃথিবীকে। এমনকি যদি যুদ্ধ কেবল প্রচলিত অস্ত্রের মধ্যেও সীমাবদ্ধ থাকে, স্যাটেলাইটের অনুপস্থিতিতে সম্ভাব্য প্রতিপক্ষ এক ধরনের কৌশলগত অদৃশ্যতা অর্জন করবে। আক্রমণকারী পক্ষ

গোপনে সৈন্য স্থানান্তর করতে পারবে, নির্ভুলভাবে আঘাত হানতে পারবে, আর নিজের অবস্থান অদৃশ্য রাখতে পারবে। অন্যদিকে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষের এনক্রিপটেড যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়বে, তাদের যুদ্ধক্ষেত্রের সমন্বয় অচল হয়ে পড়বে।

এখন এসব বিষয় আর নিছক কল্পনা নয়। বরং এগুলো এক বাস্তব ও ক্রমবর্ধমান হুমকি। ইতোমধ্যেই রাশিয়া, চীন, অ্যামেরিকা, ভারত এবং ইসরায়েল নিজদের মতো করে 'স্যাটেলাইট-কিলার' অস্ত্রব্যবস্থা তৈরি করেছে। এসব বিশেষ মহাকাশ–অস্ত্র স্যাটেলাইট ধ্বংসের জন্যই নকশা করা হয়েছে। কেউ লেজার দিয়ে স্যাটেলাইট 'শুট ডাউন' করতে চায়। কেউ আলো বা সংকেত ছুঁড়ে স্যাটেলাইটকে এমনভাবে আলোকিত করে দেয় বা যোগাযোগ ব্যাহত করে, যাতে এটি সংকেত পাঠাতে বা ডেটা সংগ্রহ করতে না পারে। কেউ রাসায়নিক স্প্রে দিয়ে যোগাযোগ ব্যাহত করে, আবার কেউ সরাসরি ধাক্কা দিয়ে স্যাটেলাইটকে ভূপাতিত করে দেয়। আর বিপদ এখানেই। বর্তমানে মহাকাশে সামরিক কার্যক্রম, স্যাটেলাইটের দূরত্ব বজায় রাখা, বা কোন ধরনের মহড়া অনুমোদিত—এই বিষয়গুলো নিয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট, কার্যকর ও সর্বজনীন আন্তর্জাতিক আইন বা চুক্তি নেই। ফলে, এক দেশের একটি সাধারণ মহড়া বা সামান্য নেভিগেশনাল ক্রটিকে অপর দেশ আসন্ন হামলা হিসেবে ভুল করতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র সরকার এই হুমকি মোকাবিলায় প্রতিরক্ষা প্রতিষ্ঠান লকহিড মার্টিনের সঙ্গে মিলে তৈরি করছে 'স্পেস ফেন্স' নামের একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন নজরদারি ব্যবস্থা। এটি মূলত একটি ভূমি-ভিত্তিক রাডার নেটওয়ার্ক, যার কাজ হবে মহাকাশে থাকা সক্রিয় স্যাটেলাইটের পাশাপাশি মহাশূন্যে ঘুরে বেড়ানো অব্যবহৃত স্যাটেলাইট, ধ্বংসাবশেষ ও অন্যান্য বস্তু শনাক্ত করা। বর্তমানে মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ প্রায় ২০,০০০টি এমন বস্তু শনাক্ত ও ট্র্যাক করতে সক্ষম। তবে তারা আশা করছে, নতুন এই নজরদারি ব্যবস্থার মাধ্যমে খুব শিগগিরই ১,০০,০০০ বস্তুকে ট্র্যাক করা সম্ভব হবে। এমনকি কোনো স্যাটেলাইটে লেজার হামলা হলে, তার উৎসও সুনির্দিষ্টভাবে শনাক্ত করা যাবে।

কিন্তু শুধু নজরদারিই যথেষ্ট নয়। কারণ পৃথিবী-সংলগ্ন মহাকাশে কোনো সংঘাত দেখা দিলে তা আরো এক ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনবে। একবার সংঘর্ষ শুরু হলে তা হবে ডোমিনো প্রভাবের মতো। একটি স্যাটেলাইট ভেঙে তৈরি হওয়া টুকরো অন্য স্যাটেলাইটে গিয়ে আঘাত করবে। সেখান থেকে আবার নতুন ধ্বংসাবশেষ তৈরি হবে এবং এই চক্র চলতেই থাকবে। ফলে মহাকাশে অজস্র

ধ্বংসাবশেষ ছড়িয়ে পড়বে, যা ঘণ্টায় হাজার কিলোমিটার গতিতে ছুটে বেড়াবে এবং বিভিন্ন দেশের স্যাটেলাইট অবকাঠামোতে আঘাত হানবে। এই ধরনের ঘটনাকে বলা হয় 'কেসলার ইফেক্ট'। ১৯৭৮ সালে নাসার বিজ্ঞানী ডোনাল্ড কেসলার এই সম্ভাব্য পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারনা দিয়েছিলেন। এই ধরনের ঘটনা ঘটলে কক্ষপথ কার্যত ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে পড়তে পারে এবং বিশ্ব অর্থনীতিতে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

আসলে এই বিপদ ভবিষ্যতের নয়, বর্তমানেই এই পরিস্থিতির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এই মুহূর্তেই পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে প্রায় ৩,০০০ অচল স্যাটেলাইট এবং ১০ সেন্টিমিটার বা তার চেয়ে বড় অন্তত ৩৪,০০০টি ধাতব টুকরো। এছাড়া রয়েছে অগণিত ক্ষুদ্র টুকরো বস্তু, যেগুলো শনাক্ত করাই কঠিন। এই মহাকাশীয় আবর্জনার যে কোনোটি সক্রিয় স্যাটেলাইটে গিয়ে আঘাত করলে 'চেইন রিঅ্যাকশন' তৈরি হয়ে একে একে আরো বহু স্যাটেলাইট ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। সব মিলিয়ে বিশৃঙ্খলা তৈরি হওয়া সময়ের ব্যাপার মাত্র। তবে জাপানের মতো কিছু দেশ ইতোমধ্যেই এর সমাধানে উদ্যোগ নিয়েছে। আপনি যদি কখনো জাপানে গিয়ে থাকেন, তাহলে নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন—সেখানে রাস্তা-ঘাটে কোথাও কোনো আবর্জনা নেই। একই পরিচ্ছন্নতার ভাবনা তারা মহাকাশেও প্রয়োগ করতে চাইছে। জাপানের 'স্কাই পারফেক্ট কর্পোরেশন' এবং সরকার মিলে এমন একটি স্যাটেলাইট তৈরিতে কাজ করছে, যা লেজার রশ্মির মাধ্যমে মহাকাশের ধ্বংসাবশেষ ঠেলে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে নামিয়ে আনবে, যেখানে তা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। এমনকি ব্রিটিশরাও (যারা আবর্জনা ফেলার জন্য কুখ্যাত) এখন একই ধরনের প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা শুরু করেছে।

হয়তো মহাকাশে যুদ্ধ কখনোই বাস্তবে ঘটবে না। কিন্তু পৃথিবীতে যেমন প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা করা হয় 'যদি ঘটে' এই আশঙ্কা থেকে, তেমনি মহাকাশেও প্রস্তুতি চলছে সম্ভাব্য সংঘাতের কথা মাথায় রেখে। তার মানে এই নয় যে যুদ্ধ অবশ্যই হবে; বরং যুদ্ধ হলে আমরা প্রস্তুত কিনা, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

তবে এই দিকেই আমাদের যেতে হবে, তার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। ইতিহাস কেবল সংঘাত দিয়ে রচিত হয়নি। প্রতিযোগিতার পাশাপাশি সহযোগিতা ও আন্তর্জাতিক সংহতিরও অনেক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রয়েছে। বিংশ শতকই ছিল এরকম দ্বৈত বৈশিষ্ট্যের যুগ। এই শতাব্দীতে একদিকে যেমন ছিল স্নায়ু যুদ্ধের সামরিক উত্তেজনা ও পারমাণবিক উদ্বেগ, অন্যদিকে তৈরি হয়েছিল জাতিসংঘের

মতো বৈশ্বিক সংস্থা, আন্তর্জাতিক আইন। পারস্পরিক যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশও ঘটেছে ঠিক এই সময়েই। এমনকি স্নায়ুযুদ্ধের সময়ও সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে 'হটলাইন' স্থাপন করা হয়েছিল, যাতে কোনো পক্ষ ভুলবশত পারমাণবিক হামলার নির্দেশ দিচ্ছে বলে সন্দেহ হলে দুই নেতা সরাসরি কথা বলতে পারেন। দুই পরাশক্তির নেতারা তখনই বুঝেছিলেন যে, পারমাণবিক যুদ্ধ মানেই সবাই পরাজিত হওয়া। এই উপলব্ধি থেকেই 'মিউচ্যুয়ালি অ্যাসিওরড ডেস্ট্রাকশন' বা 'নিশ্চিত পাস্পরিক ধ্বংস' নামক ধারণার জন্ম। এর মূল কথা হলো— দুই পক্ষের হাতেই এমন ক্ষমতা থাকবে যে, একটি পক্ষ পারমাণবিক হামলা চালালে অপর পক্ষের পাল্টা হামলায় দুই পক্ষই ধ্বংস হবে। এই মতবাদ যেমন স্নায়ু যুদ্ধের সময় যুক্তির দিক থেকে 'পাগলাটে' ছিল, ভবিষ্যতেও তাই থাকবে। কিন্তু এটি তখন কার্যকর হয়েছিল। মহাকাশ যুদ্ধের প্রশ্নেও ভবিষ্যতে হয়তো বিশ্বনেতারা এমনই কোনো বাস্তব উপলব্ধিতে পৌঁছাবেন, যেখানে সংঘাত নয় বরং প্রতিরোধ আর পারস্পরিক বোঝাপড়াই হবে মূল ভিত্তি।

অবশ্য, একটি সম্ভাব্য ঝুঁকি বরাবরই থেকে যায়। কোনো দেশ সীমিত পরিসরে একতরফা হামলা চালিয়ে কৌশলগত সুবিধা নিতে চাইতে পারে। তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেশগুলো মিউচ্যুয়ালি অ্যাসিওরড ডেস্ট্রাকশন ধারণার ভিত্তিতে এমন আত্মঘাতী ঝুঁকি নিতে চাইবে না। যুক্তির দৃষ্টিতে এই ভাবনাটি যতটা 'অবাস্তব' বা 'পাগলামি' মনে হোক না কেন, স্নায়ুযুদ্ধের সময় এটি কার্যকর ছিল এবং ভবিষ্যতের মহাকাশ রাজনীতিতেও হয়তো এমন প্রতিরোধমূলক ভারসাম্য বজায় থাকবে। তবে স্নায়ু যুদ্ধের সময় যেমন পরোক্ষভাবে কিছু যুদ্ধ হয়েছিল— যেমন কোরিয়া, ভিয়েতনাম বা আফগানিস্তানে—তেমনি মহাকাশেও হয়তো 'সীমিত সংঘর্ষ' ঘটবে। তবে সেসব সংঘর্ষ মানব অস্তিত্বের জন্য সরাসরি হুমকি না হয়ে শক্তির প্রদর্শন ও প্রতিরোধের কৌশল হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ার সম্ভাবনাই বেশি। এমন অবস্থায় প্রয়োজন হবে কূটনৈতিক চ্যানেল খোলা রাখা এবং একটি 'স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিউর' বা প্রতিষ্ঠিত বিধিমালা, যার ভিত্তিতে বিশ্বাস তৈরি হয় ও উত্তেজনা কমে।

হয়তো আমাদের নেতাদের উচিত হবে সত্যি সত্যি স্পেসস্যুট পরে ভ্রমণে যাওয়া। নাসার মহাকাশচারী কারেন নাইবার্গ একবার বলেছিলেন, "আমি যদি প্রতিটি মানুষকে অন্তত একবার পৃথিবীর চারপাশের কক্ষপথে ঘোরাতে পারতাম, তবে আমার বিশ্বাস, পৃথিবীর সবকিছুই কিছুটা ভিন্নভাবে চলত।" তিনি মূলত

পরিবেশবাদ নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, কিন্তু একই কথা কূটনীতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় মহাকাশনীতির অন্যতম প্রতিশ্রুতি হলো— 'মহাকাশের স্বাধীনতা বজায় রেখে অন্যদের সঙ্গে সহযোগিতার মাধ্যমে মানবজাতির কল্যাণ বৃদ্ধি করা'। যদি পৃথিবীর প্রতিটি দেশ সত্যিই এই দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করত, তাহলে হয়তো আমাদের ভবিষ্যৎ এতটা বিভক্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ না হয়ে বরং আশাব্যঞ্জক হতো। কল্পনা করুন এমন এক ভবিষ্যৎ— যেখানে মার্কিন কংগ্রেস নাসার সঙ্গে চীনের সহযোগিতার পথে থাকা বৈরিতা দূর করে চীনের মতো দ্রুত বিকাশমান মহাকাশ শক্তির সঙ্গে অংশীদারিত্ব গড়ে তুলছে। সেই ভবিষ্যতে হয়তো জাপান এবং দক্ষিণ কোরিয়াও নিজেদের মধ্যকার রাজনৈতিক ও সামরিক দ্বন্দ্ব কাটিয়ে মহাকাশ গবেষণায় হাত মেলাচ্ছে। আর এই উদ্যোগের সঙ্গে অ্যামেরিকান, চীনা, ভারতীয় এবং অন্যান্যরা যুক্ত হয়ে গড়ে তুলছে এক বৈশ্বিক মহাকাশ উদ্যোগ। এই উদ্যোগে প্রত্যেকে তাদের নিজস্ব প্রযুক্তি, সম্পদ এবং জ্ঞান একত্রিত করছে, যার ফলে মানবজাতির সামনে খুলে যাচ্ছে মহাকাশের উন্মুক্ত দ্বার।

এই রকম এক বিশ্বে দশ বছর পর হয়তো আমরা দেখতে পাব, আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন বিশ-কক্ষবিশিষ্ট বিলাসবহুল হোটেলে রূপ নিয়েছে। হোটেলটির নাম হয়তো 'ইন্টারন্যাশনাল মাস্ক স্পেসটেল'। সেখানে অতিথিরা একদিকে যেমন মহাকাশের অপার সৌন্দর্য অবলোকন করছেন, অন্যদিকে ফ্রিজ-ড্রায়েড মহাকাশীয় খাবারের সূক্ষ্ম স্বাদ উপভোগ করছেন। এক সপ্তাহের জন্য ১০ মিলিয়ন ডলারের এই ভ্রমণ প্যাকেজের মধ্যে থাকছে বিনামূল্যে একবার মহাশূন্যে হাঁটার সুযোগ এবং হোটেল থেকে মাত্র ৫০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত 'ওয়ার্ল্ড স্পেস ল্যাব'-এ ভ্রমণ। সেই মহাকাশীয় গবেষণাগারেই ২০২৮ সালে আলঝেইমার রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কৃত হয়েছিল। অতিথিরা চাঁদের নতুন ঘাঁটির সঙ্গেও ভিডিও কলে যুক্ত হতে পারবেন। যদিও সেখানে মাত্র বারো জন কর্মী থাকায় তারা কল নাও ধরতে পারে। আসলে, কিছু কিছু জিনিস কখনোই বদলায় না!

বিশ বছর পরের পৃথিবী আরো বেশি করে তাকিয়ে আছে মহাকাশের দিকে। মহাকাশযানগুলো দীর্ঘ ভ্রমণের পথে এগিয়ে যাওয়ার আগে পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথে জ্বালানি ভরছে। কেউ যাচ্ছে বৃহস্পতি বা শনির দিকে, কেউ বা নামছে চাঁদে। থ্রিডি প্রিন্টিং প্রযুক্তির মাধ্যমে চাঁদের মাটিতেই তৈরি হচ্ছে বিশাল বিশাল সৌর প্যানেল।

এসব সৌর প্যানেল ব্যবহার করা হচ্ছে বহুজাতিক 'গেটওয়ে' ঘাঁটিগুলোতে। আবার কিছু সৌর প্যানেল মহাকাশযানেই বসানো হচ্ছে, যাতে করে এগুলো মঙ্গলগ্রহ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে। কিছু মঙ্গলগ্রহযাত্রী ছয় মাসের দীর্ঘ যাত্রা নিয়ে এখনও ক্ষুব্ধ হয়। তখন তাদের মনে করিয়ে দেওয়া হয়, মঙ্গল প্রায় ৯ কোটি কিলোমিটার দূরে, আর একসময় তো যুক্তরাজ্য থেকে জাহাজে চেপে অ্যামেরিকায় যেতেও দুই মাস সময় লাগত! তবে এসব যুক্তিতে তারা খুব একটা আশ্বস্ত হয় না, কিছুটা অসন্তোষ নিয়েই রওনা দেয়। রওনা দেবার সময় তাদের চোখে পড়ে চাঁদের অদেখা পৃষ্ঠে অবস্থিত চীন ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের ঘাঁটিগুলো। এদিকে কিছু মহাকাশযানে আছে শুধু রোবটিক গবেষকদল। এরা গভীর মহাশূন্যে ছুটে চলার পথে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালাচ্ছে। আরো কাছাকাছি বিশাল কোনো এক গ্রহাণুতে চলছে খনন। আর সেখানে এত বিশাল পরিমাণে খনিজ উত্তোলন হচ্ছে যে, সেগুলোকে আর দুর্লভ খনিজ হিসেবে ধরা হয় না। ওদিকে স্বর্ণের দাম পড়ে গেছে। কারণ বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে, বৃহদাকার 'মিডাস' গ্রহাণুর ১২ শতাংশই স্বর্ণ নামের এই ধাতু দিয়ে গঠিত।

২০৬০ সালের মধ্যে মঙ্গলে শুরু হয়েছে 'টেরাফর্মিং' নামে এক অভূতপুর্ব বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা। এই শব্দটির অর্থ হলো, কোনো গ্রহকে মানুষের বসবাসের উপযোগী করে তোলা। এই প্রকল্পে অংশ নিয়েছে শতাধিক সদস্যের বহুজাতিক বিজ্ঞানীদল। ২০৫৪ সালে বিজ্ঞানীরা এমন একটি পদ্ধতি খুঁজে পান, যার মাধ্যমে মঙ্গলগ্রহের গ্রিনহাউস গ্যাস উত্তপ্ত করে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। আর তাতে মেশানো হয় অবশিষ্ট থাকা বিপুল ক্লোরোফ্লুরোকার্বন। আর এর ফলে সূর্যের তাপ আটকে রাখা সম্ভব হয় মঙ্গলের পৃষ্ঠে। এর ফলে ঘটে এক চেইন রিঅ্যাকশন। এই বিক্রিয়ার ফলে ধীর ধীরে মঙ্গলের বরফ গলে যায়, বায়ুমণ্ডলে তাপমাত্রা বাড়তে থাকে এবং ধীরে ধীরে মঙ্গলের পরিবেশ মানুষ বসবাসের উপযোগী হয়ে উঠতে শুরু করে। ধারণা করা হচ্ছে, ২০৭৫ সালের মধ্যেই হয়তো স্পেসস্যুট ছাড়া মঙ্গলের মাটিতে হাঁটা সম্ভব হবে।

এখন পর্যন্ত যা কিছু বলা হলো, তা অন্তত তাত্ত্বিকভাবে আমাদের নাগালের ভেতরে। তবে আমরা যত দূরে যাব, বিষয়গুলো ততই কল্পবিজ্ঞানের মতো হয়ে উঠবে। মহাকাশযানের পেছনে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে গভীর-মহাশূন্য ভ্রমণের জন্য প্রয়োজনীয় গতি সঞ্চারের যে চিরাচরিত ধারণা ছিল, ২০৮০ সালের মধ্যেই তা পরিত্যক্ত হয়েছে। এর বদলে এখন ব্যবহৃত হচ্ছে ক্ষুদ্র হাইড্রোজেন

বোমা, যা নিরাপদ দূরত্বে মহাকাশযানের সামনে বিস্ফোরিত হয়। এর ফলে সৃষ্ট 'গ্র্যাভিটি ওয়েভ' সাময়িকভাবে স্থানকে বিকৃত করে দেয়, আর সেই ফাঁকেই থ্রাস্টার চালিয়ে মহাকাশযানকে কয়েক লক্ষ কিলোমিটার গতিতে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হয়। তবু, আমরা এখনো অনেক রহস্যের খোলস ভেদ করতে পারিনি। প্লুটো অবধি পৌঁছাতে দুই বছর লেগেছিল একদল মহাকাশচারীর, কিন্তু সেখান থেকে আমাদের সবচেয়ে কাছের নক্ষত্র প্রোক্সিমা সেন্টরাই এখনও ২০,০০০ বছর দূরে! ফলে মহাকাশচারীদের ক্রায়োজেনিক ঘুমে রাখার পরিকল্পনাটা কোনো কাজেই আসেনি। ভ্রূণকে রোবট আর কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার মাধ্যমে প্রতিপালন করার যে পরিকল্পনা ছিল, সেটাও বাতিল। তার ওপরে, নৈতিক কারণে 'প্ল্যানেটারি কাউন্সিল অন এথিকস' সেই ধারণা বাতিল করে দিয়েছে।

মহাবিশ্ব অনন্ত। আর এই অনন্তের মাঝে সম্ভাবনাও অসীম। এই কারণেই বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনি এত আকর্ষণীয়। কিন্তু নিকট ভবিষ্যতে আমরা আমাদের জ্ঞানের সীমারেখায় একই সঙ্গে মুক্তও এবং আবদ্ধও। আমরা মুক্ত, কারণ এই জ্ঞান আমাদের তারার দিকে হাত বাড়াতে দিয়েছে। এই জ্ঞান মানব ইতিহাসে একদমই সাম্প্রতিক অর্জন। আবার আবদ্ধ, কারণ সেই জ্ঞান মহাশূন্যের অগাধ দূরত্ব আর প্রাকৃতিক নিয়মকে অতিক্রম করতে পারে না।

যতক্ষণ না আমরা আলোর বেগে বা অন্তত তার কাছাকাছি গতিতে চলতে পারব, ততক্ষণ আমাদের জন্য সৌরজগতের বাইরে যাওয়া প্রায় অসম্ভব একটি কাজ। আর এমন গতি হয়তো আমরা কোনোদিনই অর্জন করতে পারব না। আমাদের চোখে মহাবিশ্বের যা কিছু ধরা পড়ে, তার সবই অত্যন্ত দূরে। সূর্যের সবথেকে কাছের কাছের নক্ষত্র প্রোক্সিমা সেন্টরাইয়ের আলো পৃথিবীতে পৌঁছাতে লাগে সাড়ে চার বছর। তার অর্থ হলো, পৃথিবী থেকে এই নক্ষত্রটির দূরত্ব প্রায় ৪০ ট্রিলিয়ন কিলোমিটার। আর রাতের আকাশে যখন আমরা অ্যান্ড্রোমিডা গ্যালাক্সি দেখি, তখন আমরা আসলে দেখছি অ্যান্ড্রোমিডা র ২৫ লাখ বছর আগের রূপ। অ্যান্ড্রোমিডা এতটাই দূরে যে তার আলো আমাদের চোখে আসতেই ২৫ লাখ বছর সময় লাগে। এই মুহূর্তে যদি অ্যান্ড্রোমিডা কে রাতের আকাশ থেকে সরিয়ে ফেলাও হয়, তবুও আগামী ২৫ লাখ বছর আমরা অ্যান্ড্রোমিডাকে দেখতেই থাকব। এদিকে আলোর গতির এক-দশমাংশ অর্জন করা থেকেও আমরা এখনও বহু দশক দূরে। এই বিশাল দূরত্ব আর আমাদের গতিসীমার বাস্তবতা গভীর-মহাশূন্য ভ্রমণকে

আপাতত কল্পবিজ্ঞান লেখক, কিছু উদ্ভাবনী তাত্ত্বিক এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের হাতে ছেড়ে দিচ্ছে।

তবু, দ্রুতগামী মহাকাশ ভ্রমণের স্বপ্ন পুরোপুরি ত্যাগ করা হয়নি। বরং, অতি দ্রুতগতি অর্জনের জন্য কয়েকটি বিকল্প তত্ত্ব ও প্রযুক্তি নিয়ে গবেষণা চলছে। তার একটি হলো, ক্ষুদ্র ওজনের মহাকাশযান ব্যবহার করা। কিছু বিজ্ঞানী প্রস্তাব করছেন, কম্পিউটার চিপের আকারের ছোট ছোট প্রোব পাঠানো যেতে পারে, যেগুলোর ওজন হবে মাত্র কয়েক গ্রাম। এই প্রোবগুলোর সঙ্গে যুক্ত থাকবে আল্ট্রাথিন লাইট সেইল, অর্থাৎ অতি পাতলা আলোকসংবেদী পাল। প্রোবগুলো মহাকাশে উৎক্ষেপণের পর নিজেদের ভাঁজ খুলে বিশাল পাল তৈরি করবে। এরপর পৃথিবী থেকে শক্তিশালী লেজার রশ্মি ছুঁড়ে দেওয়া হবে এই পালগুলোর ওপর, আর সেই আলোর ধাক্কাতেই এগিয়ে যাবে এই ক্ষুদ্র যানগুলো। তাত্ত্বিকভাবে, এই প্রক্রিয়ায় এগুলো আলোর গতির একটি উল্লেখযোগ্য ভগ্নাংশে পৌঁছাতে পারবে। এই ভাবনার উপর ভিত্তি করেই একটি বেসরকারি গবেষণা প্রকল্প চালু হয়েছে, যার নাম 'ব্রেকথ্রু স্টারশট'। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হলো প্রোক্সিমা সেন্টরাইয়ের কাছাকাছি একটি পৃথিবীসদৃশ গ্রহে প্রোব পাঠানো। প্রচলিত পদ্ধতিতে সেখানে পৌঁছাতে হাজার হাজার বছর লেগে যাওয়ার কথা। কিন্তু এই নতুন কৌশলে যাত্রার সময় ২০ বছরের মধ্যে নামিয়ে আনা সম্ভব হতে পারে। তারা এই ক্ষুদ্র প্রোবগুলোর নাম দিয়েছে: 'স্টার চিপ'। তবে, এই প্রযুক্তি বাস্তবায়নের পথে এখনো বহু বাধা রয়ে গেছে। সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হলো, এই যাত্রার জন্য যে শক্তিশালী লেজার প্রয়োজন, তা এখনো আবিষ্কারই হয়নি। এমনকি যদি তৈরি হয়ও, কিংবা অনেকগুলো একত্রে ব্যবহার করা যায়, তবুও সেগুলোকে স্বল্প সময়ে ১০০ গিগাওয়াট শক্তি উৎপন্ন করতে হবে। এই পরিমাণ শক্তি প্রায় ১০০টি পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের সম্মিলিত উৎপাদন ক্ষমতার সমান!

তবে বিজ্ঞানীরা বলছেন, এই তত্ত্বটি যথেষ্ট বাস্তবসম্মত। এই ধারণা আসলে সপ্তদশ শতাব্দীর জ্যোতির্বিদ জোহানেস কেপলারের কল্পনার সঙ্গেও মিলে যায়। তিনি তাঁর সমসাময়িক বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলির কাছে এক চিঠিতে লিখেছিলেন, "স্বর্গীয় বাতাসে চলার মতো জাহাজ বা পাল বানানো হলে, কেউ না কেউ নিশ্চয়ই একদিন সাহস করে ছুটে যাবে অসীম মহাশূন্যে।"

তবে আমার চিন্তা অন্য জায়গায়। যদি কোনোভাবে সেই লেজার রশ্মির নিশানা মিস করে চিপে না লেগে ৪ লাখ কিলোমিটার দূরে থাকা কোনো ভিনগ্রহী

মহাকাশযানে গিয়ে পড়ে, আর তারা নিরামিষাশী না হয়, তখন? তাহলে হয়তো তারা বলেই বসবে, "গ্রহটা তো দারুণ দেখাচ্ছে... আমরা নিয়ে নিচ্ছি!" হ্যাঁ, এটি নিছক কল্পনা, এমনটা ঘটার সম্ভাবনা খুবই খুবই ক্ষীণ। কিন্তু মহাকাশের মতো বিশাল একটা ক্ষেত্রে ক্ষীণ সম্ভাবনাও কখনো পুরোপুরি অগ্রাহ্য করা যায় না। কারণ, এই মহাবিশ্বে রয়েছে অগণিত গ্রহ। সেই হিসেবে, আমাদের মতো বুদ্ধিমান প্রাণের অস্তিত্ব অন্য কোথাও থাকা খুব একটা অবাস্তব নয়। বরং বিজ্ঞানী মহলের মতে, সেটাই বেশি যুক্তিগ্রাহ্য। এমনকি কিছু গণিতবিদ অনুমান করেন, মহাবিশ্বে পৃথিবীর মতো গ্রহের সংখ্যা নাকি আমাদের সমুদ্র সৈকতের সব বালুকণার সংখ্যার চেয়েও বেশি।

এই ধারণাটি এসেছে আধুনিক টেলিস্কোপ ও স্যাটেলাইট, বিশেষ করে কেপলার থেকে পাওয়া তথ্যের ওপর ভিত্তি করে। কেপলার টেলিস্কোপের মতো উন্নত যন্ত্রের কল্যাণে আমরা এখন এমনসব গ্রহ শনাক্ত করতে পারছি, যেগুলো আমাদের সৌরজগতের বাইরের। এদেরকে বলা হয় 'এক্সোপ্ল্যানেট'। এই এক্সোপ্ল্যানেটগুলোর মধ্যে অনেকগুলোর কক্ষপথ, ভর, গঠন ও দূরত্ব এমন যে, সেগুলিকে বাসযোগ্য বলে মনে করা হয়। এই পর্যবেক্ষণ থেকে যে বিপুল ডেটা তৈরি হচ্ছে, তা বিশ্লেষণ করে বোঝা যায়, পৃথিবী বুদ্ধিমান প্রাণের একমাত্র আবাসস্থল হওয়ার ধারণাটিই বরং পরিসংখ্যানগতভাবে অবাস্তব। এই বিশাল মহাবিশ্বে আমাদের মতো কোনো সভ্যতা নেই—এটি বিশ্বাস করা মানে 'এক ট্রিলিয়ন বনাম এক' এর ওপর বাজি ধরা।

কিন্তু প্রশ্ন উঠতে পারে, তাহলে এখনো পর্যন্ত ভিনগ্রহীরা ফোন করল না কেন? এই প্রশ্নের সবচেয়ে চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন প্রযুক্তি বিষয়ক সাইট CNET-এর এরিক ম্যাক। তিনি বলেন, "কল্পনা করুন, পৃথিবীর সব সমুদ্রসৈকতের বালুকণাগুলো এক জায়গায় আনা হলো। প্রতিটি বালুকণা ধরে নিন একটি করে গ্রহ। কিন্তু প্রতিটি কণা অন্যটি থেকে কয়েক ট্রিলিয়ন কিলোমিটার দূরে। এই হচ্ছে আমাদের মহাবিশ্বের অবস্থা।" তাই জ্যোতির্বিজ্ঞানী নিল ডিগ্রেস টাইসন যথার্থই বলেছেন, "মহাবিশ্বে কোনো প্রাণ নেই বলে দাবি করা একদমই অযৌক্তিক। ঠিক যেন সমুদ্র থেকে এক কাপ জল তুলে তাতে কোনো তিমি না দেখে বলা যে সমুদ্রে কোনো তিমি নেই।"

তবে, যদি সত্যিই কোথাও কেউ থাকে, তবে আমরা ইতোমধ্যেই তাদের জন্য একটি 'উপহার' পাঠিয়ে রেখেছি। সেটি হলো 'পাইওনিয়ার প্ল্যাক'। ৬ ইঞ্চি

বাই ৯ ইঞ্চি আয়তনের এই ধাতব ফলকটি ১৯৭২ সালে উৎক্ষেপণ করা 'পাইওনিয়ার ১০' মহাকাশযানে বসানো হয়েছিল। ২০03 সালের জানুয়ারি পর্যন্ত এর সংকেত ধরা গিয়েছিল, তার পর শক্তি শেষ হয়ে যায়। কিন্তু যানটি ছুটে চলেছে মহাবিশ্বের দিকে। সেই ফলকে এক ধরনের 'মানচিত্র' আঁকা আছে। যেখানে লেখা: 'আমরা এখানে আছি।'

পাইওনিয়ার প্ল্যাক ডিজাইন করেছিলেন দুই কিংবদন্তি জ্যোতির্বিজ্ঞানী কার্ল সেগান ও ফ্র্যাঙ্ক ড্রেক। তাঁদের যুক্তি ছিল—যদি মহাবিশ্বে কোনো বুদ্ধিমান প্রাণী থাকে, তবে তাদের কণ্ঠনালি বা শ্রবণশক্তি নাও থাকতে পারে; কিন্তু বিজ্ঞানের প্রাকৃতিক সূত্র সবার জন্যই অভিন্ন হবে। তাই, ফলকে খোদাই করা হয়েছিল ভিন্ন শক্তি অবস্থার দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু। হাইড্রোজেন পরমাণু এক অবস্থা থেকে আরেক অবস্থায় পরিবর্তিত হলে নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্য ও সময়ের এককসহ তড়িৎচুম্বকীয় বিকিরণ নির্গত হয়। এটি একটি সার্বজনীন বৈজ্ঞানিক মানদণ্ড, যা যেকোনো উন্নত সভ্যতা বোঝার কথা। এর পাশে রয়েছে একজন নারী ও একজন পুরুষের দেহের অবয়ব। পুরুষটির হাত উঁচু করে খোলা তালু দেখানো হয়েছে, যা পৃথিবীতে শুভেচ্ছার প্রতীক। তবে এটি ভিনগ্রহীদের কাছে হয়তো শুভেচ্ছা নয়, বরং আগ্রাসনের প্রতীকও মনে হতে পারে—আমাদের জানা নেই।

ফলকের কেন্দ্রে রয়েছে সৌরজগতের একটি রেডিয়াল ম্যাপ। যেখানে সূর্যের নিচে আমাদের সৌরজগতের গ্রহগুলো আঁকা। সূর্যের অবস্থান থেকে বিভিন্ন রেখা টানা হয়েছে। রেখাগুলো যুক্ত হয়েছে নির্দিষ্ট কিছু পালসারের সঙ্গে। পালসার হলো দ্রুতগতিতে ঘূর্ণমান নিউট্রন নক্ষত্র; এগুলোর পালস বা স্পন্দনের নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি থাকে। এই ফলকে প্রতিটি পালসারের পাশে এক ধরনের সংখ্যা দেওয়া আছে। সেগুলো হলো সেই পালসারের স্পন্দনকালের মান, আর সেই মানগুলো হাইড্রোজেন এককে প্রকাশ করা হয়েছে এবং বাইনারি সংখ্যায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। পালসারের স্পন্দন সময়ের সাথে নাগাল ধরে ধীরে ধীরে বদলায়। যদি একটি সভ্যতা আজকের পালসারের মান মাপে এবং ফলকে দেওয়া মানের সঙ্গে তুলনা করে, তারা সহজেই গণনা করে বের করতে পারবে যে এই ফলকটি কোন সময়ে তৈরী করা হয়েছিল। এভাবে পালসারসমূহ একটি কার্যকর মহাজাগতিক টাইমস্ট্যাম্প হিসেবে কাজ করে। ফলকের কেন্দ্রে সূর্যকে ছোট বৃত্ত দিয়ে দেখানো আছে এবং তার চারপাশে গ্রহগুলো ক্রমানুসারে আঁকা হয়েছে। তৃতীয় গ্রহ অর্থাৎ আমাদের পৃথিবীর কাছে একটি তীর আঁকা। এই তীর দিয়ে

ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে পাইওনিয়ার যানটি পৃথিবী ছেড়ে কোন দিকে গিয়েছে। এভাবে পৃথিবীর নির্দিষ্ট অবস্থান ও কোন দিকে প্রেরণ করা হয়েছে সেই দিক বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

তবে এই শুভেচ্ছাবার্তার একটি সীমাবদ্ধতাও আছে। এই মানচিত্র ব্যবহার করে সূর্য বা পৃথিবীকে শনাক্ত করা সম্ভব হবে হয়তো কেবল কয়েক মিলিয়ন বছর পর্যন্ত। আমাদের সূর্য মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করছে। মিল্কি ওয়ে গ্যালাক্সিকে একবার চক্কর দিতে সূর্যের লাগে প্রায় ২২৫–২৫০ মিলিয়ন বছর। অর্থাৎ, এক মিলিয়ন বছরে সূর্য তার কক্ষপথে অগ্রসর হয় প্রায় ১.৬ ডিগ্রি। দশ মিলিয়ন বছরে সেটি দাঁড়ায় প্রায় ১৬ ডিগ্রি। সমস্যা হলো, সূর্য একা নড়ছে না; আশেপাশের তারাগুলোও নিজেদের ভিন্ন ভিন্ন গতিতে ঘুরছে। ফলে প্রতিবেশী তারামণ্ডলী ও ছায়াপথের স্পাইরাল আর্মের বিন্যাস সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায়। এই মিশ্র গতির কারণে আকাশের নকশা কয়েক মিলিয়ন বছরের মধ্যে পাল্টে যাবে। ফলে যদি পাইওনিয়ার প্ল্যাক-এর সংকেত কোনো এক উন্নত সভ্যতার হাতে পৌঁছায়, তবে তা শিগগিরই হতে হবে।

মহাকাশ অন্বেষণ এখনো একদম প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, আমরা কোন পথে এগিয়ে যাব? প্রথম পথ হলো ওয়েস্টফালিয়ান মডেল। ১৬৪৮ সালের ওয়েস্টফালিয়া চুক্তি হলো আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ভিত্তি। এই চুক্তির মূল কথা হলো, প্রতিটি রাষ্ট্র তার ভূখণ্ডের ভেতরে সার্বভৌম, অন্য কেউ সেখানে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। যদি এই ধারণা মহাকাশে প্রয়োগ করা হয়, তবে চাঁদ, মঙ্গল বা মহাশূন্যের অন্যান্য জায়গা রাষ্ট্রীয় মালিকানায় ভাগ হয়ে যাবে। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, ভারত, ইউরোপ—যেসব দেশ মহাকাশে পৌঁছাতে পারবে, তারা নিজেদের সার্বভৌম এলাকা দাবি করবে। এর মানে দাঁড়াবে নতুন প্রতিদ্বন্দ্বিতা, ক্ষমতার লড়াই, এমনকি মহাকাশ উপনিবেশের জন্ম। অন্য পথ হলো অভিন্ন মানবজাতির ধারণা। মানুষ নিজেদের জাতি, রাষ্ট্র বা সীমারেখা দিয়ে আলাদা করে দেখবে না, বরং মানবজাতির অভিন্ন পরিচয়ের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে মহাকাশ অভিযানে নামবে। তখন মহাকাশ হবে যৌথ প্রচেষ্টার ক্ষেত্র, যেখানে সবাই মিলে জ্ঞান ভাগাভাগি করবে, ঝুঁকি সামলাবে, আর একসঙ্গে সম্পদ ব্যবহার করবে।

এখনও পর্যন্ত যা দেখা যাচ্ছে তাতে মনে হচ্ছে, আমরা সেই পুরোনো সুপরিচিত পথেই হাঁটছি। ইতিহাস আমাদের শিখিয়েছে, যতবারই নতুন কোনো ভূখণ্ড বা মহাসাগরের সন্ধান মিলেছে, শেষপর্যন্ত তার ফলাফল হয়েছে প্রতিযোগিতা,

ক্ষমতার লড়াই, আর বিজয়ীর হাতে নিয়ম ও সীমারেখা নির্ধারণের একচেটিয়া ক্ষমতা। কেউ যুক্তি দিতে পারেন, মহাকাশে কোনো বর্তমান মালিক নেই যাকে উৎখাত করতে হবে। সুতরাং যারা সাহস করবে, ঝুঁকি নেবে আর বিনিয়োগ করবে, সেই সুফল তাদেরই প্রাপ্য হওয়া উচিত। কিন্তু এমন যুক্তি দিলেও বাস্তবতা ভিন্ন। পৃথিবীতে যত সংঘাত আর অবিচার থাকুক না কেন, আমাদের সামনে এখন এমন এক যুগ এসেছে যখন পরস্পরের প্রতি বৈশ্বিক দায়বদ্ধতা নিয়ে একপ্রকার ঐকমত্য তৈরি হয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তন এই পারস্পরিক দায়বদ্ধতা প্রমাণও করেছে। কারণ এক জায়গার কার্বন নিঃসরণ আরেক জায়গার জীবনকে বিপন্ন করে। মহাকাশের অফুরন্ত সম্ভাবনার প্রশ্নেও আমাদের এই বোঝাপড়াটাই সবচেয়ে জরুরি। হ্যাঁ, হয়তো কেবল শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলোই মহাকাশযান পাঠাতে পারবে, প্রথম গ্রহাণুতে পা রাখতে পারবে বা চাঁদের বুকে খনন চালাবে। কিন্তু সেই সাফল্যের সুফল যেন পৃথিবীর সবার কাছে পৌঁছায়, সেটাই হওয়া উচিত আমাদের সভ্যতার লক্ষ্য।

পৃথিবীর সম্পদ সীমিত। আর সেই সীমাবদ্ধতার কারণেই প্রতিযোগিতা ও সংঘাত সৃষ্টি হয়। অথচ আমাদের মাথার ওপরেই মহাশূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছে '৩৫৫৪ আমুন' নামের একটি গ্রহাণু। এর ভেতরে আছে নিকেল, কোবাল্ট, লোহাসহ আরো নানা মূল্যবান ধাতু। বিজ্ঞানীরা হিসাব করে দেখিয়েছেন, শুধু এই একটিমাত্র গ্রহাণুর বাজারমূল্য হতে পারে প্রায় ২০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার। এটি যুক্তরাষ্ট্রের মোট জিডিপির সমান! এটি কোনো নিছক কল্পনা নয়। আর এটি তো কেবল একটি খণ্ড শিলা, এরকম আরো অগণিত খনিজসমৃদ্ধ বস্তু মহাশূন্য জুড়ে ছড়িয়ে আছে যেগুলো হয়তো আমাদের সামগ্রিক বৈশ্বিক চাহিদা মেটানোর জন্য যথেষ্ট।

এটা ভাবা খুবই সরলতা হবে যে, যেসব দেশ বা যেসব কোম্পানির মহাকাশযান এই ধরনের বিপুল সম্পদের ওপর অবতরণ করবে, তারা সহজেই তা অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নেবে। তাই, এখনই আমাদের এমন একটি কাঠামোবদ্ধ চুক্তি তৈরি করা প্রয়োজন, যেখানে মহাকাশ অভিযাত্রী দেশগুলো পারস্পরিক সহযোগিতায় প্রকল্প চালাবে। আর এইসব অভিযান থেকে পাওয়া লাভ ও জ্ঞান ভাগ করে নেবে। পাশাপাশি অর্জিত সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ বাকি বিশ্বকে হস্তান্তরের বাধ্যবাধকতাও থাকবে। উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক—পৃথিবীর নিম্ন কক্ষপথে বিশালাকৃতির সৌর প্রতিফলক বসানো সম্ভব। এই জিনিসটি সূর্যের আলোকে প্রতিফলিত করে এমনসব সৌর খামারগুলোতে পাঠাবে, যেগুলো

স্বাভাবিকভাবে অন্ধকারে থাকে। এটা করতে পারলে খামারগুলো দিনে ২৪ ঘণ্টাই চালু রাখা সম্ভব। এই প্রতিফলক নির্মাণের জন্য যে বিপুল ব্যয় হবে, তার একটি অংশ এমনভাবে বরাদ্দ করা যেতে পারে, যাতে উন্নয়নশীল দেশগুলো বিনামূল্যে এই বিদ্যুৎ পায়। এমন ধারণার সংখ্যা কল্পনার মতোই অসীম। এগুলো বাস্তবায়নযোগ্যও। লেখক আর্থার সি. ক্লার্ক একবার বলেছিলেন, প্রতিটি বৈপ্লবিক ধারণা সমালোচকদের চোখে তিনটি ধাপ অতিক্রম করে। প্রথমে বলা হয়, 'এটা কখনোই সম্ভব নয়, পুরোপুরি কল্পকাহিনি'। তারপর বলা হয়, 'হতে পারে সম্ভব, কিন্তু এর জন্য চেষ্টা করা ঠিক হবে না'। অবশেষে যখন সেটা সফল হয় তখন সবাই বলে, 'আমি তো শুরু থেকেই বলেছিলাম, এটি চমৎকার আইডিয়া!''

আমাদের নিজেদের স্বার্থেই আরো একটি ক্ষেত্র জরুরি সহযোগিতা দাবি করে। মহাশূন্যে এমন অনেক গ্রহাণু বা বস্তু আছে যেগুলো একদিন পৃথিবীর জন্য ভয়ংকর হুমকি হয়ে উঠতে পারে। সেগুলো সনাক্ত করা এবং আগেভাগেই ব্যবস্থা নেওয়ার কাজটা এককভাবে কোনো দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। ১৯০৮ সালে সাইবেরিয়ার তাঙ্গুশকা অঞ্চলে একটা উল্কাপিণ্ড আছড়ে পড়েছিল। এতে কয়েকশত বর্গকিলোমিটার জঙ্গল ধ্বংস হয়ে যায়। এর থেকে বড় কোনো খণ্ডও আছড়ে পড়তে পারে পৃথিবীতে। ডাইনোসররা তো কিছু বুঝতে পারেনি, কিন্তু আমরা তো এসব বুঝি। আর প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার প্রযুক্তিও আমাদের নাগালের মধ্যেই আছে।

অবশ্য মহাকাশে সহযোগিতা পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বৈরিতা শেষ করে দেবে, এটা ভাবাও বাস্তবসম্মত নয়। মার্কিন নভোচারীরা রুশ মহাকাশযানে ভর করে আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাতে দুই দেশের ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক উত্তেজনা কমেনি। তবে আগের দশকগুলোয় যখন তাদের মধ্যে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার ঝুঁকি অনেক বেশি ছিল, তখন প্রযুক্তিগত সহযোগিতাই ছিল শান্তির দরজা খোলার উপায়। ১৯৭৫ সালের সয়ুজ–অ্যাপোলো ডকিং তারই নিদর্শন।

আজ আমরা যখন মহাকাশ থেকে পৃথিবীর দিকে তাকাই, পৃথিবী নামের এই 'বিবর্ণ নীল বিন্দুটি' আমাদের এক অসাধারণ উপলব্ধির মুখোমুখি দাঁড় করায়। যখন মহাকাশচারীরা প্রথমবারের মতো একসাথে দাঁড়িয়ে পৃথিবীকে দেখেছিলেন, তখন তারা সীমান্ত, দেয়াল কিংবা মতবিরোধ দেখেননি। তারা দেখেছিলেন একটি নিঃসঙ্গ গ্রহ, যেখানে হাজারো বিভাজন থাকলেও ভাগ্য আসলে অভিন্ন। মহাকাশ

আমাদের সুযোগ করে দেয় সীমাহীন মহাবিশ্বকে উপলব্ধি করতে। আমাদের চিন্তাকে তার অসীমতার দিকে প্রসারিত করতে। মানুষ সব সময় আকাশের দিকে তাকিয়েছে। রাতের অন্ধকারে দূর নক্ষত্রলোকের দিকে তাকিয়ে স্বপ্নও দেখেছে। আজ আমরা সত্যিই সেই উচ্চতায় পৌঁছেছি, আর সেখান থেকে আরো ওপরে ওঠা আমাদের অনিবার্য নিয়তি। আমরা যদি একসাথে পথ চলি, তবে সেই গন্তব্যে পৌঁছানো আরো সহজ ও দ্রুততর হবে। আকাশ কখনোই কোনো সীমা নয়, বরং এটা হলো শুরু। এ এক অনন্ত সম্ভাবনার দুয়ার—যে দুয়ার আমাদের খুলতে হবে সবার সম্মিলিত প্রয়াসে।

তথ্যসূত্র

অধ্যায় ১: অস্ট্রেলিয়া

Attard, Bernard, 'The Economic History of Australia from 1788: An Introduction', EH.Net Encyclopedia, March 2006 https://eh.net/encyclopedia/the-economic-history-of-australia-from-1788-an-introduction/

'Border Lengths – States and Territories', Geoscience Australia, Australian Government https://www.ga.gov.au/scientific-topics/national-location-information/dimensions/border-lengths

Christie, Nancy J., '"Pioneering for a Civilized World": Gri th Taylor and the Ecology of Geography', *Scientia Canadensis*, vol. 17, nos 1–2 (1993), pp. 103–154 https://www.erudit.org/fr/revues/scientia/1993-v17-n1-2-scientia3119/800366ar.pdf

'Confluence of the Two Seas', speech by Prime Minister Shinzo Abe at the Parliament of the Republic of India, Ministry of Foreign Affairs of Japan, 22 August 2007 https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/pmv0708/speech-2.html

Curtin, John, 'The Task Ahead', *Herald* (Melbourne), 27 December 1941 http://john.curtin.edu.au/pmportal/text/00468.html

'Edward Hammond Hargraves', *Evening News*, 31 October 1891 https://trove.nla.gov.au/newspaper/article/111989656?searchTerm=Edward%20Hargraves&searchLimits=

Elkner, Cate, 'Immigration and Ethnicity: Overview', Electronic Encyclopedia of Gold in Australia https://www.egold.net.au/biogs/EG00006b.htm

'Geographic Distribution of the Population', Australian Bureau of Statistics, 24 May 2012 https://www.abs.gov.au/ausstats/abs@.nsf/Lookup/by%20Subject

/1301.0~2012~Mai
n%20Features~Geographic%20distribution%20of%20the%20
population~49
Hughes, Robert, *The Fatal Shore* (London: Collins Harvill, 1987)

Macfarlane, Ingereth (ed.), 'Aboriginal History', vol. 26 (2002)
https://press-
files.anu.edu.au/downloads/press/p73361/pdf/book.pdf
Rudd, Kevin, 'The Complacent Country',
KevinRudd.com, 4 February 2019
https://kevinrudd.com/2019/02/04/the-
complacent-country/
Schleich, Dr Anne-Marie, 'New Geopolitical Developments in the South Pacific: The Cases of Australia and New Zealand', *ISPSW Strategy Series: Focus on Defense and International Security*, no. 533 (2018)
https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-
interest/gess/cis/center-for-securities-
studies/resources/docs/ISPSW- 533%20Schleich.pdf
Ville, Simon, 'The Relocation of the International Market for Australian Wool', *Australian Economic History Review*, vol. 45, no. 1 (2005), pp. 73–95

Worgan, George Bouchier, letter written to his brother Richard Worgan, 12–18 June 1788
https://www.sl.nsw.gov.au/collection-items/collection-10-
george-bouchier-worgan- letter-written-his-brother-richard-
worgan-12-1

অধ্যায় ২: ইরান

Ansari, Ali M., Iran: A Very Short Introduction (Oxford: Oxford University Press, 2014) Ansari, Ali M., Iran, Islam and Democracy: The Politics of Managing Change (London: Gingko
Library/Chatham House, 2019)
Langton, James, 'The Day the Oil Came: Sixty Years Ago, the Sea Gave Up Its Secrets and Changed Abu Dhabi Forever',

The National, 28 March 2018
https://abudhabioil.thenational.ae
'Mapping the Global Muslim Population', Pew Research Center, 7 October 2009
https://www.pewforum.org/2009/10/07/mapping-the-globalmuslim-population/
'Saddam Hussein and His Advisers Discussing Iraq's Decision to Go To War with Iran', History and Public Policy Program Digital Archive, Conflict Records Research Center, National Defense University, 16 September 1980
https://digitalarchive.wilsoncenter.org/document/110099
'Their Last Chance?', The Economist: Special Report, 15 January 2004 https://www.economist.com/special-report/2004/01/15/their-last-chance

অধ্যায় ৩: সৌদি আরব

Acemoglu, Daron and Robinson, James A., The Narrow Corridor: How Nations Struggle for Liberty (New York: Penguin Books, 2020)
Al-Rasheed, Madawi, A History of Saudi Arabia (Cambridge: Cambridge University Press, 2010)
'Basic Law of Governance', The Embassy of the Kingdom of Saudi Arabia, 1 March 1992
https://www.saudiembassy.net/basic-law-governance
'Civilian Gasoline Supply Report', O ce of War Information, 13 October 1943
http://plainshumanities.unl.edu/homefront/homefront.docs.0015
'Diriyah: The Original Home of the Saudi State', Saudi Press Agency, 20 November 2019
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=en&newsid=2001219
Husain, Ed, The House of Islam: A Global History (New York: Bloomsbury, 2018)
'Ikhwan', GlobalSecurity,
https://www.globalsecurity.org/military/world/gulf/ikhwan.htm

‘King Abdulaziz Al Saud: Founder of the Kingdom of Saudi Arabia’, House of Saud, Saudi
Royal Family News and Information https://houseofsaud.com/king-abdulaziz-al-saud/ Riedel, Bruce, Kings and Presidents: Saudi Arabia and the United States Since FDR
(Washington, DC: Brookings Institution Press, 2019) ‘Saudi Arabia’, US Department of State Archive https://2009-2017.state.gov/documents/organization/171744.pdf
‘Saudi Arabia: Youth Unemployment Rate from 1999 to 2020’, Statista (2020) https://www.statista.com/statistics/812955/youth-unemployment-rate-in-saudi-arabia/

অধ্যায় ৪: যুক্তরাজ্য

Collier, Basil, The Defence of the United Kingdom: History of the Second World War (London: Her Majesty’s Stationery O ce, 1957)
Crane, Nicholas, The Making of the British Landscape: From the Ice Age to the Present
(London: Weidenfeld & Nicolson, 2017)

Harvey, Michael, ‘Perspectives on the UK’s Place in the World’, Chatham House: Europe Programme Paper 2011/01 (2011) https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/public/Research/Europe/1211pp_ha rvey.pdf
Lipscombe, Nick, ‘Napoleon’s Obsession: The Invasion of England’, British Journal for Military History, vol. 1, no. 3 (2015)
McKirdy, Alan and Crofts, Roger, Scotland: The Creation of Its Natural Landscape: A Landscape Fashioned by Geology (Perth: Scottish Natural Heritage, 1999)
Parker, Joanne, Britannia Obscura: Mapping Hidden Britain (London: Vintage, 2015) Simms, Brendan, Three Victories and a Defeat: The Rise and Fall of the First British Empire,
1714–1783 (London: Allen Lane, 2007)

'The Defence Implications of Possible Scottish Independence', House of Commons Defence Committee, vol. 1, Sixth Report of Session 2013–14 (2013) https://publications.parliament.uk/pa/cm201314/cmselect/cmdfence/198/198.pdf

অধ্যায় ৫: গ্রিস

Brunwasser, Matthew, 'The Greeks Who Worship the Ancient Gods', BBC News, 20 June 2013 https://www.bbc.co.uk/news/magazine-22972610

'Greece – Agricultural Sector', International Trade Administration: United States of America, 4 June 2019 https://www.export.gov/apex/article2?id=Greece-Agricultural- Sector

Greece Population 2020, World Population Review http://worldpopulationreview.com/countries/greece-population/

'King of Hellenes Murdered', The Times, 19 March 1913

'Lausanne Peace Treaty VI. Convention Concerning the Exchange of Greek and Turkish Populations Signed at Lausanne, January 30, 1923', Republic of Turkey: Ministry of Foreign Affairs, 30 January 1923 http://www.mfa.gov.tr/lausanne-peace-treaty-vi_-convention-concerning-theexchange-of-greek-and-turkish-populations-signed-at- lausanne_.en.mfa

'Military Expenditure (% of GDP)', The World Bank https://data.worldbank.org/indicator/MS.MIL.XPND.GD.ZS

Sienkewicz, Thomas J., 'The Hellenic Language is Immortal: The Grandeur of the Hellenic Language', Monmouth College https://department.monm.edu/classics/Courses/GREK101-102/HellenicLanguage.Shadowed.htm

Weiner, Eric, The Geography of Genius: A Search for the World's Most Creative Places from Ancient Athens to Silicon Valley (New York: Simon & Schuster, 2016)

অধ্যায় ৬: তুরস্ক

Alkan, Can; Kavak, Pinar; Somel, Mehmet; Gokcumen, Omer; Ugurlu, Serkan; Saygi, Ceren; Dal, Elif; Bugra, Kuyas; Güngör, Tunga; Sahinalp, S. Cenk; Özören, Nesrin; Bekpen, Cemalettin, 'Whole Genome Sequencing of Turkish Genomes Reveals Functional Private Alleles and Impact of Genetic Interactions with Europe, Asia and Africa', BMC Genomics, vol. 15, no. 1 (2014) https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4236450/

Arango, Tim, 'A Century After Armenian Genocide, Turkey's Denial Only Deepens', The New York Times, 16 April 2015 https://www.nytimes.com/2015/04/17/world/europe/turkeys-century-of-denial-about- anarmenian-genocide.html

Mandiraci, Berkay, 'Assessing the Fatalities in Turkey's PKK Conflict', International Crisis Group, 22 October 2019 https://www.crisisgroup.org/europe-central-asia/western-europemediterranean/turkey/assessing-fatalities-turkeys-pkk-conflict

'Mavi Vatan' ['Blue Homeland'], Turkish Naval War College (2019) https://www.msu.edu.tr/mavivatandanacikdenizleredergisi/mavivatan_baski.pdf

Murinson, Alexander, 'The Strategic Depth Doctrine of Turkish Foreign Policy', Middle Eastern Studies, vol. 42, no. 6 (2006), pp. 945–64

'Targeting Life in Idlib', Human Rights Watch, 15 October 2020 https://www.hrw.org/report/2020/10/15/targeting-life-idlib/syrian-and-russian- strikes-civilian-infrastructure

Turkish Presidency [@trpresidency], 'President Erdoğan: "Hagia Sophia's doors will be, as is the case with all our mosques, wide open to all, whether they be foreign or local, Muslim or non-Muslim"', 10 July 2020 https://twitter.com/trpresidency/status/1281686820556869632/photo/1

Westermann, William Linn, 'Kurdish Independence and Russian Expansion [1946]', Foreign Aßairs, vol. 70, no. 3 (1991)

https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/1991- 06-01/kurdish-independence-and-russian-expansion-1946

অধ্যায় ৭: সাহেল

'Areva and Niger: A sustainable partnership', Areva, February 2011 https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/50/062/50062650.pdf

Bassou, Abdelhak, 'State, Borders and Territory in the Sahel: The Case of the G5 Sahel', Policy Center for the New South, 6 October 2017 https://www.policycenter.ma/publications/state-borders-and-territorysahel-case-g5- sahel

Berger, Flore, 'West Africa: Shifting Strategies in the Sahel', The Africa Report, 30 September 2019 https://www.theafricareport.com/17843/west-africa-shifting-strategies-in-the-sahel/

'Beyond Aid: The UK's Strategic Engagement in Africa', Written evidence from the Foreign and Commonwealth O ce on behalf of Her Majesty's Government, House of Commons Foreign Affairs Committee (FAC) Inquiry (2019) http://data.parliament.uk/writtenevidence/committeeevidence.svc/evidencedocument/ foreign-affairs-committee/beyond-aid-the-uks-strategic-engagement-in-africa/written/105575.html

Comolli, Virginia, Boko Haram: Nigeria's Islamist Insurgency (London: Hurst, 2015) Cooper, Rachel, 'Natural Resources Management Strategies in the Sahel', K4D Helpdesk

Report, Institute of Development Studies, 1 October 2018 https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5c6acc2340f0b61a196aa83a/453_Sahel_ Natural_Resources_Management.pdf

Devermont, Judd, 'Politics at the Heart of the Crisis in the Sahel', Center for Strategic & International Studies, 6 December 2019 https://www.csis.org/analysis/politics-heart- crisis-sahel

Fortson, Danny, 'The Great Uranium Stampede: Everybody Wants Supplies as Nuclear Power Comes Roaring Back', The Sunday Times, 7 February 2010 https://www.thetimes.co.uk/article/the-great-uranium-stampede-c7p3m6h9xxd

'General Act of the Berlin Conference on West Africa', 26 February 1885 https://loveman.sdsu.edu/docs/1885GeneralActBerlinConference.pdf

'Getting a Grip on Central Sahel's Gold Rush', International Crisis Group, Report no.
282/Africa, 13 November 2019 https://www.crisisgroup.org/africa/sahel/burkina- faso/282-reprendre-en-main-la-ruee-vers-lor-au-sahel-central

Grove, A. T., 'Geographical Introduction to the Sahel', The Geographical Journal, vol. 144, no. 3 (1978), pp. 407–15

Le Roux, Pauline, 'Confronting Central Mali's Extremist Threat', Africa Center for Strategic Studies, 22 February 2019 https://africacenter.org/spotlight/confronting-central-malis-extremist-threat/

Lewis, David and McNeill, Ryan, 'How Jihadists Struck Gold in Africa's Sahel', Reuters Investigates: A Special Report, 22 November 2019 https://www.reuters.com/investigates/special-report/gold-africa-islamists/

Nicholson, Sharon E., 'Climate of the Sahel and West Africa', Oxford Research Encyclopedia, 26 September 2018 https://oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780190228620.001.0001/acrefore- 9780190228620-e-510

Taithe, Bertrand, The Killer Trail: A Colonial Scandal in the Heart of Africa (Oxford: Oxford University Press, 2009)

Watson, Abigail, 'ORG Explains #12: The UK's Pivot to the Sahel', Oxford Research Group, 27 January 2020 https://www.oxfordresearchgroup.org.uk/org-explains-the-uks-pivot- to-the-sahel

অধ্যায় ৮: ইথিওপিয়া

'Ethiopia Imports by Country', Trading Economics https://tradingeconomics.com/ethiopia/imports-by-country

'Ethiopia: The Criminal Code of the Federal Democratic Republic of Ethiopia', The Protection Project, Proclamation no. 414/2004 (2005) http://www.protectionproject.org/wp-content/uploads/2010/09/Ethiopia_Criminal-Code-TIP_2004.pdf

'Geopolitical Dynamics in the Horn of Africa and Mechanisms for Collaboration between NATO and IGAD Countries', NATO Strategic Direction South Hub/Institute for Peace and Security Studies, Addis Ababa University (2019) https://thesouthernhub.org/resources/site1/General/NSD-S%20Hub%20Publications/Geopolitical%20Dynamics%20in%20the%20Horn%20of%20 Africa%20and%20Mechanisms%20for%20Collaboration%20 between%20NATO%20and %20IGAD%20Countries.pdf

Getachew, Samuel and York, Geoffrey, 'Ethiopia's Latest Violence Exposes Ethnic Fault Lines, Threatening the Country's Democratic Dreams', The Globe and Mail, 20 July 2020 https://www.theglobeandmail.com/world/article-ethiopias-latest-violence-exposes- ethnic-fault-lines-threatening-the/

Kessels, Eelco; Durner, Tracey; Schwartz, Matthew, 'Violent Extremism and Instability in the Greater Horn of Africa: An Examination of Drivers and Responses', Global Center on

Cooperative Security (2016) https://www.globalcenter.org/wp-content/uploads/2016/05/GCCS_VIOLENT-EXTREMISM_low_3.pdf

Selassie, Haile, My Life and Ethiopia's Progress, 1892–1937: The Autobiography of Emperor Haile Selassie I, translated by Edward Ullendorff (Oxford: Oxford University Press, 1976)

Verhoeven, Harry, 'Black Gold for Blue Gold? Sudan's Oil, Ethiopia's Water and Regional Integration', Chatham House:

Briefing Paper (2011)
https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/19482_0611bp_verhoeven.pdf

অধ্যায় ৯: স্পেন

Aróstegui, Julio and Marco, Jorge, El último Frente. La Resistencia Armada Antifranquista en España, 1939–1952 (Madrid: Libros de la Catarata, 2008)
Bown, Stephen R., 1494: How a Family Feud in Medieval Spain Divided the World in Half
(New York: Thomas Dunne Books, 2012)
Gardner, David, 'Why Basques and Catalans See Independence Differently', Financial Times, 12 July 2019 https://www.ft.com/content/3ec93f84-a2a1-11e9-974c-ad1c6ab5efd1
Garr, Arnold K., Christopher Columbus: A Latter-day Saint Perspective (Provo, Utah: Religious Studies Center, Brigham Young University, 1992)
Gorostiza, Santiago, '"There Are the Pyrenees!" Fortifying the Nation in Francoist Spain', Environmental History, vol. 23, no. 4 (2018), pp. 797–823 https://academic.oup.com/envhis/article/23/4/797/5091299
Latham, Andrew, 'Medieval Geopolitics: The Iberian Crusades', Medievalists.net https://www.medievalists.net/2019/03/iberian-crusades/
'Letters of Pope Alexander II Concerning Just Warfare Against the Forces of Muslim Iberia (1063–1064)' (2012)
http://www.web.pdx.edu/~ott/hst399/Alexanderletters/index.html
Marco, Jorge, 'Rethinking the Postwar Period in Spain: Violence and Irregular Civil War, 1939–52', Journal of Contemporary History, vol. 55, no. 3 (2020), pp. 492–513 https://purehost.bath.ac.uk/ws/portalfiles/portal/190057157/Rethinking_the_post_war_ period.pdf
Pimenta, João; Lopes, Alexandra M.; Carracedo, Angel; Arenas, Miguel; Amorim, António; Comas, David, 'Spatially Explicit Analysis Reveals Complex Human Genetic Gradients in the

Iberian Peninsula', Nature, 24 May 2019 https://www.nature.com/articles/s41598- 019-44121-6
'The President's News Conference', Harry S. Truman: Library & Museum, National Archives, 23 August 1945 https://www.trumanlibrary.gov/library/public-papers/107/presidents-news-conference
'Spain: Charles II', Britannica https://www.britannica.com/place/Spain/Charles-II 'Spain Population 2020', World Population Review
https://worldpopulationreview.com/countries/spain-population/
'Substantial Minorities in Some Countries Hold Negative Stereotypes About Jews', Pew Research Center https://www.pewforum.org/2018/05/29/nationalism-immigration- and-minorities/pf_05-29-18_religion-westerneurope-01-20/
Webster, Jason, Violencia: A New History of Spain: Past, Present and the Future of the West
(London: Constable, 2019)

অধ্যায় ১০: মহাকাশ

'45 Years Ago: Historic Handshake in Space', NASA, 17 July 2020 https://www.nasa.gov/feature/45-years-ago-historic-handshake-in-space
'Challenges to Security in Space', Defense Intelligence Agency: United States of America (2019)
https://www.dia.mil/Portals/27/Documents/News/Military%20Power%20Publications
/Space_Threat_V14_020119_sm.pdf
Havercroft, Jonathan and Duvall, Raymond, '3 – Critical Astropolitics: The Geopolitics of Space Control and the Transformation of State Sovereignty', in Securing Outer Space: International Relations Theory and the Politics of Space, edited by Natalie Bormann and Michael Sheehan (New York: Routledge, 2009), pp. 42–58
'International Space Station Facts and Figures', NASA, 16 July 2020 https://www.nasa.gov/feature/facts-and-figures

Pappalardo, Joe, 'A 10-Year Odyssey: What Space Stations Will Look Like in 2030', Popular Mechanics, 10 June 2019 https://www.popularmechanics.com/space/satellites/a27886809/future-of-iss-space- station/

Rader, Andrew, Beyond the Known: How Exploration Created the Modern World and Will Take Us to the Stars (New York: Simon & Schuster, 2019)

Sagan, Carl, Pale Blue Dot: A Vision of the Human Future in Space (New York: Ballantine Books, 2011)

Slann, Phillip A., 'The Security of the European Union's Critical Outer Space Infrastructures' (thesis), Keele University (2015) https://core.ac.uk/download/pdf/43759498.pdf

'Space Fence: How to Keep Space Safe', Lockheed Martin https://www.lockheedmartin.com/en-us/products/space-fence.html

'The Artemis Accords: Principles for Cooperation in the Civil Exploration and Use of the Moon, Mars, Comets, and Asteroids for Peaceful Purposes', https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/926741/Artemis_Accords_signed_13Oct2020002_.pdf

অনুবাদক পরিচিতি



ইমরান ওয়াহিদ

গবেষক ও অনুবাদক। জন্ম চুয়াডাঙ্গা জেলায়। তথ্যপ্রযুক্তির সংযুক্তি ও প্রয়োগ পরামর্শক হিসেবে তাঁর ১৫ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে তিনি যুক্ত আছেন পুঁথি সম্পাদনা পর্ষদের সঙ্গে। ভৌগোলিক বাস্তবতা, প্রাচীন ইতিহাস এবং ভূরাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তাঁর আগ্রহের মূল ক্ষেত্র। বিশেষ করে প্রাচীন বাংলার ভূমি ও জনপদ গঠন, রাজনৈতিক পরিবর্তন এবং সামাজিক বিবর্তন নিয়ে তিনি দীর্ঘ গবেষণা করে আসছেন। একইসঙ্গে আধুনিক বিশ্বরাজনীতি, মানচিত্রায়ণ, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির কৌশল এবং প্রযুক্তিগত রূপান্তরের ভূরাজনৈতিক অভিঘাত সম্পর্কেও তিনি নিয়মিত লেখালেখি করেন। ইতিহাস ও বর্তমানকে সমান্তরালে বিচার করার চেষ্টা তাঁর লেখার অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

প্রচ্ছদ: রাশেদ আনোয়ার
